নিবেদিতা লোকমাতা

প্রথম খণ্ড

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : জন্মাষ্টমী ১৩৭৫
চতুর্থ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৯৮

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

ISBN 81-7215-038-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৭৫·০০

বিষয়সূচী

পূর্ব জীবন . ৯-১৭২

পূর্ব জীবন . ১১
বোন মে উইলসনের স্মৃতিকথা . ১৬
পটভূমিকা . ১৬
মিসেস উইলসনের লিখিত স্মৃতিকথা . ২৪
মিসেস উইলসন-কথিত স্মৃতি . ২৬
রিচমন্ড নোবলের স্মৃতিকথা . ৪১
অনুজের শ্রদ্ধা . ৪২
রেমঁ-হারবার্টকে পাঠানো রিচমন্ড নোবলের স্মৃতি . ৪৪
নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর মা, বোন ও ভাই . ৫১
মা . ৫১
বোন . ৬৫
ভাই . ৭৫

পূর্ব জীবনে লেখিকা . ৯৫
'দি ক্রাইস্ট চাইল্‌ড্‌' . ৯৬
'হ্যাগ রিডন্‌—সম্পূর্ণ অনুবাদসহ . ১০০
'এ ভিজিট টু এ কোল মাইন' . ১০৯
'পেপারস্‌ অন উইমেনস্‌ রাইট্‌স্‌' . ১১৬
'দেয়ার রাইট টু বি বিউটিফুল' . ১২৩
'দেয়ার রাইট টু সার্ভ' . ১২৬
'দেয়ার রাইট টু চুজ্‌ হাউসেস' . ১৩০
'দেয়ার রাইট টু অ্যাডভান্স' . ১৩৩
'দেয়ার রাইট টু নো' . ১৩৭
দেয়ার রাইট টু রুল' . ১৪০
'দি রেক্সহ্যাম ফ্রি লাইব্রেরী' . ১৪৩
[শিক্ষার পক্ষে] . ১৪৬
'অ্যামবুলেন্স্‌ ওয়ার্ক' . ১৪৭
'এ পেজ ফ্রম রেক্সহ্যাম লাইফ' . ১৪৯
'ফ্রেনলজি অ্যান্ড ফিজিয়নমি' . ১৫৪

পরিবর্তন যুগ . ১৫৯

ই টি স্টার্ডির চিঠি . ১৬২
লেডী ইস্যাবেল মার্গসনের চিঠি . ১৬৪
এরিক হ্যামন্ডের স্মৃতি . ১৬৪

ভগিনী নিবেদিতা ও ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু
[মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, শ্রীমতী অবলা বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত] . ১৭৩-৪০৩

মিসেস ওলি বুল . ১৭৫
স্বামী বিবেকানন্দ ও মিসেস বুল . ১৭৭
মিসেস বুল ও নিবেদিতা . ১৮৬
নিবেদিতা-রচিত 'সারা চাপম্যান বুল' প্রবন্ধ . ১৯০

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র . ১৯৭
১৮৯৮ সাল পর্যন্ত ডঃ বসুর জীবনের রেখাচিত্র . ১৯৮

প্রথম পর্ব : ১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯ জুন . ২০৬
বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের সাফল্য ও ভারতে উন্মাদনা . ২০৬
নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র-বিবেকানন্দ-ওলি বুল . ২১০
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৮৯৯ পর্যন্ত . ২১২

দ্বিতীয় পর্ব : ১৮৯৯ জুন থেকে ১৯০২ . ২৩৯
এই পর্বে বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক . ২৩৯
প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র . ২৪৪
'বসু সমর' . ২৪৫
'বসু-সমরে' নিবেদিতার নেত্রীত্ব : ওলি বুল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহায্য . ২৪৮
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৯০০ পর্যন্ত . ২৪৮
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, অগস্ট ১৯০০ পর্যন্ত . ২৫০
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, নভেম্বর ১৯০০ পর্যন্ত . ২৫২
জগদীশচন্দ্রের অপারেশন ও নিবেদিতার পত্র . ২৫৬
[রয়াল ইনস্টিটিউশনে ডঃ বসুর বক্তৃতা, সে সম্বন্ধে নিবেদিতার পত্র এবং রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ] . ২৬১
জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার চিঠি . ২৭৩
জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থরচনায় নিবেদিতার সাহায্য : ডঃ বসুর সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রবন্ধ ও বক্তৃতা . ২৭৭
জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ . ২৭৭
রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনা . ২৭৮
মাদ্রাজ মহাজন সভায় নিবেদিতার বক্তৃতায় জগদীশ বসুর কথা . ২৮৯
'বিজ্ঞানে হিন্দু মন' বক্তৃতা . ২৯৪

নিবেদিতার বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় ডঃ বসুর কথা . ২৯৭

তৃতীয় পর্ব : ১৯০২-১৯১১ . ২৯৮
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত . ২৯৯
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ডিসেম্বর ১৯০২ পর্যন্ত . ৩০০
জগদীশচন্দ্রের শোক : নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ডিসেম্বর ১৯০৩ পর্যন্ত . ৩০৩
জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ . ৩০৬
জগদীশচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ . ৩০৭

১৯০৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত নিবেদিতা, মিসেস বুল, ডঃ বসু প্রভৃতির পত্র . ৩০৮
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ১৯০৭ পর্যন্ত . ৩০৮
[প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় বসু-সংবাদ] . ৩০৮
মিসেস বুল ও জগদীশচন্দ্রের পত্র . ৩২৯
য়ুরোপে দু' বৎসর . ৩৩৯
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৯০৯ পর্যন্ত . ৩৪০
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯১১ পর্যন্ত . ৩৪৫
নিবেদিতার সঙ্গে বসুদের ভ্রমণ . ৩৪৭
নিবেদিতার পত্রে কেদার-বদরী যাত্রা-সংবাদ . ৩৪৯
নিবেদিতার রচনায় কেদার-বদরী ভ্রমণ . ৩৫০

মিসেস ওলি বুলের দেহান্ত থেকে নিবেদিতার দেহান্ত . ৩৫৩
মিসেস বুলের শেষ দিনগুলি . ৩৫৩
মিসেস বুলের উইলের মামলা . ৩৬০
নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯১১ পর্যন্ত . ৩৬১
উইলের মামলার আরও কথা . ৩৬৪

নিবেদিতার পত্রে তাঁর শেষ দিনগুলির কথা : স্বামীজীর অনুধ্যান এবং বসু-সংবাদ . ৩৬৭

[নিবেদিতার মৃত্যুতে মিস লংফেলোর পত্র] . ৩৭৩

নিবেদিতার দেহান্তের পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় জগদীশচন্দ্রের প্রয়াস : নিবেদিতা-বিষয়ে ডঃ বসুর কয়েকটি চিঠি . ৩৭৬
নিবেদিতাকে লেখা ও নিবেদিতার সম্বন্ধে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র . ৩৭৬
অবলা বসুর নিবেদিতা-বিষয়ক রচনা . ৩৮২

বসু বিজ্ঞানমন্দির . ৩৯০

নির্দেশিকা [সুনীলবিহারী ঘোষ-কৃত] . ৪০৫

চিত্রসূচী

নিবেদিতা মুখ-চিত্র

নিবেদিতার একটি অপ্রকাশিত চিত্র—১৮৯৯

ষ্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনে মিস ম্যাকলাউডের বাসভবনে ('হলস্-ক্রফট') তোলা ছবি—১৯৩৫
দাঁড়িয়ে, মিস ম্যাকলাউড; বসে, নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন।

মায়াবতীতে (বামদিক থেকে), নিবেদিতা, মিসেস সেভিয়ার, সিস্টার, ক্রিস্টিন, অবলা বসু।

লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম ভাষণ দিচ্ছেন।

আমেরিকান সংবাদপত্রে মিসেস ওলি বুলের উইলের মামলার সংবাদ।

নিবেদিতার একটি ক্রেয়ন-স্কেচ; নিবেদিতার দেহান্তের পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুমান, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তিটি এই স্কেচের আদর্শেই করা হয়।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশপথে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তি—'লেডী অব দি ল্যাম্প'।

প্রতিলিপি

মিসেস উইলসনের পত্র	৮৩-৮৪
মর্নিং লীডার কাগজে রিচমণ্ড নোবলের পত্র—স্বামীজীর বিরুদ্ধে কুৎসার প্রতিবাদ	৮৫-৮৭
১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে লেখা নিবেদিতার 'ক্রাইস্ট চাইলড্' প্রবন্ধ	৮৮
প্রিন্স ক্রপটকিনের পত্র	৮৯-৯০
সোফি ক্রপটকিনের পত্র	৯১-৯২
নিজ পরিবারে সম্ভবত নিবেদিতার শেষ চিঠি	৯৩-৯৪
নিবেদিতার পত্র: বিষয় স্বামীজীর প্রতি ডঃ বসুর শ্রদ্ধা	২২৩
নিবেদিতাকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র	২২৪
নিবেদিতা-কৃত ডঃ বসুর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা, ডঃ বসুর লেখাসুদ্ধ	২২৫
রাখীবন্ধন (১৯০৫) দিবসে মিসেস ওলি বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র	২২৬-২২৭
স্বামীজীর উইলের উপর ব্যাঙ্কের চিঠি, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও স্বামী সারদানন্দের মন্তব্যসূদ্ধ	২২৮-২২৯
নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদ—লণ্ডন ডেইলী নিউজ, লণ্ডন টাইমস ও অমৃতবাজার পত্রিকায়	২৩০
নিবেদিতার দেহত্যাগ প্রসঙ্গে মিস লংফেলোর পত্র	২৩১-২৩৩
নিবেদিতার মৃত্যুর পরে মিসেস উইলসনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র	২৩৪
বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিবেদিতার স্মৃতিপূজা করে জগদীশচন্দ্রের পত্র—মিসেস উইলসনকে	২৩৫
নিবেদিতা সম্বন্ধে জিন হারবার্টকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র	২৩৬-২৩৭
জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে নিবেদিতার সাহায্য—মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার চিঠি (১৯০৭)	২৩৮



পূর্ব জীবন

পূর্ব জীবন

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নিবেদিতার 'দ্বিতীয় জীবন' আরম্ভ হয়েছিল একথা সত্য, কিন্তু 'প্রথম জীবন' শুরু হয় অনেক আগেই—কেবল বয়সের হিসাবে নয়, মনের হিসাবেও। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকালে নিবেদিতার বয়স ছিল প্রায় আটাশ বৎসর। বিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে কর্মজীবন আরম্ভ করেন ১৮ বৎসর বয়সে। মধ্যে দশ বৎসরের ব্যবধান। এ দশ বৎসরে নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ও মনোজীবনের ইতিহাস কার্যতঃ আমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, থাকতও, যদি না লিজেল রেম' নিবেদিতাজীবনের এই অধ্যায়ের উপরে আলোক-পাতের দীর্ঘ দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হতেন। বহু সন্ধানে, পরিশ্রমে, শ্রীমতী রেম' এই জীবনেতিহাস যথাসম্ভব উদ্ধার করেছেন; এবং নিবেদিতার পরবর্তী যে-কোনো জীবনীকার এক্ষেত্রে তাঁর পরিশ্রমের ফলভোগ করেছেন, যদিও তা মুক্তভাবে স্বীকৃত হয়েছে, এমন দেখি না। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রধানতঃ শ্রীমতী রেম'-সংগৃহীত তথ্যাদির উপরই নির্ভর করব।

নিবেদিতার 'পূর্বজীবন' বলতে আমরা প্রধানতঃ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ববর্তী জীবনই বুঝব। তবে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে এবং নিবেদিতার ভারতে আগমনের মধ্যেও কিছু সময় ছিল—সেই 'পরিবর্তন যুগের' সম্বন্ধেও কিছু তথ্য দেবার চেষ্টা করব। এসব বিষয়ে উপাদানের প্রধান উৎস নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন ও ভাই মিঃ রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতিকথা। নিবেদিতার চিঠি থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে; ম্যাকলাউডের উক্তি থেকেও। মিঃ এরিক হ্যামণ্ডের এবং মিঃ এস কে র‍্যাটক্লিফের রচনায় সংবাদ আছে, কিছু সাময়িকপত্রের রচনাতেও।

স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার আগেই নিবেদিতা লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে কি ধরনের ভূমিকা নিতে শুরু করেছিলেন, তা দেখাতে ইংলণ্ডে প্রকাশিত দু'একটি সংবাদপত্রের বিবরণী উদ্ধৃত করতে চাই। রেম' সংগ্রহে একটি সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ আছে, যার উপরে জিজ্ঞাসা চিহ্নসহ '১৮৯২' লেখা রয়েছে। সেটি এই :

The November number of *Research* will raise considerable discussion in scientific circles from several different standpoints. One article deals with the latest views of scientific investigators in regard to the effect of fresh water on the starfish, which eat the oysters on the American coast. The ravages of the starfish on the oyster beds are almost ruinous to the oyster farmers, but reading the report in *Research* will tend to convince most people that a remedy for the trouble is yet afar off. Then there is an article by Miss Margaret E. Noble, of Kingsley-gate school, Wimbledon—formerly of Liverpool—on "The Higher Education of Girls," which will set some women's tongues going; and then there is an article on "The Life Zones of the British Lias . . . . . .

কোন্ সংবাদপত্রের অংশ এটি, তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু 'সিসাচ' পত্রিকার মার্গারেট ই. নোবলের প্রবন্ধ প্রকাশ এবং অন্যত্র তার সচকিত উল্লেখ লেখিকার বিশিষ্টতাই দেখিয়ে দেয়। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তার বিষয়ে স্বীকৃতিও।

মার্গারেট নোবল কি ধরনের প্রভাব বিস্তার এবং কি জাতীয় স্থানগ্রহণ করেছিলেন সেইকালে, সে বিষয়ে যৎসামান্য তথ্যই আমরা পাচ্ছি, এবং এখানে মনে রাখা উচিত, যেহেতু তিনি ইংলণ্ডের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে যান, তাই পরবর্তী কীর্তি-গৌরবের আলোকাভাস পূর্ববর্তী জীবন পায়নি, সচরাচর বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, তথাপি তাঁর দেহত্যাগের পরে ইংলণ্ডে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিবরণীতে পূর্বজীবনপ্রসঙ্গ একেবারে অনুল্লিখিত থাকতে পারেনি।

টাইমস পত্রিকায় ২৬ অক্টোবর, ১৯১১, মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় :

NOBLE.—On the 21st (13th) Oct., at Darjeeling, MARGARET NOBLE (SISTER NIVEDITA), eldest daughter of the late Rev. S. Richmond Noble.

একই তারিখে টাইমস লেখে :

MISS MARGARET NOBLE

A private telegram from Darjeeling announces the death on October 20, at the age of 44, of Miss Margaret E. Noble, widely known in India as Sister Nivedita, of the Order of Ramakrishna-Vivekananda. A correspondent writes :—

"Miss Noble occupied a remarkable position among the English women who have thrown in their lot with the Indian people. She was of Irish parentage and birth, the daughter of a Congregational minister, the late Rev. S. R. Noble. *A trained teacher of exceptional gifts, she was one of a group of educationists who in the early nineties founded the Sesame Club.* In 1895 she came under the influence of Swami Vivekananda, who was then lecturing on Indian religion and philosophy in London, and in 1898 went out to India for the purpose of opening a school for Hindu girls in connexion with the Ramakrishna Mission, of which Vivekananda was the head. Taking a small house in the northern quarter of Calcutta, and living in the simplest Indian style, Sister Nivedita grew to exercise, partly through her classes for Hindu girls and women and more through her writings and addresses, a wide influence in India. Her house was visited by leading Indians from every province, and there were few English or Americans of distinction passing through Calcutta who did not make a point of seeing her.

"In 1904 she published 'The Web of Indian Life,' and three years later a volume of 'Cradle Tales of Hinduism'. Last year her record of the life and teachings of Swami Vivekananda appeared under the title of 'The Master as I Saw Him', and

latterly she was engaged in preparing the Swami's lectures and letters for publication."

(বক্রলিপি লেখককৃত)

টাইমস কাগজের এই সুষ্ঠু বিবরণটি নিবেদিতার পরিচিত কারো দ্বারা লিখিত সন্দেহ নেই, অন্ততঃ লেখক যে নিবেদিতার বিষয়ে ঠিক সংবাদ রাখেন তা বোঝা যায়। এর মধ্যে নিবেদিতার পূর্বজীবনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য পাচ্ছি— তিনি "অসাধারণ গুণসমন্বিত 'শিক্ষিত' শিক্ষক," যিনি সিসেমী ক্লাবের শিক্ষাব্রতী প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।

ইংলণ্ডের 'নেশন' কাগজে ২৮শে অক্টোবর, ১৯১১ যে লেখা বেরোয়, তাতে অবশ্য নিবেদিতার ভারতীয় জীবনের কথাই বিশেষভাবে বলা আছে :

The early death of Miss Margaret Noble ("Sister Nivedita," or The Consecrated), at Darjeeling, will be felt as a heavy personal loss by thousands of Hindus, especially in Bengal. She was Irish by birth, but there are few Europeans who have entered so closely into the most intimate phases of Indian life. About sixteen years ago she met the Hindu teacher and reformer, Vivekananda, in London, and under his influence she joined the Order of Ramakrishna (the name of his own *Guru*, or teacher) on the Ganges, and herself established a school for Hindu Girls in one of the poorest "native" quarters of Calcutta. Her personal influence, however, extended far beyond the school and the Vedantist Order. In the movement for national regeneration of recent years in India, she served as a recognised guide and inspirer, and young India holds no foreign name in greater honor.

২৬ অক্টোবরের ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটে পূর্বজীবন সম্বন্ধে মূল্যবান উল্লেখ :

THE LATE MISS MARGARET NOBLE

By the death at Darjeeling a few days ago of Miss Margaret E. Noble (Sister Nivedita) there has passed away one who succeeded in a very remarkable way in identifying herself with the life and sentiment of India. In 1898, when she went to the East, *Margaret Noble was a brilliant young woman of thirty, and eager educationist*, with a new and absorbing enthusiasm for India, called forth by that powerful personality the Swami Vivekananda. She took a house in the Hindu quarter of Calcutta, and began modestly with a small school for Indian girls.

AS SPEAKER AND WRITER

But Miss Noble's energies soon sought other channels of expression. She addressed large audiences in various cities on Indian ideals, ancient and modern, and there are many who think that her voice was the first to give definite and challenging form to the religion of Nationalism. She wrote as she spoke—with a

strong and vivid power of expression, and an almost fierce sincerity. Her books—especially "The Web of Indian Life" (1904) and "Cradle Tales of Hinduism" (1907)—have been widely read in England and America; but none who knew Margaret Noble well in life have ever thought of them as an adequate reflection of her fine powers of mind. In India, it is no exaggeration to say, her name was held in almost universal reverence.

(বক্রলিপি লেখককৃত)

চমৎকার লেখা, নিবেদিতার প্রতিভা ও কর্মজীবনের উৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ। মার্গারেট নোবল যে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়কালেই 'ত্রিশ বৎসরের দীপ্ত-প্রতিভা তরুণী', এবং 'আগ্রহী শিক্ষাব্রতী' তা পুনশ্চ জানলাম, আরও জানলাম বক্তা ও লেখকরূপে তাঁর ইংলণ্ডে বিদিত যশের কথা, তাঁর উচ্চাঙ্গের মনঃশক্তির কথা, সর্বোপরি, ভারতের "জাতীয়তা-ধর্মের স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, স্পর্ধাযুক্ত প্রবক্তারূপে" তাঁর ভূমিকার কথা। শেষোক্ত মন্তব্যটির বিস্তারিত আলোচনা "শিখাময়ী" অধ্যায়ে করা হবে।

নিবেদিতার ভারত-পূর্ব জীবনের সম্ভাবনাময় প্রকৃতি সম্বন্ধে লণ্ডন টাইমস বা ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্বীকৃতিকে মূল্য দিতেই হয়। এবং ইংলণ্ডের ডেইলী নিউজ কাগজে বিখ্যাত সাংবাদিক এস কে র‍্যাটক্লিফের রচনাকেও। র‍্যাটক্লিফ কলকাতার স্টেটসম্যানের সম্পাদক ছিলেন, পরে ইংলণ্ডেও সম্পাদকতা করেন। ইনি নিবেদিতার বন্ধু ও গুণমুগ্ধ. নিবেদিতার সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলি লেখা পাওয়া যায়, অন্যত্র তার যথাসম্ভব সংকলন দিতে চেষ্টা করব, এখানে ২৬ অক্টোবর, ১৯১১-তে ডেইলী নিউজে প্রকাশিত লেখাটি উপস্থিত করছি :

MARGARET NOBLE

A TRIBUTE TO A REMARKABLE CAREER

(By S. K. Ratcliffe)

News comes by a private cablegram from Darjeeling, in the Himalayas, that Miss Margaret Noble (known throughout India as Sister Nivedita) died there a few days ago, after a short illness. The announcement will bring profound grief to a large number of English and American people, to whom Miss Noble was known alike by her books and her vivid personality. It would be true to say that no English woman has ever made for herself a similar place in the affections of the Indian people, or has tried to do the work to which she put her hand.

Irish by birth and family, the daughter of a Non-conformist minister, *Margaret Noble was known in London twenty years ago as perhaps the most eager and brilliant member of a group of new educationists who, among other things, founded the Sesame Club.* In the middle of the nineties she met the Swami Vivekananda, the first real missionary of Indian religion in the

West. He had made a dramatic appearance at the Chicago Parliament of Religions two years before, had been astonishingly successful in his tour of the United States, and in 1895 was lecturing in London.

Margaret Noble became the most devoted of his followers, and in 1898 she went out to India to assist in the educational work of the Ramakrishna Brotherhood, of which Vivekananda was the head. She became, under the name of Sister Nivedita, an unattached member of the Order, and began in her small house in Northern Calcutta a school for Hindu girls and classes for Hindu women—her aim being to provide modernised instruction on the firm basis of Eastern feeling and ideals. She lived with extreme simplicity entirely among Indians. Her name became known far and wide; there were few Indians of distinction unknown to her; she identified herself with their culture and thoughts, and as a consequence her influence was incalculable. To young Bengal she was an inspiration, for there can be no doubt it was through her words, spoken and written, that the ideal of Indian nationality grew to be a living and absorbing force.

Not on its metaphysical side, but in its vital social relations, Margaret Noble was a constant and intense student of Indian thought. Some years ago she spoke frequently to audiences large and small in many cities of India, and her power of speech was a wonderful thing. In later years, when fever had destroyed her fine physique, she was content to use her pen—for the most part in the Indian monthly reviews. To readers in the West she is known chiefly through her most ambitious, "The Web of Indian Life" (which by no means reveals her full powers), or through the "Cradle Tales of Hinduism", published three years ago. She contributed a paper on "The Present Position of Woman" to the proceedings of the Universal Races Congress held in London last July. She was forty-four years of age, and to many of us her death means the passing of a rare intelligence and of a dauntless and most beautiful soul.

(বক্রলিপি লেখককৃত)

এস কে র‍্যাটক্লিফের মত বিখ্যাত সাংবাদিক-লেখকের পক্ষেই উপরের আকারের মধ্যে নিবেদিতার জীবনের মূল কথাগুলি প্রকাশ করা সম্ভব। এই লেখায় র‍্যাটক্লিফ খোলাখুলিভাবে জানিয়েছেন, নিবেদিতার লেখা এবং মুখের কথা থেকেই ভারতের জাতীয়তা-ধর্ম জীবন্ত শক্তি হয়ে ওঠে। এই লেখার মধ্যেও পূর্বজীবনের নিবেদিতা সম্বন্ধে 'ব্রিলিয়ান্ট' কথাটি পাচ্ছি, যা পরবর্তী জীবনে 'বিরল মননশক্তি' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই সকল সাক্ষ্য নিবেদিতার মাতৃভূমির সংবাদপত্রসমূহ এবং লেখকবৃন্দের। নিবেদিতার বুদ্ধি ও প্রতিভা বিষয়ে পৃথিবীবিখ্যাত বহু মনীষী ও লেখকের উক্তি আমরা ক্রমে দেখব, এখন আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরতে চাই।

নিবেদিতার বংশলতিকা

হ্যামিলটন——ম্যাকফাডেন

জন নোবল——মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস
১৭৮৮-১৮৪৪ ১৮০৯-১৮৭৩
(এগারোটি সন্তানের ৬ জন জীবিত)

রিচার্ড হ্যামিলটন——এলিজাবেথ মার্ডক

স্যামুয়েল নোবল——মেরী হ্যামিলটন
১৮৪৩-১৮৭৭ — ১৮৪৫-১৯০৯

মার্গারেট
১৮৬৭-১৯১১

মেরী (মে)
(বিয়ের পরে মিসেস উইলসন)
(তিন কন্যা, মার্গট, সিসিলি ও গ্রাণী)

রিচমণ্ড নোবল
(বিবাহিত)

বোন মে উইলসনের স্মৃতিকথা

পটভূমিকা

নিবেদিতার প্রথম জীবনের তথ্য প্রধানাংশে পাওয়া গিয়েছে তাঁর বোন মেরী (মে) উইলসনের কাছ থেকে। পরবর্তী জীবন সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ তিনি দিয়েছেন। প্রথম জীবন সম্বন্ধে ভাই রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতিকথা থেকেও তথ্য মেলে।

নিবেদিতা সেই সকল ক্ষণজন্মাদের অন্যতম যাঁরা আদ্যন্ত আদর্শবাদী। 'নিবেদিতা' নাম পাওয়ার পূর্বে থেকেই তিনি নিবেদিতা, পরে তো নিশ্চয়ই। এই হেতু, নিজের পরিবারের মানুষের কাছেও তিনি আদর্শ প্রতিমা, সাধারণতঃ যা হয় না। তাঁকে নিকট থেকে যারা দেখেছে তারা আরও শ্রদ্ধা করেছে—এই বিরল ব্যাপারটি নিবেদিতার জীবনে দেখতে পাই। বোন এবং ভাইয়ের স্মৃতিকথা থেকে ঐ মনোভাবের পরিচয় মেলে।

যাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক এবং যিনি অত্যুচ্চ চরিত্র, তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর বিষয়ে উপযুক্ত কর্তব্য পালনের ইচ্ছা স্বাভাবিক। ভাই ও বোন, দুজনেরই সে ইচ্ছা ছিল। ভাই চেয়েছিলেন নিবেদিতার জীবনী রচনা করবেন। বলাই বাহুল্য, বোনের তাতে সায় ছিল। অন্যদিকে নিবেদিতার পত্রসংকলনের বাসনাও বোনের ছিল। ভাই এবং বোন কারুরই সে ইচ্ছা সফল হয়নি। তার জন্য গভীর অনুতাপ তাঁরা বোধ করেছেন।

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে তাঁর রচিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হন জগদীশচন্দ্র। এস কে র‍্যাটক্লিফ বিশেষ সাহায্য করেন। উদ্বোধনের গণেন্দ্রনাথও বড় ভূমিকা নেন। এই সমস্ত চেষ্টার বিষয়ে মিসেস উইলসনের আগ্রহের শেষ ছিল না। কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র, র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতি তাঁকে পত্রযোগে অবহিত রেখেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তেমন

দু'একটি চিঠি আমরা পেয়েছি। চিঠিগুলি থেকে নিবেদিতার কয়েকটি বইয়ের পটভূমিকাও পাই।

১৯১২ খৃস্টাব্দের ৮ মার্চ তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা মিঃ র‍্যাটক্লিফের চিঠিতে নিবেদিতার 'ইণ্ডো এরিয়ান মিথস্'*, 'সিভিক এণ্ড ন্যাশন্যাল আইডিয়ালস্', স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইসটার্ন হোম' প্রভৃতি বইয়ের সংবাদ আছে। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত নিবেদিতার রচনা সংকলন যে বেআইনীভাবে বেরিয়েছিল, তাও জানতে পারি। নিবেদিতার গ্রন্থ সম্বন্ধে যাঁরা কিছু লিখতে চাইবেন, তাঁদের কাছে এই চিঠিটি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

Dear Mrs. Wilson,

I now know to a certain extent what is happening with regard to Margaret's MSS. *The book of Indo-Aryan Myths*, which she had undertaken to write for George Harrap & Co. was not quite half finished, but the part that is completed would be publishable as it stands if it were not for the conditions governing the series in which it was to appear. I saw the publisher a week ago, and found that he was inclined to insist upon the contract, which would involve the writing of the second part of the book by another hand. *My impression is that* Dr. Bose will not consent to this, and I think he would be quite right if he did not. Harrap is quite a reasonable man, but he points out that his farm commissioned Margaret to write the book and that large number of illustrations were also ordered which would make it practically necessary that the contract should be carried out.

You will know that Dr. Bose has brought a small volume of "Civic and National Ideals" and that a Madras publisher has issued an unauthorised collection of miscellaneous papers, including some of the most interesting things published in the "Indian Review".

A few days ago I received from Dr. Bose the MS. of a proposed volume, "Studies from an Eastern Home", which he asked me to submit to Longmans. It is not quite long enough for a volume, as Mr. Longman pointed out to me yesterday. My suggestion to Dr. Bose is that it should be added to by a selection from the articles in the "Indian Review" some of which have been included in Ganesh's volume, and that it should have a biographical introduction. He approves of both suggestions, and I gather from Dr. Bose that he is prepared to leave the question of the introduction to the publisher and

---

* বইটি পরে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল এবং আনন্দ কুমারস্বামীর যৌথ রচনারূপে কুমারস্বামীর ভূমিকাসহ 'মিথস্ অব দি হিন্দুজ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্টস্' নামে প্রকাশিত হয়।

myself. I do not know how you and Rich will feel about this, or what your view would be as to the length and character of the introduction. Perhaps you will let me know. Whoever was entrusted with it would have to get from you and from some of Margaret's London and American friends a certain amount of material and possibly some of her letters, although I assume it will be felt that these should be reserved for future use. Mr. Longman is in correspondence with Dr. Bose with regard to the details of publication, but I think there need be no delay about the volume after his reply has been received.

Yours Sincerely,
S. K. RATCLIFFE.

এর কয়েক মাস পরে ২৯ জুলাই তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা এক চিঠিতে মিঃ র‍্যাটক্লিফ জানালেন, তাঁর ভূমিকা সহ 'স্টাডিজ ফ্রম এ্যান ইসটার্ন হোম' বইটি শীঘ্রই বেরুচ্ছে। তিনি "দি ওয়েব"-এর সুলভ সংস্করণ প্রকাশের পক্ষে ইচ্ছা-প্রকাশ করলেন। এই সঙ্গে বাংলায় নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী প্রকাশের প্রসঙ্গও উঠল। গণেন্দ্রনাথ নিশ্চয় উদ্বোধন থেকে তেমন একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে র‍্যাটক্লিফ বললেন, সে বই কিন্তু তাঁর ভূমিকাটি প্রকাশের পরেই বের হওয়া উচিত, কেননা সেক্ষেত্রে বাংলা জীবনীকার নিবেদিতার লন্ডন-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন। র‍্যাটক্লিফ বললেন, নিবেদিতার বাংলা জীবনী প্রকাশের ব্যাপারে গণেন্দ্র-নাথের অধিকার অবশ্যই আছে, কারণ "গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত", কিন্তু "ডাঃ বসুর সঙ্গে কেন তিনি যোগাযোগ করেননি, তা বিস্ময়কর।" মঠের পক্ষ থেকে গণেন্দ্রনাথ এই কাজ করছিলেন কি না, তাও জানতে ইনি উৎসুক ছিলেন।

নিবেদিতার প্রথম জীবন সম্বন্ধে যে-কেউ লিখতে চান, তাঁর পক্ষে মিসেস উইলসনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। র‍্যাটক্লিফ সে সাহায্য নিয়েছিলেন। অপরপক্ষে দেখতে পাই গণেন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত নিবেদিতার বাংলা জীবনী কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থ পরিকল্পনা গণেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত, না মঠের তরফে করা, তা বলার উপায় নেই। তবে উদ্বোধন থেকে এইকালে সরলাবালা সরকারের লেখা 'নিবেদিতা' নামে একটি স্মৃতিমূলক উৎকৃষ্ট জীবনচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সে বইটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়।

পঁচিশ বছর পরে আবার উদ্বোধন থেকে নিবেদিতার জীবনী প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। ১৯৩৭ সালে প্রেমঘনানন্দ এই উদ্দেশ্যে নানা তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং মিসেস উইলসনের কন্যা মিস সিসিলি উইলসনকে উপাদানের জন্য পত্র লিখবেন। মিস ম্যাকলাউডের ইচ্ছায় লিখিত ২৭ মে, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ঐ চিঠিতে তিনি নিবেদিতার "বংশ পরিচয়, জন্ম তারিখ, প্রথম জীবন, গৃহসংসার ও শিক্ষা প্রভৃতির বিস্তর বিবরণ" চেয়েছিলেন, তৎসহ নিবেদিতার অল্প বয়সের

ফটো, তাঁর পিতা মাতা ও বাড়ির ফটোও। প্রেমঘনানন্দ লিখেছিলেন, "আমরা তাঁর প্রথম জীবনের কথা বিশেষ জানি না, যার জন্য পরিকল্পনাকে কার্যকর করা বিশেষ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

ঠিক এই সময়ে, কি এর কিছু পূর্বে শ্রীমতী লিজেল রেম' নিবেদিতার জীবনী রচনায় মনস্থ করেন, এবং শ্রীযুক্ত জিন হারবার্টের সহযোগিতায় তথ্যাদি সংগ্রহে সচেষ্ট হন। তাঁদের ব্যাপক প্রয়াসের পরিচয় দেবার স্থান এখানে নেই, শুধু এইটুকু বললেই চলবে, প্রায় দশ বৎসর ধরে তাঁরা উপাদানের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ করেছেন, এবং এই কাজে বহু সহস্র মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ ব্যাপারে দুজনের সাহায্য এঁরা সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলেন—নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন এবং নিবেদিতার মাতৃস্বরূপা বান্ধবী মিস ম্যাকলাউড। মিস ম্যাকলাউডই নিবেদিতার ভাবী জীবনীকাররূপে শ্রীমতী রেম'কে আবিষ্কার করেছিলেন। রেম'র ফরাসী জীবনীর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় জিন হারবার্ট এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"নিবেদিতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুদের একজন, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ 'য়ুম য়ুম' বলতেন, তিনি কয়েক বৎসর আগে একদিন যেন সহসা দিব্যদৃষ্টির ঝলক লাভ করলেন, যেদিন আমরা তাঁর স্ট্রাটফোর্ড অব অ্যাভনের যোড়শ শতাব্দীর প্রাসাদে বসেছিলুম।—নিবেদিতার জীবনীলেখক সত্যই প্রস্তুত হয়ে আছেন, তিনি আর কেউ নন—লিজেল রেম'। ব্যাপারটা সকলের কাছে অবিলম্বে এতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তদ্দণ্ডে সেখানেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হল, এবং সর্বদিক থেকে উপাদান অনর্গল এসে হাজির হতে লাগল।"

উপাদানের মুখ্য উৎস ১৮৯৫ পর্যন্ত মিসেস উইলসনের স্মৃতিকথা, এবং পরবর্তীকালে ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রাবলী।

মিসেস উইলসন ও তাঁর কন্যাকে উপাদানের জন্য রেম'-হারবার্ট এবং প্রেমঘনানন্দ প্রায় একই সময়ে লেখেন। উইলসনদের কাছে রেম'-হারবার্ট কিছু আগে তথ্য চেয়েছিলেন, সেইজন্য, কিংবা তাঁরা ভারতীয় প্রয়াসের সাফল্য-সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ আস্থা রাখতে পারেননি সেই জন্য—যে-জন্যই হোক, প্রেমঘনানন্দকে তাঁর প্রার্থিত উপাদান না দিয়ে রেম'-হারবার্টকে দেন। সেইসঙ্গে প্রস্তাব করা হয়—নিবেদিতার জীবনী রচনার জন্য যৌথ চেষ্টা করা হোক। ভারত এবং বহির্ভারত থেকে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা প্রথমে শ্রীমতী রেম' ফরাসী জীবনী লিখবেন, পরে সিসিলি উইলসন তার ইংরাজী অনুবাদ করবেন, এবং বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবে উদ্বোধন। এই প্রস্তাব সম্ভবতঃ প্রেমঘনানন্দ বা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয়নি, এবং বাংলা জীবনী রচনার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, যা আরও কুড়ি বৎসর পরে কার্যকর হবে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার চেষ্টায়। তার আগেই অবশ্য লিজেল রেম'র জীবনী প্রকাশিত হয়ে যাবে।

১৯৩৭ সালের মে মাসের পূর্বেই রেম'-হারবার্ট নিবেদিতার জীবনী রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে মিসেস উইলসনের সঙ্গে সংযোগ করেন। নিবেদিতার প্রতি

দায়িত্ব পালন না করার জন্য মিসেস উইলসন দীর্ঘদিন ধরে যে আত্মগ্লানি বোধ করেছেন, তা দূরীভূত হয়েছিল রেম্‌-হারবার্টের উদ্দীপ্ত প্রস্তাবে, 'যাঁরা মনে করেন কাজ বিস্তৃত ও সুচারু ভাবেই করা উচিত।' সেকথা জেনে মিসেস উইলসনের 'মানসিক ও আত্মিক বলাধান' হয়েছিল, এবং এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনার জন্য রেম্‌-হারবার্ট যখন তাঁকে মার্সেলিজ বা জেনিভায় আমন্ত্রণ জানালেন, তখন তাঁদের প্রতি এঁর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না, এবং ট্যান্টিনের (ম্যাকলাউড) প্রতিও।— "সুতরাং, ট্যান্টিন ডার্লিং, তুমি আমার জন্য আবার একটি সুযোগ করে দিলে। আমি উদ্দীপ্ত, শিহরিত।" ১৯৩৭ সালের ৩০ মে তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে এইসব কথা পাচ্ছি। ঐ চিঠিতে মিসেস উইলসন লেখেন, তিনি রেম্‌-হারবার্টকে কথাপ্রসঙ্গে নিবেদিতার ডায়েরীর কথা বলেছেন, যা ওঁরা দেখেন নি, যেগুলি হয়ত ম্যাকলাউড-প্রেরিত চিঠির দ্বিতীয় তাড়ার মধ্যে রয়েছে।'

মিস ম্যাকলাউড জানিয়েছিলেন, রেম্‌-হারবার্ট জীবনী রচনার কাজে গোটা দুবৎসর ব্যয় করবেন। সেই সংবাদে মিসেস উইলসন আনন্দে আত্মহারা। জিন হারবার্টকে লেখা ১২ জুলাই তারিখের চিঠিতে সে উল্লাস প্রকাশ করার পরে মিসেস উইলসন নিজেও খুশীর সংবাদ দিলেন—'আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমাদের কাছে ডায়েরীগুলি আছে, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে সেগুলি তাঁর (নিবেদিতার) তীর্থভ্রমণ সংক্রান্ত, এবং তাদের পাঠোদ্ধার করা নিতান্ত কঠিন।'

রেম্‌-হারবার্ট প্রচেষ্টার বিষয়ে মিসেস উইলসনের উৎসাহের আর একটি কারণ, এঁরা কেবল তথ্যভার জমিয়ে তোলাতেই উৎসাহী নন, 'জীবনী রচনায় পরিবেশ ও আবহের উপরও নির্ভর করেন।'

'That is where I feel an Oriental mind could not catch the Elusiveness of an Occidental idealist!'

এইসব কথা মিসেস উইলসন ১০ অগাস্ট, ১৯৩৭ তারিখে লিখেছিলেন, এবং ঐ পত্রেই স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর চমৎকার উত্তরের কথাও জানিয়েছিলেন।—

"I had such nice answers from the Boses—I love them for Nivedita's sake as well as their own. Sir Jagadis Bose says "we shall, of course be pleased to meet Monsieur Jean Herbert and Mlle Raymond, when they come to Calcutta. The only thing I could tell them is however in regard to Nivedita's help throughout my uphill scientific work against tremendous odds, till it received full recognition. No one who knows the real state of things will realise how much the cause of Indian Nationality owes to Nivedita's selfless devotion and long suffering."

মিসেস উইলসন তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (নিবেদিতার চেয়ে দশ বছরের ছোট) জামাইকাবাসী রিচমন্ড নোবলের সঙ্গে সংযোগ করতে বলেন, 'কারণ সেও যথেষ্ট সংবাদ দিতে পারবে।'

মিসেস উইলসনের ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-এর চিঠি থেকে পাচ্ছি, তিনি বহু উপাদান ইতিমধ্যেই রেম্‌-হারবার্টকে দিয়ে দিয়েছেন, বাকি উপাদানের বিষয়ে কন্যা

সিসিলিকে লিখতে বলেছেন। সেই সঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে মিঃ র‍্যাটক্লিফের সাহায্য চাইতে বলেছেন, যিনি 'অতীব সমর্থ', যাঁকে নিবেদিতা সবিশেষ সমাদর করতেন।'

এই সময়ে মিসেস উইলসন লণ্ডন ছেড়ে সাউথ আফ্রিকায় যাচ্ছেন। (বয়স তখন প্রায় সত্তর), যেতে প্রাণ চাইছে না, তবু নিজের সন্তানেরা রয়েছে সেখানে, যার টান কাটানো যায় না, কিন্তু লণ্ডনের সঙ্গে বিচ্ছেদ আতুর করে তুলছে প্রাণ,— "যে লণ্ডন সব সময়ে অন্তর্জীবনে প্রাণতরঙ্গ এনে দেয়; মনে পড়ে যায় নিবেদিতা আর আমি কতবার ঘুরে বেড়িয়েছি এর আনাচে কানাচে।"

মিসেস উইলসনের কথামত রেম'-হারবার্ট রিচমণ্ড নোবল ও সিসিলি উইলসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সিসিলি উইলসনকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭-এ লেখা এঁদের চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডের দেওয়া বিপুল সংখ্যক পত্রের কথা পাচ্ছি, যাদের পাঠোদ্ধার করা বহু সময় দুরূহ। পত্র পত্রিকায় লেখার সময়ে নিবেদিতা কি কি ছদ্মনাম নিতেন, সে বিষয়ে, এবং মিসেস উইলসন-কথিত তীর্থ যাত্রাকালীন ডায়েরী, যাতে অজস্র সংবাদ আছে—সে বিষয়ে প্রশ্নও ছিল। সে ডায়েরী কি সিসিলির কাছে আছে? থাকলে কি পাঠিয়ে দেবেন?*

ঐ চিঠির উত্তরে ৫ নভেম্বর তারিখে সিসিলি উইলসন জানালেন, তাঁর কাছে নিবেদিতার প্রথম জীবনের অনেক লেখা রয়েছে। কয়েকটি ছদ্মনামেরও উল্লেখ করলেন; ডায়েরী প্রভৃতি তিনি তাঁর মাকে দেখিয়ে পাঠাবেন বললেন।—

"I have, amongst other papers, a great many articles written by Aunt Margaret at different stages of her career. Her earlier noms de plume were Margaret Nealas Underwood, Nealas Underwood, and I think, Margaret Nealas. I cannot find any others. As Mother will be back here towards the end of the month, I think it would be better to let her look everything over before sending them, including the diaries."

ইতিমধ্যে ডাঃ বসুর মৃত্যু হয় (২৩.১১.১৯৩৭)। এই মৃত্যুতে মিসেস উইলসন ব্যক্তিগত শোকবোধ করেছিলেন। জোহানেসবার্গ থেকে লিজেল রেম'কে তিনি লেখেন (তারিখ নেই চিঠিতে):

"ডাঃ বসুর মৃত্যুতে বিরাট ক্ষতি হল। খুবই মুহ্যমান বোধ করছি, কারণ আমরা সকলে তাঁর অনুরক্ত ছিলুম। বেচারা লেডী বসু অতীব বেদনার্ত হয়ে চিঠি লিখেছেন। তাতে আছে—'আমার স্বামীর কাগজপত্রের মধ্যে নিবেদিতাকে লেখা মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতির কিছু চিঠি রয়েছে। সে গুলি নিয়ে কি করব?'

* "Mrs. Wilson also feels that we might get a lot of information from Nivedita's diaries, especially those written during the pilgrimage to Kashmere, and she thinks you may be able to find them. Could you send them also?"

"বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয় বিবেচনা করে সরাসরি তাঁকে লিখলাম, তিনি যেন নিবেদিতা-সংক্রান্ত কাগজের টুকরো পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন। ৩০ মার্চ লেখা তাঁর উত্তরের অংশ—'আমার কাছে নিবেদিতাকে লেখা ট্যান্টিন প্রভৃতি কয়েকজনের চিঠি ছিল, যেগুলি জনৈক সন্ন্যাসী নিয়ে যান, যিনি জীবনী প্রস্তুত করছেন।' "

এই চিঠিতেই মিসেস উইলসন জানান, নিবেদিতার ডায়েরীগুলি তাঁর হাতে নিরাপদে, বহাল তবিয়তে রয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক কাগজপত্রও।

লেডী বসুর কাছ থেকে নিবেদিতা-সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র হস্তান্তরিত হওয়ায় মিসেস উইলসন বিশেষ বিরক্ত বোধ করেছিলেন। ম্যাকলাউডকে ১৩ মে, ১৯৩৮-এর চিঠিতে তা জানিয়েছেন। শীঘ্রই যে ডায়েরী থেকে অংশ টুকে লিজেল হারবার্টকে পাঠাচ্ছেন, তাও লিখেছিলেন।*

এই সমস্ত চিঠিপত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি, নিবেদিতার ডায়েরী রীতিমত জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস উইলসনের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নিবেদিতার কিছু ডায়েরী গোড়া থেকেই তাঁর কাছে ছিল, যেগুলি তাঁর ধারণায় তীর্থযাত্রা-সংক্রান্ত, যাদের পাঠোদ্ধার করা দুরূহ বলে সে চেষ্টা বোধহয় পূর্বে তিনি করেননি। নিবেদিতার চিঠিপত্রে এই সকল ডায়েরীর প্রভূত উল্লেখ রয়েছে। স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবনের অপরূপ বর্ণনা এইসব ডায়েরীর মধ্যে ছিল, যা নকল করে নিবেদিতা নিজেদের মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করতেন। ডায়েরীগুলিতে নিবেদিতা ছবি পর্যন্ত এঁকেছেন, এমন কথা তাঁর চিঠি থেকে পাই। স্বয়ং স্বামীজী এই ডায়েরী পড়েছেন। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' বইটি এই ডায়েরী অবলম্বন করেই রচিত। পরে এই ডায়েরীগুলির কিন্তু কোনো সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়নি। শ্রীমতী রেমৎ আমাকে বলেছেন, তিনি কখনো কোনো ডায়েরী পাননি। জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে কিছু ডায়েরী ছিল, যেগুলি তিনি রক্ষা করেছিলেন, কারণ তার মধ্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের নোট ছিল, তেমন কিছু ডায়েরী লেডী বসু বোধ হয় মিসেস উইলসনের কাছে ডাঃ বসুর মৃত্যুর পরে পাঠিয়ে দেন। রেমৎ-হারবার্টকে লেখা মিসেস উইলসনের চিঠিপত্র থেকে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না, রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে কোনো ডায়েরী গিয়ে পড়েছিল (যদিও জনৈক সন্ন্যাসীর হাতে কিছু চিঠিপত্র পড়েছিল, একথা পাই)। পরে আমরা শুনেছি, মিসেস উইলসন নিজেই আফ্রিকায় সফররত জনৈক সন্ন্যাসীকে নিবেদিতার কিছু ডায়েরী দেন, আত্মপ্রাণা প্রভৃতি তাঁদের

* "I had a letter from Lady Bose in which she told me that amongst her Husband's papers, she found a good many letters from you, Mrs. Ole Bull and others, to Nivedita and some other odds and ends. She asked me what she should do. By return I asked her to let me have every spred of letters and papers belonging to or in connection with Nivedita. Then to my astonishment she wrote that she handed them over to a Swami, who came asking for them saying that he was writing a biography and you had given him many letters. I did not take any further step for the whole affair is rather unusual. I do not know anything about 'rights' in the matter, and the fact that he had letters of yours might authorise him to get others. I find myself wondering why Dr. Bose detained any letters—but I assure myself that there will be no matter in them that we should regret being made public."

জীবনীতে যেগুলির উল্লেখ করেছেন। আত্মপ্রাণা আমাকে জানিয়েছেন, সব কয় বছরের ডায়েরী পাওয়া যায়নি, এবং ডায়েরীগুলি মোটেই বর্ণনাত্মক কিছু নয়, অতি সংক্ষিপ্ত, নিবেদিতার নিজস্ব ভঙ্গিতে করা কিছু নোট তার মধ্যে রয়েছে।

ডায়েরী প্রসঙ্গ শেষ করছি জোহানেসবার্গ থেকে লেখা (তারিখহীন) মিসেস উইলসনের চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে—

"I enclose Nivedita's letter in which she refers to diaries and papers—and it was because of this that I was so surprised at Lady Bose's action. I think Dr. Bose reserved some of the diaries because they referred to his work. I cannot find a diary for 1903! I am disappointed to find that the diaries are not at all narrative—they are memoranda rather than diaries"*

যে বৃদ্ধা নারী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্মৃতির পবিত্র অগ্নি বুকে ধরে রেখেছিলেন দীর্ঘকাল কিন্তু স্থাপন করতে পারেননি বাইরের কোনো আধারে, তিনি যখন সেই অগ্নিকথা লিখবার উপযুক্ত মানুষ পেলেন, তখন তাঁর সুগভীর আনন্দের পরিচয় দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করছি। রেমণ্ড-হারবার্ট যেসব বস্তু চেয়েছিলেন, অসুস্থতার জন্য সেগুলি সময়মত দিতে পারেন নি বলে তিনি মরমে মরে ছিলেন। 'দেখতে পাচ্ছি অসুস্থতার মন্দতম দিক শারীরিক যন্ত্রণা নয়, তা হল, মানুষকে তা দুর্বল ও অসমর্থ করে তোলে।'—মিসেস উইলসন লিখেছিলেন।—'নিবেদিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করছি না, এই চিন্তা আমার অসুস্থতার মধ্যে আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করেছে। এবং সেই আকুতিই যেন আমাকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছে আবার।' রেমণ্ড-হারবার্ট তথ্য সন্ধানের জন্য ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, 'নিঃস্বার্থ সেই পরিশ্রম প্রশংসার অতীত', 'মনে হচ্ছে নিবেদিতার সমাধির একটি পাথর যেন সরে গেল'; মিসেস উইলসন জানতে চেয়েছিলেন, ওঁরা কি "কলকাতায় নিবেদিতাকে জানতেন এমন কোনো মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে নিবেদিতা বিপুল অন্তর্নিহিত শক্তি লাভ করেছিল, এবং '*দি ওয়েব*' বইয়ের অপূর্ব কিছু পরিচ্ছেদ লিখতে পেরেছিল?" ২৯ অগস্টের (১৯৩৯) ঐ পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন, 'বর্ণনার অতীত আমার আনন্দ—একাজ করবার মত শক্তি আপনারা পেয়েছেন। ধন্য আপনারা; ধন্য ট্যান্টিন। কী বিশ্বস্ত বন্ধু না সে!'

আরও লিখেছিলেন—'আমার শক্তি অব্যাহত থাকে যেন, যাতে করে আপনাদের প্রয়োজনে আমি লাগতে পারি; হাঁ সে চেষ্টা আমি করব।'

১৯৩৭ সালের নানা সময়ে, কখনো মিস ম্যাকলাউডের স্ট্রাটফোর্ড অ্যাভনের আবাসে (২৫-২৬ মার্চ), কখনো ট্রেনে, কখনো প্যারিসে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের বাসস্থানে (অক্টোবর) কখনো জেনিভায় (অক্টোবর) নিজেদের বাড়িতে এঁরা মিসেস

---

* ডায়েরী সম্বন্ধে একই জাতীয় কথা ইনি লিজেল রেমঁকে লেখেন ২৯ অগস্ট, ১৯৩৯-এ—

"But you know Lizelle, the diaries were simply notes on Dr. Bose's activities, they were no revelation of Nivedita and I understood that that was the reason he kept the diaries in his own care so long."

উইলসনকে প্রশ্ন করে তথ্য জেনেছেন। সেই সব সাক্ষাৎকারের নোট এ'রা রেখেছেন। জিন হারবার্টের নোটগুলি ইংরাজীতে, এবং লিজেল রে'মর নোট প্রধানতঃ ফরাসীতে। যে সব নোট আমি পেয়েছি, তাতে প্রচুর পৃষ্ঠা নেই। নোটগুলি খুবেই সংক্ষিপ্তভাবে করা, অনেক সময়ে এত হ্রস্ব যে, অর্থবোধ হওয়া কঠিন। বিশেষত শ্রীমতী রেম'র ফরাসী নোটগুলি তাঁর বিচিত্র সংক্ষিপ্ত মিশ্র লিখনপদ্ধতির জন্য প্রায়ই দুর্বোধ্য। ফরাসী সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ কর্মকারের সাহায্য ভিন্ন তার থেকে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হত না। এই নোটগুলি উপস্থিত করব, এই কারণে যে, সবটুকু অংশ শ্রীমতী রেম' ব্যবহার করেননি, এবং নিবেদিতার বাল্যসঙ্গিনী বোনের মুখের উক্তিগুলির মধ্যে প্রাণোত্তাপ প্রচুর। তবু পাঠকদের সতর্ক করে বলব, বিনা বিচারে এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না, কারণ, যিনি বলেছেন, দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের জন্য কিছু তথ্যগত ভুল তিনি করতে পারেন; যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা ভুল লিখতে পারেন, এবং তাঁরা যা লিখেছেন, তার থেকে পাঠোদ্ধার করবার কালে আমরাও ভুল করতে পারি।

মিসেস উইলসনের মুখের কথাগুলি উপস্থিত করার আগে প্রথমে যে লেখাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন, তার অনুবাদ উপস্থিত করছি। তার পরে কথিত স্মৃতি দেব।

মিসেস উইলসনের লিখিত স্মৃতিকথা

নিবেদিতা (মার্গারেট নোবল) সামুয়েল ও ইসাবেল নোবল, এই তরুণ আইরিশ দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান। সে তার শৈশব কাটিয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডে। যখন সে মাত্র কয়েক মাসের, সেই সময়ে আমাদের বাবা মা ঠিক করেন যে, ইংলণ্ডে বাস করবেন। সেই ওলটপালটের কালে তাকে আমাদের ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন তাকে ফেরত নেওয়ার কথা হল, তখন ঠাকুরমা এমন করুণভাবে নিজের নিঃসঙ্গতের কথা বলেছিলেন যে, শিশুটিকে "স্কুলের বয়স" পর্যন্ত তাঁর কাছে রেখে দেওয়া স্থির হয়। সে তাই কয়েক বছর সেখানেই ছিল, এবং এই সময়টি নিবেদিতার জীবনে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে।

অসাধারণ মহিলা ছিলেন আমার ঠাকুরমা। তাঁর প্রশান্তি এবং মাধুর্য সহজাত গুণ নয়, অখণ্ড আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পুণ্যার্চনার ফল। তিনি ধীর, সমর্থ মহিলা ছিলেন, অনাথ বালকদের নিয়ে তাঁর যে-বৃহৎ পরিবার ছিল, তাকে কিভাবে শাসনে রাখতে হয় জানতেন, অথচ তাঁর সম্বন্ধে তাদের গর্ব ও ভালবাসা অব্যাহত থাকতই। নিবেদিতা শেষকালে যখন সত্যই বাড়ি ফিরেছিল, তারপরে দীর্ঘ সময় সে নিজেকে বহিরাগত বলে অনুভব করত, আমরা যে অন্যান্য ভাইবোন ছিলাম, আমাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতে ব্যস্ত থাকত, সেইসঙ্গে কর্তৃত্বও করত, এবং নিজের সুখ সম্বন্ধে স্বার্থপরতার চিহ্নমাত্র ছিল না তার মধ্যে। সেই অল্প বয়সেই ক্ষমা গুণে পূর্ণ ছিল তার অন্তর। আর রূপকথার গল্প ও বিচিত্র সব বিষয়ের কথা বলে আমাদের অধীর আগ্রহে ব্যাকুল করে তুলত। বাবার উপাসনা সভায় যেসব পীড়িত আর বৃদ্ধ লোক

আসতেন, তাঁরা তাকে তার সমুজ্জ্বল কল্পনার জন্য বড়ই ভালবাসতেন ; সে তাঁদের দুঃখকষ্টের সংবাদ নিতে সদাই উৎসুক ছিল। বয়সের তুলনায় প্রবীণ ছিল সে, উৎফুল্ল নয়, প্রশান্ত। খেলাধুলা না করে পড়াশোনায় ডুবে থাকার জন্য নানা অসুবিধা ঘটত, কারণ আমার বাবা-মা বুঝতে পারেননি সে তার শৈশব হারিয়েছিল—নিঃসঙ্গ শৈশবজীবন কাটিয়ে।

বাবা ও নিবেদিতার মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল গভীর। বাবা বিবেচনাবুদ্ধির সঙ্গে তাকে বুঝতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। নিবেদিতার বয়স যখন দশ, তখন বাবা মারা যান। সে মৃত্যু তাকে প্রচণ্ড বেজেছিল।

তারপর বিদ্যালয়ের সাতটি মর্মান্তিক বছর। স্পর্শকাতর একটি শিশুর কাছে তা ছিল যূপকাষ্ঠে বলিদানের সময়। এই যে কটাহে সে নিক্ষিপ্ত হল, তার অতীত জীবন এর পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না। শিশুরা অনেকটা পশুর মত, তাদের থেকে যা-কিছু আলাদা তাকেই তারা যন্ত্রণা দেয়—এক্ষেত্রে সে ছিল পৃথক, বিশিষ্ট ও আদর্শবাদী। অন্যের মত হয়ে ওঠার জন্য তার সকরুণ চেষ্টা সত্ত্বেও সে নিজের নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন থাকত। তার যন্ত্রণার শেষ ছিল না। তা সত্ত্বেও, তার মনের অসাধারণ শক্তি, আদর্শবাদ ও কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত স্কুলে তাকে নেত্রীত্বের আসন দিয়েছিল ; তার নির্ভয় সাধুতা, আত্মার পবিত্রতা, ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ উদারতার জন্য সে যে জন্ম-নেত্রী—এই অবিতর্ক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল, পরবর্তী-কালে যা থেকে গিয়েছিল মূল্যবান ঐতিহ্যরূপে। বহুজনের মধ্যে যাপন-করা এই নিঃসঙ্গ জীবনের বছরগুলি অল্পবয়সী মেয়েটির অন্তর্জীবনে সবিশেষ বলাধান করেছিল, তাকে নিয়ে গিয়েছিল গ্রন্থ, শিল্প ও ধর্মের জগতের মধ্যে, তার আত্ম-মুক্তির ঐগুলিই ছিল পথ।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এমন একজন প্রধানা শিক্ষিকাকে পেলাম, যিনি ধর্ম-সংস্কারের অগ্নিপ্রবাহ বইয়ে দিলেন। নিবেদিতা উৎসাহী দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল, যারা বাইবেল-চর্চা করেছিল গভীরভাবে এবং সারা জীবনের জন্য সংযম ও আত্মশাসনের শপথ নিয়েছিল। তাদের অনেকেই অবশ্য বন্ধুবান্ধব ও ছুটির অবকাশে যেসব প্রলোভনাদি হাজির করত, তা এড়াতে পারেনি, কিন্তু নিবেদিতা আনুগত্যে অটল ছিল—"উদ্ভট", "গুরুমণি" এইসব আখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। সৌভাগ্যবশতঃ এহেন জীবনের কাঠিন্য এবং আত্মনিগ্রহের ভার লাঘব হয়েছিল তার সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধে। এই শিল্পপ্রীতির জন্য সে কিছু সময়ের জন্য রোমান ক্যাথলিক মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে কিন্তু সে এমন কিছু পরমোৎসাহী সুপণ্ডিত অ্যাংলো-ক্যাথলিকের ব্যক্তিগত সংস্রবে আসে, যাঁদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা দেখতে পায়। ঐ দুই সূত্র থেকে সে প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুশীলনের অমূল্য প্রেরণালাভ করে।

স্কুল ত্যাগের পরে নিবেদিতা শিক্ষকতা ও আংশিক সাংবাদিকতাকে উপজীবিকা-রূপে গ্রহণ করে। কোনো বিষয়েই উদাসীন থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ সংস্কারের পক্ষে সে মহা উৎসাহী প্রচারক ; তার অক্লান্ত প্রচারের বিষয় : শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, দায়িত্বশীল নাগরিক

হয়, কতকগুলি তথ্যের কোষাগারমাত্র হয়ে না দাঁড়ায়। এই আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে, যার মধ্য দিয়ে আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হবে। নিজের শৈশবের অভাবের কথা স্মরণ করে সে সেখানে কিণ্ডারগার্টেন পর্যায় যুক্ত করেছিল।

শিক্ষকতাতেই নিবন্ধ থাকেনি সে। সংবাদপত্রের রচনা এবং জনসভায় ভাষণাদির দ্বারা নিজেকে ও নিজের আদর্শকে সে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তুলেছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থায় নব চেতনা সঞ্চারে এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার উন্নয়নে সে ছিল অক্লান্ত কর্মী।

সুতরাং সে যখন স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেল, ন্যায্য প্রতিরোধের পরে যখন স্বামীজীর মূল্য ও আন্তরিকতার সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয় হোল, তখন চমৎকৃত হয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই ভারতের নারীদের জন্য কাজের প্রবল আগ্রহে হৃদয় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। সে অনুভব করল যে, তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ এই উদ্দেশ্যের পথেই তাকে চালিত করেছে। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্বশক্তি নিয়ে। যত প্রকারে সম্ভব, ভারতীয় নারীদের কাছে এই সত্যটি প্রতিভাত করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল, তাদের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে ; এবং তারা যাতে নিজেদের সাহায্য নিজেরাই করতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত উপাদান তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও তার ব্রত হয়ে দাঁড়াল।

এই উদ্দেশ্যেই বাগবাজারের ১৭নং বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির সৃষ্টি, যে বিদ্যালয়টি এখন সুরম্য একটি ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার আশা ও বিশ্বাস, বিদ্যালয়টি ভারতে নারী-শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শনির্ভর সৃষ্টিশীল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

নিজ আদর্শের সাধনায় নিবেদিতা কোনো ফুল-বিছানো পথে হাঁটে নি, বাধা-হীন কোনো পথ বাছে নি ; আদর্শের সিদ্ধিরূপ সে দেখেছে, কারণ দুর্জয় ছিল তার সাহস, অখণ্ড ছিল উৎসাহ, প্রলোভনের সামনে ম্লান হয়নি জীবনোদ্দেশ্য, এবং ভারতের নারীদের জন্য সর্বোচ্চ-সম্ভব উৎসর্গের কমে সন্তুষ্ট হয়নি সে।

"ঈশ্বর তার সব অভিপ্রায় সার্থক করুন।"

মিসেস উইলসন-কথিত স্মৃতি

নিবেদিতার ঠাকুরমার নাম এলিজাবেথ নীলাস। এঁদের পরিবারের আয়ারল্যাণ্ডে বাস ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের রস্টোভরে বন্ধুর (বা আত্মীয়ের) বাড়িতে গেলে সেখানে জন নোবলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জন নোবলের বয়স তখন ৪০, এঁর বয়স ১৮। পুরুষটি এঁকে আত্মহারা করে দেন, বিয়ে হয়, ফলে পরিবার থেকে বিতাড়িত ও একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েন।

জন নোবল পাদরী ছিলেন। ৫৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এগারোটি সন্তান হয়, যার ৬টি বাঁচে।

তিনি ওয়েসলিয়ান চার্চে ছিলেন। তিন বছর অন্তর এক প্যারিশ থেকে অন্য প্যারিশে বদলি হতেন, তবে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যেই। তাঁর মৃত্যুকালে পত্নীর

বয়স ৩৫। পত্নী পরে হয়ে দাঁড়ান মস্ত রাজনৈতিক, রক্ষণশীল দলের। দলের লোকেরা এঁর বাড়িতে জুটতেন সলা পরামর্শের জন্য। এঁর বাড়ি সর্বজনপরিচিত।

ইনি মার্গটকে (নিবেদিতা) ৪ বছর পর্যন্ত পালন করেন। বাইবেল পড়তে শেখান। ইনি ফুল পছন্দ করতেন, বাগান তৈরী করেছিলেন, অপূর্ব তা, প্রাচীরের গায়ে গায়ে ফুলের রাশি। ৬৪ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। মার্গট এঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। আয়ারল্যাণ্ডের জন্য প্রবন্ধ লেখার সময়ে সে এঁর 'নীলাস' পদবী ছদ্মনাম-রূপে ব্যবহার করত।

জন নোবলের ভাইয়ের নাম ডাঃ জর্জ নোবল। বিধিবদ্ধ পড়াশোনা না করলেও তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞানে পণ্ডিত বলে খ্যাত। প্রভাবশালী। ভ্রাতৃবধূর যথার্থ সুহৃদ। এঁর ছেলেরা ছিলেন ভারী কল্পনাপ্রবণ।

এঁর বড় ছেলে সব শেষে মারা যান। সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় তাঁর পত্নীসহ মৃত্যু। নিবেদিতার সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল (নিবেদিতার) মায়ের মৃত্যুকালে।

আমাদের মা যখন ৪ বছরের শিশু তখন দিদিমা মারা যান। তখন মাকে পালনের ভার পড়ে মায়ের ঠাকুরমার উপর। তিনি তিরিক্ষি বুড়ি, আধিপত্য করা স্বভাব। আদর দিয়ে ও প্রশংসা করে নাতনির মাথা খেয়েছিলেন। মা ধনী পরিবারের মেয়ে। মায়ের পিতৃপরিবারও আয়ারল্যাণ্ডে বহু পূর্বে বসতি করেছিলেন। তাঁদের মূল মন্ত্র ছিল—ফুঁড়ে এগিয়ে যাও।

দাদামশায় রিচার্ড হ্যামিলটন—কর্ক-ছাপির ব্যবসা করতেন। রাজনীতিতে বিশেষ উৎসাহী।

আমাদের পিতার জন্ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। এগারো জন সন্তানের মধ্যে তিনি শেষের দিকে তৃতীয়। এগারো জনের মধ্যে ৬ জন বেঁচেছিলেন। পিতার নাম, স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল (একজন বিখ্যাত 'প্যাস্টরের' নাম ছিল রিচমণ্ড; ঠাকুমা সেই কথা মনে রেখেই ঐ নাম দেন যাতে সন্তান ভাবী জীবনে প্রভাবিত হয়)। বড় ভাই জনই তাঁকে মানুষ করেন কারণ তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। শেষে কাপড়ের ব্যবসায়ে লাগেন। এক ধনী কাকা কাজকর্ম শিখিয়েছিলেন। বয়সের পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ছলচাতুরীতে অভ্যস্ত হতে পারেন নি কখনও। ব্যবসায়ী সমাজের এক সমাবেশে মেরী ইসাবেল হ্যামিলটনকে (জন্ম ১৮৪৫) দেখেন। তখন তাঁদের বয়স অল্প। তিন সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হয়। মেয়েটি অনেক দিন ধরেই এঁর মাকে (যিনি পরে শাশুড়ী হন) শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সেই কারণেই এই বাড়ির বধূ হওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। বিয়ের পরে সুন্দর গ্রাম-শহর ডানগাননে থাকেন পরম সুখে।

স্বামীর মতই তরুণী বধূ অনুভব করেন যে, ব্যবসা ত্যাগ করে তাঁর স্বামীর পাদরীজীবন বরণ করা উচিত। স্বামী স্থির করতে পারছিলেন না ঠিক কি করবেন। তিনি কবি, চমৎকার বক্তা, ব্যক্তিত্বে ছিল চৌম্বক আকর্ষণ। ওয়েসলিয়ান চার্চের ব্যাপারে সুখী ছিলেন না। অন্য একটি চার্চ খুঁজে নেওয়া দরকার। অল্প বয়সী বধূ গৃহসুখের সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত—সব কিছু বিক্রী করে দিতেও। শিশু মার্গটকে ৪ বছর তার ঠাকুরমার কাছে এঁরা রেখে দিয়েছিলেন। পিতা ইংলণ্ডে

গেলেন পড়াশোনা করতে। স্বাধীনতাহীন আয়ারল্যান্ডকে তাঁর অসহ্য বোধ হয়েছিল। ব্যবসা-বেচা টাকা দিয়ে খুবই অল্প খরচে ম্যাঞ্চেস্টারে লেখাপড়া শুরু করেন। পত্নীর খুবই কষ্টে কেটেছিল, কারণ এ রকম কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনে তিনি অভ্যস্ত নন, সামাজিক আমোদপ্রমোদ ভালবাসতেন। পিতার বাগ্মিতা ছিল অদ্ভুত। তাঁকে ওয়েসলিয়ান চার্চ বা চার্চ অব আয়ারল্যাণ্ডে যোগ দিতে বলা হয়। তিনি ম্যাঞ্চেস্টারে কন্‌গ্রিগেশনালিস্টে যোগদান স্থির করেন। বাড়তি রোজগার করতে চেষ্টা করতেন অন্যের ছুটির সময়ে তার হয়ে বেদীতে বক্তৃতা করে। এর ফলে শরীর ক্লান্ত এবং ফুসফুস যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়।

পিতা অতীব উৎসাহী রাজনীতিক। আইরিশসুলভ উগ্র। এ ব্যাপারে তাঁর বিপুল উদ্দীপনার কথা মনে পড়ে। ১৮৭৬ সালে রুশ-তুর্কী প্রশ্ন খুবই সজীব। যারা রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে আসত, তাদের সঙ্গে প্রচুর আলোচনা করতেন—দরজা ভালভাবে বন্ধ করে। শিশুরূপেই মার্গট অনেক তীব্র রাজনৈতিক আলোচনা শুনেছে। পিতা 'ভিকার' হলেন। দরিদ্র অঞ্চল ওল্ডহ্যামে তাঁকে পাঠানো হল। এর ভুল চার বছরের মধ্যে বুঝলেন—অশিক্ষিত লোকজনের সংস্রবে এবং পরিশ্রমে যখন যক্ষ্মা ধরল। তখন আর ফেরার উপায় নেই। চার্চ অব ইংলণ্ডে যোগদান করে বেশী স্বাধীনতা পেতে পারতেন। অত্যন্ত ডায়ন্যামিক। গোষ্ঠী পরিবর্তন পছন্দ করতেন। মার্গট তাঁর খুবই প্রশংসা করত।

খুবই পীড়িত, ওল্ডহ্যাম ত্যাগ করতেই হল, পাঠানো হল ডেভনশায়ারের একটি গ্রামে, নাম গ্রেট টরিংটন। ১২ মাস পরে এখানে তাঁর মৃত্যু হয়—ফুসফুস ঝাঁঝরা। সমস্ত 'প্যারিশ' ভেঙে পড়েছিল সংকার-অনুষ্ঠানে। জনসাধারণের মধ্যে দারুণ প্রভাব ছিল।

তখন গ্রেট টরিংটন ছোট জায়গা, গাছে ভরা, পুরনো এক দুর্গপ্রাসাদ ছিল, তার গায়ে চরে বেড়াত বনময়ূরীর দল। ছেলেদের খুশীর সীমা ছিল না। পরিবারের আর্থিক কষ্ট অত্যধিক। পিতার জীবনের জন্য প্রয়োজন ছিল মনোযোগের, ভালো খাওয়া-দাওয়ার—যার দাম অনেক। তিনি চেয়ে দেখতেন—তিনি চলে যাচ্ছেন—শিশু সন্তানদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তাঁর পত্নী। মার্গট চেঁচিয়ে বাইবেল পড়ত—বাবার বইগুলি খোঁজ করে ঠিকঠাক রাখত। বাবার সঙ্গে তার হৃদয়ের নৈকট্য ছিল খুবই। দীর্ঘ কথাবার্তা হত। ভারতবর্ষের কথা হত। বালিকা বয়সে নিবেদিতা ভাবত, বড় হলে সে ভারতবর্ষে যাবে। সেবাকে বিরাট আদর্শরূপে নিয়েছিল।

মার্গারেট জন্মাবার কয়েকদিন পরেই বাড়ির প্যাচিকা তাকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্যাথলিক মতে 'ব্যাপটাইজ' করে আসে।

চার বছর ঠাকুরমার কাছে থাকার পরে যখন মার্গট পিতার কাছে ফিরেছিল, তখন আমি তাকে পছন্দ করিনি; হিংসে করতুম। আমাদের এক ছোট্ট বোন অ্যানী, সে ডেভনশায়ারে মারা গিয়েছিল, ওল্ডহ্যামের বাগানের বিষাক্ত ফল খেয়ে। পিতার কাছে যারা আসত, সব কলেজের ছাত্র। বাবা রাজনীতির মাথা, তাঁর উদারনৈতিক রাজনীতি। বাড়ির ঝি আইরিশ, নাম ম্যাগী, খুবই অনুগত। নানা ভয়ঙ্কর গল্প বলত আমাদের।

ওল্ডহ্যাম ছিল গরীব শহর। ছেলেমেয়েরা থাকত পিছনের ঘরে। সেখান থেকে

মাঠ, ক্ষেত দেখা যেত। বেশী গাছপালা ছিল না। শহরটা শ্রমিকদের, মর্যাদাহীন। বাবা মনে করতেন আবহাওয়া স্বাসরোধী। কলকারখানা থেকে দূরে আমাদের বাড়ি। আমরা অবাক হয়ে শুনতুম, খুব সকালে, ৬টার আগে কারখানার পথে শ্রমিকদের কাঠের জুতোর শব্দ।

এখান থেকে গ্রেট টরিংটন গ্রামে চলে আসা আনন্দের কারণ হয়েছিল। নোংরা উঠোনের বদলে সেখানে সত্যকার বাগান মিলল। জায়গাটা চমৎকার, দৃশ্য মনোরম।

ওল্ডহ্যামে থাকাকালে মার্গট ও আমাকে স্কুলে পাঠানো হয়। তিন মহিলা সেটির তত্ত্বাবধান করতেন। সেটি দেড় মাইল দূরে। সেখানে বাগান ছিল। দুপুরের খাওয়াও সেখানেই হত। আমাদের ঠাণ্ডা রাখার জন্য সেণ্ট জনের ১৪টি অধ্যায় মুখস্থ করতে দেওয়া হত। দুজনের ডাক নাম দেওয়া হয়েছিল "সান্" ও "রেন্"।

আমাদের বাড়িতে বিরাট রান্নাঘর, তাতে মস্ত চিমনি। সেখানে খেলা করতাম। ফায়ারপ্লেসটুকু বাদ দিলে জায়গাটা খুব অন্ধকার। লুকোচুরি খেলতাম। মা ও দাসী আগুনের দুধারে বসে সেলাই করতেন, কারণ চোখ-বাঁধা অবস্থায় সেখানে আমরা চলে যেতাম, আটকাবার দরকার হত। আসবাবপত্রের কথা মনে নেই। অগ্নিকুণ্ডের কাছ ঘেঁষে বাবা মার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়তাম। তারপরে ঘণ্টাখানেকের আজগুবি গল্প।

আমরা চার্চের মধ্যে খেলাধুলো করতাম। খুবই প্রিয় জায়গা সেটা। মার্গট প্যাস্টরের ভূমিকা নিত, বেদী থেকে বক্তৃতা করত, আমি ও অ্যানী শ্রোতা। গান ও প্রার্থনা এবং অভিনয়। বাইবেলের কিছু কিছু অংশ জানা ছিল, বিশেষতঃ মজার জায়গাগুলি। ঐসব অংশের অভিনয় হত।

মজার অংশ যেমন, ইজরায়েলের রাজা ৪১ বছর সেবা করেছিল প্রভুকে, তবু তার পায়ে ঘা। ইসাকিয়েল ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু গোমড়া মুখে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। ডেভিড প্যালেস্টাইনের গেট আঁচড়াচ্ছিলেন পাগলের ভান করে।

বাবা মা এইসব খেলার কথা জানতেন। প্রতিদিন সান্ধ্য আহারের পরে পুজো, পড়া, স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা। চেয়ারের পাশে আমরা নতজানু। ভৃত্যরা উপস্থিত।

আমরা ছোটরা প্রতি রবিবার চার্চে যেতাম। সেখানে গল্প শোনার জন্য শান্তশিষ্ট থাকতাম। বিকালে উপাসনার পরিবর্তে মায়ের কাছে গল্প শুনতাম, তাঁর কোলে মুখ ডুবিয়ে। গল্পগুলো বিশেষভাবে লোকান্তরিত আত্মাদের নিয়ে। ধর্মকাহিনী নিয়েও। গল্প শোনার কালে মিশর সম্বন্ধে মার্গটের ভালবাসা দেখা যেত। ভবিষ্যতে সে যে মিশর ও তার শিল্পের প্রতি প্রীতি দেখাবে, তার সূচনা এখান থেকেই। হিব্রুদের প্রতি তার সহানুভূতি বেড়েই যাবে। প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সূচনা এই সময়েই।

বাল্যকাল থেকেই মার্গটের মন করুণাপূর্ণ। গাঁয়ের অসুস্থ লোকদের কাছে সে ৬ বছর বয়সেই চেঁচিয়ে বাইবেল পড়ত। বড় সুন্দর করে সে পড়ত, এবং নিজের অপরূপ কণ্ঠের প্রভাব লক্ষ্য করে খুসী হত।

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল তার। তাতে ধাক্কা খেতেন মা। রাগ করে বলতেন—কী মেয়েই হয়েছে!

বাবার মৃত্যুর পরে মাকে আমাদের দাদামশায় সাহায্য করতেন। ১০ ও ৮ বছরের দুই মেয়েকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হল। মা চলে গেলেন সমুদ্রতীরে, তারপরে লণ্ডনে, সেখানে দু'বছর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি শিক্ষা করলেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের পালন করার মত টাকা রোজগার করতে সমর্থ হলেন না। তখন ঠিক হল, তিনি একটি অতিথিভবন তৈরী করবেন পিতার সাহায্যে ; মেয়েরা ইংলণ্ডে স্কুলে পড়বে। বেলফাস্টের কাছে এই বোর্ডিংহাউস চালিয়ে মা অন্নসংস্থান করতেন।

মায়ের ব্যক্তিত্বের বিকাশ গুল্ডহ্যামে থাকাকালেই হয়েছিল, যখন স্বামীর কাজে সাহায্য করতেন। রবিবার সন্ধ্যায় চার্চে যেতেন না বলে খুবই সমালোচিত হতেন। অবিরত সন্তানধারণের জন্য তাঁর দেহ বিপর্যস্ত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মেজাজ চড়া। রাত্রে সন্তানদের জুটিয়ে নিয়ে অন্ধকারে (বাড়তি আলো জ্বালাবার পয়সা ছিল না) বাইবেলের গল্প শোনাতেন। বাইবেলের কাহিনীকে এমনভাবে অভিনয় করে দেখাতেন যে, সন্তানেরা ভয় পেয়ে যেত। রাজনীতি ও ধর্মকে মিশিয়ে দিতেন, তাতে প্রচুর কল্পনা যোগ করতেন। ইজিপ্টের জ্বালা যন্ত্রণা, বা আয়ারল্যাণ্ডের নবজাগরণ প্রভৃতির কথা শুনে শিশুদের চুল খাড়া হয়ে উঠত। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে লাফিয়ে যেতেন, ইচ্ছামত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চলতেন—যাতে সন্তানের মনে রঙ ধরে যেত। দারিদ্র্যের মধ্যেও বর্ণসৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যায়নি ; সুতো তুলে নানা অলংকরণ করতেন। পিতৃগৃহে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পালিত হয়েছিলেন, সংসারের কোনো কাজকর্ম করতে হয়নি। তাঁর গুণের জন্য তাঁর স্বামী তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল পারস্পরিক।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের যখন মৃত্যু হয়, তখনো বিচিত্র কথা, মার্গটের মধ্যে সেক্স সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। কারণ মা নরনারীর শাশ্বত মিলনের কথাই বলতেন। মায়ের কল্পনা অনুযায়ী, কিংবা মায়ের যে কল্পনা ছিল বলে নিবেদিতা বিশ্বাস করত তদনুযায়ী, সে আত্মার সঙ্গে আত্মার চিরন্তন মিলনের কথা বলত—যেন স্বর্গে পিতা ও মাতাকে একত্র দেখছে। মা আমাকে বলেছিলেন—"আমি ও সবের পারে এখন। মার্গোও (নিবেদিতা) বিয়ে কি জিনিস বোঝে না। তোমার পিতাকে মহাপুণ্যে স্বামীরূপে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাহলেও ভবিষ্যতে আর কিছুর সঙ্গে জড়িত হতে কখনো চাইব না।" মায়ের মৃত্যু নিবেদিতার কাছে অসাধারণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার মনে হয়েছিল—যেন আত্মা পাখা মেলে দিয়েছিল যাতনা-সমুদ্রের উপরে।

মা ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন।

হ্যালিফ্যাক্সে আমাদের স্কুলে পড়ার সময়ে বুধবার বিকালে প্রান্তরভূমিতে ভ্রমণ : ঝোপঝাড়, লতাগুচ্ছ, কণ্টকগুল্ম, কালোজামের গাছ, বন্য গোলাপ, ব্লু-বেল প্রভৃতি।

মার্গটকে হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পাঠানো মস্ত ভুল হয়েছিল। কোনো লাইব্রেরী পায়নি। ইতিহাস ধরনের বই সে ভালবাসত, যেমন Fifty Year in Uganda, কবিতাও, শেক্সপীয়ার, মিল্টন পরম প্রিয়। শেক্সপীয়ারের একেবারে ছিন্ন এক গ্রন্থাবলী তার ছিল। দাদামশায় তাকে বই উপহার দিতেন যখন নাতনিরা ছুটির শেষে বাড়ি ফিরত।

বছরে দুবার ছুটিতে আমরা মায়ের কাছে ফিরতাম। দেখা যেত মায়ের মনে ক্ষোভ—তিনি ধর্মের জন্য যথেষ্ট সময় দিচ্ছেন না। ছেলেমেয়েরা তাঁর মত নয় বলেও তিনি আক্ষেপ করতেন।

মার্গটের বয়স যখন ১১, একবার তখন এক বছরের ছোট ভাইকে সঙ্গে দিয়ে তাকে ফ্লিটউড থেকে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল।* অল্পবয়সী মেয়েটি একেবারে কচি ভাইকে নিয়ে একলাই গিয়েছিল। বেলফাস্ট বন্দরে পরিবারের লোকজন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা ঝাঁকুনি-খাওয়া গাড়িতে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে।

স্কুলে প্রতিবারেই আমরা একদিন দেরীতে হাজির হতাম।

ঐ সময়ে সেক্স সম্বন্ধে আমাদের কোনই সচেতনতা ছিল না। অপরিচিতদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলতে কখনো বারণও করা হয়নি।

ফেরবার পথে ফ্লিটউডে আমরা রেস্তোরায় প্রাতরাশ করতাম। স্টিমার সেখানে পৌঁছত সকাল ৬ টায়; তারপর ট্রেন ছাড়ত ১২ টায়। ট্রেনে ৪টে পর্যন্ত থাকতে হত।

বিদ্যালয় পত্রিকায় মার্গেট প্রচুর লিখেছে। কিন্তু কবিতা নয়।

মার্গট মিস কলিন্সের (শিক্ষিকা) সঙ্গে সংযোগ রেখেছিল। তিনি আমাদের কাকার বাগ্‌দত্তা হন। আমিও ঐ স্কুলে পড়িয়েছি। নিবেদিতা মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়েছে, প্রধানতঃ বনের ফুলের উপরে।

স্কুলে থাকাকালে নিবেদিতার উপর 'ব্রিদরেন অব প্লিমাউথে'র প্রভাব পড়ে। এগারো বছর বয়সে প্রতিক্রিয়া ঘটে। ১২ থেকে ১৩-র মধ্যে ক্যাথলিক ভাবকে আবিষ্কার করল বইপত্র দেখে। সে হৃদয়বত্তার সন্ধানী, বর্ণরাগের, তাই ক্যাথলিক ভাবে আকৃষ্ট। স্কুল, এই ভাবের বিরোধী। সুতরাং একে সে লুকিয়ে রাখত। মা পরে তাকে তার ক্যাথলিক ব্যাপটিজমের কথা বলেছিলেন। সেজন্য সে ঐ মতে আরও উৎসাহী হয়। এর শিল্প-সৌন্দর্যে সে বিশেষ আসক্ত।

সঙ্গীত প্রভৃতি খুবই ভালবাসত। কিন্তু ২১ বছর থেকে সবকিছু ছেড়ে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে মগ্ন।

সব সময়েই শিক্ষাবিৎ।

বিদ্যালয় জীবনে জনপ্রিয় নয়, কারণ সর্বদাই পরিস্ফুট ব্যক্তিত্ব। তার স্কুল-জীবন আগাগোড়া তীব্র ভাবপূর্ণ। উদ্ভিদবিদ্যা ভালবাসত।

সকলকে জুটিয়ে বক্তৃতা করতে পারত।

ভূতের ও বাইবেলের গল্প বলে সকলকে মাতিয়ে রাখতে পারত। নতুন গল্প বানাত।

ইতিহাসকে জীবন্ত রাখত আমাদের কাছে।

আমরা দুজনে মারামারি করতাম। একবার তার মাথা থেকে এক খামচা চুল টেনে ছিঁড়ে নিই। সে সর্বদাই প্রবল স্বভাবের।

---

* রিচমণ্ড নোবল লিখেছেন, নিবেদিতার বয়স তখন ১৩ এবং তাঁর বয়স তখন তিন। এই কথাই সত্য মনে হয়।

স্কুল ছাড়ার পর

১৮৮৪-১৮৮৬—কেসউইক
১৮৮৬ —রাগবি
১৮৮৭-১৮৮৯—রেক্সহ্যাম
১৮৮৯-১৮৯১—চেস্টার
১৮৯১-১৮৯৪—মাদাম ডি লীউ (উইম্বলডন)
১৮৯৪-১৮৯৭—নিজের স্কুল (ঐ)

১৮৯১তে আমি ও নিবেদিতা ছুটির সময়ে লিভারপুলে থাকতুম। রোটাণ্ডোয় যাবার ট্রেনের ভাড়া দেবার মত পয়সা ছিল না বলে আমরা দুজনে হাঁটতুম, নিবেদিতা সারাটা পথ আবৃত্তি করে যেত।

স্কুল ছাড়ার পরে সে 'লেক ডিস্ট্রিক্ট'-এ যায়, কোলরিজ ও সাদের বাড়িতে বাস করে; সেখানে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রাসকিনের ঐতিহ্য জীবন্ত। রাসকিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকারী এক পাদরী ছিলেন, যিনি তাকে স্বাধীনভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন।

কেসউইকে এক বেসরকারী বিদ্যালয়ে সে গভর্নেস ছিল।

সেখানে দু'বছরের মত ছিল; প্রধান শিক্ষিকা মিস চির্ভলির দ্বারা 'হাই চার্চ'-এর প্রভাবে পড়ে। তিনি বোঝান, চার্চ অব ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। ওঁরই প্রভাবে রোমান ক্যাথলিক প্রভাব থেকে মুক্তি।

তারপরে সে রাগবিতে একটি ছোট দাতব্য বিদ্যালয়ে পড়াতে গেল, সেটি কুড়িটি শিশুর অনাথ আশ্রম। পরিচালিকা ছিলেন এক মিস নিকলসন, যাকে নিবেদিতা পাগল বলত; তাঁর নানা পাগলামি ছিল, কিন্তু করুণা ও সহানুভূতিতেও পূর্ণ ছিল মন।

তারপরে নর্থ ওয়েলসের রেক্সহ্যাম নামক কয়লাখনি অঞ্চলে একটি বেসরকারী স্কুলে গেল। এইখানেই জনৈক ওয়েলশ্‌ম্যানের সংগে তার ভালবাসা হয়। ভদ্রলোক কয়লাখনির অফিসে চাকুরিয়া ছিলেন। সাহিত্য এবং রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি উভয়তঃ আকর্ষণ তাদের একত্র করেছিল।

তারপরে চেস্টারে এক স্কুলে মার্গট যায়। সেখানে যাবার অল্প পরেই ফুসফুসের ব্যাধিতে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। এঁর মা নিবেদিতাকে ভালবাসতেন। মার্গটের এইটেই মধুরতম প্রেম-ব্যাপার কিন্তু গভীরতম নয়। ভদ্রলোক তার থেকে দু'বছরের বড় ছিলেন; ইনিও হাই চার্চের।

নিজের স্কুল যখন সে আরম্ভ করে তখন বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী মাদাম ডি লীউ তার সঙ্গে ছিলেন। ইনি ডাচ, ফ্রবেল ও পেস্তালাৎস্কির অনুগামী।

উইম্বলডনে তাদের স্কুলের ব্যাপারে বিরাট সংগ্রাম করতে হয়েছে।

মাদাম ডি লীউ আমেরিকায় বড় চাকরি পেয়ে চলে যান। সেখানে পরে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। নিবেদিতা তাঁকে ভারতে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিল।

স্বামীজীর কাজ নিয়ে নিবেদিতা যখন ভারতে চলে গেল, তখন আমাকে তার স্কুলের ভার নিতে হয়েছিল।

উইম্বলডনের দুটি স্কুলই কিণ্ডারগার্টেন।

তার আগে সে প্রধানতঃ ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়েদেরই পড়াত।

উইম্বলডনের দু জায়গাতেই সে নিজের প্রভাব বিস্তৃত করেছিল এবং বহু বন্ধু ছিল তার।

তার নিজের স্কুলে ৪০টি শিশু ছিল। হল্যাণ্ডের কিছু বোর্ডারও তার ছিল, যারা ইংরেজী শিখতে এসেছিল।

১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই তার ভারত যাত্রা পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট হয়।

তার দ্বিতীয় প্রেমের ব্যাপার শুরু হয় ১৮৯৪তে। ভদ্রলোকের নাম ম্যাকডোনাল্ড, একটি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ১৮ মাস ধরে তা অব্যাহত থাকে।

শিক্ষার ব্যাপারে তার একটি বক্তব্য—শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, সে যাতে শিক্ষা খুঁজে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।

সে শিক্ষামন্ত্রী স্যার মাইকেল স্যাডলারকে জানত।

ইয়র্কশায়ারের স্কুলে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী। সংখ্যা সেখানে নিয়ন্ত্রিত।

রেক্সহ্যাম এবং চেস্টার থেকে মার্গট সপ্তাহ শেষের ছুটিতে লিভারপুলে আসত।

১৮৯১-৯ সালে মার্গট নিজের স্কুলে বক্তৃতা করতে গিয়েছে।

রেক্সহ্যামে যখন সে ছিল, তখন কয়লাখনিগুলির সমৃদ্ধির কাল। শ্রমিকদের অধঃপতিত অবস্থা তার মনে গভীর যন্ত্রণা দিত, কিন্তু কোনো সক্রিয় সমিতিতে যোগ দিতে পারেনি কারণ প্রাইভেট স্কুলে কাজ করত।

১৭ বছর বয়সে রাজনীতিতে মার্গটের বিশেষ আকর্ষণ। আয়ারল্যাণ্ড প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত। ঐ সময় হোমরুল প্রশ্নে যারা ব্যস্ত তারা পাপী তার কাছে। কিন্তু ২২-২৩ বছরে সে হোমরুলের পক্ষপাতী।

তারপরে বুয়র যুদ্ধের সময়ে বুয়রদের পক্ষপাতী। এই কালে আয়ারল্যাণ্ড তার আবেগ-কেন্দ্র।

১১ বছর বয়সে সে প্লিমাউথে এক যাজকের সঙ্গে পরিচিত হয়, যিনি তাকে মুগ্ধ করেন। সে প্রতিজ্ঞা করে, মদ্যপান করবে না, নাচে অংশ নেবে না। বোধহয় ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞাও নিয়েছিল।

নিবেদিতা সম্ভবতঃ ডেইলী নিউজে প্রবন্ধ পাঠাত। 'রিভিউ অব রিভিউজে'ও।

নিবেদিতার পাঠানো লেখাকে বদলে রিভিউয়ের সম্পাদক উইলিয়ম স্টেড 'সিস্টার রোজ' করে তাকে দাঁড় করান। কিন্তু সিস্টার রোজ প্রেমেও পড়েছিল। তাতে নিবেদিতা স্তম্ভিত; তার রাগ ও ঘৃণার সীমা ছিল না।

ভারতে যাবার অনেক আগে থেকেই সে স্টেডকে জানত।

মিস ডি এস্টেরে সিসেম ক্লাবের লেখিকা সদস্য। এক সন্ধ্যায় বিতর্ক হল, বিষয় "শিশু না বয়স্ক, কারা দেবস্বভাবের নিকটবর্তী?" নিবেদিতা শিশুদের পক্ষ নিল, মিস ডি এস্টেরে বয়স্কদের পক্ষ। মিস ডি এস্টেরে বলেন, তিনি শিশুদের দত্তকরূপে পালন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি সে কাজে; শিশুরা একেবারে লোভী

ছুঁচো, নিজেদের ছাড়া কিছু জানে না। শুনে নিবেদিতা রাগে অস্থির, অগ্নিপ্রবাহ বয়ে গেল কণ্ঠ দিয়ে, শিশুদের একেবারে স্বর্গলোকে তুলে দিল।

নিবেদিতা নিজের স্কুলে সর্বদা বীরপুজা শেখাত।

সে এমার্সন পছন্দ করত, 'মাই লেডিজ টাম্বলার'।

তার এমার্সনের বই বহু ব্যবহারে ছিন্ন। রেক্সহ্যামেথাকাকালেপুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে এমার্সন ও থরো প্রচুর পড়েছিল।

মিস মুল্যারের বোন এক সুপরিচিত ইংরেজ রাজনীতিককে বিয়ে করেছিলেন। ডেভিড মার্গসন, এম.পি.,—লেডী ইসাবেলের পুত্র।

১৯০৬—১৯০৯—'নীলাস' ছদ্মনামে বাংলাদেশের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লিখেছিল।

ইংলন্ডে 'দি সিস্টার নিবেদিতা লীগ অব হেল্প ফর ইন্ডিয়া' হয়েছিল।

নিবেদিতা একবার (১৯০২?) রাশিয়ান দূতাবাসের এক ভোজসভায় বক্তৃতা করেছিল। তাকে সামলে কথা বলতে বলা হয়।

(১৯০৭—৮) লিভারপুলে পজিটিভিস্টদের একটি গোষ্ঠী ছিল, খুবই ধনী, মানবতাবাদী এবং বিচিত্র ধরনের। তাঁদের এক মহিলা নিবেদিতা ও আমাকে তাঁদের সঙ্গে থাকতে আমন্ত্রণ করেন। নিবেদিতা বক্তৃতা করে। বাড়ির লোকজন ও ভৃত্যেরা একই ঘরে আহার করে।

এই ধরনের অনেক ড্রইংরুম-বক্তৃতা সে করে। উইম্বলডনে চমৎকার ভাষণ দেয়। এ সবের দ্বারা নিজের স্কুলের জন্য টাকা সংগ্রহে সচেষ্ট ছিল।

নিবেদিতা কান্নায় ভেঙেছে জীবনে বহুবার। তার সঙ্কটের সীমা ছিল না, কিন্তু সত্বর সেগুলিকে সে অতিক্রমও করত।

নিবেদিতা জিরাল্ড নোবলকে বিশেষ পছন্দ করত। বহু লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল।

১৯০৮ (১৯০৯?) নিবেদিতা গ্রেট টরিংটনে আবার যায় এবং মিসেস ওলি বুল ও ডাঃ বসুর সঙ্গে সেখানে থাকে।

'Minor poet' হলেন বীটী, অক্টেভিয়াস নন।

অক্টেভিয়াস বীটী ছিলেন বড় ভাই, তাঁর জন্য মার্গট 'উইম্বলডন নিউজে' প্রবন্ধ লিখত।

নিবেদিতা যখন শুনল—কৃষ্ণমূর্তিকে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া শিখতে পাঠানো হয়েছে—দারুন চটে গিয়েছিল।

সে মোটামুটি ভালই ফরাসী জানত।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার একবার চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' বইয়ের যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলে এক লাইন পড়লেই বাকি অংশ আমি বলে দিতে পারব।" গোটাগুটি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা নিয়ে তিনি ভারতে ফিরেছিলেন। তারপর ঐ বইটি ২৭ বার পড়েন।

আমার মেয়েরা রাত্রে শোয়ার আগে যাতে সারদাদেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা করে, সে বিষয়ে নিবেদিতা বিশেষ তাগিদ দিত, ভারতে যেখানেই যেত, সেখান থেকে সর্বদা কবচ-তাবিজ প্রভৃতি তাদের কাছে পাঠাত।

একদিন ত্রিচিনোপল্লীতে অধ্যাপক সুন্দরম আয়ারের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে তার প্রচণ্ড বিতর্ক চলছিল। স্বামী সদানন্দ নিবেদিতার খুবই অনুরাগী, কিন্তু ইংরেজী অল্পই জানতেন—মহা রাগে বললেন—'তুমি কে হে, নিবেদিতার সঙ্গে তর্ক করছ?'

নিবেদিতা কিংবা আমি কখনই নিজেদের বংশগৌরব নিয়ে ব্যস্ত হইনি।

একদিন নিবেদিতা এক পরম ভক্ত যুবককে, যিনি মঠে যোগদান করতে যাচ্ছেন (পরে মঠের সন্ন্যাসীই হন), জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মনে করতেন, নির্বেদিতা রাজনীতিতে বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছেন। রাজনীতির পথে তাঁর সায় ছিল না। একদিন নিবেদিতা তাঁর ঘরে সোজা ঢুকে বললেন, 'স্বামীজী, আমি আপনার সঙ্গে ধ্যান করতে চাই।' ব্রহ্মানন্দ নিজেই বলেছেন, আধ ঘণ্টা পরে যখন আমি চোখ মেলে তাকালাম, নিবেদিতা তখনো ধ্যানমগ্ন।

মাতা ঠাকুরাণী সারদা দেবী তাকে পা টিপতে দিতেন।

নির্বেদিতা যথার্থ মিশনারী। না হয়ে পারেনি।

মা মারা যাবার সময়ে নির্বেদিতা বলেছিল 'ওঁ', এবং এমন এক সান্নিধ্য অনুভব করেছিল, যার কাছে মৃত্যু কিছুই নয়।

মড স্টামের আঁকা নিবেদিতার ছবি আদর্শায়িত। সে সুন্দরী ছিল না, কিন্তু তার চেহারায় ছিল অপার্থিবতার আলো। তার নাক অত সুন্দর নয়।

নিউ স্টেটসম্যানের সম্পাদক এস কে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার মস্ত বন্ধু।

কালীকে গ্রহণ করার পরেও ক্রুশকে ত্যাগ করার প্রয়োজন সে বোধ করেনি।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের মধ্যে কঠোর মানসিক সংঘাত হয়। বশী সেন স্পষ্টই ক্রিস্টিন-ঘেঁষা, এবং বসু নিবেদিতা-পক্ষীয়।

নিবেদিতা মনে করেছিল, সিস্টার ক্রিস্টিন আরো ভালভাবে স্কুল চালিয়ে যেতে পারবে, যেকালে সে অর্থসংগ্রহ করে যাবে।

নিবেদিতা প্রেরণাদাত্রী ধরনের।

মৃত্যুকালে ক্রিস্টিনকে ডেকে পাঠায় সে। বলে, সব কিছু তার হাতেই থাকবে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে নিবেদিতা প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে কাজ করেছিল।

কার্জন নিবেদিতাকে ঘৃণা করতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে তার সমস্ত চিঠি সেন্সারের ব্যবস্থা করেন। ১৯১০-১১,—এই কালে সে চিঠিপত্রে পারতপক্ষে বসুর নামোল্লেখ করত না। ১৯১০ সালে নিবেদিতার গ্রেস্তারের সম্ভাবনা ছিল। তার বন্ধুরা চাইতেন, সে যেন আরও চতুরতা দেখায়।

ভ্রমণকালে ও ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে সে ছদ্মনাম নেয়, কারণ বন্দরসমূহে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল সরকার থেকে। জাহাজে নিবেদিতা কী নাম নিয়েছিল, তা রিচ জানতে পারে, কারণ ঐকালে রিচ তাকে চিঠি লিখেছে। 'White' নাম কি?

নিউইয়র্ক থেকে ফিরে গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্ন দেখা দেয়। সে বসুর সঙ্গে কাজ করত কিছু মাইনে নিয়ে। মিঃ থর্প তার বোনের (ওলি বুলের) টাকা উদ্ধার করে এঁদের প্রাপ্য দিয়ে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালের ধাক্কাই (ওলি বুলের উইলের মামলা) তাকে কার্যতঃ

খেয়ে ফেলেছিল। ট্যান্টিন (মামলার বিবরণবস্তু) সমস্ত পত্রপত্রিকার কর্তিত অংশ পাঠাতেন। পরে এর জন্য তিনি আক্ষেপ করেন। নিবেদিতা মরমে মরে গিয়েছিল; নিজের রোগ গোপন করে রাখে। সকল বন্ধুকে শীতকালে তার সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করে, কিন্তু কেউ আসতে পারেনি। বন্ধুদের কাছে মনপ্রাণ খুলে ধরা প্রয়োজন হয়েছিল। স্বামীজীর কথা আবার তার মনে গভীরভাবে এসেছিল। বসু তাকে প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া দেখাননি।

বোস্টনের প্রতিকৃতিতে যাকে (নিবেদিতাকে) দেখা যাচ্ছে, তা জীবনের শেষ পর্যায়ের এক ভাঙা নারীর চেহারা। তার পূর্ব পর্যন্ত আলোকরূপিণী এক নারী ছিল, যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই বলে তার শক্তি নিঃশেষিত নয়—ওটা সংকটকালের ছবি—সহসা বুড়িয়ে-যাওয়া এক নারীর।

[মিঃ ওলি বুল নরওয়ের লোক, মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন বিখ্যাত ভায়োলিনবাদক। বৃদ্ধ। স্ত্রী তাঁর থেকে ৪০ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ। স্ত্রী পিউরিটান স্বভাবের, ধনী, পিয়ানো-বাদিকা। সর্বদা স্বামীর সঙ্গী। ইউরোপের বিভিন্ন রাজসভায় কনসার্ট বাজিয়েছেন একত্রে। স্বামীর বিরাট প্রতিভা, অত্যন্ত মেজাজী। স্বামী বিবাহবিচ্ছেদ চাননি, স্ত্রীর ফেরার প্রতীক্ষায় ছিলেন, ফিরলে বলেছিলেন, ওগো জানতাম, তুমি ফিরবে। এঁদের কন্যা ওলিয়া, খুবই শিল্পস্বভাবসম্পন্ন, উগ্র স্বভাবের এবং দুষ্ট প্রকৃতির। সেই যেন নিবেদিতাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।

বিয়ের আগে মিসেস ওলি বুল ছিলেন মিস থর্প। তাঁর ভাই মিঃ থর্প মিস লংফেলোকে বিয়ে করেন। মিসেস বুলের উইলের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা ইনি করেন, এবং নিবেদিতাকে তার ভারতের কাজের জন্য টাকা দিতে মনস্থ করেন।]

রিচ, আমাদের ভাই। সে কথা রাখেনি। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল রিচ ভারতের জন্য জীবনোৎসর্গ করবে। নিবেদিতা তাকে কৃষিবিদ্যা পড়ায়। খুব অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়। তার বউ ধনী, বিদুষী, সামাজিক জীব।

রিচ স্থির করেছিল নিবেদিতার জীবনী লিখবে।

১৯০৯ সালে মায়ের মৃত্যু, উত্তর ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারে, আমাদের বাড়িতে। টেলিগ্রাম পেয়ে নিবেদিতা হাজির হয় তিন দিন আগে। কয়েক মাস আমার কাছে থাকে, বসু পরিবার আসা পর্যন্ত। আমেরিকায় সভা প্রভৃতি স্থগিত রেখে ছুটে আসে। সে যখন নিউইয়র্কে গেছে তখনই মা মৃত্যুমুখে।

মিসেস ওলি বুল ও ট্যান্টিন পরস্পর সামাজিকভাবে বন্ধু; তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উভয়েই অপর দিকে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ। নিবেদিতাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে ঈর্ষা ছিল।

মিসেস ওলি বুল নিবেদিতার অন্তর্জীবনের রূপ জানতেন।

মিসেস লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা অ্যালবার্টা, স্বামী জর্জ মণ্টেগু, যিনি পরে আর্ল অব স্যাণ্ডউইচ হন। তিনি ভারতে এসেছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ব্যবহারে ইনি সর্বসময়ে মার্জিত ও অমায়িক। সংবাদপত্র জগতে এঁর বিরাট প্রভাব। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে লণ্ডনের নানা সংবাদপত্রে রচনাদি পাঠিয়েছিলেন।*

---

* নিবেদিতার বিশেষ গুণমুগ্ধ আর্ল স্যাণ্ডউইচ ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ঘনানন্দকে লেখা এক পত্রে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে একটি চমৎকার ছবি দিয়েছেন।—

অ্যালবার্টার এক ভাই ছিল, হলিস্টার নাম, নিবেদিতা তাকে খুব ভালবাসত। সে ভার্জিনিয়ার একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল।

মিঃ ও মিসেস লেগেটের কন্যা ফ্রান্সেস—শীতল স্বভাবের। মার্গেসনের সঙ্গে বিবাহিত। মিসেস লেগেটের বয়স যখন চল্লিশের বেশী তখন তার জন্ম হয়।

মিসেস লেগেট ও তাঁর বোন ট্যাপ্টিন প্রভাব বিস্তার করতে, চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদে মহিমা বজায় রাখতে চাইতেন। পোষাকাদির ব্যাপারে তাঁরা নিবেদিতার উপর জোর খাটাতেন। নিবেদিতার চেহারা ভারী, দৃঢ়, পরিচ্ছদের ব্যাপারে তার খুবই অবহেলা। রাজ্ঞীর মত মিসেস লেগেটের মহিমা, দুই পৃথিবীতে (আমেরিকা ও ইউরোপ) তাঁর বিচরণ।

ওলি বুলের সঙ্গে মিলে নিবেদিতা নিজের পোষাকের ধরন নির্বাচন করেছিল। আমেরিকায় বন্ধুদের খুশী করবার জন্য তাকে সিল্কের পোষাক পরতে হয়েছিল। তাঁরা চাইতেন সে ভাল পরিচ্ছদে ভূষিত হোক। তাঁরাই তাকে সব কিছু দিয়েছিলেন।

নিবেদিতা যখন প্রথম ভারত থেকে ইংলণ্ডে ফেরে (১৮৯৯), তখন আমার বিয়েতে 'লেডী অব অনার'রূপে সাহায্য করেছিল এবং ট্যাপ্টিনের দেওয়া সাদা সিল্কের গাউন পরেছিল। আমার স্বামী বিরাট কোনো ব্যক্তি নন, কিন্তু ভালবাসার মানুষ।

হ্যামণ্ডরা স্বামীজীর শিষ্য। অতি বিচিত্র দম্পতি। খুবই কুদর্শন। মানবসংসারের প্রতি প্রেম পূর্ণ। মিসেস হ্যামণ্ড তাঁর পিতার (অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) বাড়ির রক্ষণা-বেক্ষণ করতেন; তাঁর স্বামী প্রবন্ধ লিখে বড় কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। অতি সহজ সরল, সহানুভূতিসম্পন্ন পরিবার। নিবেদিতার পক্ষেও সাধারণ তাঁদের জীবনযাত্রা; সে আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য পছন্দ করত।

"প্রিয় স্বামীজী, বহু বৎসর পূর্বে নিবেদিতার সঙ্গে আমার পরিচয়সূত্রে আপনি কিছু লিখতে বলেছেন। ভারতবর্ষে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ কাজের বিষয়ে যে-সব শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে, তাতে নূতন কিছু যোগ করতে পারব মনে হয় না।

আমার অবশ্য অপরপক্ষে লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অতি স্পষ্ট স্মৃতি মনে আছে, যা তাঁর চরিত্রের এমন একটি দিককে উন্মোচিত করবে, অনেকের কাছে তা বোধহয় জানা নেই। ঘটনাকালে আমার শাশুড়ী মিসেস লেগেট, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড (যাঁরা ইউরোপীয়দের মধ্যে বোধহয় নিবেদিতার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ), আমার স্ত্রী এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। নিবেদিতা লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক ক্র্যাম্বের সঙ্গে সাক্ষাতে ইচ্ছুক হন। ইনি মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাসে বিশিষ্ট পণ্ডিত, সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন, এবং বেদান্তদর্শনের সঙ্গেও পরিচিত।

আমরা সকলে মিসেস লেগেটের ১২ ব্রাউন স্ট্রীটের বাড়িতে নৈশ ভোজে মিলিত হয়েছিলাম। সময়, মনে হয় ১৯১০ বা তার এক-দু' বছর আগে।

অতঃপর ঘটনা যা ঘটল তা নিবেদিতা-অনুরূপ। তিনি আলোচনা আরম্ভ করে দাবি করলেন—ভারত এখন গণতন্ত্রের উপযুক্ত। সজোরে ঐ দাবি তিনি আঁকড়ে রইলেন, যদিও অধ্যাপক ক্র্যাম্ব একেবারে মানতে গররাজি যে, গ্রীস ও ইংরেজী-ভাষী দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও 'গণতন্ত্র' শব্দটির অর্থ পর্যন্ত উপলব্ধ হয়েছে। বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, দু'পক্ষের কেউই হারতে রাজী নন, যার সমাপ্তিতে, বেদনার সঙ্গে আমরা দেখলাম, নিবেদিতা কেঁদে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে উঠে চলে গেলেন, কিছু পরে বাড়ি থেকেও।"

(প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯৫৩)

হ্যামণ্ডরা গরীব। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাজ করত—তাদের সাহায্য করত।

নিবেদিতার মৃত্যুর তিন চার বছর পরে আমি নিবেদিতার পত্রসংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। কেউই কোনো সাড়া দেয়নি। তারপর মহাযুদ্ধের জন্য ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। ট্যাশ্টিন একেবারে চেপে যান, খুব কমই চিঠি দেন। মিসেস ওলি বুলের কাছে লেখা চিঠিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এতে নিবেদিতার মনস্বিতার দিকটি উন্মোচিত। ট্যাশ্টিনের কাছে লেখা চিঠিতে তথ্য থাকত। স্বামীজী যে ট্যাশ্টিনকে খুব পড়াশোনা করা মহিলা মনে করতেন না, তা নিবেদিতা জানতেন। স্বামীজীই ট্যাশ্টিনকে পড়াশোনার অভ্যাস ধরান।

আরও যেসব বন্ধুর কাছে চিঠি ছিল, তাঁরা হলেন :

মিঃ অ্যাপলটন : শোনা যায় ইনি সব চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছেন। উইম্বলডন কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

মিঃ হ্যাভেল : ডেনমার্কের লোক। আমেরিকার নিউইয়র্কে বাস করতেন। কলকাতা মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। এঁর সঙ্গে নিবেদিতার মননপ্রধান পত্রালাপ। বিষয়—শিল্প ও তার বিকাশ।

মিঃ ও মিসেস ক্রপটকিন : লণ্ডনে থাকাকালে নিবেদিতা এঁদের বিশেষ জানতেন। এঁরা লণ্ডনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চিঠির ব্যাপারে মাডাম ক্রপটকিন বলতে চেয়েছিলেন—সবই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

মিঃ কুক : লেডী ইসাবেলের বন্ধু, শিল্পী, রাস্কিন-এর কাজ করতেন। নিবেদিতার স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। রাসকিনের বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে তন্ন তন্ন ভাবে নিবেদিতাকে জানান।

মিঃ গেডেস ও টমসন : এঁরা দুজনে একত্রে এডিনবরার টাওয়ার তৈরী করার কাজ করেছিলেন। নতুন ধরনের স্কুল এটি, যেখানে শিশুরা পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষালাভ করত। গেডেস তাঁর পত্নীর সব অর্থসম্পদ এতে খরচ করেন। এই পরীক্ষা-মূলক কাজে টাকা নষ্ট হওয়াটা পত্নী খুশী মনে মেনে নিয়েছিলেন।

নিবেদিতার গোষ্ঠীর সকলে বড় লোক হয়ে ওঠেন। তাঁরা নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা আদর্শ প্রবেশ করিয়ে দিত। তার ছিল অখণ্ড মন। মোটেই নম্র শান্ত ছিল না। সম্ভ্রম আদায় করে নিত। তাকে হেলাফেলা করা যেত না।

সে মোটেই saint ধরনের নয়, বরং prophet ধরনের।

সে পূর্ণ পবিত্র। কখনো পুরুষ-সম্পর্ক হয়নি। যৌন-আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। সব আকাঙ্ক্ষাই মননের জগতে।

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। বসু ব্রাহ্ম হলেও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

নিবেদিতা জগদীশ বসুর বক্তৃতা লিখে দিত, এবং তাঁর বিপদে সাহায্য করেছে।

নিবেদিতার একটি মনোরম ছবি জগদীশ বসুর বাড়িতে আছে।

লণ্ডনে থাকাকালে বসু নিবেদিতার সঙ্গে প্রায়ই সিনেমা ও থিয়েটারে যেতেন ;

সেগুলি হাসির বই হওয়া চাই। সহজ উপন্যাসাদি তাঁরা পছন্দ করতেন, হালকা ধরনের, যাতে মনের কিছুটা বিশ্রাম হয়।

ভারতের প্রতি নিবেদিতার ভালবাসাই বসুর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। সেই সর্বাঙ্গীণ ভালবাসাকে কি করে প্রকাশ করব জানি না, তা আবেগময় অথচ গভীর পবিত্র।

নিবেদিতাকে জেলের বাইরে রাখতে বসু সচেষ্ট ছিলেন। নিবেদিতা ভারতের জন্য শহীদ হতে উদ্‌গ্রীব কিন্তু বসু সরকারী ব্যাপারে জড়িত ; তিনি নিবেদিতাকে সাবধান হতে বাধ্য করেছিলেন। বসু ভয় করেছিলেন, তাঁর কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। নিবেদিতা তা অনেকটা মেনে নেয়, কারণ বসু তার কাছে মূর্তিমান ভারতবর্ষ।

বসু কখনই নিবেদিতার আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতে পারেননি। নিবেদিতা তাঁকে সন্তানবৎ মনে করত। বসু বুঝেছিলেন, নিবেদিতা অন্য ধরনের মহিলা। বসু হলেন সেই শিশু, নিবেদিতা যাকে কামনা করেছিল, এবং বিবেকানন্দ-মারফৎ তাঁকে পেয়েছিল।

আমি একবার চেয়েছিলাম তাকে আমার একটি সন্তান দেব। সে তা জানত।

তার ত্যাগধর্ম নিয়ে বসু প্রায়ই তামাসা করতেন। উত্তরে একবার নিবেদিতা বলেছিল, 'কিন্তু শিশুদের উপর ভালবাসা তো ত্যাগ করতে পারলুম না।'

একবার জাহাজে ফেরার সময়ে নিবেদিতা এক মিশনারী পরিবারকে দেখে যাদের চারটি শিশুকে যাত্রীদের দয়ার উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নিবেদিতা তাদের তুলে নেয়। সে বলে, ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে দাম্পত্যজীবনের জন্য আমার অভাববোধ কখনো হয়নি—অভাববোধ শুধু সন্তানের জন্য।

মার্গট সব সময়েই এমন একজনের সন্ধান করত, যিনি তার চেয়ে বড় চরিত্রের হবেন। বিবেকানন্দের মধ্যে সেই চরিত্র পেয়েছিল।

আমি স্বামীজীকে প্রথম দেখি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি নিবেদিতার সঙ্গে ইংলন্ডে আসেন।

স্বামীজীর কাজে তার যোগদানের ঔচিত্যের বিষয়ে আমরা কখনো প্রশ্ন তুলিনি। নিবেদিতা তার "আহ্বান" পেয়েছিল। উপলব্ধির পথে অগ্রসর তার জীবন।

আমি অনুভব করেছিলুম, যদি একবার বিবেকানন্দের ক্ষমতাকে পথ ছেড়ে দিই, তাহলে আমার আর বিয়ে হবে না, অথচ আমি তখন বিয়ে করতে যাচ্ছি।

বিবেকানন্দ যে-কোনো বিষয়ে কথা বলবার সময়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন।

প্রতি বক্তৃতার অন্তে নিবেদিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলত, 'স্বামীজী, ক্ষমা করবেন কিন্তু—'

নিবেদিতা বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়নি। সে সত্যের সন্ধানী। বিবেকানন্দ ছিলেন সত্য—যার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছিলাম।

নিবেদিতা যখন স্বামীজীর কাজে যোগদানের বিষয়ে স্থিরপ্রত্যয় হয় ট্যাণ্টিন সে বিষয়ে কিছু জানতেন না। পরে ১৮৯৮ সালে নিবেদিতাকে ভারতে পেয়ে বিস্মিত হন। কলকাতায় তাঁদের সাক্ষাতের কালে ট্যাণ্টিন দেখেন, নিবেদিতার মুখ মশায় কামড়ে ফুলে আছে কিন্তু তবু তা আনন্দে হাসিতে দীপ্ত।

বিবেকানন্দ যে-কোনো জিনিসকে অবিলম্বে স্পষ্ট আকারে ধরে দিতে পারতেন, যেখানে অন্যেরা হাতড়ে বেড়াত।

বিবেকানন্দ জ্যোতির্ময় আত্মা। কোনো কিছুই অস্বচ্ছ নয় তাঁর কাছে। বক্তব্যকে পরিষ্কার করে তোলার ক্ষমতা নিবেদিতারও বহুলাংশে ছিল।

নিবেদিতা যখন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেল, তারপর থেকে তার পক্ষে রোমান ক্যাথলিক বা অন্য কোনো অনুশাসনে আস্থা রাখা সম্ভব হয়নি।

বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দসহ আমাদের পরিবারে প্রায় মাসখানেক ছিলেন।

বিবেকানন্দ আমাদের ভাই রিচমণ্ডকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে গিয়ে 'বীফ স্টীক' খেতে দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ জানতেন, নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ডের রাজনীতিতে নিমগ্ন। তিনি তাকে বিবেচনা করে চলতে বলেছিলেন, গোঁড়ামি না রাখতে এবং খোলাখুলি জড়িয়ে না পড়তে।

আগে আয়ারল্যাণ্ড ছিল তার আবেগের কেন্দ্র। বিবেকানন্দই তাতে বিপর্যয় ঘটিয়ে সেখানে ভারতের প্রতি আবেগ সঞ্চারিত করেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস-প্রদর্শনীর পর স্বামীজী, নিবেদিতা, লেগেটরা, মিসেস ওলি বুল প্রভৃতি দল বেঁধে মাসখানেক কি মাস দেড়েকের জন্য (ফ্রান্সের) ব্রিটানীতে বেড়াতে যান। এখানেই স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁর চরম নির্দেশ দেন, যা নিবেদিতার জীবনে পরম জ্যোতি।

বিবেকানন্দ সেই ঊর্ধ্বমুখী আলোকশিখা যা নিবেদিতার প্রাণমূলকে শিহরিত করেছিল।

রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতিকথা

[নিবেদিতার ছোট ভাই রিচমণ্ড নোবল দিদির অতীব ভক্ত। পরবর্তী জীবনে জামাইকায় খ্রীস্টীয় যাজকরূপে ইনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইনি নিবেদিতার ভাই এবং বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এঁর পক্ষে ভারতের নিপীড়িত মানুষের কথা ভোলা কখনো সম্ভব হয়নি। স্বামীজীর প্রভাবে ইনি ভারতকে কর্মক্ষেত্ররূপে নেবেন, প্রায় স্থির করেছিলেন, পরে অবশ্য তা কার্যকর হয়নি। তা হলেও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল এবং তা প্রকাশও করতেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে, ইনি যখন ২৩-২৪ বছরের যুবক তখন ইংলণ্ডের চার্চ গেজেট পত্রিকায় 'ভারতে মিশনারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তা কিয়দংশে উদ্ধৃত হয় 'বেঙ্গলী' পত্রিকায়, ২৫ অগস্ট, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। ঐ প্রবন্ধে রিচমণ্ড নোবল কঠোরভাবে জানান, ভারতে যে সব মিশনারী যান তাঁরা অধিকাংশই মূঢ় ও নির্বোধ, নিতান্ত অশিক্ষিত, কোনো রকম দার্শনিক চিন্তার ধারে-কাছে নেই তাঁরা, দার্শনিক চিন্তায় পারদর্শী হিন্দুদের তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, খ্রীস্টান হলেই সোজা স্বর্গবাস, যেখানে "একেবারে ভগবানের সঙ্গে বসে মদ খাওয়া যাবে।" মিশনারীরা কি পরিমাণে জাতিগর্বে অধীর, বিজিত জাতির প্রতি ঘৃণায় শিহরিত, তা তীব্রভাবে ইনি জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর জীব, তাও কঠোরভাবে জানাতে ভোলেন নি। এঁর ভাষার নিষ্ঠুরতা এমনই ছিল যে, বেঙ্গলীর সম্পাদক পর্যন্ত মৃদু প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছেন।*

আইরিশ জাতীয়তার রক্তে পালিত রিচমণ্ড নোবল ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিবাদী। যেহেতু তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ জানতেন, সেজন্য যখন স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ লেখা প্রকাশ করল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা, রিচমণ্ড নোবল প্রতিবাদ না করে পারেন নি। তেমন একটি চিঠি আমরা রেম-সংগ্রহে পেয়েছি।

রিচমণ্ড নোবলের নিবেদিতা সম্বন্ধে দুটি লেখা আমরা পেয়েছি। প্রথমটি নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ১৯১২-র জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি প্রেরিত হয় রেম-হারবার্টের কাছে, তাঁদের ১৫

---

* রিচমণ্ড নোবলের উক্ত রচনার অংশ—

"It would be imagined that these missionaries would go amongst their *hearers in a spirit of humility*, and not of arrogance. Oh dear no! They come as Englishman, as a conquering race, and treat the Hindus as the vanquished foe. Is it any wonder that between this and the fact that *they are the missions flourishing* financially when it receives nothing from the converts, they conclude that the missions are promoted by the Government? The result of all this is, that only the scum of the Hindus become *Christians, and then only for* purposes of their own, so much so that the phrase "There are no Native Christians, about," has come to mean that you are quite safe from burglary."

সেপ্টেম্বর, ১৯০৭-এর চিঠির উত্তরে। রেম-হারবার্ট যখন "মার্গারেট নোবল নাম্নী অতি অসাধারণ মহিলাটির জীবনের সত্য ও পূর্ণ চিত্র দেবার জন্য" ভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন দিদির অতি ভক্ত ভাইয়ের পক্ষে সাড়া না দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ'র লেখায় আমরা নিবেদিতার সাহিত্যপ্রীতি ও আবৃত্তিক্ষমতার যেমন উজ্জ্বল ছবি পাই, তেমনি যেহেতু ইনি খ্রীষ্টীয় যাজক ছিলেন, তাই সহজেই নিবেদিতার প্রথম জীবনের খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ক্রম-রূপান্তরের ছবি দিতে পেরেছেন। কয়েক লাইনে বিবেকানন্দের রেখাচিত্রও অনবদ্য।]

অনুজের শ্রদ্ধা

(মডার্ন রিভিউ, জানুয়ারী, ১৯১২)

মডার্ন রিভিউ পড়বার জন্য আমি সাধারণতঃ খুবই উৎসুক হয়ে থাকি। আপনাদের এই মাসের সংখ্যাটি স্বভাবতঃই আমার কাছে বিষাদময় আকর্ষণের বস্তু, যদিও সে বিষাদের সঙ্গে তৃপ্তি ও আনন্দও মিশ্রিত রয়েছে, কারণ এই সংখ্যাটি আমার ভগিনীর প্রতি বহু ভারতীয় জনসেবকের সহৃদয় মনোভাবের স্মারকপত্র। অনুজ ভ্রাতা নিজ ভগিনী সম্বন্ধে কিছু বলতে অগ্রসর হয়েছে, এই ব্যাপারটিকে হয়ত আপনারা অস্বাভাবিক ও অশালীন ভাবছেন, কিন্তু আপনাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, আত্মম্ভরিতার দ্বারা চালিত হয়ে একাজ আমি করছি না,—এর মূলে আছে আপনাদের সকলের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

আমার ভগিনীর জীবনে দুটি দিক ছিল, যা সব সময়ে সকলের জানা ছিল না ; এক, তার বিপুল ধর্মানুভূতি, দুই, তার প্রবল প্রগাঢ় জাতীয়তা। এই দুই প্রবণতা তার জীবনে এমনই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে ছিল যে, যথার্থভাবে বলতে গেলে দুটি নয়, একটি উদ্দেশ্যেই সে সতত উজ্জীবিত ছিল—নিজ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আত্মবিকাশে মানুষের নিঃসংশয় অধিকার ঘোষণায়। যে-দেশের অধিবাসী আমি, সে দেশের মানুষের পক্ষে এই ব্যাপারটি বুঝতে পারা সম্ভব, কারণ, এখানে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা—তথাকথিত 'ন্যাশনালিস্ট', বা তথাকথিত 'ইউনিয়নিস্ট' তাঁরা যাই হোন—জনসাধারণকে নিজেদের 'গেলিক' পূর্বপুরুষদের প্রাণধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য দেশের মন্দ নকলনবিশ হতে প্ররোচনা দেন। বিজাতীয় ইংরেজী ভাবধারায় নিমজ্জিত হওয়াই আয়ারল্যাণ্ডের পতনের অন্যতম কারণ। এর প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের গেলিক ভাষা, গেলিক নৃত্যাদি, গেলিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, এবং সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে আইরিশ কৃষকদের, যাতে তারা কুসীদজীবী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শিকারে আর পরিণত না হয়। এক কথায় এখানে আমাদের প্রধান সমস্যা—আইরিশ জাতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ। মনে হয়, আমাদের দেশের মতই আপনাদের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা বলবেন, এই নীতি প্রগতিবিরোধী, যেহেতু আমরা মানুষকে জাতীয় করে তুলতে চাইছি, যখন কালধর্ম আন্তর্জাতিকতার দিকে ; আমরা যেন জনগণের পার্থিব উন্নতির পথ

বন্ধ করতে চাইছি। এর উত্তর, কেউই প্রথমে জাতীয় না হয়ে যথার্থ আন্তর্জাতিক হতে পারে না ; এবং তাকে জাতীয় হতে শিক্ষা দিয়ে, তাকে তার পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার সংগে পরিচিত করিয়ে আমরা তাকে মেরুদণ্ড ফিরিয়ে দিচ্ছি, ফিরিয়ে দিচ্ছি হারানো ব্যক্তিত্ব, তাকে সবলতর শ্রেষ্ঠতর মানুষ করে তুলছি, যা সে ছিল না। এক কথায় আমরা তাকে পৃথিবীতে পথ কেটে চলবার মত করে গড়ে তুলছি। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে-আইরিশের কাছে স্বদেশের কোনো মূল্য নেই, তার নৈতিক শক্তিও নেই, সে মনোবলহীন ক্ষয়িষ্ণু অধঃপতিত জীব। বৈষয়িক সাফল্যে বিশ্বাসী আমাদের বস্তুবাদী বন্ধুরা মানব-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকটি উপেক্ষা করেন।

বুঝতে পারছি প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটছে। উদ্দেশ্য ছিল, আমার ভগিনীর ভারত গমনের পিছনে কোন্ কারণ-সমবায় বর্তমান ছিল, সে বিষয়ে অল্প কিছু বলি। শ্রীমতী অবলা বসু তাঁর প্রবন্ধে অনুগ্রহ করে আমার পিতার এক বিচিত্র পূর্ব-ধারণার বিষয়ে জানিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে মার্গট (এই নামেই আমার বোনকে আমি সর্বদা স্মরণ করি) যে-ডাকে সাড়া দেবে, তার প্রারম্ভিক অনুশীলন কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। পনের বছরের মত যখন তার বয়স, তখন চার্চ অব ইংলণ্ডের ট্রাক-টারিয়ান আন্দোলন তার মনে নাড়া দেয়। এই আন্দোলনে পূজো-প্রার্থনার যে বর্ণ-মহিমা এবং স্যাক্রামেণ্ট প্রভৃতি প্রতীকের উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল, অনুগামীদের কাছ থেকে যে নিষ্ঠাভক্তি ও শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনা দাবি করা হয়েছিল,—তা আমার ভগিনীর কল্পনাকে আকর্ষণ করে এবং তার জীবনে প্রথম বড় ধরনের ধর্মীয় প্রভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই 'হাই অ্যাংলিসিজমে'র প্রভাব তার জীবনে শেষ সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। এই কালের আত্মনিগ্রহের অভ্যাস পরবর্তীকালে তার কর্মজীবনের পক্ষে তাকে অধিকতর যোগ্য করে তুলেছিল।

হাই অ্যাংলিসিজম্ ছিল অতীব কঠোর, অনমনীয়, নিতান্ত অনুদার,—তা মার্গটের মত চরিত্রের মানুষের আধ্যাত্মিক আকুতি শান্ত করতে পারেই না, কারণ নিশ্ছিদ্র গোঁড়ামি, অন্য মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে এর অনুগামীদের প্রকাশ্য অসহিষ্ণুতা মার্গটকে অবশেষে নূতনতর পথের সন্ধানে উন্মুখ করল—এই ধর্ম-রীতি ছাড়া অধিকতর 'খৃস্টীয়', অধিকতর মানবিক কোনো ধর্ম আছে কি? ট্রাকটারিয়ানরা অবশ্য তাকে ঐতিহ্যের মূল্য শিখিয়েছিল। ক্রমে সে চার্চ অব ইংলণ্ডের 'দি ব্রড চার্চ স্কুল' নামে পরিচিত সংস্থায় যোগ দিল, কিন্তু তার প্রথম জীবনের ট্রাকটারিয়ান-অভিজ্ঞতার অনেকখানি তার মধ্যে থেকে গেল।

উৎকৃষ্টতর শব্দের অভাবে Broad churchism যাকে বলছি, সে বস্তু মার্গটের মত চরিত্রের মানুষের আধ্যাত্মিক আকুতি শান্ত করতে পারেই না, কারণ মামুলী কতকগুলি কথা বলা ছাড়া এর মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি অথবা সুগভীর কোনো শিক্ষা ছিল না। এর মধ্যে ছিল এক ধরনের সিনিক মনোভাব যা অন্যের বিশ্বাসকে কুসংস্কারপূর্ণ বা বিদ্যাহীন মনে করত, সেই জন্য ধর্মজীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় রসানুভূতির প্রশ্রয় এতে ছিল না। মার্গটের জীবনের এই সন্ধিক্ষণেই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। সে এতাবৎ যা শিখে বা অনুভব করে এসেছে, সব কিছুকেই স্বামীজীর শিক্ষার মধ্যে সমন্বিত দেখতে পেল, সব

কিছুই এক সময়ের অংশ, কোনো কিছুই অপরকে খণ্ডন করে না; সবই এখন নূতন জীবনে, নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে গেল, এবং মার্গটের সদা-প্রস্তুত সহানুভূতি অধীনস্থ এক জাতির যাতনার অনুভবে সহজেই জাগরিত হয়ে উঠল।

স্বামীজী দেহত্যাগ করেন তরুণ বয়সেই। আমার ভগিনীও দেহত্যাগ করল অল্প কিছু বেশী বয়সে। আমার ভগিনী যে স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, তা অদ্ভুত কিছু নয়, কারণ আমি নিজে স্বামীজীকে দেখেছি, আমি জানি তাঁর শক্তি। তাঁকে একবার শুধু দেখা ও তাঁর কথা শোনা মাত্র অবিলম্বে বলতে হবে আত্মগতভাবে—Behold the Man!—দেখ, দেখ, কে ইনি! সত্য ধ্বনিত তাঁর কণ্ঠে—মানুষ অনুভব করত—কারণ তিনি অধিকারের সঙ্গে কথা বলতেন, শুধু পণ্ডিত বা, পুরোহিতের মত করে নয়। স্বামীজী নিশ্চয়তাকে, প্রত্যয়কে নিজের মধ্যে বহন করতেন, জিজ্ঞাসুকে দিতেন আশ্বাস ও বিশ্বাস। সেই জিনিসই আমার ভগিনীকে তিনি দিয়েছিলেন; এই ধ্রুব-প্রত্যয়ই তাকে স্বামীজীর আহ্বানে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে শক্তি দিয়েছিল; এবং বিনা দ্বিধায় সে আহ্বান স্বীকার করার পরে কখনো তাকে অনুতাপ করতে হয়নি।

প্রিয়জনের বিয়োগবেদনা আরও বেড়ে যায় যদি স্বভূমি থেকে বহু দূরে তার মৃত্যু ঘটে। আমার ভগিনীর ক্ষেত্রে কিন্তু মনে হয়েছে, সে যেন শেষ ক্ষণে আমাদের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডেই ছিল। ডাঃ বসু এবং শ্রীমতী বসুর আবাসে তার জীবনাবসান, তা যেন তার স্বজনের মধ্যে, পরিবারের মধ্যেই। মার্গারেটের প্রতি আমি এই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছি, সে তার জাতির ঐতিহ্যগত কর্তব্য পালন করে গেছে শেষ অবধি—সে সাহায্য করছে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মানুষকে, এবং শান্তির পথে চালিত করেছে তাদের অভিযাত্রাকে।

রেম-হারবার্টকে পাঠানো রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতি

আমার বোন মার্গারেট ৬ জন ভাই বোনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। আমি সর্বকনিষ্ঠ। পিতার মৃত্যুকালে আমার দুই বড় বোন এবং আমি, এই তিনজনই জীবিত ছিলাম। আমি তখন মাত্র তিন মাসের।

মার্গারেটের সঙ্গেই আমার আদিতম স্মৃতি জড়িত। যখন আমার বয়স তিন বছরের কিছু বেশী, তখন মায়ের আর্থিক দুর্দশার ভার লাঘব করতে আমাকে দাদামশায়ের কাছে আয়ারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে মায়ের আবাস থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছিল মার্গারেটের উপর, তখন সে স্কুলের মেয়ে, ১৩ বছরও বয়স হয়নি। খুব অস্পষ্টভাবে একটি জাহাজের কথা মনে পড়ে, আর জাহাজী নীল রঙের পোষাক পরা একটি বালিকাকে, যে আমাকে ভোলাচ্ছিল। এই ঘটনাটির আকর্ষণ এইখানে—এর মধ্যে আমার বোনের সাহস ও আত্মনির্ভরতার ইঙ্গিত আছে, যে দুটি গুণ পরবর্তীকালে তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে। স্থলপথে এবং সমুদ্রপথে একটি অবুঝ শিশুকে নিয়ে যাওয়া প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষেও সহজ কাজ নয়—সে তো নিতান্ত বালিকা।

আমার মনোবিকাশের ক্ষেত্রে মার্গারেটের প্রভাব বিরাট। শেক্সপীয়ারের নাটকীয় বক্তৃতার আবৃত্তি করতে সে ভালবাসত। ম্যাকবেথ থেকে তার আবৃত্তি কী দারুণ হৃদয়গ্রাহী হত, এখনো তা স্পষ্ট মনে আছে :

"Is this a dagger which I see before me
The handle toward my hand?"

কিংবা জুলিয়াস সীজার থেকে অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ :

"Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears!"

তার ধ্বনিময় কণ্ঠের "for Brutus is an honourable man" এখনো আমার কানে সুস্পষ্ট বাজছে, যেন আজ সকালেই তা শুনেছি। আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকতুম। প্রথম জীবনে আমার দাদামশায় আমাকে বাইবেল পড়তে উৎসাহ দিতেন, মার্গারেট উৎসাহ দিত শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে ; তার ফলে, এই দুই প্রেরণায় আমি অপূর্ব শিক্ষা পেয়েছিলুম। মার্গারেটই তার অতীব স্বল্প পুঁজি থেকে আমাকে পয়সা দিয়েছিল থিয়েটারে প্রথম শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতে—লীসিয়ামে 'কিং হেনরি দি এইটথ্',—আর্ভিং অভিনয় করেছিলেন উল্‌সির ভূমিকায়, এবং ড্যালীতে 'টুয়েলফথ্ নাইট' দেখতে,—এডা রেহান যাতে ভায়লা সেজেছিলেন। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউই মার্গারেটের তুল্য তীব্র শক্তিতে শেক্সপীয়ারের লাইনগুলি বলতে পারেননি।

আমার বোন প্রথম জীবনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করত। একবার, যখন আমার বয়স দশও হয়নি, তার সঙ্গে 'লিভারপুল সায়েন্স ক্লাবে'র সভায় গিয়েছিলুম।......আমরা পিছনে বসেছিলুম। কতকগুলি গম্ভীরমুখ ব্যক্তির সঙ্গে মার্গারেটের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, যার ফলে পরে তার লণ্ডনে আসা সম্ভব হয়। ঐ সভার বক্তা মিঃ লজ্‌ম্যান তাঁর বোনের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এই দুই মহিলা পরে একসঙ্গে উইম্বলডনে স্কুল খোলেন।

মার্গারেট যেখানেই যেত, সেখানেই নির্ঘাত একটি সাহিত্যসংস্থা গজিয়ে উঠত। উইম্বলডনে এমন একটি সংস্থা সে আরম্ভ করে। এ সেই যুগ—যাকে এখন দুরন্ত নব্বুয়ের দশক বলা হয়—যখন টমাস হার্ডি তাঁর কর্মজীবনের চূড়ায়, যখন তাঁর Jude the Obscure নিয়ে উত্তপ্ত সংঘর্ষ চলেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সভাগুলিতে জড়ো হয়ে যুবকের দল সমকালীন ঔপন্যাসিকদের নিয়ে (হায়, যাদের খুব কম সংখ্যককেই এখন স্মরণ করা হয়!) ডেইলী টেলিগ্রাফ বা অন্যান্য রবিবাসরীয় সংবাদপত্রের সমালোচনার সূত্রে মহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুগম্ভীর আলোচনা চালাত। এখন শুনতে মজাদার মনে হলেও এইসব সাহিত্য-খ্যাপা তরুণদের আন্তরিকতা ছিল নিদারুণ ও সন্দেহাতীত। তাদের কেউ কেউ কবিযশঃপ্রার্থীও ছিল।

সিসেমী (Sesame) ক্লাবের সংগঠনে মার্গারেট যে অন্যতম প্রেরণাশক্তি হয়ে দাঁড়াবে—এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এক্ষেত্রে সহযোগিতা ছিল লেডী

রিপন এবং মিঃ রোনাল্ড ম্যাকনীলের। রোনাল্ড ম্যাকনীল তখন সেণ্ট জেমস গেজেটের সম্পাদক ছিলেন, পরে হন লর্ড কুশেনডান। নর ও নারী, সকলের জন্যই এই ক্লাব উন্মুক্ত ছিল, সেকালের পক্ষে অভিনব ব্যাপার, এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল সংস্থাটি। ডোভার স্ট্রীটে উঠে যাবার আগে গোড়ায় ক্লাবটি অবস্থিত ছিল ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের কাছে। ১৯৩৪ সালে লর্ড কুশেনডানের মৃত্যুর এক মাস আগে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি গূঢ় হাসির সঙ্গে মার্গারেটের বিরুদ্ধে তাঁর একটি অভিযোগকাহিনী বলেছিলেন। ক্লাবের আস্তানা নিয়ে একবার একটি মামলা হয়; মালিক তাঁর সাক্ষ্যে মিঃ ম্যাকনীল এবং আমার বোনকে ঘর ভাড়া নিয়েছে এমন 'মধুচন্দ্রের দম্পতি', বলে উল্লেখ করেন। মার্গারেট শুনে রেগে অস্থির।

লর্ড কুশেনডান এবং মার্গারেট, উভয়েই উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে আগত। লর্ড কুশেনডান জন্মেছিলেন অ্যানট্রিম কাউন্টির ব্যালিকাসল্-এ, এবং আমার বোনের জন্ম টাইরন কাউন্টির ডানগাননে। লর্ড কুশেনডান আলস্টারের প্রচণ্ড সমর্থক, অপরপক্ষে আমার বোন দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের পক্ষাবলম্বী, অর্থাৎ সে তৎকালীন আইরিশ জাতীয়তাবাদের সমর্থক। আলস্টার-পক্ষীয়রা, যাদের 'আইরিশ ইউনিয়নিস্ট' বলা হত, সাধারণতঃ তারা নিজ আইরিশ আবাসের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত, অপরপক্ষে আইরিশ ন্যাশন্যালিস্টরা বাসস্থান বিষয়ে মোটামুটি উদাসীন। সাধারণতঃ আয়ারল্যান্ড থেকে দূরে ছড়িয়ে তারা বাস করত। লর্ড কুশেনডান এবং আমার বোনের মধ্যে আইরিশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত, এবং এইসব আলোচনা উত্তপ্ত ও বেদনাদায়ক হয়ে উঠত। এঁরা পরস্পরের প্রতি রীতিমত রূঢ় আচরণ করতেন, ফলে যে-কেউ ভাবতে পারত, জীবনে এঁরা আর কথা বলবেন না। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রান্ত, কারণ এঁরা চমৎকার বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন, বন্ধুত্ব আরও গাঢ় এইজন্য যে, এঁরা সাঁড়াশি-হাতুড়ি নিয়ে পরস্পরের কাছে যেতে পারতেন শত্রুভাব না রেখেও। এমনি একটি সংঘর্ষের দুদিন পরে—আমার জানা উগ্রতম সংঘর্ষ বটে—দেখা গেল লর্ড কুশেনডান আমার বোনের একটি বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করছেন, এবং যৎপরোনাস্তি তার পক্ষ সমর্থন করছেন!

সাহিত্য ও শিক্ষা মার্গারেটের কাছে জোরালো আকর্ষণের বস্তু হলেও তাই তার স্থায়ী আকর্ষণের বিষয় নয়। ধর্মই নিঃসন্দেহে তার মূল জীবনোদ্দেশ্য। ধর্ম সে পেয়েছিল উত্তরাধিকাররূপে। পিতা ছিলেন বাগ্মী প্রচারক, পিতামহও তাই। পিতামহ তাঁর প্রণয়িনী মার্গারেট নীলাসকে নিয়ে ওয়ারেনপয়েন্ট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে। মার্গারেট নীলাস ছিলেন লিভারপুলের এক ওয়েলশ্-সম্ভূত ইউনিটারিয়ান পরিবারের মেয়ে।

মার্গারেটের সাহিত্যচেষ্টার শুরু হয় সারমন্-জাতীয় লেখা দিয়ে। এই ধরনের লেখাকেই নিখুঁত করার চেষ্টায় সে ব্রতী ছিল। বাইবেলের একটি অংশ বেছে নিয়ে তার উপর সারমন্ লিখত। সারমন্‌টি হয়ত দশ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে গেল। সে তখন সেটিকে আবার লিখে মাত্র তিন কি চার পৃষ্ঠায় দাঁড় করাল। সবশেষে

আবার লিখল—সমস্ত বক্তব্যকে ধরালো এক পৃষ্ঠায়। যাঁরা তার বইয়ের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই এই সংহত করার চেষ্টা লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের হয়ত কৌতূহল থাকতে পারে—কিভাবে সে এই গুণটি আয়ত্ত করেছিল।

পরিবারের অন্যান্যদের মতই মার্গারেটের আদি ধর্মীয় শিক্ষা ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্ট মতে। এ বিষয়ে কোনো ভুল ধারণা যেন না থাকে। অধিকাংশ লোকের ধারণা, সকল ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্টই ক্যালভিনিস্ট। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমরা Free Will-এ বিশ্বাস করি, এবং আমাদের কোনো Predestination তত্ত্বে বিশ্বাস করতে নির্দেশ দেওয়া হয়না কিংবা বিশেষভাবে কাউকে ত্রাণ করতে, নরকে পাঠাতে বা চির শাস্তির বিধান দিতেও বলা হয় না। জন ওয়েসলি এবং সিমিয়ন-এর আদর্শে আমরা ইভেনজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্ট। অন্য পক্ষে ক্যালভিনিস্টদের চেয়ে আমাদের কর্মভার কিছু কম নয়। আমরা কঠোরভাবে 'স্যাবাথ' পালন করি, প্রতি রবিবারে দুই থেকে চারবার পর্যন্ত পূজানুষ্ঠানে যোগ দিই, বাইবেলকে মানবের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রেরণাবাণীরূপে গণ্য করবার মত শিক্ষা আমরা পাই; বাইবেলের মধ্যে আমাদের জীবনাচরণের সম্পূর্ণ নীতিনির্দেশ করা আছে, যে আচরণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রত্যক্ষ ও পূর্ণভাবে আমরা দায়বদ্ধ। একথা সত্য, ক্যালভিনিস্টদের মত কোনো ক্লান্তিকর বাঁধা বুলির কাছে নতিস্বীকার করতে আমাদের বলা হয় না, কিন্তু আমরা অপরপক্ষে বিশ্বাস করি, একদিন আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠে ঈশ্বরের কাছে অপরাধীরূপে আমাদের উপস্থিত করবে। এ ধরনের শিক্ষা সমুচ্চ অখণ্ড বিশ্বস্ততা দাবি করে, যা মোটেই মনোরম ব্যাপার নয়। এড়িয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া, বা ছলচাতুরীর কোনো সুযোগ এখানে নেই, আমাদের সমস্যার মুখোমুখি আমাদেরই হতে হয়,—সবকিছু দায়িত্বও আমাদেরই, অন্য কারো নয়। এই শিক্ষার সুগভীর প্রভাব আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যেই ছিল, এবং মার্গারেটের জীবনের সকল পর্যায় এই নীতির উপর গঠিত হয়েছিল।

উৎসাহী ইভেনজেলিক্যাল মতাবলম্বীর ধর্মোৎসাহপূর্ণ হৃদয় সহজেই নূতন প্রভাবে ধরা দেয়। বিদ্যালয় ত্যাগ করবার আগেই মার্গারেট চার্চ অব ইংলণ্ডের 'হাই চার্চ' বা 'ট্রাকটারিয়ান' আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে। এই আন্দোলনকে চার্চ অব ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিকতার অনুকরণপ্রয়াস বলা হয়ত অনুচিত হবে, যদিও এই আন্দোলনের অনেক অনুগামীই রোমান ক্যাথলিক মতের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকারী ছাড়া কিছু নয়।

ইভেনজেলিক্যালরা পূজাপদ্ধতির বিষয়ে অল্পই মনোযোগ দেয়; 'স্যাক্রামেন্ট' প্রভৃতিতে গুরুত্ব আরোপ করে সামান্যই; ঐ সবের মূল্য বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রভুর স্মরণ-মনন ঘটানোতেই মাত্র। গির্জার পাদরীরা ঐতিহাসিকভাবে অ্যাপসলদের কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন কি না এ বিষয়ে ইভেনজেলিক্যালরা ভ্রূক্ষেপই করে না। অপরপক্ষে ট্রাকটারিয়ানরা প্রকাশ্য পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে মনোযোগী, স্যাক্রামেন্টের শুভফলের উপর জোর দেয়, এবং ঐতিহ্যধারাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে। অর্চনার আনুষ্ঠানিকতাকে তারা বর্ধিত করেছে, রোমান চার্চের সঙ্গে সচরাচর যুক্ত এমন বহু আনুষঙ্গিক জিনিসের প্রবর্তন করেছে। এই সকল ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে

শিল্পসুষমা পেয়েছে এবং বহুক্ষেত্রে এমনকি রোমীয় নমুনাকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। সর্বজনীন পূজাপাঠে, তাদের অনবদ্য গদ্য রচনা এবং উপাসনার অপূর্ব শিল্পরূপ এখানে তাদের সহায়তা করেছে।

এই বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এই দেখাতে যে, আমার বোনের রোমান্টিক স্বভাবের সঙ্গে কোন্ বস্তুর সংযোগ ঘটেছিল, এবং কী তাকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। এর ফলে ধর্মার্চনায় কেবল বর্ণগরিমা ও নাটকীয়তাই সে লাভ করেনি, (তার মন সর্বদা শিল্পের ভাবাকৃতিতে পূর্ণ থাকত)—তার মন যুক্ত হতে পেরেছিল অতীত সন্তগণের যুগের সঙ্গে। মার্গারেট ভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক সময়ে রোমান চার্চে যোগদানের কথাও ভেবেছিল। যদি এমন ঘটনা ঘটত, তাহলে হয়ত কোনো সিস্টার নিবেদিতাকে পাওয়া যেত না। মার্গারেট যদিও ভক্তিমতী কিন্তু তাকে কোনোভাবে অনড় অন্ধভক্ত বলা যাবে না। এক গুডফ্রাইডেতে —যে-দিনটিতে নিষ্ঠাবান হাই চার্চ ব্যক্তিদের উপাসনা ও ধ্যানাদিতে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করার কথা—সে পরমানন্দে মজা করে তার ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিল। এহেন স্বাধীনতা গ্রহণের ব্যাপারটা তার ভাই ভুললেও সে কখনো ভোলেনি। তার জীবনের শেষের দিকে ভাই যখন ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিল, সে ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য নিজের এই রীতি পরিহারের ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েছিল।

অন্য প্রভাবের সম্মুখীন হওয়াও তার নির্ধারিত নিয়তি। অ্যাংলো-ক্যাথলিক-দের (এ নামই তারা সাধারণতঃ পছন্দ করে) সংকীর্ণতার প্রতিরোধ না করে সে পারেনি; অ্যাংলো-ক্যাথলিক মত তাকে তার মনোবিকাশের সুযোগ দেয়নি। তা আবেগকে পুষ্ট করলেও বুদ্ধিকে শুকিয়ে মারত। সে কিভাবে চার্চ অব ইংলণ্ডের উদারতর চিন্তাশীলদের সংস্পর্শে এসেছিল তা বলতে পারব না, কারণ আমরা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখতে পারিনি। মনে হয় সে যাজক স্কট হল্যাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং তাঁর মারফৎ ফ্রেডারিক ডেনসন মরিস ও তাঁর মত অন্যান্যদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। সে যাই হোক, সে "উদারনৈতিক ধর্মীয় চিন্তার" মূল্য স্বীকার করতে শুরু করেছিল।

এই উদার চিন্তার জগতে যখন সে প্রবেশ করেছে, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ; তার ফলেই প্রাচীন ধর্মগুলির উদারনৈতিকতার রূপ সে প্রথম উপলব্ধি করল; 'আমার ধর্মেই একমাত্র ত্রাণ সম্ভবপর',—এই যে ধারণা ইহুদী, খ্রীস্টান কিংবা ইসলাম প্রভৃতি সেমিটিক ধর্মগুলি পরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে পোষণ করেছে, ঐ প্রাচীন ধর্মগুলি সেই ধারণা থেকে একেবারে মুক্ত। একথা হয়ত বলা চলে, ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে এই সংযোগ তাকে খ্রীস্টীয় ধর্মমতকে নূতন দৃষ্টিতে দর্শনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, একথা ঠিক, একেবারে প্রথম থেকেই সে অনুভব করেছিল ভারতের ডাক আছে তার জন্য।

মার্গারেট প্রথমবার ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করার আগে স্বামীজীকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। স্বামীজীকে মানবদেহে যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব তিনি কী ছিলেন। শিষ্যরা সচরাচর গুরুর মধ্য থেকে নিজেদের অভিপ্রেত শিক্ষা-বস্তুকেই নির্বাচন করে নেয়, এবং তারা গুরুকে নিজেদের মতাদর্শের

প্রয়োজনেই ব্যবহার করে। কিন্তু স্বামীজীকে জানার অর্থ স্বয়ং খ্রীস্ট কী ছিলেন তাই কিছুটা জানা। অফুরন্ত রসিকতার ভাণ্ডার ছিলেন ; সেই হাসির আলোকেই নানা যুগের বিচার করতেন, এবং সেইভাবেই অনুভব করিয়ে দিতেন, ঈশ্বর আমাদের স্নেহশীল পিতা-মাতা, কদাপি নির্দয়-কঠোর প্রভু নন। নির্লিপ্ত বোধের এক জগতে তিনি উন্নীত করে দিতেন।

একবার তাঁর সন্দেহ হল, মার্গারেটের চাপে বোধহয় আমাদের বাড়িতে গোরু খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমার কাছে মার্গারেট সে কথা অস্বীকার করলেও স্বামীজী তা মানলেন না, এবং তার গোঁড়ামি নিয়ে তামাশা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, গোরু ইংরেজের সাধারণ খাদ্য; গোঁড়া মার্গারেটের জন্যই যে, আমাদের গো-খাদ্যে বঞ্চিত হতে হচ্ছে সে ধারণা ছাড়লেন না; আমাকে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে 'বীফ স্টিক' খেতে দিলেন। তিনি বললেন, পুরুতরা সর্বদা মেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে চলে কারণ মেয়েরাই তাদের সমর্থন করে।

স্বামীজীর সাক্ষাৎ যে পেয়েছে, কোনো না কোনোভাবে উন্নীত না হয়ে সে পারবে না। মানুষটা হয়ত মন্দ লোকই রয়ে গেল, কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সে এইটুকু সান্ত্বনা অন্ততঃ পাবে, সে আরও কত মন্দ হতে পারত কিন্তু হয়নি।—স্বামীজীর সংস্পর্শ কোনো না কোনো ভাবে মন্দত্বের সংশোধন না করে পারে না।

মার্গারেটের প্রথম ভারতযাত্রার দিনটিকে এখনো আমার মনে পড়ে—ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া লাইনারে সে যাবে—আমরা বিদায় দিতে গিয়েছি টিলবেরী ডকে। আমার অন্য বোন এবং মাও ছিলেন। আরও দুজন বন্ধু ছিলেন—এবেনিজার কুক, যিনি মরিসের বন্ধু ও ড্রয়িং-শিক্ষক এবং অক্টেভিয়াস বীটি, যিনি ১৮৯৫ সালে চেলসিয়া থেকে উদারনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন। মা এবং বোন কাঁদতে লাগল। জাহাজের যাত্রীদের এবং নেপলস্ প্রভৃতি যেসব বন্দরে জাহাজ ছুঁয়েছিল তাদের জীবন্ত বর্ণনায় পূর্ণ মার্গারেটের চিঠিগুলির কথা আমার এখনো মনে আছে।

পরবর্তী সাক্ষাৎ সাউথ আফ্রিকার যুদ্ধের ঠিক আগে। ঐবারই স্বামীজীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আবার সে যখন বাড়ি ফিরল, তার সঙ্গে ডাঃ জগদীশ বসু ও শ্রীমতী বসু ছিলেন। সে সময়ে ডাঃ বসু অত্যন্ত সংকটের মধ্যে কাজ করছিলেন। তাঁর কাজের মূল্য কেউ কেউ অস্বীকার করেছিল, কেউ কেউ বা চুরি করে নিতে চেয়েছিল। তিনি তখন 'Response on the Living and Non Living' বইখানি লেখায় ব্যাপৃত ছিলেন। মার্গারেট লেখায় সাহায্য করছিল। ডাঃ বসু হুইস্ট তাস খেলা ভালবাসতেন। মার্গারেট খেলতে চেষ্টা করত, কিন্তু এ ধরনের আমোদে সে নির্লিপ্তভাবে যোগ দিত; সেটাই তার স্বভাব ছিল। আসল মজা ছিল তার খেলার ধরনে—যা নিয়ে আমরা আমোদ করতুম।

আমোদ-প্রমোদের কথায় আমার মনে পড়ছে তার বাইসাইকেল চড়ার চেষ্টার ব্যাপারটি। এক সময়ে রাস্তার অন্য দিকে একজন ঝালাইওয়ালা কাজ করছিল।

সাইকেল-অধিষ্ঠিত মার্গারেট তাকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণবস্তু মনে করল—এবং ধাক্কা মারার কাজটি নিবারণ করতে পারল না কিছুতে। দৃশ্যটা আমি কখনোই ভুলব না—আমার ভগিনীদেবী গতিশীল সাইকেলে আসীনা, তাকে প্রাণপণে সংযত করতে চেষ্টা করছেন, যেমন অশ্বরজ্জু আকর্ষণ করে থাকে লোকে, প্রশস্ত পথকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে ছুটছেন, কণ্ঠে উচ্চ নিনাদ : "মিঃ ঝালাইওয়ালা, সাবধান! সাবধান!" আজ পর্যন্ত স্যার জগদীশ বসু হাসিতে বেসামাল হয়ে পড়েন সেই ঘটনাটি স্মরণ করলেই।

আমার বোন যাকে বলে ওস্তাদ সাইকেল-চালিয়ে, তা কখনই হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সে না-পড়ে এক মাইল-দেড় মাইল চালাবার মত শিখে নিয়েছিল। এইটুকু শিক্ষার জন্য তার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। সে উদারভাবে ঘোষণা করেছিল, আমি তার পকেটে ঐশ্বর্য পুরে দিয়েছি। এই মহাকীর্তির স্মরণোৎসবরূপে স্থির হোল আমরা "ট্যুরে" বেরিয়ে পড়ব। অতীব হ্রস্ব ট্যুর। বেশ চেষ্টা করে আমরা উইম্বলডন থেকে মাইল চারেক যেতে পারলাম, মিচামের কাছাকাছি জায়গাটা, পুরনো ধরনের পাবলিক হাউসের সামনে হাজির হলাম। জায়গাটা অবিলম্বে মার্গারেটের কল্পনায় প্রাচীন কালের পথিপার্শ্বের সরাইখানায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেখানে থেমে, তার ভিতরে ঢুকে আমাদের জলযোগ করতেই হল। মনে হয় চা পান করা হয়েছিল। মার্গারেট দারুণ খুশী, অতি সাধারণ যে খাদ্য-পানীয় জুটেছিল তাতেও, কেননা—তা রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের আনুষঙ্গিক। আমরা যে পথিক—বহু কষ্টে সেখানে পৌঁছেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।। হয়ত শেষ পর্যন্ত সে-ই ঠিক, কেবল আমার গদ্যাত্মক মন সেই সময়ে তা দেখতে পায়নি।

পরবর্তীকালে সে আয়ারল্যাণ্ডের ডোনিগ্যাল কাউন্টিতে আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ড তার মন টানেনি। তার সমস্ত মন অধিকার করে ছিল ভারতবর্ষ। আমাদের সব কিছুই নীরস, তা ঠিক, যদিও আমার কাছে তা নীরস ছিল না মোটেই, তা এমনই রোমাঞ্চিত করে তুলত আমায় যা অন্য কোথাও পাইনি। কালগতে আমি এই ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন কিন্তু বুকে ঈর্ষার মোচড় লাগত—হায়রে, আমার বোনের হৃদয়ে আয়ারল্যাণ্ডের স্থান নেই, তা নিয়ে নিয়েছে ভারতবর্ষ।

১৯১১ সালের শেষের দিকে মার্গারেটের কাছ থেকে একটি চিঠি এসে পৌঁছল, হস্তাক্ষর এলোমেলো ; আমার প্রশংসা উদ্রিক্ত করত যে দৃঢ় মুদ্রিত ব্যক্তিত্বময় রচনা, তা নয়; নৈরাশ্যে, দুঃখে ভাবতে চেষ্টা করলুম—এর অর্থ কি? মার্গারেট মৃত্যুশয্যায়। চিঠিতে কিন্তু লিখেছিল, তার মারাত্মক অসুখের বিষয়ে যদি কোনো সংবাদ পৌঁছায়, তাতে যেন গুরুত্ব না দিই, এ ব্যাপারে মিথ্যে হৈ চৈ করা হচ্ছে, অসুখ সামান্যই। সে চিঠি পৌঁছবার আগেই তার এল—সে নেই।

নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর মা, বোন ও ভাই

মা

নিবেদিতার চিঠি থেকে তাঁর মা, বোন ও ভাই সম্বন্ধে তাঁর নানা মানসিক প্রতিক্রিয়ার কিছু অংশ উপস্থিত করছি। নিবেদিতার ঘরোয়া ছবিটি এই সব অংশে পাওয়া যাবে। তিনি যে একদিন এবং চিরদিন ঘরের মেয়ে ছিলেন, নিছক কর্মের ও ধর্মের পতাকাবাহীই নন, এই সব পত্র থেকে পেয়ে যাই। সেই সঙ্গে দেখি, ঘরের মধ্যেও তাঁর ধর্মের প্রদীপটিই জ্বলছে।

নিবেদিতা প্রচুর লিখেছেন জীবনে, কত বিষয়ের কথা, কত মানুষের কথা, কিন্তু বিস্ময়কর হল, নিজের মায়ের কথা (পিতার কথাও) লিখে যাননি। শ্রীমা সারদাদেবী—নিবেদিতা যাঁকে নিখিল মাতৃত্বের প্রতীক মনে করতেন, তাঁর কথা লিখেছেন, মিসেস ওলি বুল, স্বামীজীর মতই নিবেদিতাও যাঁকে মা বলতেন, তাঁর কথাও লিখেছেন, লেখেননি শুধু নিজের মায়ের কথা, বোধহয় এই জন্য যে, যে-পূর্বজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছেন, তাকে প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় করতে তাঁর নীতিতে বেধেছিল, এবং আত্মমর্যাদায় বেধেছিল ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রকাশ্যে গৌরবান্বিত করতে।

কিন্তু কী গভীর ভালবাসতেন নিবেদিতা তাঁর মাকে। শ্রদ্ধায় এবং করুণায় মিশ্রিত সেই ভালবাসা। মায়ের সুদীর্ঘ দুঃখজীবনকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, দেখেছেন সাধারণ এক জীবনে অসাধারণ সহনকে, দায়িত্বের বোঝার চাপে নিষ্পিষ্ট যাতনাকে, তারই মধ্যে শান্ত তপস্যাকে। দেখেছেন—সামান্য অর্জনের জন্য যাঁকে বুকের রক্ত তুলে খাটতে হয়েছে, তিনিই কী উদার মহিমায় ত্যাগ করেছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকে।

নিবেদিতার মায়ের জীবনের দিকে তাকালে দেখব, তাঁর ক্ষেত্রে সুখ কত ক্ষণস্থায়ী। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল মেরী হ্যামিলটন; জন্ম হয়েছিল ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে; বিয়ে হয় স্যামুয়েল নোবলের সঙ্গে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে(?)। বিয়ের সময়ে স্যামুয়েল মোটামুটি সচ্ছল ব্যবসায়ী। বিয়ের এক বছর পরে প্রথম সন্তান মার্গারেট অর্থাৎ নিবেদিতার জন্ম হয়। আরও এক বছর পরে স্যামুয়েল আদর্শের টানে, জনসাধারণের মধ্যে কাজ করার আকাঙ্ক্ষায়, ব্যবসা বেচে দেন এবং শিশু-কন্যাটিকে নিজের মায়ের কাছে সঁপে দিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে হাজির হন। সঞ্চিত পুঁজিতে দু'এক বছর কাটে, তারপরে অর্থকষ্ট, তখন ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় স্যামুয়েলকে, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও কঠোর শ্রম তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেয়, ক্ষয় রোগ ধরে, যার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন। মেরীর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ।

এগারো বছরের বিবাহিত জীবনে মেরী একদিকে যেমন আদর্শবাদী স্বামীর সান্নিধ্যে উদ্দীপ্ত হয়েছেন, ধর্মসঙ্গিনী ও কর্মসঙ্গিনীরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্য দিকে পেয়েছেন দারিদ্র্য ও মৃত্যুশোক। স্বামীর মৃত্যুর আগেই কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছিল। অবশিষ্ট তিনজনকে (দুই কন্যা, মার্গারেট ও মে এবং পুত্র রিচমণ্ড) নিয়ে মেরীর কঠোর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয়—সেই সংগ্রামের অনেকখানি অংশই নিবেদিতার স্বচক্ষে দেখা। নিবেদিতা দেখেছেন, দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম কিভাবে কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর মায়ের প্রাণসার। তারপরে—দুঃখদিনের শেষ হবার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়েছে, মেয়ে দুটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত, ছেলে শিক্ষিত ও প্রাপ্তবয়স্ক—ঠিক তখনি বড় মেয়ে চেয়েছে অজানা এক দেশে পাড়ি দিতে—অজানা ধর্মের মধ্যে—অজানা আশঙ্কার মধ্যে।

মেয়ের যাত্রায় মা বাধা দেননি।* মেয়ে মনের দিক থেকে স্বতন্ত্র, তা জানতেন, সেজন্য কষ্টও তাঁর কম ছিল না। বৈধব্য-জীবনে মেরী সাচ্ছল্যের সুখ পাননি, আনুগত্যের তৃপ্তিও পাননি, কেননা তাঁর বড় মেয়ে পারিবারিক ধর্মবিধির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব থেকেই, বিদ্রোহ করে আসছিল।

মনের দিক থেকে নিবেদিতা মায়ের অন্তরঙ্গ নন, কিন্তু ভুলবেন কী করে তাঁর দীর্ঘ দুঃখের তপস্যাকে! যখন ইংলণ্ড থেকে ভারতে যাত্রা করলেন, তারপরে ভারতে বাস করতে লাগলেন, সমস্ত সময়েই 'ছোট্ট মা-টির' কথা তাঁর মনের কোণে বেঁধা একটি কাঁটা হয়ে রইল, সামান্য স্পর্শেই তাতে চাপ লাগত, আর রক্তক্ষরণ হত।

সেই ব্যথাতুর কাতর কন্যাহৃদয়ের ছবি নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে আমরা পাই। যে-কথা কোনোদিন প্রকাশ্যে লেখেননি, পত্রে পত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই মনের কথা, নিজের 'ছোট্ট মা-টি'র চারপাশে বিছানো সেই সতৃষ্ণ ভালোবাসার অপরূপ কথাগুলি।

নিজের মায়ের কথা চিঠিতে লেখার সময়ে নিবেদিতা 'ছোট্ট মা-টি' ভিন্ন লেখেননি প্রায়। ভালবাসার অপূর্ব এই রূপ—কন্যা যেন পরম স্নেহে নিজের মাকে কন্যারূপে দেখছে।

---

* বাধা না দেবার একটা গূঢ় কারণ ছিল। প্রথম সন্তানসম্ভবা হলে মেরী আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, শুভ প্রসব হলে সন্তানটিকে তিনি দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। নিবেদিতা সেই প্রথম সন্তান। ঘটনাটি নিবেদিতার মা একমাত্র মিস ম্যাকলাউডকে বলেন, তিনিই পরে সকলের গোচর করেন। রোমা রোলাঁকেও ম্যাকলাউড এই ব্যাপারটির কথা বলেছিলেন, রোলাঁর ডায়েরীতে তা পাওয়া যায়।

নিবেদিতার বোনের কাছ থেকে আরও জানা গিয়েছে, নিবেদিতার পিতা মৃত্যুকালে পত্নীকে বলে যান, কন্যা যদি ধর্মের জন্য আত্মদান করতে চায়, তাকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। রেমঁ-সংগ্রহে ম্যাকলাউডের এই কথাগুলি পাই :

"Nivedita: 'I cannot understand my little mother, the widow of an orthodox clergyman, opening every door to me when I wanted to go to India.' But the mother had made a vow when she was with child that she would consecrate the child to the Lord when He should call her. She told the story once to Miss Macleod who told it later herself to Nivedita. Vivekananda himself never knew it."

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ জুনের এক চিঠিতে নিবেদিতা নিজের বাল্যের অভিমানী স্বভাবের কথা লিখেছেন—"জানো কি, ছোটবেলায় প্রাণপণে চেষ্টা করে তবে আমার গর্বিত মাথাখানি নামিয়ে মায়ের কাছে খাবার চাইতে পারতাম।" মায়ের এই অভিমানী জেদী মেয়েটি দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে এসে বিশ্বমায়ের আঁচলের তলায় যখন পরম আশ্রয় পেলেন, তখনকার সুগভীর আনন্দও কিন্তু গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদের যাতনাকে মুছতে পারেনি। মিস ম্যাকলাউডকে ১২ মার্চ ১৮৯৯, তারিখে লিখছেন: "তুমিই এঁকে (সারদাদেবীকে) মা বলে ডাকতে শিখিয়েছ—আমার ছেড়ে-আসা ছোট্ট মায়ের দাবির সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই।"

বিষণ্ণ মধুরতায় ভরা লাইনটি। একদিকে নবজীবনে নবপ্রাপ্তির আনন্দ, অন্য-দিকে গত জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা, একসঙ্গে। মার্গারেট নোবল ভারতবর্ষে এসে 'নিবেদিতা' নামের শ্বেতবস্ত্রে রাগরক্ত অতীত জীবনকে আবৃত করেছেন, নবজীবনের আলয়ে মাতৃরূপে পেয়েছেন চির মাতৃত্বের বিগ্রহরূপিণী এক নারীকে, যাঁর চরণপদ্মের আলপনা চলে গিয়েছে দ্বারপথ থেকে মন্দিরকক্ষে, কিন্তু এই ভবনে প্রবেশের আগে ছেড়ে এলেন কোন্ গৃহদেবীর স্নেহাঞ্চলের শান্তিকে।

সুগভীর, শিহরিত, আলোড়িত দীর্ঘশ্বাস নিবেদিতার—'আমার ছোট্ট মা-টি!'

নিজ পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে তাঁদের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় কিভাবে নিবেদিতার মন মথিত থাকত, তার কিছু কিছু পরিচয় তাঁর চিঠিতে পাওয়া যায়। আশঙ্কার কালো ছায়াভরা মনের রূপ, ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে, (২১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯)—

"আমাদের পরিবারের বিষয়ে কিছু মিষ্টি খবর লিখতে চেষ্টা করবে কি। আমি কি খুবই স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছি, কি জানি, কিন্তু বাড়ির লোকজনের হস্তাক্ষরে কোনো চিঠি এলে আমি থরথরিয়ে কেঁপে উঠি এবং না-পড়ে পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়। বাস্তবিক তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে এমন বোকার মত ভীতু হয়ে উঠেছি যে, একজন যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বাড়ির জন্য মন-কেমন করছে কি না, তখন বলেছি, আমি বোধহয় কিছুতে সুখী হব না যতক্ষণ না কোনো দুর্বিপাকের ঢেউ হঠাৎ এসে অন্য পৃথিবীতে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জানি উদ্ভট কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে যুক্তিবিচার অর্থহীন। নাগালের মধ্যে প্রেতচ্ছায়া—তবু তার অস্তিত্ব ভুলতে চাইছি যেন। এহেন মনোভাবের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হল, তথাপি এখানকার (ভারতের) জীবনকে ভালবাসছি। প্রিয় জয়া, যদি তুমি কোনো অসুস্থ মনের চিকিৎসা করতে সমর্থ হও—সে মন অন্ততঃ একবারের জন্য—এবারের জন্য—আমারই হোক—আমাকে একটু সাহায্য করো, যাতে এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে উচিত মনোভাব অবলম্বন করতে পারি।"

নেল হ্যামন্ডকে লেখা একটি চিঠিতে (১.৩.১৮৯৯)—

"নেল, তুমি জানো যে, নিজের পরিবার সম্বন্ধে আমার হৃদয়হীনতার ভাবটি আমি কত অনুভব করি। কিন্তু আমরা এত পৃথক হয়ে পড়েছি যে, এইসব কথা (শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি ভক্তির কথা ইত্যাদি) কী করে তাদের বলব? আমার সমস্ত

হৃদয় এই নূতন ধর্মীয় আকর্ষণে যেভাবে গ্রথিত হয়েছে, সে বিষয়ে তাদের কিছু বলতে সাহস করি না।"

নিজের পরিবর্তিত ধর্মবিশ্বাস (নিবেদিতা একেবারে কালীতত্ত্বে পর্যন্ত বিশ্বাসী হয়েছিলেন) কিভাবে নিজের পরিবারের গোচর করবেন, এবং তাঁরা কিভাবে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল মনে। কালী সম্বন্ধে তাঁর মত যদি ইংলণ্ডে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে বোনের বিয়ের ব্যাপারে অসুবিধা পর্যন্ত ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন। এদিকে নিবেদিতার মা তাঁর কন্যাকে "ব্যাকুলভাবে কাছে পেতে চাইছিলেন," এবং নিবেদিতা ব্যাকুলভাবে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন, তাঁর পরিবর্তিত ধর্মবিশ্বাসের চেহারা "মায়ের বুক ভেঙে দেবেনা" (২৮.৫.৯৯), যদিও বিপরীতই ছিল অনুভব।

নিবেদিতার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল একটি পরম ঘটনায়—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করে স্বামীজী হাজির হলেন ইংলণ্ডে, এবং নিবেদিতার পরিবারে কয়েকদিন কাটালেন। বিবেকানন্দের উপস্থিতিই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা—সাহস—সত্য। নিবেদিতা লিখেছেন (১২.৮.১৮৯৯)—

"নিম-এর (বোনের) প্রণয়ী আচার্যদেবের চরণে নতজানু হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মা, নিম ও রিচ। অপরূপ।"

নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন—

"আমাদের বাড়ির সবকিছু যেন ভারতের জন্যই উৎসর্গীকৃত।...বিশ্বাস করি, আমার ভাইও একদিন স্বামীজীর সন্তান হয়ে দাঁড়াবে, তবে মা বেঁচে থাকতে তা হবে না বলেই মনে হয়।" (২২.৩.১৯০১)

মা বেঁচে থাকতেই রিচ স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিতে পারতেন, যদিনা স্বামীজী স্বয়ং বিপরীত ইচ্ছা করতেন—

"তুমি জানো, স্বামীজী তাকে ডাক দেবেন বলেছিলেন; কেবল ভেবেছিলেন, মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ; অথচ আমার প্রিয় ছোট্ট মা-টি কখনই অভিযোগ করতেন না আমি জানি।"

রিচ প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তিনি স্বামীজীকে দেখেছিলেন। বহু দিন পরে তিনি লিখেছিলেন—"স্বামীজীকে সশরীরে দেখার আগে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় তিনি কি ছিলেন।...তাঁকে জানার অর্থ খ্রীস্টকে কিছুটা জানা।"

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নিবেদিতার মায়ের জীবনের চতুর্থ পর্ব শুরু হল বলা যায়। প্রথম পর্বে তাঁর কুমারী জীবন, দ্বিতীয় পর্বে বিবাহিত জীবন, তৃতীয় পর্বে বৈধব্য জীবন ও সংগ্রামী জীবন—(নিবেদিতার ইংল্যান্ড ত্যাগ ও প্রথম ভারতবাস পর্যন্ত সময়); এই তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ সম্প্রদায়-সীমায় আবদ্ধ ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবতী নারী। চতুর্থ পর্বই শেষ পর্ব। এইকালে নিজ ধর্ম ধারণার প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও উদার আধ্যাত্মিক বোধে জাগরিত। বিবেকানন্দের প্রভাবই তার মূলে।

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই তিনি ভারত সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন

সন্দেহ নেই। তাঁর স্বামীর ভারত বিষয়ে আগ্রহ ছিল। ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে নিজ কন্যার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, ও পরিশেষে ভারতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর মনে অবশ্যই নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে যথেষ্ট, যা স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে দূর হয়নি।

অতঃপর ভারতবাসীর জন্য তাঁর দ্বার খুলে গিয়েছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন (২৮.৯.১৯০০)—

"আমার ছোট্ট মা-টি এখানে এসেছিলেন ডাঃ বসু ও মিসেস বসুর থাকার কথা বলতে। তাঁর পক্ষে এটা খুবই মিষ্টি ব্যবহার নয় কি?"

স্বামীজীর প্রভাব সংক্রামিত হওয়ায় উদারতর হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু পূর্বতন সংস্কার ও ধারণা দূরে হয়নি—মায়ের এমনই একটি মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন নিবেদিতা মিসেস ওলি বুলের কাছে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-র চিঠিতে—

"অনেকেই দেখছি আমার ছোট্ট মা-টিকে ভালবাসে এবং তিনি বিশেষ ধরনের যে-সব স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেন, তার জন্য প্রত্যাশী হয়। মাকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে চেষ্টা করছি, কারণ তিনি খ্রীস্টীয় ধরনের কর্ম-উপাসনার নিষ্ঠুর দিকের অভিজ্ঞতা পেতে আরম্ভ করেছেন। এখন যেহেতু তাঁর কাজের কাল শেষ হয়েছে, তাঁর সাহায্যের দরকার আমাদের কারোরই নেই—তিনি মনে করছেন তিনি এখন বোঝার মত, এবার যেতে পারলেই হয়। এখনই প্রথম আমি হিন্দু ভাব ও রীতির সৌন্দর্য ও মর্যাদার রূপ বুঝতে পারছি ; মানুষের সত্যকার বাঁচার জীবন তো এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়। মানুষের বিষয়ে যার যা ধারণা, ঈশ্বরের বিষয়েও তাই—ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে সেবা ও বন্দনা চান (কী নির্বোধ ও যুক্তিহীন শোনাচ্ছে কথাগুলো তা জানি, কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তাও না ভেবে পারছি না) ; মা তাই অনুভব করতে পারেন না—ঈশ্বরকে শুধু ভালবেসে যাওয়াই একমাত্র কাজ হতে পারে। এই অপর দিকটি শুধু বলে বোঝানো যায় না ; তবু বিশ্বাস করি, যেভাবেই হোক, তা মায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। বসুদের পেলে একদিন এ বিষয়ে মাকে বলতে তাঁদের বলব। বসুদের আসতে বলতে ইতস্ততঃ করছি, কারণ, চাকর-বাকর না থাকলে ঘণ্টাখানেকের জন্যও যদি কোনো অতিথি আসে তাহলে মাকে এত ব্যস্ত হতে হয় ও খাটাখাটুনি করতে হয় যে, তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন—তাঁকে ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করেও কোনো ফল হয় না।"

এর পরে নিবেদিতা কিছু কথা লিখেছেন, যার মধ্যে তাঁর স্পর্শকাতর মনটি অপূর্ব ফুটেছে—"স্বামীজীকে কোনো খবরাখবর দিই নি, এই ব্যাপারটিকে তুমি যদি অদ্ভুত মনে করো, তার উত্তর—আমি স্বামীজীকে জানাতে চাই—'আমি মা-এর সঙ্গে বাস করতে গিয়েছি, এবং কিছু সময়ের জন্য এমন কি তাঁর (স্বামীজীর) বিষয়েও ভাবতে চাই না।"

["If you think it funny that I send no messages to Swami, I would like him to know that I have gone away to stay with Mother and I do not want even to *think* of him for a while."]

বিচিত্র বিমিশ্র মন এখানে। একদিকে স্বামীজীর বিরুদ্ধে অভিমানের ব্যঞ্জনা, তিনিই যেন মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, অন্যদিকে সূক্ষ্ম অভিযোগ, নিজের মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েও স্বামীজী তাঁকে জগন্মাতার নিত্য সান্নিধ্য দান করেন নি, যে-সান্নিধ্যে অপরপক্ষে তিনি নিত্য বাস করেন। নিবেদিতা যখন সেই অচেনা মাকে লাভ করলেন না, তখন তাঁর চেনা ছোট্ট মা-টি ছাড়া গতি কি? স্বামীজীর বাক্-ভঙ্গির নকল করে অভিমানের খোঁচাটুকু দিলেন—নিজের মায়ের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে mother শব্দটিকে বড় অক্ষরে Mother লিখে জানালেন,—কি করব, আমার ক্ষেত্রে অগত্যা নিজের মা-ই ঈশ্বর-মা।

নিবেদিতার মায়ের জীবনে নূতন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিসর দেখা দিয়েছিল অতঃপর। তিনি সহানুভূতি-স্নিগ্ধ হৃদয়সান্নিধ্য পেয়েছিলেন নিবেদিতার সুহৃদদের কাছ থেকে। মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস ওলি বুল এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর অনেক সমস্যার সমাধানে। সেজন্য নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। ৭ মে, ১৯০৩, তারিখে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন :

"লেডী বেটীর (মিসেস লেগেট) সহৃদয়তা সবচেয়ে মর্মস্পর্শী।...আমার ছোট্ট মা-টি সহসা দেখছেন—প্রাণোত্তপ্ত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অবস্থিত, যখন ভেবেছিলেন—এ পৃথিবীতে তিনি বড় নিঃসঙ্গ।"

১৮ অগস্টে একই জনকে লেখা চিঠিতে :

"সেন্ট সারা (মিসেস বুল) এবং আমার কাছে লেখা মায়ের এ সপ্তাহের চিঠি তোমার ও লেডী বেটীর কথায় পূর্ণ। পাঁচ বছরের শিশুও যার থেকে গভীরতর, মধুরতর সুখ পাবে না, এমন সুখ আমার ছোট্ট মা-টি পেয়েছে। আর, তোমার জ্যাকেট, মসলিনের গাউন, পালকের টুপি প্রভৃতির চেয়ে সুমধুর সুখের বহিরঙ্গ উপাদান আর কি হতে পারে।"

মায়ের দুঃখময় জীবনের কথা সদাই মনে জাগরূক ছিল বলে নিবেদিতা তাঁর যন্ত্রণাবৃদ্ধি করতে চাইতেন না, এমন কি যখন ১৯০৫ সালে ব্রেন ফিভার হয়ে প্রায় মৃত্যুমুখে, তখনো মাকে খবর দিতে দেননি; আরোগ্যের পরেও অসুখের সংবাদ জানাতে নিষেধ করেছেন (ম্যাকলাউডকে লেখা ৫ এপ্রিলের চিঠি)। মায়ের জন্য সদাই কাতর তাঁর মনের ছবি ফুটেছে ১৯০৭ সালের এক চিঠিতে—

"অগস্ট বা সেপ্টেম্বরে পাশ্চাত্তা যাচ্ছি।...যে-সব বন্ধুদের বন্ধুত্বের মূল্য দিতাম, তাদের কতজন শেষবার ইংলন্ড ছাড়ার পরে মারা গেছে। মাকে দেখতে আবার গিয়েছি, ভাবতে ইচ্ছা করছে। বেচারা ছোট্ট মা-টি—কত রোগা, পাতলা হয়ে গেছেন যেন।"

ঐ বছরই ১০ সেপ্টেম্বরে ওলি বুলকে—

"তুমি যে ইংলন্ডে আসছ, এ সংবাদ পূর্ণ তৃপ্তিকর। মা মিষ্টিতম ছোট্ট নীড়টি তৈরী করে রেখেছেন— আমাদের সকলের আসার জন্য মনে মনে প্রস্তুত। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম।"

নিবেদিতার এই মাতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা করেছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা :

"য়ুরোপ হইয়া সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিবেদিতা ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মাতা ও ভাই-ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।...ভারতের যে আধ্যাত্মিক জীবন নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহার আস্বাদ প্রিয়জনকে দিবার জন্য তাঁহার কী আগ্রহ। কত জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য— মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, নানা রকমের মালা, কবচ, পাথরের নুড়ি, ছোট ছোট বেতের বাক্স, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার ক্ষুদ্র পট।...বোতলে করিয়া আনিয়াছেন গঙ্গাজল। একদিন গোপালের মার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়া নিবেদিতা যখন তাঁহার নিকট রক্ষিত মালাটি মাতাকে স্পর্শ করিতে দিলেন, তিনি অভিভূত হইলেন।"

১০ নভেম্বর নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"বাড়ি ফিরতে কী সুখ! কী আনন্দ!—যেখানে স্নিগ্ধতম আত্মাটি বিরাজ করছে। মা তাঁর নিজের রাজ্যে মাধুর্যে, সাহায্যে, সেবায় পূর্ণ। প্রতিটি জিনিস এখানে অপরূপ সুন্দর!"

এই সুন্দর নীড়-স্বপ্নটি ছিন্ন হয়ে গেল বছরখানেকের মধ্যে। ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় কাজের জন্য গিয়েছিলেন নিবেদিতা, সেখানে দারুণ আহ্বান গেল প্রত্যাবর্তনের জন্য—শেষ শয্যায় মেরী, অবিলম্বে না এলে দেখা হবে না।

নিবেদিতার ব্যাকুল ঊর্ধ্বশ্বাস প্রত্যাবর্তন-চেষ্টার রূপ ছড়িয়ে আছে কয়েকটি চিঠিতে। কালবিলম্ব না করে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন, ব্যবস্থা করে দেবার জন্য একান্ত মিনতি করে লিখেছিলেন প্রতিপত্তিশালী মিঃ লেগেটকে। ১১ জানুয়ারী, ১৯০৯-এর সেই চিঠি—

প্রিয় মিঃ লেগেট,

এই দারুণ সংকটকালে আপনার নিকটে প্রার্থনার সুযোগ গ্রহণ করছি, যদিও জানি, এর দ্বারা কী অসুবিধা ঘটাচ্ছি, এবং জানি আপনার সময়ের মূল্য কতখানি!

মিসেস বুলের নামে টেলিগ্রাফ করছি :

অনুগ্রহ করে ক্যাম্পানিয়া থার্টিনথ্-এ মার্গটের জন্য আসন সংগ্রহ করুন। যদি সম্ভব হয়—ইণ্ডিয়ান মিশনারী রেটে। তারে উত্তর জানান।—সারা বুল

আমরা এখানে হিসাব করে দেখেছি ক্যাম্পানিয়া (কুনার্ড লাইন) নিউইয়র্ক থেকে পরশু, ১৩ই সকাল দশটায় ছাড়বে। আমাদের ধারণা, সস্তাতম স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে অন্য যে-কারো চেয়ে আপনার ক্ষমতা বেশী।

আর একটি নিবেদন করতে পারি কি?—আপনার পক্ষ থেকে টেলিফোনে যদি কেউ জেনে নেয় যে, আগামীকাল, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠে বসতে পারি কি না, এবং সেই খবরটি যদি টেলিগ্রাফ করে কেউ আমাদের জানিয়ে দেয়! মিসেস বুল স্থির করেছেন, ট্রেনে বিকাল তিনটে কি চারটের আমার সঙ্গে নিউইয়র্ক যাবেন ; তারপরে স্টেশন থেকে গাড়ি করে মারী হিল হোটেলে ; সেখানে

আমার মালপত্রের জন্য ওয়াগন নেবেন, জাহাজে উঠবেন আমার সঙ্গে, এবং যদি সম্ভব হয়, রাত্রিটা জাহাজেই কাটাবেন।

এ সমস্ত হতে পারে, এমন জানিয়ে যদি একটি টেলিগ্রাম এসে পৌঁছায়, কী না কৃতজ্ঞ হব আমরা!

গভীর ভালবাসার সঙ্গে, এবং যে অসুবিধা ঘটাচ্ছি তার জন্য শত সহস্র দুঃখের সঙ্গে।"

পরদিন মিস ম্যাক্লাউডকে—

"আগামীকাল সকালে...ক্যাম্পানিয়াযোগে বিদায়। মিঃ লেগেটকে তার করেছিলাম, তিনি আমার টিকেট কেটেছেন। তার এসেছিল শনিবার দুপুরে।...

জানি, তুমি আমার জন্য এই প্রার্থনা করবে যে, শেষ ক্ষণে আমি যেন মায়ের সেবায় লাগতে পারি। আহা আমার প্রিয় জননী!

তাঁর কাছে যেতে পারছি—তাতে গভীর শান্তি আর আনন্দ।"

১৬ জানুয়ারী জাহাজ থেকে একই জনকে—

"এই যাত্রায় সব কিছুই বিষাদের নয়। আমাকে আহ্বানের কারণটি দারুণ, নিশ্চয়ই, কিন্তু এই অপরূপ ব্যাপারটি তো রয়েছে—আমি যেতে পেরেছি—হয়ত সময়েই পৌঁছব।"

যাত্রাশেষে কী ঘটল, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তা মিঃ লেগেটকে লিখে জানিয়েছেন মিসেস ওলি বুল ২৭ জানুয়ারীতে—

"গতকাল মার্গটের কাছ থেকে একটি তার এসেছে, শুধু লেখা : 'শান্তি!' তাহলে ছোট্ট মা-টি মার্গটকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রাণটি ধরে রেখেছিলেন, এবং মার্গট প্রার্থনা করতে পেরেছে কয়েকদিন!"

অন্তিম পর্বের বর্ণনা পাই নিবেদিতার দুটি চিঠি থেকে। একটি ম্যাকলাউডকে, অন্যটি ওলি বুলকে লেখা। মৃত্যুর বর্ণনায় নিবেদিতার লেখনী চিরদিনই গভীর রসময়। আর এখানে তো ঘনিষ্ঠতম মর্ত্যবন্ধনের ছেদ! তথাপি বৈরাগ্যশান্ত সুর। নিবেদিতার সঙ্গে একদা তাঁর মায়ের সংঘর্ষ হোত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে। খ্রীস্টীয় যাজকের পত্নী, পুত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন দিনে দিনে। তিনিই শেষ ক্ষণে আকাঙ্ক্ষা করলেন 'ভারতীয় মৃত্যুকে!' অমোঘ প্রভাব বিবেকানন্দের!

৩০ জানুয়ারীতে মিস ম্যাক্লাউডকে লেখা চিঠি :

"গত মঙ্গলবার সকালে মা মারা গেছেন—তখন নিম আর আমি শুধু ছিলাম তাঁর কাছে। আমি চাপাস্বরে বললাম, 'হরি ওঁ!'—যাতে তাঁর কানে সেই হয় শেষ শব্দ! ঈশ্বরের করুণার শেষ নেই—ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, এখন তিনি যাচ্ছেন 'পূর্ণ তৃপ্তি' নিয়ে। ২৪ ঘণ্টা একত্র ছিলাম আমরা, আমি দেখলাম—তাঁর সমস্ত আত্মা ফিরল পরজীবনের দিকে। শুক্রবার সকাল থেকে মোটামুটি সারাক্ষণ ওষুধে নিঃঝুম ছিলেন।

শেষ যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা তিনি বলেছিলেন, তা হল 'ভারতীয় মৃত্যু' হচ্ছে

আমার। আমরা ভাবলাম, তিনি অগ্নিসংকার চাইছেন, যা পূর্বেও চেয়েছেন। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তাঁর সে ইচ্ছা পালিত হল। আমাদের পারিবারিক যাজক সংকারমন্ত্র পড়লেন—আহা, কী সুন্দর ভাবে। একমাত্র এই পরিবর্তন করেছিলেন—

'Commit her body to the *fire,* in the sure and certain hope of the resurrection of the body.'

এঁর শরীর অর্পিত হোক অগ্নিতে, এই স্থির-নিশ্চিত প্রত্যাশায়—পুনরুত্থিত হবে দেহখানি।

কী আনন্দ হল শুনে, কারণ ঐ অর্থে তিনি ইতিমধ্যেই পুনরুত্থিত হয়েছেন; যে-'দেহবস্ত্রখানি' আমরা সরিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে (পুনরুত্থানের) ঐ মেয়ের কোনোই সম্পর্ক নেই।

তাঁকে হারিয়ে কত না হারিয়েছি! তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আর কিছু চাইবার হেতু নেই। এখন একমাত্র কাজ, যত দ্রুত ও নীরবে সম্ভব ভারতে ফিরে যাওয়া। বুঝতেও পারিনি কতখানি গুরুত্ব নিয়ে তিনি জীবনের কেন্দ্রে বর্তমান ছিলেন। এখন দেখছি, তাঁর উপস্থিতি কত জিনিসের মূলে। কিন্তু তিনি, প্রিয় ছোট্ট মা-টি আমার, তাঁর দ্বিতীয় বিবাহদিন পেয়েছিলেন। কী সুখী, একেবারে শিশুর মত—নিশ্চয় এখন তাই হয়ে উঠেছেন। কত উদার ছিলেন, প্রেমে পূর্ণ, নিঃস্বার্থপর। এখন তিনি এমন সত্তালোকে পৌঁছেছেন, যেখানে বিরাট প্রেমের তরঙ্গ তাঁর উপর ভেঙে পড়বে, উন্নীত করবে তাঁকে, স্থাপন করবে সমুচ্চ তরঙ্গচূড়ে।

পুণ্যা। পুণ্যা। পুণ্যপ্রাণ। শুধু এইটুকুই বলতে পারি।"

মিসেস ওলি বুলকে লেখা ৪ ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে মৃত্যুক্ষণের আরও বিস্তারিত বর্ণনা :

"'সূর্যের একটি কিরণরেখা ছড়িয়েছিল, আমাদের প্রত্যেককে—সকলকে—সেবা ও আশীর্বাদ করতে',—তোমার এই কথাগুলি কী সুন্দরভাবে মায়ের বিষয়ে ভাব-প্রকাশ করেছে! আহা, আমার পৌঁছানো তাঁর কাছে কতখানি না হয়ে উঠেছিল! মিঃ অ্যাডামস যা বলেছিলেন, তা যেন আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল। নিম বলেছে, আমি যে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম, এর পরে সে আর কখনো ঈশ্বর-করুণায় অবিশ্বাস করতে পারবে না। তোমার উপস্থিতি বড়ই চেয়েছিলেন—সেকথা প্রায়ই বলতেন।...প্রার্থনাঘরে শান্ত প্রহরটির জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ আমি জানি, তুমি তাঁকে সাহায্য করেছিলে। কত না মনে হয়, অপর জীবনের মধ্যে জন্মলাভ এই পৃথিবীতে জন্মলাভের মতই ব্যাপার—প্রেম ও প্রার্থনা তাতে বহুল সহায়তা করে।

নিম খুব শোক পেয়েছে। পুত্রশোকের মত বেদনা। আর্নেস্ট ও রিচ—এই দুজনই ছিল শুধু কফিনবাহক—এখানে ও অগ্নিসংকার স্থানে। তাঁর বিষয়ে 'ভাইকারের' কত ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সুকোমল আন্তরিকতা!*

---

* মায়ের অগ্নিসংকার অনুষ্ঠান যে খ্রীস্টান যাজক পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর উদারতার জন্য নিবেদিতার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। ম্যাকলাউড ও ওলি বুল, দুজনকে লেখা চিঠিতেই তাঁর বিষয়ে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। প্রায় দেড় বছর পরে অক্সফোর্ডের বিখ্যাত

শেষ সন্ধ্যায়, শেষের শিহর যখন দেখলাম, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করলাম—এঁকে তুলে নাও কর্‌ণা করে, যত শীঘ্র সম্ভব, মধ্যরাত্রির আগেই। তারপরে ভাবলাম, প্রার্থনা তো করেছি, এখন আর কিছ্‌ চাওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে বা অন্য কারো কাছে ; অপরপক্ষে 'পরম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যাশা' করতে হবে—যা শ্রেয় তাই তাঁরা করবেন এঁর জন্য। আরও দেখলাম, আমার প্রার্থনার পরে তাঁরা যা-কিছ্‌ শ্রেয় বলে স্থির করবেন, তাকেই বরণ করতে হবে।

সকালে যখন তাঁর কাছে গেলাম, দেখি শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে। নিম বলল, পাঁচটা নাগাদ এমন হতে শ্‌র্‌ হয়েছে।

প্রাতরাশে গেলাম, যদিও ম্‌হ্‌র্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যাওয়া কঠিন ছিল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম, তৎক্ষণাৎ নিমকে ডাকলাম।

কিন্তু আর্নেস্ট যতক্ষণ না গিয়েছে এবং নিম আর আমি শ্‌ধ্‌ তাঁর কাছে আছি, ততক্ষণ ম্‌ত্যুলক্ষণ দেখা দেয়নি। তারপর শেষের শ্‌র্‌। আহা—তিনি যা চেয়েছিলেন, ঠিক সেই জিনিসটি সর্বাংশে, একেবারে আক্ষরিকভাবে যেন ঘটে গেল! বলে সেকথা বোঝানো যাবে না।

আমি সাক্ষাৎ অন্‌ভব করলাম—স্বামীজী এসেছেন—এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দ্বার তিনি নিজে উন্ম্‌ক্ত করে দিচ্ছেন। আমি চাপা স্বরে বললাম—'হরি ওঁ!'—যেন তাঁর কানে প্‌থিবীর শেষ শব্দ হয় ঐগ্‌লিই! এত স্তব্ধ-গভীর আমরা, এত স্‌গম্ভীর, ম্‌ত্যুর অপ্‌র্ব নিরোধের তীব্রতা আমাদের এতই অভিভূত করে ফেলল যে, চোখের জল বা তেমন সব-কিছ্‌ আবেগ স্তম্ভিত হয়ে রইল, ছেয়ে গেল অন্‌পম শান্তি আর আনন্দে,ঊর্ধ্বলোকের বস্তু যা—সারাদিনের জন্য।"

৪২ বছর বয়সে নিবেদিতা তাঁর ৬৪ বছরের মাকে হারালেন। ৩২ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন মা, আরও ৩২ বছর পরে স্বামীর সঙ্গে প্‌নর্মিলিত হবার জন্য তাঁর আত্মা ঊর্ধ্বপ্রয়াণ করল। ঐ ৩২ বছরের বৈধব্য কী নিয়ে কাটিয়েছিলেন, নিবেদিতার চিঠিতে তারই কথা (৪.২.১৯০১)—

"মা আমাকে বাবার সব-কটি উপদেশ-ভাষণ রিচ ও তার সন্তানদের জন্য সাজিয়ে গ্‌ছিয়ে রাখতে বলেছিলেন।...বাবার ভাষণগ্‌লি অপ্‌র্ব—একজন কবি যেন তাঁর হ্‌দয় উদ্‌ঘাটিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের জনগণের স্থ্‌ল মস্তিষ্ক কিন্তু প্রেমপ্‌র্ণ হ্‌দয়ের উপরে। এগ্‌লো যে পড়তে হল তার জন্য খ্‌বই আনন্দিত। সেইসঙ্গে এই কথা ভেবে ব্‌কে আঁচড় লাগল—বেঁচে থাকতে মা কতখানি স্‌খ পেতেন এগ্‌লি থেকে।

ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ চেইনীকে লেখা চিঠিতে (১৭.৪.১৯১০) প্‌নশ্চ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন—

"আপনাকে কখনো বলা হয়নি, গত বছর যখন মা মারা গেলেন দ্‌র ইয়র্কশায়ারের ছোট 'প্যারিশে', সেই সময়ে আমাদের বালকের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা আমাদের। তাঁর নাম, বার্কলি ই আর। তিনি আপনার অধীনে ছিলেন, সেইসঙ্গে অক্সফোর্ডের প্রভাবও পেয়েছেন; তাঁর মন এতই প্রশস্ত—সহায়ক—স্‌ন্দর। আপনি গভীর আনন্দ পেতেন যদি দেখতেন তাঁর মানসিক প্রসারতা কিভাবে কাজে ফলবতী হয়েছে এবং শ্‌ভকর হয়েছে আমাদের সকলের পক্ষে।"

১৮৭৫ বা ১৮৭৬ সালের ভারতীয় দুর্ভিক্ষের উপরে লিখিত একটি ভাষণ পেয়েছি, সেটি তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে।

এই ভাষণগুলি মায়ের কাছে হৃদয়ের সামগ্রী, যাদের ধারণ করে তিনি তাঁর অপূর্ব বৈধব্য যাপন করেছেন।"

মায়ের মৃত্যুদিন তাঁর দ্বিতীয় বিবাহদিন বলে মনে হয়েছিল নিবেদিতার কাছে। ডেভনশায়ারে পিতা সমাহিত, সেখানে মার ভস্ম স্থাপন করতে নিবেদিতা গেলেন—

"পিতার সমাধিতে মায়ের ভস্ম স্থাপন করবার জন্য ডেভনশায়ারে গিয়েছিলাম মে ও আর্নেস্টের সঙ্গে। ইস্টার ইভের দিন সে কাজ করা হয়েছে, সুন্দর নয় কি? স্থানীয় লোকজনই সে কাজ করেছে, মাকে সম্মান জানাতে। সুতরাং তাঁরা দুজনই এখন একই বিশ্রামস্থানে, পাইনঘেরা জায়গাটিতে। আমরা যেন অনুভব করেছিলাম— তাঁরা আবার তাঁদের তরুণ জীবনে ফিরে গেছেন। আহা—হায়! কত অধৈর্য আর অবহেলার স্মৃতিকে বেদনাশ্রুর সঙ্গে স্মরণ করতে হচ্ছে। তোমার কাছে যেন কখনো দুষ্ট না হই—হতে দিও না কখনো!" (ম্যাকলাউডকে লেখা; ৫.৪.১৯০১)

এর পরে অবশিষ্ট রইল শুধু স্মৃতির উদাস রোমন্থন। অধ্যাত্মরহস্যময় ভাষায় অনির্বচনীয়ের প্রকাশ চেষ্টা। পর পর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করে যাচ্ছি :

বোন মে-কে লেখা, ১৫.৫.১৯০১

"মার স্মৃতি 'শান্ত স্তব্ধ'—এই ভাবটি আমাকে অনেকখানি শান্তি দিয়েছে, কারণ আমার মনে হত তা যেন সঞ্চরমান। তোমাকে বলেছি কি—সংবাদটি যখন সেই সকালে ওলিয়ার কাছে পৌঁছেছিল—সে তারই প্রতীক্ষায় ছিল। খুব ভোরে তার ঘুম ভেঙে যায়, তার মাথার দিকে কে যেন দাঁড়িয়ে, জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সরে যায়—'বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।' ওলিয়া আধো তন্দ্রায় স্বপ্নে শিশুকে বলল, 'সিলভিয়া, ও একটা অশরীরী আত্মা।' কিন্তু শিশু বলল, 'না, না, মানুষ।' ওলিয়া বলল, 'না অশরীরী!' সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে সে পুরোপুরি জেগে উঠল, ব্যাপারটা মনে এতই প্রভাব রাখল যে, সে উঠে ঘড়ি দেখল, তখন তিনটে বাজতে পনেরো। ব্যাপারটা স্বপ্ন হতে পারে, *একথা কিন্তু পরেও তার মনে হয়নি।*

সুতরাং প্রিয় বোনটি, আমি অনুভব করছি, মা তাঁর সুদীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করার পরে আমরা যেন আমাদের পরম প্রিয়ের নিশ্চিত বার্তা পেয়েছি। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রা—না, তা তো নয়—এ তো শুধু বর্তমান থেকে চিরন্তন প্রেমে নিমজ্জন।

সুইডেনবর্গ আমাকে খুবই সান্ত্বনা দিয়েছে। আর্নেস্টও যে পছন্দ করেছে, তার জন্য খুবই আনন্দিত। কারণ সুইডেনবর্গ অনুভব করিয়ে দেয়—যবনিকার এদিকেই যত যাতনা ; আর কেউ যখন তা অনুভব করে তখন প্রিয়তম মানুষের মৃত্যুতে *পর্যন্ত বেদনাদংশনটুকু* থাকে না। হায়, পূর্ণ দিব্য সুখে অবস্থিত কাউকে ভালবাসতে যে আমরা প্রায়ই অভ্যস্ত নই! মিঃ স্টেডের লিপিটুকু তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, আশা করি রক্ষা করবে।...আমাদের প্রিয়তম মৃতের বিশ্রাম কী সুপবিত্র!

সে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য গভীর উদ্বিগ্ন আমি। সে শান্তি থেকে মায় কয়েক মুহূর্তের যাতনাপূর্ণ চৈতন্যে তিনি অবতরণ করুন আমাদের আহ্বানে—তাও আমি সহ্য করতে পারব না। এক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবনা কী সত্য!—একটি অস্তিত্ব-প্রকৃতি আছে, যাকে এইসব ক্ষণে নিজেদের মধ্যে অনুভব করতে পারি—যেখানে সবই আনন্দ, যেখানে বিচ্ছেদের কল্পনাও অচিন্তনীয়, মৃত্যুতেও যেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এখানেই আসল সান্ত্বনা—সেই পরমে, অভেদে, নিত্যে—শান্তি থেকে কাউকে টেনে জাগানোয় নয়। 'এই অসত্য হইতে আমাদের সেই সত্যে লইয়া যাও।'"

১ জুলাই, ১৯০৯, একই জনকে

"আহা, সেই পরম মুহূর্তগুলিতে তুমি এবং আমি আমাদের বড় ভালবাসার মায়ের পাশে উপস্থিত ছিলাম—মুহূর্তগুলি আমার নিত্য মনের সাথী। এ পৃথিবীতে আর বেশী যন্ত্রণা মাকে সইতে হয়নি, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞ। প্রিয় বোনটি, আমি হাজির হলে তিনি তোমাকে ভুলে গিয়েছিলেন, একথা সত্য নয় মোটেই। ঐ দিনগুলিতে আমরা দুজনই একসঙ্গে তাঁর মনে ছিলাম।...মৃত্যু এল—কী অপরূপ! জীবন থেকে তাঁর প্রস্থানের সেই মুহূর্তকয়টিতে তিনি যতখানি জীবন্ত, এমন আর কখনো ছিলেন না।"

মায়ের মৃত্যুর এক বছর পরে লেখা চিঠি (৬.৯.১৯১০) একই জনকে

"তোমার হৃদয়ভাব খুবই অনুভব করছি, কিন্তু তার কাছে হারলে চলবে না। যখন আমরা ভাবি যে, আমাদের প্রিয়জনটির প্রভাব সর্বদিকে বুঝি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে, তখন ঐ ধরনের অনুভূতি তীব্রতর আকারে হাজির হয়। এক্ষেত্রে কী বলতে পারি বলো? শুধু বলি, পরিবর্তন ঘটছে ভালোর জন্যই, তাঁর অনন্ত ভালোর জন্য, আর এর মধ্যে একটা তাৎপর্য আছে যা আমরা একদিন খুঁজে পাবই যদি ধৈর্য ধরি। জীবন সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু অনন্ত অর্থে পূর্ণ, সুখ ও দুঃখকে যা নিজস্ব যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে।

যখন এই চিঠি তুমি পাবে, সেই শেষ দিনগুলি পুনশ্চ যাপিত হবে পৃথিবীর দুই প্রান্তে, এবং গত বৎসর যা শান্ত ও উন্নীত মনে হয়েছিল, এখন মনে হবে তা নিদারুণ।...প্রিয় বোনটি, শোনো, আমার কাছে সব কিছুর সার অর্থ হচ্ছে : প্রতিটি সম্পর্কবন্ধনই মূল্যবান, যেহেতু মৃত্যুচ্ছায়াবিস্তার যে-কারো উপরই হতে পারে। আহা, মাকে আবার যদি ফিরে পাই, তাঁর মূল্য কত না বড় হয়ে ধরা দেবে! তাই এসো—আমাদের চারপাশের সবাইকে ভালবাসি, পূজা করি। আমাদের আত্মার উদ্যান থেকে মানবিক সম্পর্কের শ্যামল ভূমিখণ্ডগুলি এখনো শুকিয়ে যায়নি একেবারে। আমাদের সকলেরই উপর সূর্যকিরণ ছড়াবে,-হাঁ, ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ তা ঘটবে, যে-পর্যন্ত না আমরা ব্যাকুল ভালবাসার এবং সেবার অনন্ত আকৃতির শিক্ষা নেব, যাতে শোক করবার আর কোনো কারণ থাকবে না, এবং এই সব কিছু থেকে উড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত করে দেবে—ঈশ্বরের দিকে পাখা মেলে দেওয়ার জন্য।

আবার আমরা মাকে দেখব, দেখবই, তুমি এবং আমি দুজনই। তাঁকে তখন ভালবাসব, সেবা করব, অতীতের সেই নিদারুণ ক্ষোভ ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে নয় কিন্তু। আ—হা! কী সে পবিত্র ভালবাসা ও আত্মিক উদারতা তিনি দিয়ে গেছেন! তাঁর দোষগুলি সবই বহিরঙ্গ, অন্তরে তাঁর তুল্য কেউ নয়। ঈশ্বর রক্ষা করুন তাঁকে, সুখী করুন—যেখানে তিনি আছেন; তিনি আমাদের চিরদিনের—চিরদিনের—প্রেমপাত্রী।"

৫ মে, ১৯১০, একই জনকে

"আমি নিতান্ত নিশ্চিতভাবে জানি—মা, তুমি এবং আমি আবার একত্র হব। খুবই ভরসা করি যে, অন্য জীবনে আমি তোমার উপর বোঝা চাপাবো না, যা নিতান্ত স্বার্থপরের মত এ জীবনে করেছি। সত্য সত্যই আশা করি তা। সত্যই আশা করি যে, আমাদের ছোট্ট মা-টির উপর ভালবাসা উজাড় করে দেব। যাই হোক না কেন, আমি স্থির নিশ্চিত—সাহায্য তিনি পাবেন, কেননা আমাদের দ্বারাই আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে; তিনি তৃপ্ত হবেন যা হয়েছেন তা হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন বলে; তুমি আর আমি তৃপ্ত হব তাঁর জন্য যা করতে চাই তা করার সামর্থ্য পেয়েছি বলে। জীবনের নবলব্ধ স্বাধীনতা ও মহিমার আলোকে তখন দৃষ্টিপাত করতে পারব। এ জীবনে সকল বৃহৎ ব্যাপারে তিনি কী যথার্থ মহিমা ও মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন, এবং ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিতে কী অসহনীয় স্বভাবের!"

১২ জুন, ১৯১০, একই জনকে

(বদরীনারায়ণ যাত্রাপথে লিখিত)। "প্রতি রাত্রে মায়ের স্বপ্ন দেখি। কত সকরুণ স্বপ্নগুলি। মৃতের জন্য প্রার্থনার যোগ্যভূমি নাকি বদরীনারায়ণ। তোমাদের সকলের কথা কত মনে পড়ে!"

মৃত্যুর পরে মায়ের সঙ্গে মিলিত হতে এত উৎকণ্ঠিত ছিলেন নিবেদিতা—তার জন্য বেশী দেরী করতে হয়নি তাঁকে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর দেহান্ত হল তাঁর। 'ভারতীয় মৃত্যু'ই হল। ভস্মীভূত করা হল মরদেহ। ভস্মাবশেষের কিছু অংশ পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংলণ্ডে, পরিবারবর্গের কাছে। এবং সেই চিতাভস্ম সমাহিত করা হয়েছিল ডেভনশায়ারে পাইনঘেরা সেই জায়গাটিতে, যেখানে মাত্র আড়াই বছর আগে নিবেদিতা নিজে গিয়ে মায়ের চিতাভস্ম স্থাপন করে এসেছিলেন পিতার সমাধিপার্শ্বে।*

---

* নিবেদিতার ভস্ম ইংলণ্ডে পাঠানো সম্বন্ধে মূল্যবান সংবাদ আছে মিজেল রেমকে লেখা মিসেস উইলসনের ২৯ অগস্ট, ১৯৩৯-এর চিঠিতে—

"নিবেদিতার চিতাভস্ম সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন। না, তা ইংলণ্ডে পাঠাবার জন্য আমি অনুরোধ করিনি। মনে হয়, ডাঃ বসুর উদ্যোগেই তা হয়েছিল। একটি কথা মনে রাখবেন, নিবেদিতা আমাদের পিতার স্মৃতিকে পূজা করত। ১৯০৭ সালে মিসেস বুল ও বসুদের সঙ্গে নিয়ে সে ডেভনশায়ারে গিয়েছিল—পাইনগাছের আশ্রয়ে যে-প্রিয়

তারিখটি ছিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর। নিবেদিতার প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীর পূর্বদিন। সমাধিকৃত্য করিয়েছিলেন গ্রেট টরিংটনের কংগ্রিগেশন্যাল চার্চের 'মিনিস্টার' রেভাঃ এডওয়ার্ড বার্নস্টোন। নিবেদিতার পিতা ওখানেই 'প্যাস্টর' ছিলেন। চার্চের পক্ষে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। "মর্তজীবনে সিস্টার নিবেদিতা নামে কথিত যে-আত্মা অল্পদিন পূর্বেও এই স্বল্পাবশিষ্ট ভস্মরাশিকে জীবন্ত করে রেখেছিল, সেই আত্মার প্রভায় পূর্ণ ছিল স্থানটি।"

নিবেদিতার সমাধিকৃত্য একবার হয়েছে ভারতে, আবার হল ইংলণ্ডে। প্রথমবার বরণ-করা দেশে, দ্বিতীয়বার জন্মভূমিতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন্ত যোগসূত্র যিনি ছিলেন, তাঁকে সম্মান জানাতে মিলিত হল দুই মহাদেশ। পঞ্চভূতে বিলীন হলেন নিবেদিতা। ভারতে চিতা যখন জ্বলেছিল, 'তেজ' তাকে গ্রহণ করেছিল, সূক্ষ্মতর অংশ ছড়িয়ে গিয়েছিল 'মরুৎ'-এর মধ্যে, এবং তা মিশিয়ে গিয়েছিল 'অপ্'-এ, অবশিষ্ট অংশ টেনে নিল 'ক্ষিতি'—ভারতে ও ইংলণ্ডে, আর সব কিছু রইল 'ব্যোম'-এর উদার আশ্রয়ে।

নিবেদিতা তাঁর পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে চিরতরে সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে, সমাহিত হয়ে রইলেন।

কথাগুলি আমার নয়। এমন একজনের*, যিনি ম্যাগী নোবলকে তার বাবার কাছে গ্রেট টরিংটনে দেখেছিলেন, তখন থেকে জানতেন, সেই ছোট্ট মেয়েটিকে—হাসিতে খুশীতে আলোজ্জ্বলা মেয়েটিকে। পরেও মেয়েটিকে দেখেছেন, ভারতের কাজে যখন সে জীবন উৎসর্গ করেছে। তারও পরে, যখন সে ফিরে এসেছে পিতার সমাধিক্ষেত্রে মাতার ভস্ম সমাহিত করতে। তারও পরে, যখন সে এসেছে—সে আসেনি, এক মুষ্টি পবিত্র ভস্ম এসেছে পিতা ও মাতার সমাধিমূলে স্নেহাশ্রয় লাভের জন্য।

O Krishna, Thou loving shepherd of the people,
Buddha, Lord of infinite compassion,
Jesus, Thou Lover and Saviour of the soul,
May Ye and all the nameless Masters of the spirit,
Receive and save this soul!
Keep her in Thine own presence, O Lord God,
And let light perpetual shine upon her.

ভূমিতে পিতা সমাহিত আছেন, সেই স্থানটি দেখবার জন্য। ১৯০৯ সালে আমার সঙ্গেও সেখানে সে যায় মায়ের চিতাভস্ম সমাহিত করতে। ঐ স্থানটি তার কাছে কী, কি সুখ-স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসে—সেসব কথা সে নিশ্চয় তার বন্ধুকে বলেছিল। কিন্তু মনে হয় না, ওখানে নিজের ভস্ম-সমাধির ব্যাপারে সে কোনো নির্দেশ দিয়েছিল। অবশ্য আমি তার পরম প্রিয় পবিত্র স্থানটিতে তার ভস্ম সমাহিত করিয়েছিলুম। আমার কিন্তু সর্বদা মনে হয়েছে, গঙ্গার মুক্ত-প্রবাহকেই সে ভালবাসত।"

* লেখকের নাম বর্থা এম্ জো। ডেভনশায়ারের গ্রেট টরিংটন থেকে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর এটি পাঠানো হয় এবং প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১২, ডিসেম্বরে।

বোন

মে, মার্গটের একেবারে কোলে-পিঠের বোন। শৈশবের খেলাধুলো একই সঙ্গে; পিতার মৃত্যুর পরে অবস্থাবিপর্যয়ে একই বোর্ডিং স্কুলে প্রেরিত; তারপরে কর্ম-জীবনে দুজনই শিক্ষয়িত্রী। নিবেদিতা ভারতে চলে যাবার পরে নিবেদিতার স্কুলের ভার তাঁকেই নিতে হয়। নিবেদিতার পরবর্তী জীবনেও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষয় ছিল। স্বামীজীর প্রেরণার অধীন মে-ও হয়েছিলেন এবং নিবেদিতা-গোষ্ঠীর প্রায় সকলের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। বসু-পরিবারের সঙ্গে এঁর এমনই ঘনিষ্ঠতা ঘটে যে, জগদীশচন্দ্র শেষ জীবন পর্যন্ত গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে তা মনে রেখেছেন। এঁকে লেখা জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি আমরা পরে জগদীশ-প্রসঙ্গে হাজির করব।

বোনকে এবং বোনঝিদের নিবেদিতা নিয়মিত চিঠি লিখেছেন। বড় বোনঝি মার্গটকে নিবেদিতা ধর্মকন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের কাছে নিবেদিতার চিঠিগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক, সাধারণের ভালোলাগার বস্তু তাতে নেই—একথা সিসিলি উইলসন (মেজ বোনঝি) লিজেল রেমঁকে লিখেছিলেন। সেসব চিঠি তাঁরা দেননিও। মে উইলসনকে লেখা অল্প কয়েকটি চিঠি আমরা পেয়েছি। এবং মে বা তাঁর কন্যাদের প্রসঙ্গ ম্যাকলাউড বা ওলি বুল প্রভৃতির কাছে লেখা চিঠিতে পাচ্ছি। এইসব চিঠিপত্র থেকে অংশ নির্বাচন করে উপস্থিত করব। এখানে নিবেদিতাকে নিতান্তই ঘরের মেয়ে রূপে পাব, জীবনীকারের কাছে এই একান্ত মূর্তিখানি বড় দুর্লভ, সেইসঙ্গে নিবেদিতার আদ্যন্ত আদর্শবাদিতাও এখানে দেখা যাবে, কারণ লোকলোচনের অন্তরালের জীবনেও যদি অম্লান থাকে মহত্ত্ব, সে মহত্ত্ব সহজাত, আরোপিত কিছু নয়।

নিবেদিতা যখন স্বামীজীর কাজের দায় গ্রহণ করে ভারতে চলে এলেন, তখন তাঁর বোন কেবল বিচ্ছেদের দুঃখ-সাগরে ভাসলেন না, উদ্বেগের চাপা আগুনেও পুড়তে হল তাঁকে, কারণ সংসারের দায়িত্ব পড়ল তাঁর উপরে, বিশেষত নিবেদিতার স্কুলের দায়। এই দায় আরও দুর্বহ বোধ হওয়ার কারণ, ইতিমধ্যেই মে নিজ জীবনের পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেছিলেন—তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন।

বোনের উপরে দায় চাপিয়ে ভারতে চলে এসেছেন বলে নিবেদিতারও মর্মপীড়নের সীমা ছিল না। তার রূপ কয়েকটি চিঠিতে দেখতে পাই।

নেল হ্যামণ্ডকে জুন ৫, ১৮৯৮ তে লিখেছেন—

"যে-সব খবর দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ। আমার নিম, জেনো, সে যে নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা জানি, আর তা আমারই দোষে। কিন্তু আমি খাঁটি—অতীব নিশ্চিতভাবে অনুভব করি যে, তার ভারকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না যাতে তা বওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য পালন করার সুযোগ আমি পাব, তাও বিশ্বাস করি। ইতিমধ্যে, যাঁরা তার প্রতি ভালবাসা-ভরা বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা মোটে কথা। তোমাদের কল্যাণপূর্ণ প্রিয় হৃদয়টিকে ধন্যবাদ জানিয়েছি—সর্বান্তঃকরণেই।"

অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে, ভারতের কাজ ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার

কথা পর্যন্ত নিবেদিতা ভাবতে থাকেন। ম্যাকলাউডকে ৩০ জানুয়ারী, ১৮৯৯, লিখেছেন—

"একটা বিচিত্র কথা বলবার আছে। এবছর হয়ত সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হতে পারে। সত্যই, ব্যাপারটা অনিবার্য মনে হচ্ছে। নিমের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে কার্যতঃ আমাকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে—পরিশ্রম আর চিন্তায় সে ভেঙে পড়েছে, এ অবস্থায় বিয়ে করবে কি করে? মনে হচ্ছে, এ বছরই সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু স্কুলের দায় ঘাড়ের উপরে—স্কুলের যা অবস্থা তাতে মনে হয় যেন তাকে অনির্দিষ্টকাল এইভাবেই চলতে হবে। এক্ষেত্রে একটি উত্তরই আমার জানা আছে। তার জীবন সব সময়ই আমার জীবনকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, এখন আমার পালা তাকে পথ ছেড়ে দেবার—অবশ্যই দিতে হবে। যদি সে বিয়ে করতে চায়, ভিন্ন কোনো অভিপ্রায় তার না থাকে, তাহলে অবশ্যই বাড়ি ফিরে গিয়ে পুরনো স্থান নিতে হবে আমাকে। আর এখানকার সকলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝবেন, এই সম্ভাবনায় কিছুটা শান্তি পেয়েছি। সবদিক দেখে আমি বলতে পারি, এখানে এসে ভালই করেছি, কোনো সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু সেইসঙ্গে আমার বোনকেও বলি দিয়েছি আমি—সেটা নিদারুণ। তবে তার (বোনের) অভাব-পূরণের ব্যবস্থাও আছে, তাও ভুলিনি। সুতরাং বৃথা অনুতাপে সময়ক্ষেপ করব না। ঈশ্বরকে শুধু এইকথা বলি আমার বোনের সুখকে নষ্ট করবার পথে একটা সীমার বাইরে তাঁর জন্যও যেতে পারি না। তাছাড়া আমি ঈশ্বরের কাছে কোনো-ভাবে প্রয়োজনীয় একথা ভাবা আমার পক্ষে খুবই অহঙ্কারের জিনিস নয়কি! কিন্তু স্বামীজীকে আমি এ বিষয়ে কিছু বলিনি, যাতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে, যা হৃদয়কে উপড়ে ফেলা ছাড়া কিছু নয়, আমি অনিশ্চিত-মন হয়ে পড়ি।......হায়, নিমের বরাতে না জানি কি আছে! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পারিবারিক গর্ব এমনই যে, বাইরে থেকে (ভিতরের ব্যাপারের) চিহ্নমাত্র দেখতে পাবে না। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে আমাকে কাজ করতে হবে; শুধু তাকে লিখে দেব, আমি ফিরে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছ, বোঝা জমিয়েছি আমিই, সে ভার তাকে বওয়াতে পারি না অবশ্যই।"

ম্যাকলাউডকে, ২৪ ফেব্রুয়ারী, লেখা—

"নিমকে অবশ্যই লিখো। তাকে উৎসাহিত করো। কেন জানি না মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে তার সংগ্রাম অতি কঠোর। কিছু একটা করা দরকার। তবে এও জানি, যে-মুহূর্তে সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় গা ভাসান দেবে, তখন ভয় থাকবে না, সংগ্রামও শেষ। নিম প্রভুরই হাতে আছে, জানি, জানি তা, শুভ হবে সব কিছুরই।"

নিবেদিতার মানসিক কষ্টের কথা জেনে মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন স্কুলের ব্যাপারে, যা নিমকে ভারমুক্ত করেছিল। কৃতজ্ঞ নিবেদিতা ১৫ মার্চ ১৮৯৯, মিসেস বুলকে লিখলেন—

"এই অপূর্ব মুক্তির বার্তা আমার কাছে এল, যা পাওয়ার অধিকার আমার নেই, এর জন্য তোমাদের দুজনের (ওলি বুল ও ম্যাকলাউড) কার কতখানি ভূমিকা জানি না, কিন্তু তোমার হাত আছে নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে আমার অনুভূতি কত গভীর তা তোমাকে এখনি জানাতে চাই, ধন্যবাদ এখানে নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার।

যেন কবরের বুক-চাপা পাথর একটা সরে গেল—উপমাটি এ সপ্তাহে বারবার মনে উঠেছে।"

১৬ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—

"প্রিয়তমা যুম, আমাদের বাড়ির সংবাদের মধ্যে জোরালো সুখের সংবাদটি বেছে পাঠাবার জন্য কি ভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি, বলো। তুমি নিমকে ভালবাসো, সে আমার থেকে আলাদা বলেই ভালবাসো—স্বর্গীয় কথা।"

পুনশ্চ ম্যাকলাউডকে, ৫ এপ্রিল তারিখে—

"নিম সম্বন্ধে তোমার খোলাখুলি মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদও যথেষ্ট নয়। তোমার কাছে সে যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি। বাস্তবিক তোমার শক্তির এ এক প্রমাণ। আমার কাছে এত খোলা মন সে কখনো হয়নি। বেচারা নিম! —এই ভারকে সে এত দুর্বহ ভাবছে, তা ভাবতে ভয়ঙ্কর লাগে। সে বিয়ে করুক বা না করুক, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যেখানেই থাকুক, স্বামীজীর কাজ করে যাবে। না করে পারবে না। যে অপূর্ব ক্ষণে আমার কর্মফল-ভার তুমি তার ঘাড় থেকে তুলে নিলে, সেই ক্ষণ থেকে তাকে তার নিজের ভার বইবার এবং নিজের সমস্যার সম্মুখীন হবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি, আমার বিভ্রান্ত ভাবনা ও চিন্তার পাক থেকে তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমার দিব্য ক্ষমতায় তুমি বলতে পারো, বলেছও— এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা তার আছে। দুটো কি তিনটে চিঠিতে আমার ভাবনা-যাতনার চেহারা তুমি দেখেছ, সেগুলির বিস্তারিত উত্তর দেবার কষ্ট স্বীকার তুমি করবে না ভরসা করি।"

১৯ এপ্রিল, একই জনকে—

"মিষ্টি কথাগুলির জন্য ধন্যবাদ, গত মেলে যা লিখে পাঠিয়েছ। সেই সঙ্গে নিমের চিঠি পুরে দিয়েছ।

শেষোক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে আমার গভীর হৃদয়ানুভূতির কথা তুমি জানো, এ বিষয়ে কিছু বলা অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে, উপযুক্ত কিছু বলার আশা রাখি না। শুধু এই ভরসা করি, এবার কাজ করে যেতে পারব, যা তোমার বিরাট বিশ্বাসের মর্যাদা হয়ত সম্পূর্ণ নষ্ট করবে না।

মে'র কী ভাগ্য যে, সেই রাত্রিটি এবং রবিবার তোমার সঙ্গে কাটাতে পেরেছে! সে নিশ্চয় দারুণ খুশী হয়েছে! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি তোমাকে যেভাবে জানি, সে সেইভাবে তোমাকে জানার কিছু সুযোগ পেয়েছে।"

স্কুলের বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পরে মে-র বিয়েরও ঠিকঠাক হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ২ মে তারিখে নেল হ্যামণ্ডকে বোনের প্রতি 'মধুর ও সহৃদয় মনোভাব' দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে নিবেদিতা মে-র মহত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন—"অনেক দিক থেকে সে আমার থেকে অনেক অনেক এগিয়ে আছে। তার সম্বন্ধে ভাবার সময়ে নিজেকে খাটো মনে হয়।" এসব কথা লেখার প্রয়োজন হয়ত এইজন্য হয়েছিল যে, মে'র সাদা-মাঠা আচরণের পিছনে যে উদার সহনশীলতা ছিল, তা প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যেত।

এর পরে স্বামীজীসহ নিবেদিতার ইংলণ্ড যাওয়া এবং নিম-এর বিয়েতে

যোগদানের সম্ভাবনা দেখা গেল। নিবেদিতা নিতান্ত আনন্দিত হলেন এই সম্ভাবনায়। এইবারই ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা শেষ বারের মত গৃহস্থকন্যার ভূমিকা গ্রহণ করবেন—বোনের বিয়েতে 'মেড অব অনার' হবেন। বিবাহ সমাপন পর্যন্ত এই সংক্রান্ত পত্রাংশ পরপর উদ্ধৃত করছি—

ম্যাকলাউডকে, মে ৮, ১৮৯৯—

"রাজা মধুর স্বভাবে, প্রদীপ্ত। আগামীকাল যাত্রার টিকেটের ব্যবস্থা করতে হবে।......তিনি (স্বামীজী) নিমের বিয়েতে হাজির থাকবেন ও আশীর্বাদ জানাবেন!!! যদি তোমার কোনো কথায় এ জিনিস ঘটে থাকে, আমি জানি তুমি সে-রকম কথা স্বতঃই বলবে, যাতে আমার বোনটি জীবনের ও হেন ঐশ্বর্য লাভ করে।"

একই জনকে, মে ২১, ১৮৯৯—

"নিম ও মাকে (যাত্রার কথা) বলো না। আমি চাইনা আমাদের যাত্রার কথা তারা জানুক, কেননা তাহলে বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ মনোযোগ না দিয়ে আমাদের জন্য ব্যস্ত হবে।"

একই জনকে, জুলাই ১৯—

"তোমার কাছ থেকে নিমের বিয়ের তারিখের কথা জানতে পেরে খুবই আনন্দিত। স্বামীজীর সঙ্গে যদি তার প্রণয়ীর কথাবার্তা বলার সুযোগ ঘটে ওঠে, কৃতজ্ঞ হব। স্বামীজী বলেছেন, সম্ভব হলে তিনি তা করবেন। অনেকদিন বাড়ি থেকে কোনো খবর পাইনি।"

একই জনকে, জুলাই ২৯—

"নিমের বিয়ের দিন থেকে আমি সব কিছু পরিহারের ব্রত নেব। ভরসা করি, এজীবনে আর কখনো আমার জন্য নতুন গাউন তৈরী করার দরকার হবে না। অবশ্য যদি রিজলিতে যাই এবং তুমি চাও তাহলে তোমার ফ্রক পরে আমি লৌকিক সাজ করব। অন্যথায় আমি এক স্যাজে—একটি স্যাজেই! হুম, আমি এমন বড় নই যে, আমার অবশিষ্ট জীবনের পাঁচ মিনিট সময়ও ঐ একটি উদ্দেশ্য ভিন্ন ব্যয় করতে পারি।......

মিঃ স্টার্ডি লিখেছেন, তিনি ওয়েলশ্ চলে গেছেন। স্বামীজীকে বাসস্থানের জন্য উইম্বলডনে যেতে হবে, যে-পর্যন্ত না তিনি কর্মসূচী স্থির করেন। স্বামীজীর দলে তিন জন আছেন। তিনি লন্ডনে থাকাই পছন্দ করেন। সুতরাং জানি না কি ঘটবে। অবশ্য আমি চাই, তিনি উইম্বলডন চলুন, কয়েকদিনের জন্য হলেও। কিন্তু নিমের বিয়ে পর্যন্ত তিনি ইংলন্ড থাকবেন, এমন আশা করার অধিকার আমার নেই।"

একই জনকে, অগাস্ট ৩—

"সোমবার সকালে পৌঁছেছি। নিতান্ত অসময়ে হলেও মা, নিম, মিস প্যাসটন এবং দুই আমেরিকান মহিলা মিসেস ফাঙ্কি ও মিস গ্রিনস্টাইডেল-এর সাক্ষাৎ তখন পেয়েছি।

রাজা সোমবার এইসব বন্ধুদের সঙ্গে শহরে কাটিয়েছেন, এঁদের সান্নিধ্য দেবার জন্য। কিন্তু মঙ্গলবার খুব সকালে ফিরে এসেছেন, শেষ পর্যন্ত

উইম্বলডনকেই ভাল মনে করে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে দুবার দীর্ঘ কথালাপ ঘটে গেছে। নিম তাঁকে খুশী করেছে; রিচকে পছন্দ করেছেন তিনি।

নিম তাঁকে মনোরম ঘর খুঁজে দিয়েছে, স্টেশনের কাছে, তার চারদিকে সবুজ, এবং শান্ত পরিবেশ।......

ভবিষ্যতের কথায় নিম একেবারে চুপচাপ। তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে—সত্যই সুন্দর সে। তার সঙ্গে এবার আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়টি—একেবারে যা-তা—দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত চিন্তা বা অনুভূতি কিছু নেই—সহসা সব কিছু ঝাঁপিয়ে এল—আর সেও—সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতে কেঁদে উঠল। সে বলল—তার মনে হল যেন সমাধির ঢাকা খুলে বেরিয়ে এলাম আমি।......

মিসেস গিবসন চলে গেছেন। কিন্তু নিম সিসেমীতে স্বামীজীকে আপ্যায়িত করার কোনো চেষ্টাই ত্যাগ করবে না।"

একই জনকে, অগস্ট ১২—

"গতকাল তিনি (স্বামীজী) জিজ্ঞাসা করলেন—আমেরিকা যাবার জন্য কবে তৈরী হচ্ছ?

—যখনি আপনি চাইবেন, স্বামীজী।

—কী? বোনের বিয়ে পর্যন্ত থাকতে চাও না?

—হাঁ, আমার তাই করা উচিত, আপনি কি বলেন?

—হাঁ, আরও এক মাস, তাই নয় কি?

নিম, সেন্ট সারাকে প্রায় পুজো করে। তোমাকে বলে—'পরীর মত ধর্ম-মা।' সে বলে, সে আগে কখনো স্বপ্নেও সুসজ্জিতা সেন্টদের কথা ভাবেনি। তোমার সবুজ ও পিঙ্গল ফ্রক এমন গায়ে হয়েছে—মহিমান্বিত ব্যাপার! আর শাদা ফ্রক—মহা মহিমান্বিত!—যদিও এখনো পরে দেখিনি।......

স্বামীজী গ্লাসগো থেকে অ্যালান লাইনে নিউইয়র্ক যাত্রা করছেন আগামী ১৭ই, বৃহস্পতিবার। তিনি চান ৬ই সেপ্টেম্বরে নিমের বিয়ের পরে যত শীঘ্র সম্ভব আমি যাত্রা করি।"

একই জনকে, অগস্ট ১৭—

"গতকাল সকালে করা আমার টেলিগ্রাম বলছে— স্বামীজী তোমাদের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তাঁর শেষ কথা আমাকে—'যত শীঘ্র পার এসো।'......মে'র বিয়ে ৬ সেপ্টেম্বর। যদি আদেশ হয়, তার অব্যবহিত পরেই যাত্রা করতে পারি। নচেৎ আরও এক সপ্তাহ পরে, গ্লাসগো থেকে অ্যালান লাইনে যাত্রা।......

নিমের প্রণয়ী আমাকে খুশী করেছে। সে আচার্যদেবের চরণে নতজানু হয়েছিল, যেমন হয়েছিল মা, নিম ও রিচ। অপরূপ!......

চমৎকার তোমার ফ্রকগুলি, বিশেষতঃ শাদা ফ্রকটি, যেটি বিয়েতে পরব।"

একই জনকে, সেপ্টেম্বর ৭—

"গতরাত্রে যাত্রা করার ঠিক দশ মিনিট আগে বহু-প্রত্যাশিত তোমার চিঠি এল, যাতে জানলাম রাজা পৌঁছেছেন—কখন, কিভাবে—তাও। আমার হৃদয় শান্ত হল। ন'টা বেজে কুড়িতে আমি বাড়ি ছাড়লাম।

গতকাল অপরাহ্ণে নিমের বিয়ে হল। মিষ্টি নিম! অনুষ্ঠানপর্ব সমাধা করলেন

কাকা—খুবেই সুখের হল যা—নিজেই ব্যাপারটা সাজিয়েছিলেন—অতি মনোরম ভাবস্পর্শ ছড়ানো ছিল যাতে। কাকা বললেন, এ কাজ করতে তাঁর খুবই ভাল লেগেছে, কারণ নিমকে এত সুখী দেখাচ্ছিল, এবং সে একেবারেই কাঁদা-কাটা করেনি। সুন্দর নয় কি? যখন সে গির্জা-পার্শ্ব থেকে নেমে এল, সবাই চমৎকার গোলাপ আর পদ্ম ছুঁড়েছিল সামনে। তারপরে সকলে বাড়ি এলাম চায়ের জন্য, একত্রে কেক কাটার জন্য—মহা মজা হল তখন। সবাই বলল, নিতান্ত মধুর ও ঘরোয়া হয়েছে ব্যাপারটা। তবে তার জন্য কোনো কৃতিত্ব আমরা দাবি করতে পারি না, কারণ আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিয়ে, সুতরাং আমরা জানতামই না এক্ষেত্রে নিখুঁত ফর্ম্যালিটি কি!! যাইহোক, আমি বিশেষভাবে সুখে ও বিস্ময়ে ছিলাম, কারণ আমার কখনই মনে হয়নি—বিয়ে ব্যাপারটা কম-বেশী আমোদের জিনিস হয়ে উঠতে পারে।

যদি অ্যালবার্টার জন্মদিনে হাজির হতে পারি, আমি ঐ একই পোষাক পরতে চেষ্টা করব, তোমরা তাহলে দেখবে—কী দারুণ দেখতে হয়েছিল আমাকে। আর নিমের বিষয়ে—সব কথাই তোমাকে বলব। মা তোমাকে ডাকে কেক পাঠাবেন।......

আর্নেস্ট ও নিম নর্ম্যাণ্ডি গেছে, তাদের বাইসাইকেল নিয়ে।"

নিমের দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। তার সুখে সুখী বড় দিদি মিসেস বুলকে লিখেছেন ২৬ ডিসেম্বরে—

"নিমের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। বেটকে লেখা তার চিঠি বেট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাতে নিম লিখেছে—'আমি কত সুখী সেকথা লিখে জানাতে চাই। সারা পৃথিবীতে আমার স্বামীই সেরা বলে আমার মনে হয়। যত তাকে জানছি, ততই ভালবাসছি।' সুতরাং প্রিয় মিসেস বুল, তুমি দেখছ, আমার সব সন্দেহের শুভ সমাপ্তি। এত ভাল কথাগুলি, আহা যেন সত্য হয়। আমার কাছে লেখা চিঠিতে নিম সুখী হওয়ার বিষয়ে কদাপি উল্লেখ করেনি, সেটাই মনে হয় সেরা ইঙ্গিত। কিন্তু সারাক্ষণ 'আমরা', 'আমরা', 'আমরা' বকে গেছে। তুমি আগে যা বলেছিলে তাই সত্য। নানা বিষয়ে তাকে সর্বোচ্চ উপলব্ধি করতে হবে। তার কমে সে শান্তি পাবে না—তাই ভবিতব্য।"

ম্যাকলাউডকে, ডিসেম্বর ২৬, ১৮৯৯—

"গতকাল...নিমের চিঠি এল। পরিপূর্ণ সুখের কথায় ভরা চিঠি...প্রতি দ্বিতীয় শব্দে 'আমরা', এবং আর্নেস্ট ও সে যে সত্যই আধাআধি টাকা দিয়ে আমার জন্মদিনের কলমটি কিনেছে আমাকে এই আশ্বাসদান, ইত্যাদি। তার সুখ সম্বন্ধে আরও বেশী নিশ্চয় বোধ করতাম যদি সে তার উল্লেখ না করত। সে আরও লিখেছে, মিস ম্যাকলাউড ইংলণ্ড ফিরলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যেন বাস করেন।"

নিমের আনন্দময় নীড়ের কথা, তার সন্তানাদির কথা পরবর্তী দু'একটি চিঠি থেকে অল্প কিছু তুলে দিচ্ছি।

ম্যাকলাউডকে, অগস্ট ২৯, ১৯০০—

"নিমের চিঠি তোমাকে পাঠাতে ইচ্ছা করি। অপরূপ—নয় কি। তার জীবন তুলনায় এখন কত বেশী ঐশ্বর্যময় হয়েছে।......

নিমের শেষ চিঠিটি পাঠিয়ে দিচ্ছি, সুগভীর সুখে পূর্ণ; এই সুখ যে সে পেয়েছে তার জন্য আমার কোনো কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়।"

ম্যাকলাউডকে, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০০—

"আর্নেস্ট হয়ত তোমাকে লিখেছে যে, বুধবার সকালে নিমের সন্তান হয়েছে—মেয়ে।"

একই জনকে, ২২ মার্চ ১৯০১—

"নিম দীর্ঘ পীড়ায় ভুগছে, অন্ত্রে ক্ষত, ভয় পেয়েছিল হয়ত ক্যানসার। এখন সত্যই আগের চেয়ে ভাল—তাই লিখেছে। এধারে আমাদের খুকিটির বয়স ৬ মাস হয়ে গেল; সে নিজের চেয়ারে বসতে পর্যন্ত পারে।"

একই জনকে, মে ৩, ১৯০১—

"ইয়র্কশায়ারে গিয়েছিলুম, নিম ও তার শিশুকে কুটীরে, ভায়োলেট ও প্রিমরোজের মধ্যে—রাডিয়ার্ড কিপলিঙয়ের নিজের জায়গায় দেখলুম। শিশুটি সোনালি আলো, মাধুর্যের পুঞ্জ; নিম জানে, কেমন করে ভালবাসতে হয়, ভালবাসা পেতে হয়।"

একই জনকে, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৪—

"প্রিয় য়ুম, তুমি যে নিমের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাতে কতই না খুশী হয়েছি। তার গৃহজীবনের মাধুর্য, বিশ্বাস করি, তাকে অনুভব করিয়েছে যে, তার গৃহে তোমার জন্য যথেষ্ট স্থান রয়েছে, আর অভ্যর্থনা।"

একই জনকে, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৪—

"বিশ্বাস হয় যে, তুমি সোজা নিমের ওখানে গিয়েছ। ঐ দিন (খ্রীসমাস) তার কাছ থেকে মধুরতম এক চিঠি পেয়েছি। আমার নিশ্চিত ধারণা, তার ছোট্ট আশ্রয়টি শান্তিতে জড়ানো।"

এবারে বোনকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠি পর পর তুলে দিচ্ছি। ২৯ জানুয়ারী,১৯০৩-এর চিঠি—

"মিস্টি নিম, মনে মনে ঠিক করেছিলুম, এবার ছেলে হবে। কিন্তু মায়ের শরীর যেহেতু ভাল রয়েছে, অন্যথা হওয়াতে কিছু মনে করছি না।

তার (নবজাতকের) নামটি যে পাঁচটি মিঠে সিম্ফনির মধ্যে আছে, তাতে আনন্দ পেয়েছি।

৭ই জানুয়ারী তারিখে স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছে কয়েকবার। (সম্ভবতঃ ঐ দিন কন্যাটির জন্ম)।

ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে তোমার নববর্ষের চিঠি আর্নেস্টের চিঠি পাবার পরে পেয়েছি। সেটা চমৎকার।

আহা বাছা মার্গট-গোলাপমণি (নিমের প্রথম মেয়ে)—তার কথা ডাঃ বসু এখনো বলেন।

আশাকরি সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে, তার পিতাও।

প্রিয় বোনটি, আমার ফটোগ্রাফ যে তোমাকে চিন্তিত করেছে, তার জন্য দুঃখিত। এ ছবি পাঠিয়েছি, কারণ বেট-এর (পারিবারিক পরিচারিকা) ধারণা, ছবিটি অদ্ভুতভাবে মায়ের মত। সে যাই হোক, এখন আমি আবার বেশ মোটা-সোটা হয়ে উঠেছি।

তোমাকে মজা দেবার জন্য অন্য একটি জিনিস পাঠাচ্ছি—মিঃ স্টেডের দুটি চিঠি। তাঁর প্রথম চিঠি পড়ে আমি কি রকম আতকে উঠেছিলুম, বুঝতেই পারো। আমার সমস্ত কাজের দফা রফা হয়ে যেত। অবশ্য ব্যাপারটা গোপনীয়।

আমাদের বেচারা ছোট্ট মা-টি! কী ভয়ঙ্কর সময় গেছে তাঁর! সেজন্য কী দুঃখই পেয়েছি! ধরে নিচ্ছি, এর মধ্যে তার শেষ হয়েছে—কিন্তু তাঁকে কত না সহ্য করতে হয়েছে। আর্নেস্ট খুবই বিবেচক—সে মনে করে এসব কথা আমাকে জানিয়েছে।......

আবার চিঠি খুলে লিখছি : টাকা আমি সত্যই পেয়েছি। কিন্তু যখন টাকা আসে তখন আমি বাইরে ছিলাম, এবং কোনোভাবে প্রেরকের নাম হারিয়ে গিয়েছিল। তাই মাকে জানিয়েছিলাম।......মা বোধহয় তোমাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

পরের মঙ্গলবার সরস্বতী পুজা—আমাদের ভারতীয় মিনার্ভা দেবী, এবং ৫০টি দরিদ্র বিধবা ভরণপোষণের কিছু টাকা পাবে—তোমার টাকা তাতেই যাবে।

বিধবাদের পক্ষে ভিখারী হওয়া সম্ভব নয়, তাঁরা ক্ষয়িষ্ণু ভদ্রনারী, ঠিক সেই শ্রেণীর মানুষ, যাদের সাহায্য করা তোমার পছন্দ হবে।"

১১ অগস্ট, ১৯০৪-এর চিঠি—

"প্রাণের নিম, তোমার চিঠিটি মনোরম। এই ধরনের ব্যাপারগুলিই বইটিকে (দি ওয়েব) উপলব্ধ করায়, আমি যে শেষ পর্যন্ত এটিকে লিখতে পেরেছি, তার আনন্দ অনুভব করায়। স্টাইলের বিষয়ে—তুমি অন্য যে-কারো তুলনায় এই ব্যাপারটিতে আমার সাফল্যে বেশী আগ্রহী। তুমিই প্রথম বলেছিলে—আমার একটা স্টাইল আছে। সুতরাং তুমি যখন বলছ, স্টাইল অনেক উন্নতিলাভ করেছে, এবং সন্তোষজনক তা—এতে গভীর স্বস্তিবোধ করেছি, সেই সঙ্গে আনন্দও।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, বইটি এখানে সবাই বুঝেছে এবং সমর্থন করছে কি না? কী বলো! বোম্বায়ের এক মুসলমান ভদ্রলোক গত রবিবার এসেছিলেন আমাকে 'ধন্যবাদ' জানাতে—'আমাদের মায়েদের বিষয়ে আমরা যা অনুভব করি' তা এত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করার জন্য, এবং (ইতস্ততঃ করে, কিছু সলজ্জভাবে)—ভারতীয় পত্নী স্বামীর সম্বন্ধে কী অনুভব করে, তা বলার জন্য।

আমার বইয়ের আসল বিষয়, হিন্দু ও মুসলমানের মূলগত ঐক্য এবং উভয়ের ঐক্যবদ্ধ মহান ভবিষ্যৎ। সুতরাং (মুসলমান ভদ্রলোকের) উক্ত সমর্থন সম্বন্ধে তুমি কী বলবে বলো? তুমি অবশ্য বুঝবে যে, বইটি সম্বন্ধে আমার সর্বোচ্চ আশা—স্বামীজীর ভাবগুলিকে ভাষা দেওয়া. যে-সব কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন, সেগুলি বলা।

ইতিমধ্যে তুমি জেনে গেছ, আমি অসুখে পড়িনি।

হাঁ, হিমালয়ের ঝঞ্ঝা অপরূপ। কিন্তু গঙ্গার উপরে ঝড়ও আমার কাছে অন্ততঃ অনুরূপ মহান। মুহূর্তমধ্যে পৃথিবী আঁধার হয়ে যায় আর গর্জাতে থাকে ঝড়। এবং—গ্রীষ্ম দেশের বজ্রধ্বনি থেকে বৃষ্টি অপূর্বতর।......

ডাঃ বসু সর্বাধিক আগ্রহের সঙ্গে তোমার চিঠি শুনেছেন। বইটি সম্বন্ধে প্রতিটি শব্দ শুনতে চেয়েছেন, এবং মার্গট ও সিসিলী সম্বন্ধে প্রতিটি শব্দ। তিনি প্রায়ই বলেন, তাঁর সমস্ত স্নেহ ক্ষুদ্র মার্গটের উপর ঢেলে না দিয়ে তিনি খুবই ভুল করেছেন—সুযোগ যখন ছিল।

প্রিয় নিম, গৃহ-তরণী পথ করে শান্ত বারিতে প্রবেশ করছে শুনে কত না আনন্দবোধ করেছি! আর আমার আনন্দ—তোমার অঙ্গন উজ্জ্বল হয়ে আছে ফুলে ফুলে।

আমার আর্থিক অবস্থা নিয়ে তুমি কখনো ব্যস্ত হয়ো না যেন—তা কখনই দুঃখজনক নয়। মানুষ সামনের দিকে অল্পই দেখতে পায়, কিন্তু আলো সব সময়ই আসে—যখন আমরা কাজ করে এগিয়ে যাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুবই আমোদজনক। সহৃদয়তার সঙ্গে যে-সব আমন্ত্রণের চাপ আমাকে দেওয়া হয়েছে, যদি সেগুলিকে গ্রহণ করতাম, তাহলে তুমি শুনতে যে, আমি এখন মিশরে আছি, তারপরে ইতালীতে, পুনশ্চ আমেরিকায়। বাল্যে কত না চেয়েছি ইতালী ও মিশর দেখতে, আর তারপরে বেঁচে থেকে সেই দুই জায়গা দেখার আমন্ত্রণ চিন্তামাত্র না করে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছি!! সুতরাং মনে রেখো, সব সময়েই আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, ভারতেই আমি স্বচ্ছন্দে সুখে বাস করতে পারি—আহা, কত সুখে! আমার তো মনে হয়, যদি এক পেনিও না থাকে—সেই হল খাঁটি আদর্শ। আমরা টাকা চাই—কাজের জন্যই। এবং সে সম্বন্ধে ভাবতে চাই—দায়িত্ব আমাদের নয়, ঈশ্বরের।"

১ নভেম্বর, ১৯০৫-এর চিঠি—

"মিষ্টি নিম, তোমার কেকটি চমৎকার। যে-ই খেয়েছে সেই বলেছে, এমনটি কখনো খাইনি। আমাদের দার্জিলিঙয়ে থাকাকালে ওটি পৌঁছায়। সুতরাং আমাদের দুটি জন্মদিন ঘটে গেল। আমাদের দার্জিলিঙ ছাড়ার আগের রবিবার সেটি কাটা হল যখন বসুরা ও আমি সবাই একত্র আছি। যে-টিনে ওটি মোড়া ছিল, মিসেস বসু সেটি পর্যন্ত এনেছেন। আর্নেস্ট সহৃদয়, সে আমার জন্মদিনে লিখে পাঠিয়েছে। তোমরা সকলে মিঃ লালের (মিঃ পরমেশ্বরলাল) প্রতি কতই ভাল ব্যবহার করেছ!

মিঃ গোখলে ব্রাডফোর্ডে বক্তৃতা করছেন জেনে নিতান্ত আনন্দিত। তোমাকে কি জানিয়েছি, আমার অসুখের সময়ে তিনি এসে কিভাবে সারারাত্রি থাকার প্রার্থনা করেছিলেন এবং বারান্দায় বসে বরফ ভেঙেছিলেন। ও-কাজ করেছিলেন যখন তিনি দারুণ ব্যস্ত—মহান এক কাউন্সিল-বক্তৃতা প্রস্তুত করছিলেন—যা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কার্জনের মুখোমুখি। ক্রিস্টিনের তিনি সবিশেষ গুণগ্রাহী। তাঁর হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণাই নেই।

গ্রীষ্মকালে কিছু মালা পাঠিয়েছিলুম, পেয়েছ কি? এ-বিষয়ে কিছু শুনিনি।

জিনিসগুলি কিছু নয়, তবু সেগুলি যে খোয়া যায়নি তা জানতে পারলে খুশী হই।......সংবাদ পাচ্ছি, আমার ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি মাঝেমাঝে গণ্ডগোলে পড়ছে; ডাঃ বসু এই জন্যই তাকে আরও ভালবাসেন। তিনি বলেন, এর দ্বারা বোঝায় তার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য আছে। আমার প্রাণের ছোট্ট খুকি মার্গট—আজ তার একটি ফটোগ্রাফ নিয়ে দেখছি—কী চমৎকার! সিসিলীর কোনো ফটোগ্রাফ কি তোলা হয়নি? ভুলো না, তাকেও আমি ভালবাসি। দু'জোড়া কুশই......ডাঃ বসু ও আমার জন্য যা পাঠিয়েছে—খুবই স্বাগত।

মিঃ ডিগবির বই পড়ে আর্নেস্ট খুবই ভাল করেছে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় ধারণা ঐ বই থেকে পেয়ে যাবে। কিন্তু আরও খুশী হব যদি সে এমন বই পড়ে যাতে ভারতের মহিমা প্রকাশিত, যাতে লেখা আছে ভারত কি দিতে পারে। যেমন, স্বামীজীর বইগুলি, 'লাইট অব এশিয়া' (যা কার্যতঃ প্রাচীন ভারতীয় পুস্তক 'ললিত বিস্তরের' আক্ষরিক অনুবাদ), তিলকের 'ওরিয়ন', এবং 'দি আর্কটিক হোম ইন দি বেদজ', আমার অমর রচনাগুলি যা লেখা হয়েছে বা হবে ইত্যাদি। এই জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইংরেজের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে দৃঢ়তর ভূমি লাভ করতে পারব যখন আমরা 'ভারত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি করতে পারব।

আহা, কি বিরাট ছিলেন স্বামীজী, প্রিয় নিম! আমি কী আনন্দিত—তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তোমার স্বামীকে, তোমাদের যুগ্মরূপকে।

মিষ্টি ছোট্ট জননী, ঈশ্বর তোমাকে এবং তোমাদের সকলকে এখন ও চিরদিন নিরাপদে রাখুন। শুভরাত্রি।—তোমার ভালবাসার পেগী।"

১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৫-এর চিঠি—

"মিষ্টি নিম, আনন্দের ক্রীসমাস, সুখের নববর্ষ, তুমি ও তোমাদের জন্য। দীর্ঘদিন ধরে তোমাকে একেবারে ভারতীয় কিছু উপহার পাঠাতে চেয়েছি, অবশেষে তা পাঠাচ্ছি, একটি ব্রেসলেট, যা তুমি পরবে এমন ভাবার মত নির্বোধ অবশ্য নই। এটা তোমাকে নিছক শিল্পবস্তুরূপে উৎফুল্ল করবে, যা করেছে আমাকে। বাচ্চাদের জন্য কয়েকটি রত্ন-পাথর পাঠাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু যখন এটিকে দেখলাম সেগুলিকে যৎসামান্য মনে হল—এবং এটিকেই সংগ্রহ করলাম।

দামের কথা ভেবে অসুখী হয়োনা যেন। এত সুন্দর তবু মোটেই দামী নয়। একটা সংগ্রহশালা থেকে কিনেছি।

ভরসা করি তোমার কুটীরটিকে শীতকালীন আবাসরূপেও তুমি ভালবাসছ। তা নিশ্চয় খুব নির্জন বা আর্দ্র নয়। শিশুদের জন্য ছোট নকল রত্ন-পাথর যা কিনেছি, সেগুলি ভারতীয় বালিকারা কী পরে দেখাবার জন্য; আর আংটি কিনেছি ছোট বয়সে আমার গভীর আংটি-প্রীতি স্মরণ করে। যদি আমি এসব পেতাম শৈশবে—এই সামুদ্রিক শামুক আর মুক্তাজননীর (অর্থাৎ ঝিনুক) উপর বসানো জিনিস-গুলিকে—তাহলে নিজেকে তো মহারাণী বলে মনে করতাম।

তোমার চিঠি সব সময়েই মনোহারী। এক বছর আগে তুমি একটা অপূর্ব চিঠি লিখেছিলে। কয়েকদিন আগে রাত্রিতে সেটা পড়ছিলাম।

মিষ্টি বোনটি আমার, ঈশ্বর তোমাকে এবং তোমার প্রিয়দের রক্ষা করুন, তোমার আবাসটিকে পাখির নীড়ের মত করে তুলুন, যে-সব পাখিরা একদিন মহান মানব-ঐশ্বর্যে পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলবে।—ইতি, তোমার বড় ভালবাসার পেগী।"

১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সালে নিবেদিতার মায়ের মৃত্যু ও ভস্মাবশেষের সমাধি পর্যন্ত নিবেদিতা ও মে-র মধ্যে অনেকবার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা বেশ কিছুদিন একসঙ্গে কাটান। মায়ের মৃত্যুর মহাবেদনার লগ্নে দুই কাতর প্রাণ কোন অনুভূতির বন্ধনে ধরা পড়েছিল সে বিষয়ে 'নিবেদিতার চিঠিতে তাঁর মা' অংশে জানিয়ে এসেছি। নিবেদিতার অধ্যাত্ম সত্তার গভীর রূপের পরিচয়ও ঐ সব অংশে পেয়েছি।

প্রসঙ্গ শেষ করছি ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের পয়লা জুলাই তারিখে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি দিয়ে। চিঠিটি আসলে ভ্রমণস্মৃতি; ইউরোপের বিখ্যাত মন্ট ব্ল্যাঙ্ক ঘুরে এসেই লিখেছিলেন। সাক্ষাৎ দর্শনের তপ্ত স্পর্শ আছে দীর্ঘ চিঠিটিতে, সবটা উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। ঐ চিঠিতে নিবেদিতা মন্ট ব্ল্যাঙ্কের পার্শ্বস্থ বিশাল হিমবাহের দারুণ মহিমার কথা লিখেছিলেন, তার অবর্ণনীয় নির্জনতা, বিরাটত্ব, বৈদ্যুতিক বায়ুমণ্ডলের কথা। "যে আধঘণ্টা ধরে ঐ অংশ অতিক্রম করেছিলাম, আমরা তখন ছিলাম যেন মেরুপ্রদেশে। আমাদের চতুর্দিকে অত্যুচ্চ হিমতরঙ্গ, মহাসাগর যেন তুষারায়িত, এবং ব্যাদিত-মুখ গহ্বরসমূহ—একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ মানেই মৃত্যু।" এইসব কথা বলার পরে নিবেদিতা কাহিনীগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—"ত্রিরিশ চল্লিশ বছর ধরে মৃতদেহ চাপা আছে ওখানে, তবু তাজা, তরুণ— সমাধিস্থ করেছিল সমসাময়িক পলিতকেশ বৃদ্ধ মানুষেরা।"

এই চিঠির শেষকালে নিবেদিতা বোনকে প্রাণ ঢেলে কয়েকটি কথা লেখেন, বিদায়ের পূর্বেই তাঁর বিদায়বার্তা যেন, যদিও বলেছেন, এ আমার বিদায়বার্তা নয়—

"ভালবাসার বোনটি, তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি একেবারেই মনে হচ্ছে না। কোনো বিদায়বার্তা নয়—শুধু তোমার নিজস্ব মনঃশক্তির জন্য প্রার্থনা। আর—ধন্য হও, ধন্য হও, ধন্য হও নারীকুলমধ্যে—বিশ্বাসের সংরক্ষণের জন্য, কর্তব্য পালনের জন্য। যাদের কখনো এড়াতে পারবো না, এমন তিনটি স্নেহের পুত্তলীর জন্য আমার ভালবাসা রইল—ঐ আমার ধর্মকন্যা মার্গট, মিষ্টিমণি সিসিলী আর খুশী-হাসির ফ্রানসি। তাদের পিতাকে ভালবাসা দিও। তাকে আদরে যত্নে রেখো, যতখানি পারো বিশ্রাম দিও। আর তুমি—তোমাকে ভালবাসা ভালবাসা ভালবাসা।"

ভাই

ভাই রিচমণ্ড নোবলের বেশ কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে আমরা দিয়ে এসেছি। ভাইটির সম্বন্ধে নিবেদিতার ভালবাসা ও আশার শেষ ছিল না। রিচমণ্ড একে বাড়ির ছোট ছেলে, তদুপরি বড়দির অনুগত, তদুপরি 'পুরুষালি পুরুষ'— নানা

অবিবেচনায় কাজে দিদিকে ব্যস্ত করলেও তাকে নিয়ে সস্নেহ-গর্ব ছিল দিদির। নিবেদিতার চিঠি থেকে তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরছি।

২৯.৯.১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মিসেস বুলকে লেখা এক চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন—

"স্বেচ্ছাসেবকবৃত্তি রিচকে অনেক কিছু দিয়েছে। আর্দ্র আবহাওয়ার মধ্যে সে তাঁবু ফেলেছিল, নিজের কাজ নিজে করেছে, চমৎকারভাবে খাড়া ছিল এবং পক্ষকালের নোটিশে যে-কোনো জায়গায় যেতে তৈরী।"

৪.৪.১৯০১ তারিখে ম্যাকলাউডকে—

"রিচ এখন এখানে। আমার প্রতি ব্যবহার সুন্দর। খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে তিন মাস পেলাম। তাতে বড় আনন্দ পেয়েছি। দশাসই চেহারা, চড়া গলা, মাঝে মাঝে জ্বালায়—কিন্তু অনেক দিক থেকে গ্র্যান্ড। কলকাতার ব্রাদারহুডে যোগ দেবে বলেছে। তার মানে মনে হয় মাকে যখন দেখতে হবে না তখন অক্সফোর্ড মিশনে যোগ দেবে।

ছুটির দিনের ব্যায়ামরূপে সকাল-সন্ধ্যায় বাইসাইকেল চড়ছি। দারুণ উপভোগ করছি। এমনকি সেন্ট সারাও শিখতে শুরু করছেন—রিচকে শিক্ষক করে।"

একই জনকে—৯.১১.১৯০১—

"এমনকি রিচ ও মা পর্যন্ত আর কখনো পাশ্চাত্যে না ফিরতে বলছেন।... আর একটি কথা বলার আছে, তা আর কিছু নয়—রিচের জন্য তুমি যা করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ।"

একই জনকে—২৩.৪.১৯০৩—

"রিচের বিষয়ে তোমাকে ব্যস্ত করা উচিত হবে না, কারণ মায়ের কিছু বন্ধু তাকে জামাইকার পথে অতিথি হিসেবে নিয়ে যেতে চাপাচাপি করছেন, যদিও মা বলছেন—রিচকে সাহায্য করার বদলে কাজ দেওয়া হোক। ইতিমধ্যে মনে হয় তুমি ব্যাপারটা জেনে গেছ যে, অসুবিধা ভালভাবেই দূর হয়েছে।...আমার বিশ্বাস, এখনো সে কিছু করবে—ভারতের জন্য যদি না হয়, অন্ততঃ মানবতার জন্য। আমি একান্তই চাই—স্বামীজী যেভাবে তাঁকে নেবেন বলেছিলেন, সেভাবে সত্যই তাকে নিয়েছেন।"

একই জনকে—৭.৫.১৯০৩—

"রিচের প্রতি তোমাদের—তুমি, লেডী বেটী (মিসেস লেগেট), মঃ নোবেল—ব্যগ্র সহানুভূতি ও সহৃদয়তার জন্য কী বলব জানি না। গভীর গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ...মা জানিয়েছেন, রিচের নাকি একদিকে পক্ষাঘাত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মস্তিষ্কের কাজের জন্য এ জিনিস হতে পারে—কদাপি আমার জানা ছিল না। কিন্তু ডাঃ বসু বলেন, ফুটবলের জন্যই ঐ কাণ্ড—সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রোপচারের ফলে যার সম্ভাবনা প্রকটিত। ডাঃ বসু বলেছেন, ব্যাপারটা গোপনীয়। তোমাকে বলছি এই জন্য যে, যদি রিচের সঙ্গে দেখা হয়, শারীরিক কসরতের ব্যাপারে তার উৎসাহ কমাবে। কিন্তু সে পুরুষ। পুরুষোচিত ব্যাপারে তার শক্তি সে দেখিয়েছে—হাঁ।"

একই জনকে—২০.৫.১৯০৩—

"রিচের জন্য তোমার সর্বপ্রকার স্নেহের জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের পরিবারের নারীস্বভাবের পরম ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। স্বয়ং তুমি,

লেডী বেটী এবং অ্যালবার্টা—প্রেরণা ও কর্মনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সত্যকার সুযোগ প্রথম সে পেল। তার মধ্যে যে বিরাট আত্মবিশ্বাস তুমি জাগিয়েছ, তা এতই সুপবিত্র যে তার পক্ষে তার উল্লেখ করাও সম্ভব নয়—একথা আমি জানি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

একই জনকে—১৮.৮.১৯০৩—

"রিচ যে উত্তরাঞ্চলে ট্রেন ভ্রমণের সময়ে তোমার সঙ্গে গিয়েছিল, তাতে আমি বড় খুশী। বেড়ানোর ক্লান্তি অনেক কমে যায় যদি তরুণ একটি বীরযোদ্ধা সঙ্গে থাকে—আর আমাদের রিচ তো এসব ব্যাপারে সদাই প্রস্তুত পরমানন্দে।...

আমরা সবাই যেন তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি, তাই নয় কি? তুমি একে একে আমাদের সকলকে 'দত্তক' নিয়েছ। তোমার সঙ্গে রিচমন্ডের এই যাত্রাকে স্বামীজীর তাকে ডাক দেওয়ার ইঙ্গিত বলেই মনে করি। তুমি জানো, স্বামীজী তাকে ডাক দেবেন বলেছিলেন। কেবল ভেবেছিলেন, মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ। অথচ আমার প্রিয় ছোট্ট মা-টি কখনই অভিযোগ করতেন না, আমি জানি।

রিচ সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ—তাকে বিরাট হতে হবে স্বপ্নে ও কর্মে—বিশ্বাস করি তা সত্য হবে। তার সম্বন্ধে আমার বদ্ধমূল ধারণার কথা তুমি জানোই। সব সময়েই আমি বিশ্বাস করেছি, একদিন সে স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণীকে বহন করবে। ডাঃ বসু এখন মনে করেন, যদি সে কঠোর পরিশ্রম করে এবং যদি তার স্বাস্থ্য ভেঙে না পড়ে—সে অত্যুচ্চ স্থানে উঠতে পারবে। ডাঃ বসু বলেন, চমৎকার-ভাবে সে শুরু করেছে; সেইভাবে যদি এগিয়ে যেতে পারে, রাজনৈতিক সম্মান নিশ্চিত তার জীবনে আসবে, কিন্তু এখনি তার কিছু গ্রহণ করা উচিত হবে না, গোড়ার দিকে শুধু সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

নিজের মধ্যে আমি দর্শন, ভক্তি ও অনুভূতির বিরাট শক্তি অনুভব করছি, দেখছি যে, এমন শক্তি বিরল। পুরুষের বুদ্ধিতে যেন নৈতিক পক্ষাঘাত এসে গেছে। তাদের মধ্যে যারা ভাল, তারা নিস্তেজ, লক্ষ্যহারা—যখন ফেটে পড়া তাদের দরকার—নব ধর্মযুদ্ধের আহবান এলে যা করে পুরুষ। আর, যারা মন্দ, তারা তাতেই ডুবে আছে।

যদি রিচ এই সমস্ত জিনিস বুঝতে শুরু করে, সেইসঙ্গে পায় ভালবাসার শক্তি ও পুরনো স্বাস্থ্য, অফুরন্ত প্রাণশক্তি—তাহলে তাকে তোমার নিশ্চয় মনে হবে—বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে অধীর-অস্থির তেজী তরুণ রণতুরঙ্গ। নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা তার নেই, তাই চিঠিপত্রে বেশী কিছু লেখে না।"

নিজেকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা রিচমন্ডের সত্যই বেশী ছিল না। সে চেষ্টা যখন করতেন, অনেক সময়ে অবাঞ্ছিত ফল হত। ১০.১০.১৯০৪ তারিখে রিচমন্ড, নিবেদিতাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যার উদ্দেশ্য খুবই মহৎ—দিদির বিপদে বীরপুরুষ ভাইয়ের তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসা—কিন্তু দিদি ভাইয়ের এতখানি উৎসাহকে ভাল চোখে দেখেন নি।

ভাইয়ের চিঠিটি আগে উদ্ধৃত করি—লিঙ্কন কলেজ থেকে লেখা—

"অতিবড় ভালবাসার মার্গট, বারে বারে ফিরে আসুক এই সুখের দিনটি। এই বছর তোমাকে অভিনন্দন জানানোর মস্ত কারণ ঘটেছে। প্রথমতঃ তুমি এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করেছ (দি ওয়েব বই), যা ভারতে তোমার কাজের স্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ। দ্বিতীয়তঃ তোমার বই ভালই চলেছে। যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের কাছে এই দুটি জিনিস অতীব তৃপ্তিকর। চিরদিন তুমি কাজ চালিয়ে যেতে পার, এই আমার হৃদয়ের একান্ত অভিপ্রায়। কিন্তু এরও বেশী কিছু তোমাকে বলতে চাই—তোমার চাই পিছনে দাঁড়াতে পারে এমন একটি মানুষ। আমি চাই, তুমি বোঝো যে—আমি সেই মানুষ। তোমার পাশে আমি আছি। ভারতে যদি তোমার উপর উৎপীড়ন হয়, তাহলে অগ্রণী আইরিশ নেতাদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে আমার এতই প্রভাব আছে যাতে তোমাকে যারা অভিযুক্ত করতে চায়, তাদের কাছে ব্যাপারটা নিতান্ত অসুবিধা-জনক করে তুলতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, যে-ব্যক্তি তোমাকে পীড়িত করতে চায়, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক—ব্যক্তিগত শত্রুতার। আইরিশ রীতি তুমি জানো—আমার কথার অর্থ তুমি বুঝবে। ব্যাপারটা চরম শোনাচ্ছে, তবু তোমাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, যথাসম্ভব রক্ষণাবেক্ষণ তোমার দরকার। তোমার সাহস যেন হারায় না—এগিয়ে যাও।

তোমার বন্ধু লালের (পরমেশ্বরলাল) সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে খুব ভাল লেগেছে। কিছু কিছু ভারতীয়, যাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মধ্যে সে সর্বাত্মক ভদ্রলোক ; ভালো বংশের গুণাবলী তার আছে। মানুষের নেতা হবার যোগ্যতা তার আছে ; তাই দুঃখ লাগে যখন দেখি জাতীয়তার ভিত্তিতে কাঠামো গড়ে তোলার পরিবর্তে রাজনীতিতে তার বিশ্বাস। আয়ারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পদ্ধতির ব্যর্থতা আমি দেখেছি। যদি গভীরতর কোনো জিনিসের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, রাজনৈতিক আন্দোলন শূন্য বস্তু, একথা জানি আমি। এদেশে যখন ফিরবে, আইরিশ প্রশ্নের ক্ষেত্রে কতখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে দেখে অবাক হয়ে যাবে। অতি প্রিয় দিদি আমার, যে-কাজ তুমি নিয়েছ, যা আমাদের সকলের হৃদয়মধ্যে স্থান নিয়ে আছে, সে বিষয়ে তোমার সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করে পত্র শেষ করছি।—সর্বোত্তম ভালবাসাসহ, তোমার চিরদিনের প্রিয় ভাই, রিচ।"

দিদির শুভাশুভের জন্য এতখানি উদ্বেগ এবং সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে মহাবীরত্বের ভূমিকার প্রতিশ্রুতি দিদির মোটেই ভাল লাগেনি। ভাইয়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দিদি ইতিমধ্যেই কোন্ ভূমিকা নিয়ে নিয়েছেন। চড়া মেজাজের ভাই সম্বন্ধে দিদির মনে চিন্তাও ছিল যথেষ্ট। ৬ নভেম্বর ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা এ বিষয়ে লিখলেন—

"রিচের কাছ থেকে জন্মদিনের যে চিঠি পেয়েছি, তা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাবছি, এটা তোমার কানে বেসুরো ঠেকবে কি না, আমার কানে যেমন ঠেকেছে—শারীরিক শক্তি প্রয়োগের ঐ ইঙ্গিত। রিচ যেন স্থূল আর অশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই শীতে যদি লণ্ডনে যাও, তাহলে তাকে হেসে থামিয়ে দিও। তার ওসব কথা মিষ্টি ঠেকবে এমন খোকা সে নয়।"

ম্যাকলাউড রিচের পক্ষ সমর্থন করে নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। রিচমণ্ড সম্বন্ধে নিবেদিতার দুশ্চিন্তার কিছু কারণ কিছুদিন থেকে ঘটছিল। রিচের রাজনীতিই নয় তা—তা তাঁর ব্যক্তিজীবন—প্রণয়সংক্রান্ত ব্যাপার। যে-ভাইকে নিবেদিতা অত ভালবাসেন, তার প্রণয় বা বিবাহ বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন না। এক্ষেত্রে উদ্বেগের বিশেষ কারণ—রিচ জীবনে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই সংসারে জড়িয়ে পড়তে চাইছে—এবং এমন একজনের সঙ্গে যে অতীব ধনী। দরিদ্র অথচ আত্মাভিমানী আইরিশ পরিবারের যে-রক্ত ছিল নিবেদিতার মধ্যে, মর্যাদানাশের কল্পনায় তা তপ্ত হয়ে উঠেছিল অবিলম্বে। অথচ প্রেম—সীমাকে লঙ্ঘন করে—জানতেন। সেই মথিত মনের ছবি—শঙ্কা, স্নেহ ও গর্ব চমৎকার ফুটেছে একটি চিঠিতে, ম্যাকলাউডকে লেখা, ১১.৬.১৯০৩—

"মহিলাটি সম্বন্ধে তুমি কী জানো তা কি আমাকে লিখবে? আমি খুবই উদ্বিগ্ন। তার বয়স কত? তার পরিবারের লোকজনের কাছে এনগেজমেন্ট ব্যাপারটা কি গোপন রাখা হয়েছে? এবং আমাদের পরিবারের কাছেও?...রিচ নিজের সামাজিক অবস্থা, তারও বেশী, নিজের আর্থিক অবস্থার বহু উঁচুতে অবস্থিত কারো কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে—এটা আমার কাছে ক্ষমার অযোগ্য কাজ। আশা ও বিশ্বাস করি—করতে চাই—মেয়েটির নিজের অন্ততঃ কোনো টাকা নেই। যদি থাকে, সমস্ত ব্যাপারটা জঘন্য।

রিচের উপর তোমার যে বিরাট প্রভাব আছে, বিশ্বাস করি, তা প্রয়োগ করে তুমি অন্ততঃ তাকে বোঝাবে—তার পক্ষে অদ্ভুত ভাল একটি ডিগ্রী নেওয়া মেয়েটির জীবনের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয়। যদি রিচ তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে নির্বাচন করা মেয়েটির পক্ষে বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে; আমাদের কাছেও তাই।

অন্য দিকে বলতে পারি, আমি এই দেখে পরম আনন্দিত যে, রিচ বন্দনাযোগ্য একটি নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছে।"

রিচমণ্ডের এই প্রণয়-ব্যাপারটি তাঁর দিদির পক্ষে দীর্ঘ দিনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। মিস ম্যাকলাউডকে তিনি মেয়েটির বিষয়ে বার বার প্রশ্ন করেছেন—"সে কে? বাস করে কোথায়? কোথায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ? তার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? সে আমাকে প্রায়ই চমৎকার সব চিঠি লেখে, অথচ আমি এত অন্ধকারে আছি—"। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪-এর চিঠিতে রিচমণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা, যাকে কেন্দ্র করে দিদির বহু স্বপ্ন ছিল—"আমি বিশেষ চাই, ইংলণ্ডে গেলে তুমি (ম্যাকলাউড) রিচের কথা মনে রাখবে। ধনী বন্ধু, সহপাঠী ও অন্যান্যদের মধ্যে দরিদ্র ছাত্রের অবস্থা কী না শোচনীয় দাঁড়ায়, এবং সেই অবস্থার মধ্য থেকে পৌরুষের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে তার পক্ষে কি বিপুল পরিমাণ সতেজ সরলতা ও নৈতিক সাহসের দরকার হয়। এক এক সময় আমার এত ভয় হয়, পাছে রিচ তার সুন্দর সত্যপ্রিয়তা হারিয়ে কপটতা ও চালিয়াতির মধ্যে ডুবে যায়। বিশেষতঃ মায়ের ব্যাপারে তাকে ঠিক রেখো।"

এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উপস্থাপনের কারণ, এর দ্বারা নিবেদিতার ব্যক্তি-জীবনের একটি অনালোকিত অংশের উপর আলোকপাত হয়েছে। নিজ পরিবারের সঙ্গে মনের যোগ তাঁর বজায় ছিল সর্বসময়, কিন্তু অপরপক্ষে সব কিছুর মধ্যেই

একটা নির্লিপ্ততা বজায় ছিল, এবং তিনি যে-কোনো জিনিসকেই আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে দেখতেন। মায়ের সঙ্গে রিচের সংঘর্ষের সম্পর্ক নিয়ে তিনি অস্বস্তিতে ছিলেন, এবং রিচের কোনো আচরণে মা যাতে আঘাত না পান সে বিষয়ে বিশেষ সন্ত্রস্ত ছিলেন। নিবেদিতা জানতেন, দীর্ঘ জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মার মন স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে, রিচের নবলব্ধ সম্পদশালী বন্ধুদের সম্পর্কে তিনি সন্দিহান হবেনই। সেজন্য যখন তিনি শুনলেন, রিচের সঙ্গে মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে, তখন রিচেরই দোষ দেখেছিলেন। পরে যখন মিস ম্যাকলাউড জানালেন, এক্ষেত্রে রিচের দোষ নেই, তখন মায়ের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা-করুণা সত্ত্বেও 'রিচকে অবিভক্ত সমর্থন জানানোর' আনন্দ বোধ করলেন। রিচের উপর তাঁর বড় ভরসা বলে তার আচরণের সামান্যতম ত্রুটিতে তিনি অতিরিক্ত বিচলিত হতেন, যে-'রিচের ভবিষ্যতের মত সুপবিত্র কোনো ব্যাপারে সুন্দরতম কিছু ভিন্ন আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।'

রিচ তাঁর দিদির মন কতখানি অধিকার করেছিলেন, নিম্নের চিঠিতে তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১২.৯.১৯০৪-এ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি—

"যদি তুমি ইউরোপে যাও এবং লণ্ডনে এক সপ্তাহের জন্য কাটাও, তোমাকে তাহলে একটি কাজ করতে বলব, যার জন্য অসীম বিচক্ষণতা ও হৃদয়মাধুর্য প্রয়োজন।

আমি চাই, মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে রিচ বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াক, এবং বিয়েট্রিসকে মায়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিক।

তুমি মাঝে মাঝে আমার সম্বন্ধে অত্যুক্তি করে থাকো। এই ক্ষেত্রটিতে তুমি প্রমাণ করো যে, আমার অন্তর্দৃষ্টিতে তোমার কিছু বিশ্বাস আছে। কিছুদিন ধরে আমার মনে ব্যাপারটা ঘুরছে, সেইসঙ্গে তোমার ইউরোপ যাওয়ার সম্ভাবনা এবং ছোটখাট জিনিস, যাদের বলে বোঝানো যাবে না অথচ চিঠিপত্রে যাদের আভাস পাই—এইসব জমে উঠে আমাকে খুলে বলতে প্ররোচিত করছে।

প্রিয় য়ুম, বিশ্বাস করো, জীবনের এই সংকটক্ষণে সামান্য ভ্রান্ত লজ্জা বা ক্ষুদ্রতা রিচমণ্ডের গোটা চরিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করবে, সত্য ও মহিমার উৎসকেই একেবারে বিষাক্ত করে তুলবে।

রিচের বিচিত্র অবস্থা-সংকটের কথা ভেবে দেখো,—তার মত দরিদ্র এক ছোকরা সহসা তার থেকে পঞ্চাশ গুণ অবস্থাপন্ন লোকদের সমাজে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বন্ধুদের সহৃদয়তায় এবং নিজের বুদ্ধিযোগে। জীবনের এই পরীক্ষা থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে সে মাত্র একটি উপায়েই পারে—যদি সে পারিপার্শ্বিকের বিষয়ে খেয়াল না করে, যদি সে অন্যত্র যে সতেজ সরলতা ও সহজতা দেখিয়েছে, এখানেও তাই দেখায়। আমার ধারণা, তুমি ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলতে পারো যদি মায়ের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাও এবং সেই সময়ে বিয়েট্রিসকে আনিয়ে নাও। কিছু বিবেচনা-শক্তি অনেকখানি ভুল নষ্ট করতে পারে, যে ভুল পথ হয়ত অসচেতনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো এক সময়ে বিয়েট্রিস যেন ছোটখাট ব্যাপারকে মানিয়ে নেবার সুযোগ পায়, সেটাই উচিত, যে-জিনিসগুলি রিচ হয়ত চাইবে সে না দেখে।

এনগেজমেন্টের ব্যাপারটা মা এখন জেনে গেছেন, সুতরাং সহজভাবেই তিনি মেয়েটিকে বুঝে নিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, তুমি মায়ের ছোট্ট নীড়টিকে পছন্দ



নিবেদিতার একটি অপ্রকাশিত চিত্র—১৮৯৯।



স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভনে মিস ম্যাকলাউডের বাসভবনে('হলস্-ক্রফট') তোলা ছবি—১৯৩৭। দাঁড়িয়ে, মিস ম্যাকলাউড ; বসে, নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন।

করো, তা মিষ্টি, অনাড়ম্বর হওয়া সত্ত্বেও নারীমর্যাদাপূর্ণ। আমার স্থির ধারণা, কোনোভাবেই তা হীন বা অমার্জিত নয়। মনে হয়, বিয়েট্রিসের যোগ্য ভূমিকা হবে, এই গৃহ-পরিবেশ থেকে সর্বোত্তম আদায় করে নেওয়া, যা তুমি বা আমি করি, এবং রিচকে এ সম্বন্ধে সঠিক মনোভাবে স্থাপিত করা। অন্ততঃ বিয়েট্রিসের এই সুযোগ পাওয়া উচিত। আর, তোমার সামাজিক মর্যাদা ও ঐশ্বর্য এক্ষেত্রে স্বাধিকারে কথা বলতে তোমাকে সামর্থ্য দেবে।...যে পরিবেশে তুমি তুষ্ট ও গর্বিত হতে পারো, তার বিষয়ে এ পৃথিবীতে কে আছে যে অভিযোগ করতে পারে?

ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর অস্বস্তির কথা মনে পড়ে।* কেবল তিনি জানতেন না, পুরুষকে যা প্রতিহত করে, মেয়েরা কত সহজে তা মানিয়ে নিতে পারে।

সুন্দরতম বিয়ে হল তাই যেখানে নারী পুরুষের সমস্ত জীবনটি হৃদয়ে গ্রহণ করে। আমি কখনো সহ্য করতে পারবো না—মা, নিম বা আর্নেস্ট, রিচের বাড়িতে স্বাগত নয়। অতি জঘন্য হবে তা, এত স্থূল, হঠাৎ-নবাবী ভাব, যা রিচের যোগ্য হবে না, মেয়েটির পক্ষেও নয়, তাকে যেভাবে আমি কল্পনা করে এসেছি, তদনুযায়ী। কিন্তু যদি উল্টো কথাটাই সত্য হয়, সে যেন তোমাকে মধ্যবর্তী ও ব্যাখ্যাকাররূপে পেয়ে এখনি নিজস্ব ভাবে সম্পর্ক গড়ে নেবার সুযোগ পায়। বিয়ে হয়ে যাবার পরে শুধু মুখচেনা পরিচয়ের বাইরে আর কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

চোখের সামনে ছবিটা আঁকছি: এক বিকালে তুমি আর মা রয়েছ, মা যাতে একটু ভাল দেখায় তা করিয়ে নিয়েছ, এবং চায়ের সঙ্গে কিছু ভাল আয়োজন—রিচ এমন সময়ে বিয়েট্রিসের সঙ্গে এসে হাজির মাকে চমক দেবার জন্য। ব্যাপারটা এই ধরনের হলেই ভাল দাঁড়াবে, যে-সময়ে আমার ছোট্ট মা-টি নিজের স্বাভাবিক সুমিষ্ট ভালবাসার মেজাজে থাকবেন; তাঁর গভীরতর দোষগুলি রিচমন্ডের স্ত্রীর কাছে কখনই আত্মপ্রকাশ করবে না, কারণ তিনি বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে গিয়ে এত দিনে কিভাবে অপরকে স্বাধীনতা দিতে হয় শিখেছেন।

প্রিয় য়ুম, আমি যেভাবে ব্যাপারটিকে দেখে থাকি, তুমিও সেইভাবে দেখবে বলে বিশ্বাস করি; এক্ষেত্রে সক্রিয় হওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে। রিচের এই ব্যাপারটি খুব পাতলা বরফের আবরণের উপরে স্কেট করার মত; তা যে তুমি করছো তা যেন দেখবে না বা দেখাবেও না, যাতে হীনতাবোধের পরিবর্তে রিচের আত্মগৌরববোধ ক্রমেই বেড়ে যায়। একাজ তুমি যদি না পারো, অন্য কেউ পারবে না, এবং না পারলে ছেড়ে দিও। সেক্ষেত্রে আমাকেও অনেক কিছু ছাড়তে হবে, যা তোমাকে বলে উঠতে পারব না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, বিয়েট্রিস নিজে অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করুক; এক্ষেত্রে তুমি বা আমি যা করতাম, সে তাই করুক। সম্ভবতঃ সে খুবই অল্পবয়সী, তবু আমি যদি সে হতুম তাহলে মায়ের কাছে নিয়ে

---

* স্বামীজীর দেশাভিমান বিদেশীর অবজ্ঞা সহ্য করতে পারত না। তিনি সব সময় নিজের বিদেশী অনুরাগীদের সাবধান করে দিতেন—ভারতের আর একটিও নিন্দা সইতে তিনি প্রস্তুত নন। নিবেদিতা বা ম্যাকলাউডকে তিনি পরিস্কার জানিয়েছিলেন, যদি তারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অধঃপতন সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে, তবেই যেন ভারতে আসে। ঐ বিষয়েই নিবেদিতা ইঙ্গিত করেছেন।

যাবার জন্য জোর করতুম, তারপরে মা ও তাঁর পারিপার্শ্বিক, তাঁর আকার ও তাঁর দারিদ্র্য সব কিছুকে গৌরবে ভরিয়ে তুলতুম, যাতে রিচ অনুভব করত, ভালবাসা সোনালী স্বপ্নের মত, অথচ দৃঢ় ও স্থায়ী—যেমন জীবন হয়ে থাকে তেমনই।

কিন্তু আমরা গর্বিত জাতি। আর বেচারা ছেলেটি পুরুষসুলভ বেহিসেবীর দোষে ভুগছে; সেইসঙ্গে আছে তার নিজস্ব গর্ব।

দারিদ্র্য জন্ত জিনিস, তার গর্ব যেন সে অনুভব করে।"

প্রসঙ্গশেষে মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির (৫.১২.১৯০৬) উল্লেখ করতে পারি, যাতে রিচের চাকরির সুরাহা হওয়ায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করে নিবেদিত লিখেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—তাঁরা রিচকে সব সময়ে নিজেদের আশ্রয়ে রেখেছেন—আমি জানি, জানি তা।"

22 Norfolk Sq.
Hyde Park. London W 2.
Aug 10th 37

Dear Monsieur Herbert,

Enclosed please find a transcript of the Swami's letter to my daughter Cicely Wilson. I believe she wrote to you giving you his name. I also sent a copy to Tantine so that there should be no cross purposes. Excuse the manner of the copy, but letters are so soon too bulky.

I sent your letter on to my daughter, because in it you spoke of the eventual translation into English; to ask her if she would be willing to undertake that should you be willing. You see she has lived in France for short periods, & so would have enough command of French to understand that an idiom needs careful rendering & her own literary knowledge & polish are considerable. And I think we should all be very gratified if you were able to approve of such a scheme. She wrote that she would love to do it if & when you wished it, but that she felt she was hardly the one to propose it.

Thank you so much for helping me about Pallisher's. I found a second-hand copy of The Web — original edition — in excellent condition & a new Indian edition of "The Master" — very well printed & very clear for reading — in Luzacs. They informed me that the latter was in good demand. I am so glad I shall have the pleasure of seeing you. I am asking Mlle Reymond if I can come a little sooner?

নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসনের চিঠি—জিন হারবার্টকে ১০. ৮. ৩৭ তারিখে লেখা। রেম'-হারবার্ট নিবেদিতার জীবনী রচনার পূর্বে মিসেস উইলসনের সঙ্গে কি ধরনের যোগাযোগ রেখেছিলেন, তার কিছু নমুনা এই চিঠি থেকে পাঠক পাবেন। সেই সঙ্গে নিবেদিতার বোনের হস্তাক্ষরের নমুনাও; তাই রিচমণ্ডের একটি চিঠির প্রতিলিপিও আমরা দিয়েছি। পত্রমধ্যে নিবেদিতা সম্বন্ধে ডঃ বসুর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধানিবেদন লক্ষণীয়।

for I find as many final engagements pushed into October.

I am very thrilled to seeing how well you understand this business of building a biography not only on facts but also on atmosphere. That is where I feel an Oriental mind could not catch the elusiveness of an Occidental idealist! However you know so much more than I, but and mine may only be an inhibition.

I had such nice answers from the Boses – I love them for Nivedita's sake as well as their own.

Sir Jagadis Bose says "We shall, of course, be pleased to meet Monsieur Jean Herbert and Mlle Raymond, when they come to Calcutta. The only thing I could tell them is however in regard to Nivedita's help throughout my uphill scientific work against tremendous odds till it received full recognition. No one who knows the real state of things will realise how much the cause of Indian Nationality owes to Nivedita's selfless devotion & long suffering" (But here again is atmosphere!)

Have you been in communication with her brother Richmond Noble who is living in Jamaica? If not we must do something about it because he can also add to the store of knowledge. He was 10 yrs younger

With kind regards. Sincerely yours

Mary L Wilson

নিবেদিতার ভাই রিচমণ্ড নোবলের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় ক্রীশ্চান মিশনারী প্রভৃতিরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে কি ধরনের প্রচারকার্য চালাত।

21A High St.,
Wimbledon
S.W.
Aug. 1st/02

Sir,

In reference to an article which appeared yesterday in the 'Leader' and which is exaggerated in 'Star' on Vivekananda, I would beg to suggest that your have been mightily abused. I know how careful you usually are in regard to articles published *under your editorship, I am therefore the* more surprised that an *unsigned* article written by an enemy—for Swami had many bitter enemies, some missionaries, some Anglo-Indians on account of Swami's denunciations of them, and others—should have been allowed in. Men like Lord Reay, Archdeacon Wilberforce, and Mr. Macniel (St. James Gazette) knew and reverenced Swami. The late Mr. Haweis was one of his most intimate friends. Though I am soon to be ordained in the Orders of the Church of England, yet having come into contact with Swami I have learnt, while still retaining my Christian Faith, to appreciate so good a man.

You know that even here men of great intellect (e.g. the late Mr. Galdstone) have many bitter enemies who leave no stone unturned to blacken their characters, a fortune (?) when a man is dead and that in a distant land how much easier it is to attack him and how hard to defend him. Your paper is *different to the others, and had it appeared in the 'Globe'* or 'Mail' I would have passed it, but yours has been so scrupulously just and interested in the welfare of India that I cannot rest till it is set right.

Yours faithfully,
R. S. W. Noble

[বিষয়বস্তুর প্রতিলিপি পরের পৃষ্ঠায়]

Toronto / The Editor of the Morn. Leader
21A High St., Lond
Wimbledon
S.W.
Aug 1st/02

Sir,
In reference to an article which appeared yesterday in the 'Leader' which is exaggerated in 'Star' on Vivekananda, I would beg to suggest that you have been mightily abused. I know how careful you usually are in regard to articles published under your editorship. I am therefore the more surprised" that an unsigned article written by an enemy. for Swami had many bitter enemies some missionaries, some Anglo-Indians on account of Swami's denunciations of them, and others — should have been allowed in. Men like Lord Reay, Archdeacon Wilberforce, Mr. MacNeil (St. James' Gazette) knew and reverenced Swami. The late Mr. Haweis was one of his most intimate friends. ~~My~~ sister Though I am not sure to be ordained

in the Orders of the Church of England; yet having come into contact with Swami I have learnt, while still retaining my Christian Faith, to appreciate so good a man.

You know that great men of great intellect (e.g. the late Mr. Gladstone) have many bitter enemies who leave no stone unturned to blacken their characters, particularly when a man is dead & that in a distant land how much easier it is to attack him and how hard to defend him. Your paper is different to the others, & had it appeared in the 'Globe' or 'Mail' I would have passed it, but yours has been so scrupulously just & interested in the welfare of India, that I cannot rest till it is set right.

Yours faithfully,
R. S. Wrottesley

6

THE CHRIST CHILD.

It is Christmas time, and at this season, when the very air seems laden with carols, when homes for the most part are at their happiest, and when the children are glad with the universal gladness of the time, there comes a special call upon us to go back in thought to that first Christmas-tide, so long ago, whence proceed the joy and blessedness.

Christmas—the Christ time—is a widespread festival. Throughout Europe, from north to south and east to west, it rings a merry peal to loving thought and kindly household cares; and children, as it comes, lie awake at night to think about Santa Claus, and to cast up their private accounts with conscience, or fall asleep may be, to dream of Christmas fairies, and the wonderful star of old; while even the grown people find themselves wondering why the words, "In Bethlehem of Judæa, in the days of Herod the King," have power to raise such a world of vague emotions in their minds. It has long been so. Christmas has grown with our growth, and strengthened with our strength. Long ago, in these northern lands, we had the Yule-tide, with its religious mysteries, and its greater or less excess. But there crept a new joy into the lives of men, and in its honor they did re-name the great feast of the year's home-season—for what reason better than that a little child had come into the world?

A little child! Say rather a mighty soul, that has stood at the helm, and handled the rudder of human nature through all the ages since—a little child "Bethlehem of Judæa in the days of Herod the King." The words linger on our lips, and slowly we go backwards to the picture. It is very still and silent, midnight, and the eternal stars shine down on Bethlehem as they do on Athens and on Rome. Which of them, glittering points in the revolving chariot-wheel of God, knows or recks that Bethlehem to-night has received a jewel from the hand of Truth brighter than any glittering on the brow of Athens, that the glory of Israel, though, perchance, pale and dim, burns to-night with a steadier, intenser flame than even the fierce glowing lights of Rome? The stars are cold and distant, and Bethlehem is still. The hour is fraught with the destinies of ages, yet the silence is unbroken. Save by one sound—in the deep hush we hear the cry of an infant, and the scene is quiet no longer; for that cry echoes through all Christendom, and the joy of 1800 years come rolling back to us in a glad tide of music—the means of Church bells and children's carols, of the anthems of the old who depart in peace, with the hymns of the young who get them ready to the battle, aye, and no little of it, the cry of strong hearts on whom the Christ-child has descended in their struggling, with all the benediction of Truth.

The picture itself is a homely one—a rough cave, a gracious woman on whose lap lies a tiny babe, an old man attending on them, and in the shadows (for so the conception of art has grown into the heart of the world), a little black lamb, gazing on the mother's love-treasure with great lustrous eyes full of a wistful yearning consciousness. A strange group truly, yet with nought of grandeur to the careless eye, and we, who kneel in thought beside the forms of mighty dead, may well wonder at the magnetism that has drawn men hither, through so many ages, as to the soul's true house of bread. It is not in the scene that we find the answer, but in its lesson; not Bethlehem, but the Wilderness draws nearer reality; not the child, but the Christ Child. This is the birth-night of a genius, to whom, as to all genius, more or less, the right and good of common men will be utter depravity and baseness; to whom mighty anguish will be the breath of nature; whose crown shall be won in death; who by the majesty of His own self-sacrifice shall first make the path for each man beyond the little circle of self to the centre of the greater circle of the love of Humanity, yet, who in the midst of pain and woe and sorrow, shall be happy, gloriously happy withal, in the sense of having caught the whispers of the God-voice; of having come closest of all to the burning, throbbing heart of Truth. The happiness of Christ—we laugh at the words. Yet, let us bethink ourselves. Is this not the very secret we learn from Him—how to know the crown of thorns, the crown of glory, the unutterable fullness of beatitude in the hungering and thirsting after righteousness? It is impossible, as we watch the sweet story grow, to help thinking of the old Indian Buddha, who was tempted and tried, yet became "the blessed" so many centuries before. We cannot repress the thought of Socrates, as we look at this life's stern loyalty to truth, with its winning lowliness and grace. Undoubtedly they are there, Buddha and Socrates, but whether their memories fall athwart the cradle of the Christ, or whether they agree as brethren sprung right from the common soul of human genius, who can tell?

Bethlehem stands out on the face of history like a grand white cameo—a pure woman and a pure child; and we should never forget that the call it sent forth to all the world proved the first spell potent to raise in the mind of man the idea of the universe. The Christianity that held Western Europe so long under its sway did not wrongly give itself the name of Catholic, for it was the outcome of man's earliest assumption to conceive of things in their totality. We follow the steps of the Christ Child reverently; we see Him turn with bitter consecration from the loves and hopes and happiness of common souls; we hear Him cry, "Come unto Me all ye that labor and are heavy laden," with the yearning pity of only a royal soul; we bend in awe before Calvary's sublime enthronement of human sorrow; and we feel the truth of the quaint old German tales of the child who comes to us in the snow of the winter-tide, in cold and hunger and want, but departs with words of blessing, and leaves us to say we have seen a prince, for the Christ Child has been here.

NEALAS.

Christmas 1887.

এই প্রবন্ধটি ১৮৮৭ সালে অর্থাৎ নিবেদিতার ২০ বছর বয়সে লেখা। প্রবন্ধের তলায় নিবেদিতার প্রিয় ছদ্ম-নাম—'নীলাস'। তার তলায় তিনি নিজের হাতেই 'Christmas 1887' লিখে রেখেছেন।

Viola. Bromley. Kent.
July 11th 1907

Dear Madam

We were very pleased to get a word from you. We well remember the few pleasant hours we spent together when you came with our dear friend, Mrs. Ole Bull, and we were so pleased to hear that Miss Noble is perhaps coming soon to England.

We are just now leaving for Brittany, for 5-6

বিশ্ববিখ্যাত রুশ মনীষী ও বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের পত্র। চিঠিটি সম্ভবত মিস ম্যাকলাউডকে লেখা। পত্রমধ্যে নিবেদিতার উল্লেখ আছে। Viola. Branly (?) Kent.

weeks, but we hope to have the pleasure of seeing you some day in the fall. —

When you write to Mrs Ole Bull, or to Miss Noble give them please our warmest greetings.

With kindest regards from my wife and myself I am, dear Madam

Yours sincerely

P. Kropotkin

July 15, 1907

Dear Madam,

We were very pleased to get a word from you. We well remember the few pleasant hours we spent together when you came with our dear friend, Mrs. Ole Bull, and we were so pleased to hear that Miss Noble is perhaps coming soon to England.

We are just now leaving for Brittany, for 5-6 weeks, but we hope to have the pleasure of seeing you some day in the fall.

When you write to Mrs. Ole Bull or to Miss Noble give them please our warmest geetings.

With kindest regards from my wife and myself. I am, dear Madam,

Yours sincerely
P. Kropotkin

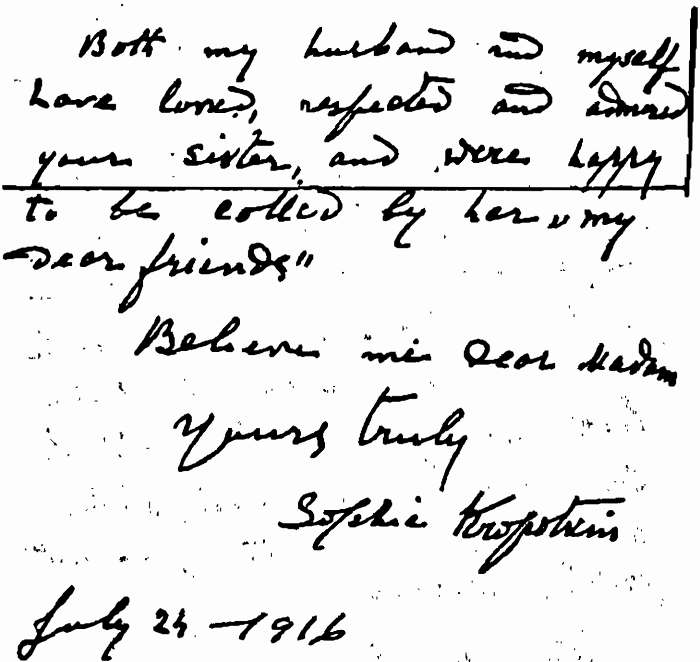
Henfield
Sussex

Dear Madam

Your letter after many readdressings found us here in a small village in Sussex. We return to Brighton at the end of this week and I shall look among old letters and if there any from your sister will send them to you with great pleasure.

We are glad to hear that Miss Noble's biography is going to be written. A life like hers consecrated to the oppressed ones will be most welcome now. Humanity of today, perhaps

more than at any other time is in need of biographical sketches of such lofty noble souls as Margaret Noble was.



প্রিন্স ক্রপটকিনের পত্নী সোফি ক্রপটকিনের লেখা এই পত্রে নিবেদিতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা হয়েছে। যে-রকম সম্ভ্রম ও অনুরাগের সঙ্গে ইনি নিবেদিতার বিষয়ে বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় নিবেদিতার সঙ্গে ক্রপটকিন-পরিবারের কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল। ক্রপটকিনের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য আমরা পরবর্তী খণ্ডে দেব।—

Henfield
Sussex

Dear Madam,

Your letter after many wanderings found us here in a small village in Sussex.

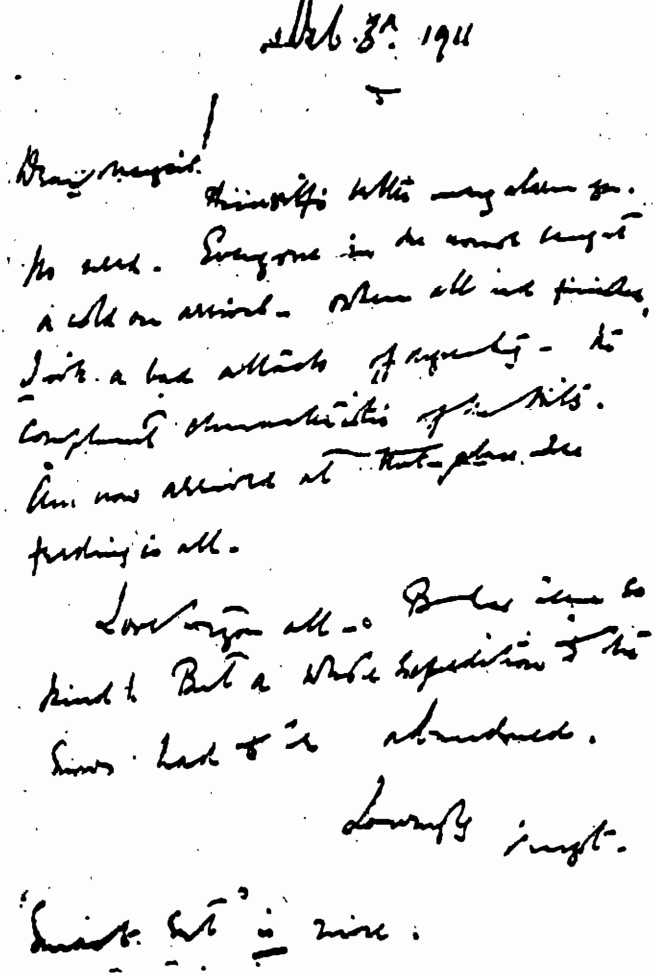
We return to Brighton at the end of this week and I shall look among old letters and if there any from your sister, will send them to you with great pleasure.

We are glad to hear that Miss Noble's biography is going to be written. A life like her's consecrated to the oppressed ones will be most welcome now. Humanity of today, perhaps more than at any other time is in need of biographical sketches of such lofty noble souls as Margaret Noble was.

Both my husband and myself have loved, respected and admired your Sister, and were happy to be called by her "my dear friends".

July 24, 1916

Believe me dear madam
Yours truly,
Sophie Kropotkin



৩ অক্টোবর, ১৯১১-এর এই চিঠিটি সম্ভবতঃ বাড়িতে পাঠানো নিবেদিতার শেষ চিঠি। লিজেল রেম'কে রিচমণ্ড নোবল যে স্মৃতিকথা পাঠান, তাতে নিবেদিতার সর্বশেষ চিঠির কথা বলা হয়েছিল, যাতে 'হস্তাক্ষর এলোমেলো', যাতে নিবেদিতার স্বাভাবিক 'দৃঢ়-মুদ্রিত, ব্যক্তিত্বময়' রচনা নেই। নিবেদিতা ঐ পত্রে জানিয়েছিলেন, যদি তাঁর অসুখের কোনো সংবাদ পৌঁছে থাকে তাতে যেন গুরুত্ব দেওয়া না হয়, ইত্যাদি।

Oct. 3rd. 1911

Dear Magsil (?),

Himself's letter may alarm you. No need. Everyone in the house cought a cold on arrival—and when all had finished, *I* took a bad attack of dysentery—the complaint characteristic of the hills. Am now arrived at that place when feeding is all.

Love to you all. B has been so kind! But a whole expedition to the snows had to be abandoned.

Lovingly,
Margot

[' '] is nice.

পূর্বজীবনে লেখিকা

রিচমণ্ড নোবল বলেছেন, 'মার্গট যেখানেই যেত সেখানেই একটা সাহিত্য সংস্থা গজিয়ে উঠত'—আগেই তা জেনেছি আমরা। মিসেস উইলসন জানিয়েছেন, 'শিক্ষকতার সঙ্গে সাংবাদিকতাও সে করত।' মিস সিসিলি উইলসন নিবেদিতার কয়েকটি ছদ্মনামের উল্লেখ করেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয় তাঁর আটাশ বৎসর বয়সে। তার আগেই তিনি লেখিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে। এই কালে যেসব লেখা লিখেছেন, সেগুলির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। প্রায়ই ছদ্মনামে লিখতেন বলে আরও অসুবিধা। সিসিলি উইলসনের চিঠিতে আমরা আগেই দেখেছি, তাঁদের কাছে মার্গারেট-মার্গারীর 'প্রভূত সংখ্যক' প্রবন্ধ ছিল। রেম-সংগ্রহে আমরা কয়েকটি লেখা পেয়েছি, 'প্রভূত সংখ্যক' নয়। এই লেখাগুলির অধিকাংশই আমরা এখানে উপস্থিত করছি, মূল ইংরাজীতে, অনুবাদ করে নয় (মাত্র একটি ব্যতিক্রম), কারণ এগুলি অন্যত্র কোথাও নেই বলেই মনে হয়, সুতরাং নিবেদিতা-গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

যে-সব রচনা আমাদের কাছে আছে, তার মধ্যে নিবেদিতার পরবর্তী সব কর্মটি ভূমিকার পূর্বপ্রস্তুতি পর্ব দেখা যাবে। সেবা, শিক্ষা ও ধর্মান্দোলনে অংশ, করোটি-তত্ত্ব ও রহস্যময় স্পিরিটের বিষয়ে কৌতূহল, সেই সঙ্গে জাতীয়তা-নির্ভর রাজনীতির প্রতি আসক্তি, সব কিছুই। প্রাপ্ত রচনাগুলির মধ্যে দু' একটি মুদ্রিত করছি না। যেমন চার্চের তর্ক বিতর্কের কিছু লেখা, যা *Churchman V. Interloper* —এই শিরোনামায় চিঠিপত্র কলমে বেশ কিছুদিন ধরে বেরিয়েছিল। এই বিতর্ক নিতান্ত স্থানীয় এবং এর সমস্ত আকর্ষণ সেই কালেই সীমাবদ্ধ; তাছাড়া নিবেদিতা বিতর্কে কোনো এক পক্ষে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি কে—'চার্চম্যান' না 'ইনটারলোপার'—সুনিশ্চিতভাবে ধরা শক্ত। এ বিষয়ে শ্রীমতী রেম'ও কোনো আলোকপাত করেননি। একমাত্র উপায় রচনাভঙ্গি থেকে অনুমান করা, এক্ষেত্রে আমরা সে কাজ করতে চাইছি না।

এ ছাড়া বাদ দিচ্ছি একটি লেখা যেটি নিবেদিতার কি না বলতে পারব না। লেখাটি সুদীর্ঘ, নাম— *Notes on the Life of Frederic III Emperor of Germany and King of Prussia*. লেখাটির শিরোনামার তলায় লেখা আছে—"Specially translated from the German for the *North Wales Guardian*" শেষে লেখা—K. W. Kingston House, Wrexham রেম-সংগ্রহে এই লেখার একটি প্রুফ কপি রয়েছে। এটি যে নিবেদিতার লেখা তা স্পষ্ট করে বলতে পারছি না। নিবেদিতার কাগজপত্রের মধ্যে প্রুফ কপি থেকে-যাওয়া যেমন লেখাটি তাঁর হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়ে দেয়, অপরপক্ষে যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, নিবেদিতা যথেষ্ট পরিমাণে জার্মান জানতেন, ততক্ষণ বলা যাবে না এটি তাঁরই করা অনুবাদ। এ ছাড়া নর্থ ওয়েলস্ গার্ডিয়ান পত্রিকার ২৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৬-র একটি

সম্পাদকীয় স্ৰেম-সংগ্রহে রয়েছে, যার বিষয়বস্তু সমস্ত বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর হিসাব নিকাশ। এই পত্রিকার সঙ্গে নিবেদিতার যোগ ছিল বলে এটি তাঁর লেখা হতেও পারে। কিন্তু না হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে, কারণ এই সম্পাদকীয়ের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই রক্ষণশীল। এতে গ্লাডস্টোনকে তাঁর উদারনীতির জন্য আক্রমণ করে রক্ষণশীল শাসনকে সমর্থন করা হয়েছে, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের গুণগান রয়েছে।

এর পরে উক্ত সংগ্রহের লেখাগুলি উপস্থিত করছি :

THE CHRIST CHILD

শিশু খ্রীস্ট

[লেখাটির তলায় হাতে লেখা তারিখ দেওয়া আছে 'ক্রীসমাস, ১৮৮৭।' দেখে মনে হয়, ঐ তারিখ নিবেদিতার নিজেরই হাতে লেখা।

পরবর্তীকালে ধর্ম ও দার্শনিকবোধে পরিবর্তন ঘটার জন্য নিবেদিতার খ্রীস্টপ্রীতির কথাটা অনেক সময়ে আবৃত থাকে। নিবেদিতা এক পত্রে লিখেছেন, 'আমি গোঁড়া খ্রীস্টান ছিলাম', তা আগেই দেখে এসেছি। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই, নিজস্বভাবেই, সেই গোঁড়ামিতে ভাঙন ধরে, স্বামীজী সেই ভাঙনকে সম্পূর্ণ করে এক নতুন ভাবজগতে তাঁকে স্থাপন করেন, যাতে খ্রীস্টানীর কোনো ঠাঁই নেই, কিন্তু খ্রীস্ট ও খ্রীস্টীয়তার পূজ্য আসন। শৈশব সংস্কারের মধ্যে যে-খ্রীস্টকে নিবেদিতা পেয়েছিলেন, শেষ অবধি তিনি নিবেদিতার মনে রয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান রচনাটি তাঁর যৌবনের খ্রীস্ট-প্রীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত।

খ্রীস্টকে কেন্দ্র করে এই ধরনের রচনা খ্রীস্টান জগতে প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ পাদরী যাজকদের পরিবারের মধ্যে। ভাষণ দেবার কালে খ্রীস্টজীবন ও বাণীর কোনো অংশকে বেছে নিয়ে ভাব বা বক্তব্য বিস্তার পাদরীদের করতেই হয়। নিবেদিতার পিতা সে-কাজ করেছেন, এবং ঐসব উপদেশ-ভাষণের মধ্যে তিনি তাঁর কবিহৃদয়কে উজাড় করে দিতেন, নিবেদিতার নিজের কথায় তাও দেখেছি। পিতার উপদেশ-ভাষণগুলি নিবেদিতার খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর ভাইয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী নিবেদিতা স্বয়ং উপদেশ-ভাষণ লিখতেন।

আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তু যীশুর জন্ম, যার জন্য 'সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক।' খ্রীস্টের অন্য মূর্তির তুলনায় নিবেদিতা শিশু মূর্তিকেই বেশী ভালবাসতেন, তা তাঁর পরবর্তী লেখা থেকেও বোঝা যায়। স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের যে-বর্ণনা করেছেন, তাতে দেখি, র‍্যাফেলের আঁকা Sistine Child-এর ললাটের কোমলতা ও মহিমা স্বামীজীর মুখে তিনি দেখেছিলেন। গোপালের মায়ের কথা লিখবার সময়ে শিরোনামা দিয়েছিলেন—'Gopaler-Ma: The Mother of the Christ-Child'.

এই লেখাটি লেখার সময়ে নিবেদিতার বয়স একুশের মত। এর মধ্যে হৃদয়

উজাড়-করা খ্রীস্ট-প্রীতি রয়েছে। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গোঁড়া খ্রীস্টানী একেবারে নেই। খ্রীস্ট ত্রাণকর্তা সত্য, কিন্তু তিনিই একমাত্র নন। তাঁরও পূর্বসূরী আছেন। খ্রীস্টের কথা লিখতে গিয়ে তাঁকে লিখতে হয়েছে—"এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বুদ্ধের কথা না ভেবে পারি না, যাঁকে প্রলোভিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধত্ব পেয়েছিলেন, বহু শতাব্দী পূর্বে। মনে থেকে মোছা যায় না সক্রেটীসের কথা—তাঁর জীবন—সত্যের প্রতি কঠিন আনুগত্যে পূর্ণ অথচ বিনম্র বিজয়ী লাবণ্যে সিক্ত সেই জীবন। নিঃসন্দেহে তাঁরা আছেন, বুদ্ধ এবং সক্রেটীসেরা, কিন্তু খ্রীস্টের দোলনার উপরে তাঁদের স্মৃতিবারিবর্ষণ হয়েছিল কিনা কে বলবে—কিংবা তাঁদের ভাবৈক্যের মূলে কি রয়েছে মানব-প্রতিভার অখণ্ড উৎস থেকে জন্মগ্রহণ—তাই বা বলবে কে?"

করুণার বিগ্রহ বুদ্ধ এবং সত্যের শুদ্ধ আকার সক্রেটীসকে যিনি খ্রীস্টের পূর্বসূরী বলে স্মরণ করেন, তিনি খ্রীস্ট বিষয়ে নূতন ভাবনায় সমর্থ। দেখি যে, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্টের যন্ত্রণা শিহরিত স্বীকৃত মূর্তির পরিবর্তে খ্রীস্টের আনন্দ-মূরতিকে দর্শন করতে চেয়েছেন।—

"এ-হোল এক প্রতিভার জন্মরাত্রি......যাঁর কাছে নিজ মৃত্যুই নিজ মুকুট।...... যিনি যাতনা, শোক ও দুঃখের মধ্যেও সুখী, সগৌরবে সুখী, কেননা ঈশ্বরের স্বরমর্মর তাঁর কানে পশেছিল; তিনি সত্যের জ্বলন্ত, স্পন্দিত হৃদয়ের সবচেয়ে নিকটে এসেছিলেন। 'সুখী' 'খ্রীস্ট!'—শুনলেই হাসি পাবে। তবু যদি ভেবে দেখি!"

আলোচ্য রচনাটির মধ্যে তীব্র অনুভূতিস্রোত বহমান। খ্রীস্টজন্মের গভীর তাৎপর্য, তাকে কেন্দ্র করে সমগ্র খ্রীস্টান জগতের আনন্দোৎসব লেখিকা যেন সত্তা মেলে অনুভব করেছেন। তারায় তারায় বেজেছে যে পদধ্বনি, তারই পদাবলী রচনা করতে চেয়েছেন তিনি। অলংকার দিয়েছেন সুন্দর ক'রে—ইতিহাসের বক্ষে বেথলিহেমকে তাঁর মনে হয়েছে মহান মর্মর-পট, যাতে খোদিত পবিত্র নারী ও পবিত্র শিশু। 'ছোট্ট শিশু! আ-হা! বলো, বিরাট শক্তিধর আত্মা—জন্মপরবর্তী শতাব্দীগুলিতে মানবপ্রকৃতির কর্ণধার।' পবিত্র পুরাণী-সুরে লিখে গেছেন—"'জুডার বেথলিহেম—হেরড রাজার কালে'—কথাগুলি জড়িত-মর্মরিত হয় আমাদের কণ্ঠে, ধীরে মন পৌঁছিয়ে যায় 'চিত্রটির' কাছে : একেবারে নিথর, নীরব, নিশীথরাত্রি—চিরতারকার আলোক ঝরছে বেথলিহেমের উপরে, এথেন্স ও রোমের উপরেও।"

তারপরে, সেই চির পুরাতন কাহিনী নতুন হৃদয়ের ভাষায় :

সেই চিরদিনের প্রশ্ন আকাশভরা তারা-সাগরের দিকে তাকিয়ে—বলো, তারকাদের মধ্যে কে জানো, আজ রাত্রে বেথলিহেম একটি রত্ন পেয়েছে, যা এথেন্সের ললাটরত্নের চেয়েও উজ্জ্বল, রোমের ধাঁধানো আলোকের চেয়েও, যা স্থিরতর নিবিড়তর জ্যোতিতে দীপ্যমান ম্লান ইজরায়েলের শিখরে। রাত্রি, শীতল সুন্দর সারি সারি নক্ষত্র, স্তব্ধ বেথলিহেম। নিয়তি-সমুদ্যত প্রহর, কিন্তু এখনো অভগ্ন নীরবতা। সহসা একটি শব্দ—মৌনের বুকের ধ্বনি-শিহরণ—একটি শিশুর কান্না—তখনি সংগীতে অশান্ত দৃশ্যপট—সেই কান্না ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র খ্রীস্ট-পৃথিবীতে, আর, ১৮০০ বছরের আনন্দতরঙ্গ সমুদ্রসংগীতে ভেঙে পড়ল আমাদের

উপরে : গির্জার ঘণ্টারব ও শিশুদের প্রার্থনার সুর, শান্তিতে বিদায়ী বৃদ্ধদের উদ্দেশে প্রশস্তিগীতি, সমরে প্রস্তুত যৌবনের বন্দনাগান, শিশু খ্রীস্ট যাদের সংগ্রামী হৃদয়ে আবির্ভূত সেই সব বীরপ্রাণের নির্ঘোষ......।]

It is Christmas time, and at this season, when the very air seems laden with carols, when homes for the most part are at their happiest, and when the children are glad with the universal gladness of the time, there seems a special call upon us to go back in thought to, that first Christmas-tide, so long ago, whence proceed this joy and blessedness.

Christmas—the Christ time—is a widespread festival. Throughout Europe, from north to south and east to west, it rings a marry peal to loving thought and kindly household cares; and children, as it comes, lie awake at night to think about Santa Claus, and to cast up their private accounts with conscience, or fall asleep may be, to dream of christmas fairies, and the wonderful star of old; while even the grown people find themselves wondering why the words, "In Bethlehem of Judaea, in the days of Herod the King," have power to raise such a world of vague emotions in their minds. It has long been so. Christmas has grown with our growth, and strengthened with our strength. Long ago, in these northern lands, we had the Yule-tide, with its religious mysteries, and its greater or less excess. But there crept a new joy into the lives of men, and in its honor they did re-name the great feast of the year's home-season—for what reason better than that a little child had come into the world?

A little child! Say rather a mighty soul, that has stood at the helm, and handled the rudder of human nature through all the ages since—a little child "Bethlehem of Judaea in the days of Herod the King." The words linger on our lips, and slowly we go backwards to the picture. It is very still and silent, midnight, and the eternal stars shine down on Bethlehem as they do on Athens and on Rome. Which of them, glittering points in the revolving chariot-wheel of God, knows or recks that Bethlehem to-night has received a jewel from the hand of Truth brighter than any gleaming on the brow of Athens, that the glory of Israel, though, perchance, pale and dim, burns to-night with a steadier, intenser flame than even the fierce glowing lights of Rome? The stars are cold and distant, and Bethlehem is still. The hour is fraught with the destinies of ages, yet the silence is unbroken. Save by one sound—in the deep hush we hear the cry of an infant, and the scene is quiet no longer; for that cry echoes through all Christendom, and the joy of 1800 years come rolling back to us in a glad tide of music—the music of Church bells and children's carols, of the anthems of the old who depart in peace, with the hymns of the young who get them ready to the battle, aye, and no little

of it, the cry of strong hearts on whom the Christ-child has descended in their struggling, with all the benediction of Truth.

The picture itself is a homely one—a rough cave, a gracious woman on whose lap lies a tiny babe, an old man attending on them, and in the shadows (for so the conception of art has grown into the heart of the world), a little black lamb, gazing on the mother's love-treasure with great lustrous eyes full of wistful yearning consciousness. A strange group truly, yet with nought of grandeur to the careless eye, and we, who kneel in thought beside the forms of mighty dead, may well wonder at the magnetism that has drawn men hither, through so many ages, as to the soul's true house of bread. It is not in the scene that we find the answer, but in its issues: not Bethlehem, but the Wilderness draws us in reality; not the child, but the Christ-Child. This is the birth-night of a genius, to whom, as to all genius, more or less, the right and good of common men will be utter depravity and baseness; to whom mighty anguish will be the breath of nature; whose crown shall be own in death; who by the majesty of His own self-sacrifice shall first make the path for each man beyond the little circle of self to the centre of the greater circle of the love of Humanity, yet, who in the midst of pain and woe and sorrow, shall be happy, gloriously happy withal, in the sense of having caught the whispers of the God-voice; of having come closest of all to the burning, throbbing heart of Truth. The happiness of Christ—we laugh at the words. Yet, let us bethink ourselves. Is this not the very secret we learn from Him—how to know the crown of thorns, the crown of glory, the unutterable fullness of beatitude in the hungering and thirsting after righteousness? It is impossible, as we watch the sweet story grow, to help thinking of the old Indian Buddha, who was tempted and tried, yet became "the blessed" so many centuries before. We cannot repress the thought of Socrates, as we look at this life's stern loyalty to truth, with its winning lowliness and grace. Undoubtedly they are there, Buddha and Socrates, but whether their memories fell athwart the cradle of the Christ, or whether they agree as brethren sprung right from the common soul of human genius, who can tell?

Bethlehem stands out on the face of history like a grand white cameo—a pure woman and a pure child; and we should never forget that the call it sent forth to all the world proved the first spell potent to raise in the mind of man the idea of the Universe. The Christianity that held Western Europe so long under its sway did not wrongly give itself the name of Catholic, for it was the outcome of man's earliest assumption to concieve of things in their totality. We follow the steps of the Christ Child reverently; we see Him turn with bitter consecration from the loves and hopes and happiness of common souls; we hear Him cry, "Come unto Me all ye that Labor and

are heavy laden," with the yearning pity of only a royal soul; we bend in awe before Calvary's sublime enthronement of human sorrow; and we feel the truth of the quaint old German tales of the child who comes to us in the snow of the winter-tide, in cold and hunger and want, but departs with words of blessing, and leaves us to say we have seen a prince, for the Christ Child has been here.

NEALAS.
Christmas 1887

HAG-RIDDEN

ডাইনী পাওয়া

[ভগিনী নিবেদিতাও গল্প লিখতেন।

নিবেদিতাকে আমরা অবশ্যই ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর নব রূপায়ণের কর্মে পরবর্তীকালে নিযুক্ত দেখেছি, কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি যে গল্প লিখতেন, তার একটিমাত্র নমুনা আমরা সৌভাগ্যবশতঃ পেয়েছি। ১৮৮৭ সালে লেখা এই ডাইনীর গল্পটিতে (লেখিকার বয়স তখন কুড়ি) শক্তির পরিচয় আছে। এবং এর মধ্য থেকে পরবর্তী নিবেদিতাকেও চিনে নেওয়া যায়। গল্পের বিষয় বিশ্লেষণ করে পাঠকদের রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না, শুধু বলি, যে-দুটি রূপে পরবর্তী নিবেদিতা প্রকাশিত—তাঁর সেই অপূর্ব বেদনাময় মাতৃমূর্তি এবং সত্যের চিরসন্ধান—একটি ডাইনী গল্পের মধ্যেও সেই উভয় রূপের পরিচয় মেলে। ডাইনী—তবু মা—তারই মর্মান্তিক কাহিনী এটি, এবং ডাইনীও 'নিজস্ব-ভাবে নিজস্ব ভূমিতে সত্যসন্ধানী' —মার্গারেট নোবল জানাতে ভোলেন নি। গল্পটিতে আগাগোড়া একটি ভৌতিক রহস্যময় পরিবেশ বজায় রাখা হয়েছে, সেইসঙ্গে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, এবং শেষ কালে ঘটনাধারার আকস্মিক পরিবর্তনে ছোট গল্পের রীতি রক্ষা। সাহিত্যরসিক পাঠকেরা এই গল্পটি থেকে গল্পকার নিবেদিতাকে আবিষ্কার ক'রে এই পথে হায় কেন তাঁর প্রতিভা প্রবাহিত হল না, বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারিবেন।

প্রথমে গল্পটির সম্পূর্ণ অনুবাদ দিই—]

একটি কুটিরের সামনের দরজার উপরে এই সাইনবোর্ডটি টাঙানো—

'জেনেট নাটাল
গাছ-গাছড়া বিক্রেত্রী।'

থর্নবার্গ প্রান্তরভূমির ধার ঘেঁষে, রাস্তার ঢালের নীচে কুটীরটি। তার গা ঘেঁষে কোন বাড়ি নেই, সবচেয়ে কাছের বাড়িও অন্ততঃ পাঁচশো গজ ব্যবধানে। একসার সিঁড়ি নেমে গেছে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত, গহ্বরের মত জায়গাটার চারধার ঘিরে নড়বড়ে বেড়া। অন্য দিকে ঝুলছে ধুলো-রঙের শুকনো পুদিনার ঝাড়, নানা ওষুধের গাছ-গাছড়া ও তেমনি সব বিদ্ঘুটে গন্ধ ভরা জিনিসপত্র—ব্যবসার পুঁজিপাটা সব।

জানলায় যদিও প্যারিসকা লাড্ডু যা মিঠে গুলির মত ছেলেদের প্রাণের জিনিস রয়েছে, তবু কাছাকাছি গাঁ থেকে কোন ছাওয়াল এসে কোনদিন জানলায় কাচে নাক থেবড়ে উঁকি দেয়নি, কারণ কুঁড়েটির খুব বদনাম, লোকজন তাই এড়িয়ে চলে, যদি না স্বার্থের খাতিরে হাজির হতে হয়।

নাটাল-বুড়ির মোরগ-মুরগী, ভেড়া-ভেড়ী, এরা সব বাড়ির পিছনকার পাহাড়ে চরে বেড়ায়, সেখানে চরবার মত অনেকখানি জমি পায়, কিন্তু পল্লীর পাদ্রিকে বাদ দিলে থর্নবার্গের আর কেউ বুড়ির বাড়ির ডিম বা মুরগী খেতে ভরসা করে না—খেলেই—বাপ্‌রে—বাঁচোয়া আছে! পল্লীর যত লোকজন, জলা-প্রান্তরের আশপাশের লোকজনসুদ্ধ সবাই, এমন কি সাত মাইল দূরে বারমারসাইড বাজার-শহরের চাকরানি ও ছেলেরাও—সবার কাছেই জেনেট নাটাল 'জ্ঞানী বুড়ি'। তবু—যারা তার সংগে পরামর্শ না করে এক পা-ও চলে না, এবং প্রাপ্তিযোগ ঘটলে সেগুলি কদাপি ভোগ করে না তাকে নমস্কার না-জানিয়ে—তারাও তাকে ভালবাসে না। তারা ভয় করে তাকে, বুড়ির ঘৃণার জ্বালায় সামনে কুঁকড়ে সরে যায়। কারণ স্পষ্টই বোঝা যেত, বুড়ির জাদুশক্তিকে যারা নিজেদের প্রয়োজনে লাগাত, বুড়ি তাদের ঘৃণা করত।

কারো কারো কাছে অবশ্য মনে হত, বুড়ি আসলে অন্য জগতের মানুষ, শাপভ্রষ্ট হয়ে নেমে এসেছে। হোংকা চাষা উইলসন এক সকালে তার কাছে সাহায্যের জন্য হাজির হয়েছিল অনিচ্ছাভরে—পরে অবাক হয়ে দেখে, নিজের অজান্তে চাষাড়ে সম্বোধনের বদলে কখন 'মহাশয়া' বলে ডাকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। হোংকা উইলসন এক আঁধার রাতে চার মাইল পথ হাঁটার সময়ে রূপোর ঘড়িটা হারিয়ে ফেলেছিল। ঘড়িটা সে পেয়ে গেল একটা গেটের পাশে খড়ের গাদার মধ্যে, ঠিক যে-জায়গাটির কথা বুড়ি বলে দিয়েছিল। এই ঘটনার পরে বুড়ির পাওনা নিয়ে বিবাদ করার পরিবর্তে—তা করবে বলেই আগে-ভাগে মতলব করে এসেছিল—সে এত শ্রদ্ধাবোধ করল যে, টাকার কথা তুলতেও তার লজ্জা হল, যদিও কৃতজ্ঞতার ঋণ সে শেষ কড়ি পর্যন্ত শুধেছিল। শীতকালে সে কয়েকবার নিঃশব্দে থলে-ভর্তি আলুর বস্তা বুড়ির দরজায় রেখে এসেছিল।

জেনেট নাটালের ঘৃণার পিছনে কিন্তু সে অন্যজগতের মানুষ, এই জাতীয় কোন অহংকার ছিল না। কিংবা নিজের অলৌকিক শক্তির বৃথা বড়াই থেকেও তা আসেনি। তা কি প্রতারিত ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রতারকের অবজ্ঞার উল্লাস?—কদাপি নয়। এই বৃদ্ধা নারীর শক্তির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, সে অন্ততঃ নিজ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল, এবং তার প্রয়োগেও দ্বিধাহীন। একবার, মাত্র একবারই সে তার শক্তি ব্যবহার করেছিল সন্তর্পণে, যখন হতভাগিনী অ্যানী উইলডার

তার নাবিক প্রণয়ীর ভাগ্য জানতে এসেছিল—এসেই বুড়ির কোলে মুখ গুঁজে বসে পড়েছিল নারীসুলভ আর্ত সংকোচে আর বড় যাতনায়। তার মাথা-ভরা সোনালী চুলগুলোর উপরে শুকনো শীর্ণ হাতখানি যখন স্নেহভরে রেখেছে, তখন বুড়ির ভাঙা শরীর কিন্তু একেবারে খাড়া, রাজ্ঞীমহিমা যেন ভর করেছে ক্ষণেকের জন্য—আর কোটরগত ধূসর চোখ প্রসারিত কোন এক দূর-দৃশ্যের দিকে। তারপরে উন্মুক্ত ওষ্ঠ থেকে যে-কথাগুলি বেরিয়ে এল, সেগুলি সংখ্যায় অল্প কিন্তু বড় নির্মম—

'বাছা, ওরে বাছা, তোর জোয়ানটার জন্য কাঁদিসনে আর। সে কখনো ঘরে ফিরবে না।'

মেয়েটির সঙ্গে সমপ্রাণতার একটা গভীর আবেগ বোধ করলেও 'জ্ঞানী বুড়ি'র বক্তব্য এতটুকু নরম হল না। বুড়ির চোখে যে ভাসছে তরুণ নাবিকের চেহারাখানি—গভীর জলের নীচে, জটিল আগাছার মধ্যে সে শুয়ে আছে, সমুদ্র-তলের নরম কাদায় ইতিমধ্যেই তার দেহ আধখানা ঢেকে গেছে—ছবিটা এত স্পষ্ট যে, বুড়ি যেন সেখানে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। তারপরে যখন মেয়েটি আঁতকে উঠে কোল থেকে মুখ তুলে চিৎকার করে তীরের মত ছুটে পালাল, তখন তার জন্য করুণার বদলে বুড়ির নৈরাশ্যই হল। এর পরে কয়েকদিন সে প্রবল জ্বরে বিছানায় পড়ে রইল।

কারণ, জেনেট নাটালের নিজের জীবন নিষ্ফলা সন্ধানে কেটেছে। সে তার আশাভঙ্গের জগৎ থেকে আপাত-সুখীদের যখন দেখে, তা যেন পর্বতের চূড়ো থেকে তলায় তাকানো, সহানুভূতির কোন যোগ থাকে না তার মধ্যে।

অনেকে আবার মনে করে আলেয়ার পিছনে ছুটছে সে, তার মগজে পাগলের অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নেই—যদি সত্য হত এ-কথা! জেনেট নাটাল তাহলে হয়তো সান্ত্বনা পেত। কিন্তু সান্ত্বনা সে পায় না, ভিতরের ব্যর্থতার জ্বালা একটুও কমে না। কদাকার এক গাইয়াকে যে বলে দিতে পারে, তার প্রেয়সী আসলে বিশ্বস্ত কিনা, সে কিন্তু হায়, কোন বিশেষ একটি দণ্ডিত আসামী এখনো তার ছেলেটিকে বশীভূত করে রেখেছে কিনা, তা দেখতে পায় না। ছেলেটি—আর কেউ নয়—তার নিজের পেটের ছেলে—চল্লিশ বছর আগেও যে তার কোলে বসে থাকত। বুড়ির বিশ্বাস, তাকে অন্যায় ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তবু, নিজের অপ্রাকৃত ক্ষমতা সত্ত্বেও সে আবিষ্কার করতে পারেনি আসল দোষী কে?

যাদের আত্মা তার সঙ্গে একই অন্ধ গহ্বরে নিমজ্জিত নয়, তাদের সম্বন্ধে ব্যর্থতার এই গভীর বেদনা তাকে উগ্র করে তুলেছিল। নিজ জীবনের এই ভয়ানক অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার জন্যই সে যা দেখত বলে দিত কঠোর নিষ্ঠুর ভাবে।

তবু, থর্নবার্গ প্রান্তরের এই জ্ঞানী বৃদ্ধা নিজস্ব রীতিতে এবং নিজস্ব ক্ষেত্রে সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যারা যে-কোন মূল্যে সত্যের সন্ধানী।

নভেম্বরের শেষে এক অপরাহ্নে—যে সময়টিতে জেনেট নাটালের মানসিক স্থৈর্য বিশেষ কারণে সর্বদা বিঘ্নিত থাকে—এমনি সময়ে বারমারসাইড বাজার থেকে প্রান্তরের উপর দিয়ে সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ধূসর শুষ্ক শীতল আবহাওয়া, রাস্তার ধারে জলাভূমিতে তুষার-ঢাকা নলখাগড়ার মধ্য দিয়ে বয়ে-যাওয়া বাতাসের

সন্‌সনানি, তাতে শিউরে কেঁপে ওঠে পিছনের প্রান্তরের শুকনো ফার্ন,—এদের উপর ছড়িয়ে পড়ল সন্ধ্যার মরা আলো,—ঠিক তখনি গাধাটি গাড়ি টেনে পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘুরে উপত্যকায় নেমে গেল থর্নবার্গ চার্চের দিকে। সময়টি বুড়ির প্রিয়, সন্ধ্যার অস্বচ্ছ আলো সে ভালবাসে। গির্জা-চত্বরের নীচু পাঁচিলের এক পাশে রাশি রাশি ঝরাপাতা জড়ো করা আছে, বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাছের মাথার মস্ত শাখাগুলিকে নাড়িয়ে, ডালে ডালে গোঙানির ঘুম-পাড়ানো গান মৃতদের জন্য।

গির্জা-প্রাঙ্গণের মুখে পুরনো ধরনের একটি 'লীচ গেট', যদিও সেটি বেশীদিন তৈরী নয়। সেখানে একটি খুঁটিতে গাধাটিকে বেঁধে বেষ্টনীর মধ্যে বুড়ি ঢুকল।

স্থানটিতে বুক-চাপা স্তব্ধতা, কিন্তু তা বড় জীবন্ত বুড়ির কাছে, অদৃশ্য বন্ধুজনদের সান্নিধ্যে। বুড়ি ভিতরে ঢুকছে, তার বলিকুঞ্চিত দেহে উল্লাসের রক্তিমাভা। তার চোখগুলি সুন্দর, গভীর অন্তর্ভেদী চাউনি, তাতে এখন চাপা উত্তেজনার উজ্জ্বলতা, পুরনো বিমূঢ়তা আর নেই, সন্ধান-ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার তীব্র দীপ্ত।

ভাঙা, কুঁজো দেহটি ঝুঁকে ঝুঁকে এগোতে লাগল এক কবর থেকে অন্য কবরে, প্রতি কবরে থামল, যেন অদৃশ্য কার সঙ্গে কথা বলল। দেখা গেল, সদ্য মাটি-চাপানো কবরগুলির প্রতি তার বিশেষ আসক্তি। আঁধার ঘনিয়েছে, ব্যগ্র চোখ যেন তার মধ্যে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দেখছে। কিন্তু ক্রমে মুখের প্রত্যাশার চেহারা একটু একটু বদলে গেল, নৈরাশ্য, তারপরে একেবারে ভগ্ন আশার বিধ্বস্ত আকার।

'বাছা, ওরে আমার বাছা, আমার দুলাল'—তার গলা চিরে অবশেষে শব্দ বেরিয়ে এল—'তুই কি বাড়িতে ফিরবি না? তোর জন্মরাত্রিতেও নয়? নিজের বুড়ি মায়ের কাছেও ফিরবি না? বাছা, বাছা রে! আমার বাছা রে! দু-বছর আগে দেখেছি, আমিই তোর কফিন বইছি, দেখেছিলাম, এই দিনটিতেই তুই বাঁধন ছিঁড়ে বেরুবি, অথচ তিন বছর হয়ে গেল, তুই এখনো এলি না। ওরে বাছা, তুই নিজের মায়ের কথাও ভাবিস না! বাছা, বাছা, ওরে আমার বুকের দুলাল!'

ককিয়ে কান্না, তবু তারি মধ্যে জেনেট নাটালের রাজ্ঞীমহিমা যায়নি। এই 'ঈশ্বরের ভূমিতে'ও, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যেও, সে ব্যক্তিগত বেদনায় মগ্ন হবার মত যথেষ্ট নির্জনতা বোধ করল না।

ফেনিয়ে ওঠা কান্না চেপে, শূন্য স্থানটির দিকে পরম সৌজন্যের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বন্ধুগণ, বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে এই গির্জা-প্রাঙ্গণ প্রতীক্ষার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। আমার সঙ্গে তোমরা এস আমার অগ্নিকুণ্ডের পাশে, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত সুখের আশ্রয়, বন্ধুর আহ্বান—খুবই আমোদ বোধ করবে তোমরা—চল সেখানে।'

বুড়ি যখন গাড়িতে উঠছে, পাদরী মহাশয় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'শুভরাত্রি জেনেট।' আর নিজের মনে বললেন, 'নিশ্চয় আবার কবরে কবরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেচারা—আহা বেচারা! প্রতিদিন মাথার গণ্ডগোল বাড়ছে। উইলসনের ঘাড়ির ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত।' জেনেট কিন্তু পাদরীকে দেখেনি বা তার সম্ভাষণ শুনতে পায়নি। তার মনোযোগ নিবদ্ধ অশরীরী নীরব

জনতার প্রীতি, যারা তার সঙ্গী হয়ে গাড়িতে উঠল। নিঃসঙ্গ গৃহের দিকে গাড়িটি এখনি ছুটবে।

বহু ঘণ্টা কাটল। রহস্যময় অতিথিরা চলে গেছে অনুভব করার অনেকক্ষণ পরে জেনেট নাটাল আগুনের সামনে গিয়ে বসল—মর্মভেদী দৃষ্টি নামিয়ে আনল জ্বলন্ত কয়লার উপরে। ভবিষ্যৎবাণী করার মেজাজ এবার তার উপর ভর করল। এই রকম সময়েই নিজশক্তির উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

নীচু ভাঙা ধরা গলায় সে বলল, তীব্র আগ্রহের থরথরে স্বরে,—'হ্যাঁ, এই তো, তুমি এসে গেছ জেন হেওয়ার্ড—আমার সাহায্য চাইতে এসেছে। ভাল, ভাল কথা, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে, ওগো মেয়ে, ইচ্ছা পূরণ না হলে কত ভাল হয় তা যদি জানতে! ...ওঃ তুমি, হেনরী মরিস, কী চাও—চাবি? তাই তো বটে। আমাকে তাড়া দিও না ছোকরা, ওটা পাওয়া যাবে ঠিক সময়েই। এই যে এটাকে টানো দিকি—এটা একটা ড্রয়ার, ড্রয়ার গো, এর সামনে পিতলের আংটা ঝুলছে, আর এখানে চাবিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে, আর একটা—'

একেবারে তন্ময়, মুখে বিড় বিড় শব্দ, কিন্তু হঠাৎ রুদ্ধশ্বাস আর্তধ্বনি—একটা চেনা ছবি যেন চোখের সামনে—তাই তো বটে!—

'আ—হাঃ! এই তো আবার এসেছ কফিন ধরে—তুমি, জেনেট নাটাল—দেখি—দেখি—দেখি—' লম্বা গলা বাড়িয়ে টলমল করতে করতে বুড়ি উঠে দাঁড়াল, যেন আগুনের মধ্যে চোখ আরও ঢুকিয়ে সে ভবিষ্যৎকে সামনে এগিয়ে আনতে চায়।—'হ্যাঁ, এই তো সেই কফিন—একেবারে একই কফিন—অ্যাঁ, আজ একই দিনে। বাছা, আমার বাছা। ঐ তো নাম লেখা আছে, নিশ্চয় তাই—নাঃ, না তো! কোনো নাম নেই তো! লেখার চাকতিটি যে আয়না হয়ে গেল!—ওর মধ্যে আছে কি? দেখি দেখি! ওহ্‌!—ঈশ্বর দেখতে দাও—অ্যাঁ একি—আমি? ও হোঃ হোঃ—এ যে আমি—আমি—!!!' চেয়ারের উপরে সে লুটিয়ে পড়ে গেল, ককিয়ে উঠল আঁ আঁ আতঙ্কে—আর ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রামের মধ্যে গির্জার চূড়োয় ঘণ্টা বাজল একে একে—এগারোটা।

লণ্ডন শহর। ওয়াটারলু ব্রিজের দক্ষিণ দিকের এক দরজার ছায়ায় একটি লোক হাতের উপর ভর করে হুমড়ি খেয়ে আছে—সামনের ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঘোর-লাগা চোখে। তার পোশাক, এবং ছোট করে ছাঁটা চুল দেখলে বোঝা যায় সে খালাস-পাওয়া আসামী। একটা লণ্ঠন ঝুলছে—তার তলায় পরিষ্কার খানিক জায়গা, চলমান পথচারীরা স্বতঃই সেদিকে সমীহের ভাব নিয়ে তাকিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা কালো দস্তানা।

ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশী সময় ধরে লোকটি সেখানে বসে আছে। তার জ্বলজ্বলে চোখ পায়ের সামনে ফেলে রাখা ঐ জঘন্য চ্যালেঞ্জের উপর নিবদ্ধ। হঠাৎ—নিকটের এক ঘড়িতে বাজল এগারোটা। এবং তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই কোণে ধাক্কা দিল।

উৎকর্ণ বাতাসের মধ্যে শেষ শব্দটি যখন কেঁপে নিঃশেষিত হয়ে গেল, তখন

লোকটির মুখে সহসা পরিবর্তন। দাঁড়িয়ে উঠল সে, খাড়া হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নিল—'আমি মুক্ত'—সে ধীরে বলল, যেন নূতন পৃথিবীতে সে জেগেছে। দাঁড়িয়ে সে একের পর এক শ্বাস বুক ভরে টানতে লাগল।

দূরে নদী তমসাময়ী—কালীতরঙ্গে ধাবমানা—তার আঁধার ও মৃত্যুর আদু যেন মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল। লজ্জা-সংকুচিত মুখে লোকটি কালো দস্তানাটা তুলে নিল—ওটাকে সে নিজেই ছুঁড়ে দিয়েছিল।

'আমি মুক্ত'—আবার বলল—'আমি মুক্ত। হ্যাঁ, এই সমস্ত সময়টা আমাকে তাহলে ডাইনীতে পেয়েছিল।'

আত্মার মুক্তির ক্ষণটি। জীবনে সেই প্রথম, তার পঞ্চাশ বছর বয়সে জন নাটাল লাফিয়ে ছিটকে ছুটে চলল। মুক্ত। নিজের জীবন, নিজের স্বভাব গড়ে নেবার পক্ষে মুক্ত সে।

শেষ প্রহরের সংগ্রাম কঠোর, ভয়ঙ্কর, থর্নবার্গ প্রান্তরের বৃদ্ধা নারী এবং লণ্ডন বস্তী অঞ্চলবাসী তার পুত্রের মধ্যে। এখন সব শেষ। বিজয়ী চলে গেল নিজের পথে—প্রত্যাবর্তন করল নিজস্ব প্রকৃতিতে—তা ভাল বা মন্দ যাই হোক; অপর দিকে যে পরাভূত, সে ঘুমিয়ে পড়ল নিজের চেয়ারে, নিঃসঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের পাশে—যে ঘুম চিরদিনের।

JANET NUTTALL
HERBALIST

The cottage, over whose front door hung this sign, nestled by the roadside, skirting Thornburg Moor, at a distance of some five hundred yards from its nearest neighbour. A flight of steps led down to its entrance, and a shaky-looking fence railed in the pit so created, while in the window lay dusty looking bunches of dried mint, sage, camomile, and other disagreeable and odorous items of the stock-in-trade.

Even had the window contained Parisian bon-bons, and those hard gluey balls beloved of children, no urchin from the nearby hamlet would have flattened his nose against the pane, for the cottage had an evil name, and people shunned it, save when interest of another nature, pressed.

Old mother Nuttall's cocks and hens, and her donkey clogged on the hill behind the house, got a wide berth for feeding-ground, and in no Thornburg household, save and except the vicarage, would eggs and chickens from her poultry-yard have been eaten, without fear of dire results. By all the parish, and the inhabitants of the moor-side, as well as by servant-girls and children as far as Bermerside Market-town seven miles off Janet Nuttall was known as a "wise woman." Yet even those

who took no step in life without consulting her, and enjoyed no boon without her tribute, did not love her. They feared her, and shrank from her contempt. For it was very evident, that the old woman despised those who made use of her occult powers.

To some, it seemed that she had 'come down' in life and burly Farmer Wilson, who came to her for help one morning, involuntarily, and to his own amagement, changed the "mother" of his rough address to "Madam". He had lost a silver watch in the course of a four-mile walk on a dark night, and when he subsequently discovered the missing chronometer in a heap of straw, beside the very gate she had indicated to him, instead of disputing her fee, as he had shrewdly foreseen himself doing, he was too delicate even to mention money. But he paid the uttermost farthing of his obligation, several times over during the course of the winter, in sacks of potatoes, left quietly within her door.

Nevertheless, it was from no pride of origin, that the scorn of Janet Nuttall sprang. Neither was it a pluming of herself, on her talents, and least of all, the triumph of the charlatan over his dupe. Whatever the nature of the old woman's gifts might be, she at any rate, believed in them fully. Once, and once only, she had been almost tender in their exercise. It was when poor Anne Willder had come to her to learn the fate of her sailor-lover, and had hidden her face on the old woman's knee, in an agony of terror and maidenly shame. Gently the withered hand had been laid on the golden head, and the frail figure in its high-backed chair, had grown erect and queenly for a moment, while the deep-set grey eyes, dilated to a distant vision. But the words that fell from the parted lips, were few and bitter.

"My lass, my lass, weep no more for your laddie. He'll never come home again!"

In the wise woman, there had sprung up a sudden throbbing sense of kinship, yet she had not softened her message. To her eyes, the figure of young Savey', in his deep sea-grave, lying among tangled weeds, and already half buried in the ooze of the ocean-floor, were as real as if she herself were on the spot, and she told the worst bluntly. Indeed, disappointment rather than pity had been her strongest feeling, when the girl fled from her with a piercing shriek, and for several days afterwards kept her bed, in a high fever.

For Janet Nuttall's own life was spent in a fruitless search, and from her position of despair, she looked down on the merely happy, as from a mountain-height.

The fact that other people would have regarded the object of her efforts as a chimera, and their field of pursuit as an insane delusion, could no way lessen the bitterness of inward failure for her. She could tell a country yokel if his sweetheart

were true to him; but whether a certain convict-person still held the son, who forty years ago, had lain as a babe in her arms, she could not see. And though she believed he had been condemned unjustly she could not, in spite of her gifts, discover the true perpetrator of the crime.

It was this deep knowledge of pain that made her haughty to those whose souls did not lie with hers in the abyss; it was the awful tragedy of suspense in her own life that made her utter remorselessly the thing she saw.

In her own way, and on her own plane, the wise woman of Thornburg Moor was of the member of those who thirst after Truth at any cost.

One afternoon, late in November—a month during which Janet's calm was always somewhat broken,—she was driving her empty cart home across the moor from Bermerside Market. It was a time of cold grey weather, when the breeze whistled among frozen rushes in the pools by the road-side, and stirred the withered bracken on the expanse beyond. Twilight fell as the donkey rounded the shoulder of the hill, and disappeared into the dell where Thornburg Church was situated. It was the hour, and the light that the old woman loved. Under the low-Churchyard wall, brown leaves had drifted, and in the tree-tops the wind tossed about the huge branches, moaning its weird sleep song over the dead.

A lych gate, of ancient pattern, but recent date, formed the entrance, to the Churchyard, and to one of the posts, Janet fastened her donkey, and then passed into the enclosure.

To her the silent place was alive with friends a delicate flush warmed her wrinkled features, as she entered. Her eyes—beautiful and deep seeing—shone with suppressed excitement, while the customary look of baffled stirring on her face, was heightened into passionate yearning for the nonce.

From grave to grave, the bent old figure went, stopping at each, as if to talk with the invisible, and choosing with marked preference those with new-turned soil. Her eyes strained eagerly into the gathering dusk, and gradually her air of expectation changed to an expression of disappointment, mounting finally to despair.

"Eh my bairn, my bairn!" she cried at last. "Will ye no come home? Not on your own birth night? Not to your own old mother? My lad, my lad! Two years I saw myself carrying your coffin, and well I marked that on this day ye would slip your fetters. And now its the third year and ye havena' come. So ye no mind yer old mother!. My lad, my lad, my own lad!"

A something of untamed queenliness pertained however to Janet Nuttall, and not even in the darkening God's acre, could she feel sufficiently alone to indulge her private grief.

"Friends," she said mastering a sob, and turning courteously to address empty space, "its ill biding in a Churchyard, in

wind and rain. Come back with me to a warm hearth, for a bit of shelter and a friendly word's always heartsome, and may help ye on to the good land."

The Vicar, passing, as she climbed into her cart, called out "good-night, Janet," and muttered to himself, must have been wandering about among the graves again, poor old body! She grows more daft every day. Strange about Wilson's watch!" But Janet neither saw her pastor, nor heard his salutation. Her attention was engrossed by that silent crowd, who accompanied her in her market cart to her lonely home.

Hours passed away, and long after she conceived her strange visitants to have departed, Janet Nuttall sat before the fire and bent her piercing gaze on the glowing coals. Her prophetic mood was on her and at times like this, she believed firmly in her powers.

"Yes," she said, in a low broken voice, and with evident anxiety, "there ye come, Jane Hayward, asking my help. Well, well, ye'll get yer wish woman but ye were better without it if ye only knew! And ye, Henry Morris, what do ye seek? A Key? I see it! Hurry me not, man. It'll be found, all in good time. Here, pull away something—its a drawer, a drawer, with a brass ring in front of it, and here's the Key! ....Yes, yes, and here's another—"

She had forgotten herself utterly by this time, in her eager muttering, but now she gave a smothered scream as some visions seemed to come upon her with a sense of recognition.

"Oh! here you are again, with the coffin in your arms, you—Janet Nuttall—Let me see, let me see!" and craning her neck, the old woman tottered to her feet, as if by peering further into the fire, she could indeed bring the future nearer to her eyes. "Yes its the same coffin," she went on, "the very same, and the same day! My boy! My boy! There's the name upon it surely—why no! There's no name! The plate's a looking-glass—what is in it? Let me see! oh!"

"Dear God let me see—why its myself!" She fell back into her chair, with a moan of horror, and at that moment, from the Church steeple in the village, rang out eleven strokes.

It was London, and in the shadow of a door-way, on the south side of Waterloo Bridge, a man, whose clothes and closely cropped hair proclaimed him a discharged convict, crouched with folded arms, moodily gazing at the pavement in front of him. There was a clear space there, under a lamp, and passing pedestrians automatically respected it. In the middle of it had been thrown—a black cotton glove.

Already, for an hour or more, the man had sat there with glowering eyes fixed on the sordid challenge at his feet. Suddenly, a nearby clock boomed out eleven, and the sound reverberating, struck down into the corner.

As the last stroke died away on the listening air, a curious

change suddenly came over his face, and he rose and stretched himself. "I am a free man," he said slowly, as if in the light of a new world, and he stood there, taking in one deep breath after another.

The river running black in the distance, had lost the fascination of death and darkness all at once. He bent with a shame faced movement to lift the theatrical emblem he had himself cast down.

"I am free", he repeated, "I am free. Surely all this while, I have been hag-ridden."

It was the moment of the soul's liberation, and for the first time, and at forty years of age, John Nuttall turned with a spring in his step. Free! To carve out a life and a character for himself.

It was a grim battle that had been a-fighting that last hour, between an old woman on Thornburg Moor, and her son in a London slum. Now, however, it was over, and the victor went forth to be his own man for good or evil, while the vanquished slept in her chair by her lonely fireside—that sleep from which there is no awaking.

MARGARET NEALAS UNDERWOOD.
About 1887 (M. L. W.)

About 1800 words.

A VISIT TO A COAL MINE

By a Lady

(June 23, 1888)

['কয়লাখনি দেখে-আসা'—রচনাটি উচ্চাঙ্গের। লেখাটির মধ্যে একদিকে পাই বাস্তবরসান্বিত একটি বর্ণনা, যাতে কয়লাখনির পারিপার্শ্বিক, যাবতীয় কাজকর্ম, আকার প্রকার প্রভৃতির নিখুঁত বিবরণ রয়েছে, এমনই তা যে, উনিশ শতকের শেষের দিকে ইংলণ্ডের কোনো কয়লাখনির চেহারা জানতে চাইলে এই লেখাটিকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে দেওয়া যাবে, অন্যদিকে আরো কিছু আছে, যার জোরে জানিয়ে দেওয়া যায়, সাহিত্যে বাস্তবরস সৃষ্টির জন্যই মার্গারেট নোবল দেহধারণ করেননি। ভাবের, আদর্শের ও কল্পনার জগতের চির অধিবাসী ইনি—সামান্যতম স্পর্শে এঁর হৃদয়াগ্নি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মনোযোগী এই ছাত্রী, কোনো কিছুকেই বিজ্ঞান ও ইতিহাসের (কখনো কখনো প্রাগৈতিহাসিকেরও বটে) প্রেক্ষাপটে স্থাপন না করে, তার পরিচিত অস্তিত্বের ধারাবাহিক, সেই সঙ্গে সুবৃহৎ তাৎপর্যে দর্শন না ক'রে পারেন না। সুতরাং, কয়লাখনিতে উপস্থিত হয়ে,

সেখানকার বহু মানুষের কর্মব্যস্ত রূপ দেখে বিরাট শক্তিতরঙ্গের রূপ অবশ্যই দর্শন করেন,—ভূমিগর্ভের মধ্যে যে মানবপ্রতিভূরা জমাট অন্ধকারতুল্য কয়লার বুকে আঘাত করছে, তারা প্রতীয়মান হয় 'দেবদূত' বলে, সমাহিত উদ্ভিদ জগতের যারা 'পুনরুত্থান' ঘটাচ্ছে, যারা আর এক রূপে 'অগ্নি ও আলোকের স্বর্গাগার' উত্থারে ব্রতী বিরাট শক্তিধর পুরুষের দল। বৈজ্ঞানিক সত্য কল্পনারসে সিক্ত হয়েছে এখানে, ইতিহাস আরোপিত হয়েছে তার উপরে; মার্গারেট নোবল জানিয়েছেন—ঐ খনি-শ্রমিকদের ঘর থেকেই এসেছেন ইতিহাসের অদম্য আত্মার প্রতীক মার্টিন লুথার।

নিবেদিতা বস্তু সত্যকে কখনোই অস্বীকার করেন নি, কখনোই স্বীকার করেন নি একমাত্র সত্য বলে। অতীত জীবন্ত হত তাঁর কল্পনায়, বর্তমান প্রদীপ্ত হত তাঁর চেতনায়। ইতিহাসের কথা যখন তিনি বলেন, তথ্যের ব্যত্যয় না করেও তখন তিনি ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিক এবং বিজ্ঞানের কথা যখন বলেন, তখন উপাদান অবিকৃত রেখেও বৈজ্ঞানিক-ঔপন্যাসিক। কয়লাখনির মধ্যে যখন তিনি অবতরণ করছেন—অগ্রবর্তী লণ্ঠনের অতি ক্ষীণ আলোক-সংকেত দপ্‌দপ্‌ করছে আশঙ্কায় —অন্ধ কৃষ্ণগুহায় ঝরঝর জলপতনের শব্দ, প্রবেশব্যাকুল বাতাসের মৃঢ় যন্ত্রণাস্বর— সেই সময়ে অকস্মাৎ—দপ্‌ করে নিভে গেল লণ্ঠন, আর—'কয়লার মহালোকে শুধু আমরা—আমরা বহু বহু অতীতের বিশাল ইতিহাসের বুকে।'

মার্গারেট নোবল অবতরণ করলেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে।

...বিশাল নীচু জলাভূমি, তার একেবারে তট পর্যন্ত ঝুঁকে নেমে এসেছে ঘন নিবিড় অরণ্যের আস্তরণ। বিরাট—অতি বিরাট আচ্ছন্ন অরণ্য! যুগ যুগ ধরে তার মধ্যে ঘুরলেও জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ মিলবে না—সেই নিশ্ছিদ্র নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে ধ্বনিত হয় সমুদ্রস্তনিত বিশ্বসঙ্গীত, আছড়ে পড়ে হুহুংকারে প্রমত্ত ঝঞ্ঝা, কিন্তু চেতনার কোনো শব্দ নেই—নেই—শুধু হয়ত পতঙ্গের পাখার ঝিম্‌ ঝিম্‌, কিংবা বিরাটাকার সরীসৃপের গোপন গমনের স্পন্দন। আচ্ছন্ন অতিকায় অরণ্য, অজস্র শাখায় পত্রে অসংবৃত, জটিল, গহন...

সমুদ্র ও অরণ্য! নিঃসঙ্গ, নিথর অন্ধকার চারিদিকে, না, দীপ্তজ্যোতি তারকা-রাজি লণ্ঠনের মতো ঝুলে আছে উত্তপ্ত শিহরিত কুয়াশাচ্ছন্ন বায়ু-যবনিকার উপরে। শুধু তাও নয়, যখন সময় আসে, আকাশ ও সমুদ্রের বর্ণরঙিন সভাতলে আবির্ভূত হয় চন্দ্রমহিমা—বর্ষিত হয় আলোকধারা জলরাশিতে, রূপালি তরঙ্গ ওঠে, পড়ে, ভেঙে যায় লক্ষ চূর্ণে...তাপ-ভীষণ গরীয়ান্‌ দিবসের অবসানে রাত্রি—মোহময়ী যাদুকরী রাত্রি—রহস্যমহিমা গ্রাস করে নেয় সব কিছু...

—সে মহিমা দেখেনি কোনো আঁখি। দেখেছে কল্পনার আঁখি, যেমন মার্গারেট নোবলের।

এই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর অরণ্য কিভাবে যুগে যুগে বিস্তারশীল জল-রাশির দ্বারা নিমজ্জিত হয়েছে, ধীরে অতি ধীরে কিভাবে ভূমিগর্ভে প্রোথিত হয়েছে তা, এমনই ধীরে যে, মহাকালের নয়ন ছাড়া কোথাও ধরা পড়বে না, প্রোথিত অরণ্যের উপরে নূতন অরণ্য উঠেছে, তার উপরে নূতন অরণ্য, নিম্নের অরণ্য যত নেমেছে, তত

কঠিন হয়েছে, শিলীভূত সুকঠিন সেই অরণ্যসমাধি স্তব্ধ হৃদয়ে রক্ষা করেছে অতীত প্রাণাগ্নি—প্রতীক্ষা করেছে কখন মুক্তি দেয় প্রমিথিউসেরা—

মার্গারেট নোবলের চোখে অগণিত খনি-শ্রমিক অগণিত প্রমিথিউস।]

It was some little time ago that, lured by the accounts of a geological and somewhat poetic friend, we were driven to beg an invitation to the scene of his labours, from our kind friend, Mr. William Pattison, the Manager of the Bersham Coal Mine. It is a golden rule to impart the good that we receive, and so bright is the memory of this our visit to the Ebon Fairy-land, and so many good impulses did it raise and develop in us that we feel that others, if they but knew what was to be gained by it, would gladly go and do likewise.

There is something awesome in the busy scene at the mouth of the shaft. Here one stands, muffled up against dust, damp, and draught, in man's cap and coat; in one's hand is the small, heavy lamp which marks out those who are about to descend into the black abyss; around is a perfect network of truck lines, all converging towards the mouth of the pit; at one side is the ribbed, leaden slope, down which each load is emptied, that the lumps and large pieces may bound off into one receptacle, while the small coal slips down the furrows into another; in all directions men are passing and repassing, pushing one business, settling another, beginning something else. Everywhere are Life and Works astir, busy, eager, courageous, as all life work must be, if it will lead to Life Victory. And meanwhile the victory sleeps and smiles beneath our feet! Not one of these men, cheerful, careless, prosaic it may be, but may pass (by a swifter and surer road than most mortals) to the Great Unknown before the evening dews; not one but is fighting a good fight in grim earth-grapple for the very root of human civilization, "ravaging the graveyards of Heaven for the buried gold of fire and light;" and no few are here whose stunted forms and dusky features are shrines, seen by memory's light, of some "deed of grace" that, coming in the way of duty, has been accepted and fulfilled quietly, with the heroism that is most heroic in its humility. The very man who stands at our side, chatting so pleasantly, and so courteously displaying the multitude of scientific contrivences for our security, is he who, some seven years ago, rushed into the flaming mine, without hope or thought for his own, that he might glorify his responsibility in so saving the life and property of others.

One thrills with admiration. This is a large atmosphere, and one breathes freer in it; but alas! for us, there will be no danger, a woman's path will be as free from that as a garden walk on a fine day.

How comes it, we think, that we never before realised the firm antagonism, the dauntless spirit born in the soul of him

who wrestled as scholar, as saint and as reformer, till the curtain rose and the stage of history was trodden by the son of the miner of Eisleben—the giant souled Martin Luther? Never again shall we look on the black gruesome face of a miner returning from his daily toil without some flutter of reverence, without some of the benediction that ever comes with the recognition of a secret beauty. Yet man here tremendous in the spiritual aspect is insignificant before the magnitude of material fact which fronts us.

Down, down we go, a quarter of a mile into the very thews and sinews of Mother Earth, till we stand on the upper floor of the mine (there is another level beneath this), at the focus of many paths, many truck lines, many double rows along the roof of the same small lamp we carry (the specific virtue of which is that it goes out when tilted, or when in contact "with coal gas, which is poisonous also to human life), and many double rows too of timber supports, without which the smooth shale above must inevitably fall in, weighed down by overlying strata, and even with which, it has but a limited period of duration. (N.B. There is an outlay of 2,000 a year on this item alone, and Canada is the chief source of supply.) In the distance above us, we hear the dropping of water, like heavy rain, percolating through the sandstone, down which we have just passed ; beside us, the inrush of fresh air makes the organ-music of a great stone ; for a moment the commonplace going and coming have ceased ; our lamp has gone out, and our companion has turned away to replenish it ; we are alone,—alone in the coal country,—alone with a mighty vision of the Long, Long Ago.

Wrexham and all the pleasant country had vanished like a dream, and in its stead lay only a vast tract of low marshy land, clothed with dense forests to its very shores. Immense, dim forests ! within which one might wander in unbroken solitude many lifetimes, hearing the distant world-music of the sea, deafened by the crashing fury of tropical tempests, but unconscious of any sounds indicative of life, save perhaps the buzz of insects, or the stealthy motion of a great reptile here and there. Dim mighty forests, of vegetation too rich, luxuriant, unconditioned, to let them nurse in moss-lap the wee violets and primroses, baby-darlings of the spring wood of to-day. Yet forests wondrous beautiful withal, in their long dark array of ferns and cycads, and their fathom-deep carpet of enormous club-mosses. Beautiful, exceedingly, had there but been mortal eye to note their beauty! Though no ship sailed the sea that lay around those shores, the sun set then as now, in loving, lingering fashion to the west ; then as now, he kissed the treetops through the openings in the many-hued cloudcurtains, ere he took the last step down the golden water-stair, to leave the

Ocean, though bereft of her royal lover, serene in the tender rippling faith that he would come again.

Ocean and forest! alone, still, and but for the great luminous stars that hang like lamps above the misty veil of the hot, trembling air. Yet no—hot even alone beneath the stars, for there in her season, in the grand purple hall of sea and sky, stands our beautiful liege lady, the Moon, and her light falls upon the waters in a long clear path is broken into silver fragments, shining down between the trees on the running stream, or into the marsh-pool of the forest. The solemn heat and glory of the day are gone, and night has put on a more witching majesty, but a *majesty that no eye beholds.*

It is an awful thought. We men, who think that the world was made for us, are here brought face to face with the thought that it was as beautiful, as thought-stirring, as meaning-full as now, ere ever a human soul existed on it, or a single mind heard the whispers of Law and Force and Truth.

The ages passed on, and the forests sank lower and lower beneath the encroaching waters. Slowly, slowly it went down; so slowly that the forest pools seemed to stand ever where they had ever stood before, and none but the brooding Eternity could know that the rusting moan of waves and trees was the millenniumlong "Nunc Dimittis" of their departure. Yet year by year a higher tide would join some few more lakelets with the waters of the sea, and the fringing waterreeds, through which the woody matter of the trees was filtered as it sank, would grow in wider and wider circles, till at last all lay submerged, and the ocean gently and evenly deposited a firm sand-covering, putting its dead plant-world to rest with loving care, to await the far-off resurrection by fire. And then the story is repeated. Over the buried trees grow others, different in kind, condition, and development, the old forgotten—as the young shall be—but neither for ever.

It is a wonderful picture. A picture in which each line, each tint, is the work of many years, and the whole the delineation of ages beyond the thought of man to compass. Many times has Wales been but "a dark strait of barren land," while "on one side lay the ocean, and on one lay a great water"; often has she robed herself in gloomy forests, which have again disappeared beneath encircling water; once at least has she worn the white ice-mantle, and exchanged it for the fiery hues of volcanic lavas, until to-day she lies before us in garments of green, and brown, and grey, passive under the hands of nature's latest mystery-Man. And man is at once the loftiest and most frivolous of beings. The miner gains his livelihood as an angel of the resurrection to the plant-life of the far-off ages, and the chemist coats his pills with seeds such as carpeted the forests of the olden time; but does either ever think of the truths, of

the histories, of the poems, that lie latent beneath his fingers? We trow but rarely. "Earth's crammed with heaven, and every common bush afire with God, but only those who see take off their shoes, the rest sit round it, and pluck blackberries."

But here is our lamp and we must go. It does not seem so dark as it was, for our eyes have become accustomed to the twinkling light, and it is not till we get into the more remote parts that we realise the great subterranean heat. We take one of the main roadways, and stooping as we best can, follow our guide along the line of route. Lest all the air from the shaft should distribute itself through the upper level of the mine, and leave none for the lower, brattice cloths are at first suspended across the passages at regular intervals to turn it partially back. Behind one of these we find the manager's "office." It is a curious little den, prevented from wearing an entirely rustic look by an incongruous heap of loose coal; it is something between an arbour and a coal hole. Along the floor of the roads run lines laid on sleepers, over which we stumble, ankle deep in dark, grey dust. With this dust everything is covered, save the rough, glossy coal on each side, and the smooth shale above. As we go on, we now and then hear a shout in the distance, and looking up see a truckful of coal, pushed by men or drawn by a pony, coming at full speed towards us.

It is on its way to the shaft, where, the pony taken out, the truck is ran into the "cage", raised to the pit's mouth, run off on the lines above to the "sorter," and as rapidly returned to the "cage" and to the men below, to go through the same process again and again. From this we have to take refuge in the recesses between the wooden pillars which support the roof, and the mild excitement of these scrambles is the only form of danger which we come near. We may burn to distinguish ourselves, but alas! burn we ever so ardently, we have no more chance than—than—the newspaper reporters at Telel-Kebir!

In the dim reaches of the mine we find men at work. They are seated on the ground, one foot against the wall, and both hands wielding the pickaxe, with which they deal their heavy blows and bring the great lumps of black rock tottering down. Here, perhaps, in this heavy, reeking atmosphere, one thinks one has found a *cul de sac,* and pursued the road to its utmost limits, to find no outlet save by the way we came. But we are mistaken; there, in that corner, where it seemed closed up, is a tiny opening, and when we see the paths beyond we realise that not unto us has it been given to find the boundaries of the territory we explore. Here they show us the mark of an ancient stream in its windings—the bed making that curve in the strata that is here named a "horseback", but in Staffordshire would be dubbed a "pig's". In another place, not far off, gas is to be found in some small quantity and they hold up

the lamps that we may see the blue flame creep up, as its dread enemy proceeds to put out the light.

So we go on. At one place Mr. Pattison puts up his hand, because here the smooth surface of the shale is broken, and we would see that it is really shale and not slate (a difference simply of pressure on strata) that is above us. And lo, on his hand lies a thick grey scale of rock, bearing a perfect impression of a leaf! It is of delicate ovate form-less acuminate than the lily of the valley, which it greatly resembles with entire margin, and a venation which might be called *divergent*, since it is intermediate between the midribbed and the parallel modes. This was, indeed, a treasure, and in all our visit we had no happier moment than that when our eyes were the first to behold the tiny nature-secret that the sea tucked up in her mud-blankets so many long ages ago.

It was Saturday afternoon, and our experience had all the charm of novelty when, after sitting on a throne of black diamond for some twenty minutes, we were put into the front rank of the men going up, and entered the top compartment of the age to make the ascent. Oh, the speed of that journey! At first it was easy enough to look round and make observations on the strata we were passing through—at that time we were rising at the rate of 400 yards per minute—but suddenly came the sensation of a swift fall, a fall too swift and sudden to allow even of terror, or of anything but complete physical bewilderment; one barely grasped the fact that something had snapped, and that we were sinking, and the sun was shining, we were at the top, and it was time to get out. The motion up had been so rapid as to seem like a descent, and we had "our own erratable temperature" to blame for taking it at its quickest. But it ought to be said that even in case of accident in overwinding it is not possible for the cage to drop, for the pulleys are so contrived that the instant a rope is detached from the cage, a kind of iron plate runs up and prevents any further uncoiling, thus effecting a stoppage. A clocklike instrument in the engine-room records the time and the exact place where the cage is arrested. It is thus with everything. Accidents are guarded against, but every provision is made for them should they occur, and she who would feel nervous on a visit like this would be like that absolutely cautious man, whose only rational security lies in instant suicide.

The ventilation is a matter of great interest. The method of mechanical suction is employed at Bersham, by which, while pure air is received in the mine through the principal shaft, the impure passes out by a vent specially constructed for the purpose. At the top of the second shaft a great wheel, thirty feet in diameter, is kept revolving at a rate of 4800 times per minute. This sucks up the hot impure air, and hence the name of the process. In some mines a great fire is kept burning

between the two shafts, and this is termed furnace ventilation.

The water supplying steam to the powerful machinery at Bersham is obtained from the permeable rocks through which, of course, the upper part of the bore has been made. The difficulty of pumping this water from its great depths, is overcome by the hundredfold multiplication of leverage in the engine-room.

There they lie bright steel ropes, some flat, some round, two inches in diameter more or less, coiled round the great metal drum; they are renewed, we are told, on the slightest appearance of fraying, and are examined carefully day by day.

Great had been for us the pleasure of the past hours, but when we stood beside the great iron monster, and knew that to a Watt and to a Stephenson, aye, to the very men around us, these things would be simple explicable facts, human influences, but of motion more regular and certain than vital functions ever could be, a daily living miracle of cause and effect; oh, then, in all the enjoyment of sight-seeing lay the humiliation of ignorance, and the sharp point of resolve for future doing.

In that resolve was the day's fruit, whereof all other thoughts and words had been but blossom, and it is in the hope that some other may be inspired to plant a like seedling tree of knowledge in her mental garden, that we venture to offer this humble bouquet from our reminiscenes of a coal mine.

It would be so easy in this country were but instruction organised, to learn much of mechanics, much of geology, much of physics; it would be so easy every way, for here are heads that know, hearts that will aid, and illustrations on a gigantic scale. We do not ask for power to spend £17,000 or £22,000 wisely, as Mr. Pattison has twice proved his ability to do. For that, we must establish a Mining College; but we do ask for increased perception, stronger faculty, larger knowledge of all that comes to us through eye and ear, in a word, for mental hygiene—for Science.

Our opportunities are great for learning and for collecting. Not long ago the trunk of a tree seven feet high was discovered in the very mine of which we are speaking, and it was sent—where? *To the South-port Museum!* It is a case of "Ask, and ye shall receive," but how is it with us when we ask not?

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS

[মার্গারেট নোবেলের বয়স যখন মাত্র একুশ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কের সীমাকে স্পর্শ করেছেন, সেই সময়ে 'এক বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধা নারীর' ভূমিকা নিয়ে যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে, এক পত্রে প্রকাশের পরে

পত্রান্তরে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল। নারীর অধিকার সম্বন্ধে এই ৬টি প্রবন্ধ মার্গারেট নোবলের চরিত্রের অনেকগুলি দিককে উদ্ঘাটিত করেছে। লেখাগুলি বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত, তা লেখিকার প্রতিভার লক্ষণ, কিন্তু তিনি যে বৃদ্ধার ছদ্মনামে এগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে আছে তাঁর স্বভাবের লক্ষণ। মার্গারেট জন্মবৃদ্ধা, জন্মবিজ্ঞা; বিদ্যালয়ে সমবয়স্কদের তিনি সমান মনের মনে করতেন না, পরবর্তীকালে বয়োজ্যেষ্ঠদেরও অনেক সময়ে সন্তানবৎ দেখেছেন। লেখাগুলিতে অধিকন্তু শিক্ষয়িত্রীর মনোভঙ্গি রয়েছে; মার্গারেটের বৃত্তির প্রতিফলন সেখানে দেখা যায়। ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ, ইতিহাস-সত্যকে অধিগত করার ক্ষমতাও প্রবন্ধগুলিতে দেখতে পাই। ইতিহাসের তথ্যজ্ঞান শুধু নয়, গভীর মননের সামর্থ্যও, তথ্যের উপরে দার্শনিক ভাবনার গভীরতা অর্পণের চেষ্টা ও তাতে সাফল্য লক্ষণীয়। পাঠকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন, লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি তথাকথিত বৈপ্লবিক, অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনশীল। বিদ্রোহের পতাকার বদলে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনবোধকেই বহন করতে চেয়েছেন তিনি। সেইজন্য মনের স্বাস্থ্যের মত দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাই বলে লেখিকা নারী-অধিকারের প্রচলিত দাবির বিরোধী নন। ওসব সাধারণ বুলি তিনি মেনেই নিয়েছেন; তাদের যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন নি। আসল প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশের, স্বক্ষেত্রে নির্বাচনের এবং সামগ্রিক সমাজ গঠনের। পুরুষের কাজ আত্মসাৎ করে কি নারী সেই সামগ্রিক সমাজ গঠন করতে পারবে? উত্তর—নিশ্চয়ই না। সমাজে যদি গৃহ থাকে, যদি সন্তান থাকে, তাহলে সে সকলের সুষ্ঠু সংরক্ষণের প্রয়োজনও থাকবে, এবং নারীকে প্রধানতঃ সে ভার নিতে হবে।

নারী-অধিকারের বাতাসে ভর করে যেসব আবর্জনা উড়ে এসেছে, তাদের বিষয়ে কঠোর সমালোচনা লেখাগুলিতে আছে। আধুনিকতার অর্থ দাঁড়িয়েছে পুরুষের মন ভোলানোর জন্য নিজেকে অধিক লোভনীয় করার প্রতিযোগিতা। মার্গারেট নোবল এই হীনমন্যতার বিরুদ্ধে নারীর অধিকার ঘোষণা করতে চেয়েছেন। এর ঠিক উল্টো দিকে আছে, *শারীরিকভাবে যা প্রধানতঃ পুরুষের কাজ; সেগুলিকে* প্রাণপণে অধিকার করার চেষ্টা। এই প্রগতিও লেখিকার মনঃপূত নয়। তাঁর মতে, নারী-অধিকার মানে নারীর নিজস্ব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকার।

প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আজকে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় কারণ হঠাৎ-শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা এখানে পুরুষের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট এবং ফ্ল্যাট ছেড়ে হোটেল—মোক্ষ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর অনেক চিন্তার সাদৃশ্য আছে। স্বামীজীর বক্তব্য অবশ্য আরও মূলগত। যাই হোক, একথা বলা চলে, স্বামীজী নিশ্চয় মার্গারেটের তখনকার চিন্তাপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েই তাঁকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগের ইচ্ছা করেছিলেন।

নিবেদিতার চিন্তাধারার স্তর নিয়ে যাঁরা চিন্তা করবেন, তাঁদের কাছে প্রবন্ধগুলি অবশ্যপাঠ্য।

প্রথম প্রবন্ধ : নারীর সৌন্দর্যের অধিকার : এই অধিকারের দাবি সহ 'একজন বৃদ্ধা নারী পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়েছেন, মাথায় চোখ বসিয়ে এবং হাতে নোটবই

নিয়ে।' সৌন্দর্যের অধিকার-দাবি বলতে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, গোড়াতেই তাকে দূর করেছেন—সৌন্দর্যের অধিকারের লড়াই কিন্তু যথেচ্ছ প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহারের পক্ষে লড়াই নয়। তারপরে একটিমাত্র কথায় সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন—তা হল 'হার্মনি', যা নারী ও পৃথিবী, ফুল ও কবিতার সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। এইসঙ্গে সাহিত্য থেকেও দৃষ্টান্ত দিয়ে হার্মনি কি, বোঝাতে চেয়েছেন।

সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের যোগ অঙ্গাঙ্গি। দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে সচেতন হতে শুরু করেছে সকলে। সুতরাং এইবার 'নারীর জন্য সেই বিশেষ শিক্ষা দাবি করা দরকার, যাতে তাদের অনস্বীকার্য অধিকার—স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষার অধিকার।' সে শিক্ষার উদ্দেশ্য—'ফ্যাসানের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তার পরিবর্তে অধিক বৃহৎ, অধিক মুক্ত, অধিক গৌরবান্বিত এবং কম ক্ষতিকর সৌন্দর্য ও শিল্পের সেবা।'

ফ্যাসানের তামাসা নিয়ে 'বৃদ্ধা নারী' অনেক তামাসা করেছেন। ফ্যাসানের চেহারা কী?—শক্ত জুতো পরে পা ছোট রাখা, সেই ধরনের গ্লাভস পরা, যাকে নাকি অপরে সুন্দর বলে প্রশংসা করে, কয়েক সের ওজনের পোষাক দেহের এক জায়গায় ধরিয়ে দিয়ে অন্য জায়গাটিকে প্রায় স্বচ্ছাবৃত রাখা। চশমার অত্যন্ত পুরু কাচের মধ্য দিয়েও বৃদ্ধা নারী যা দেখেছেন তাতেই চমৎকৃত, শিহরিত। পীনবক্ষা রমনীর ক্ষীণকক্ষা হবার কী প্রাণান্ত প্রয়াস! 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', বৃদ্ধা লিখেছেন, 'যে-সব নারীর অন্তঃশরীর সুস্থ, তারা কোমরকে কাঁধের পরিধির এক-তৃতীয়াংশে দাঁড় করাতে পারে না।'

আতঙ্কিত বৃদ্ধা প্রশ্ন করেছেন—ক'জন জানে যে, তলপেটে ফিতে বাঁধলে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে চামড়ার রঙ জ্বলে যায়? উঁচু-হিল জুতো দৃষ্টি দুর্বল করে, শিরদাঁড়ায় চাপ দিয়ে মাথা ও শরীরের ছাঁদ নষ্ট করে? পোষাকের অসম সংস্থাপনে রক্ত সঞ্চালন যথাযথ হতে পারে না, তার বিপদ সম্বন্ধে কতজন অবহিত? পারিবারিক ও নাগরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই ক'জন নারী সজ্ঞান?

ফ্যাশানের পুতুলের দল আর্টের সঙ্গে ফ্যাশানের তফাত বোঝে না। আর্ট দিয়েছে—গ্রীক দেবদেবীদের স্থায়ী লাবণ্য, র‍্যাফেলের সেন্টদের নারী-মডেল, দিয়েছে রুবেন্সের সৃষ্টি-সন্ততিদের। আর ফ্যাশানে পাওয়া গিয়েছে ভিক্টোরিয়ান যুগের কোমরে দড়ি-বাঁধা পোষাকের খ্যাপামিকে।

'স্বাভাবিক, মুক্ত সুসমঞ্জস'—নারীর মধ্যে এইসবই সুন্দরের নিশানা, যেমন দেখা যায় ভাস্কর্যে। এ জিনিস ফ্যাশন-পান্ডারা মেনে নিলে তবেই আবার ইংলন্ডের নারীরা প্রাচীন গ্রীসের নারীর মত লাবণ্য-সচ্ছন্দ হয়ে উঠবে। এবং ফ্যাশনের দায় না ঘুচলে কখনই ইংরেজ নারী তার শারীর শক্তির সকল সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারবে না।

নারীর স্বাস্থ্য, অর্থাৎ শক্তি, অর্থাৎ সৌন্দর্যের পক্ষে ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছেন এই 'বৃদ্ধা নারী' অনবদ্য ভাষায়। মানবতার মহাযজ্ঞে নারীই পুরোহিত। মানুষের কাছে অমৃতপাত্র তারাই বয়ে আনে। তাদের স্বাস্থ্য-সাধনায় যদি ত্রুটি থাকে তাহলে সে অমৃত বিষ হয়ে যাবে, মৃত্যু ঘনাবে সৃষ্টির উপরে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ : কর্মের (ও সেবার) অধিকার : গোড়ার দিকে খ্রীস্টবাণী উদ্ধৃত—বড় যদি হতে চাও, আগে হও ভৃত্য।

নারীর কর্মাধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে নানা সামাজিক সমস্যা জড়িত, যেমন বাইরে চাকুরিতে নারীর অংশগ্রহণের ফলে পুরুষের জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হবে কি না।

এইসব সমস্যার দিক ছেড়ে দিয়ে 'কাজ' করার সহজ দিকগুলিই আলোচিত হয়েছে।

গৃহ নামক কর্মক্ষেত্রে নারী আত্মবিস্মৃত সেবা-কর্মের সুযোগ পায়। বাড়ির প্রতিটি কাজেই তার দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে, যতই সে শিক্ষিতা বিদগ্ধা হোক। "যে মহিলা সুন্দরভাবে টেবিল সাজাতে পারেন, ডিনারের রান্নার সুব্যবস্থা করতে পারেন, ঘরের সবকিছু প্রয়োজনমাফিক সাজিয়ে রাখতে পারেন, তারপরে অতিথিকে হৈ চৈ না বাধিয়ে বা ভঙ্গ না করে সহজ সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা করতে পারেন, তিনি নারীকুলচূড়ামণি মহাপণ্ডিতার চেয়ে বহুগুণে উচ্চদরের নারী।"

পুনশ্চ—যে মহিলা অবিলম্বে 'সাপার'এর পরিকল্পনা করতে পারেন, যা একই সঙ্গে সহজ সুন্দর অথচ পুষ্টিকর, গৃহশৃঙ্খলা যিনি রক্ষা করতে পারেন, বুদ্ধির সঙ্গে ভৃত্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সে মহিলা 'নারীর অধিকার' অনেক বেশী বজায় রেখেছেন—ঐ সমস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সমর্থ কোনো মহিলার তুলনায়।

সুতরাং নারীর পক্ষে বলাই বাহুল্য বাড়িতে বিপদ আপদ ঘটলে, কাটা পোড়ার ক্ষেত্রে, এমন কি মাথা-ধরার ক্ষেত্রেও, কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা জানা দরকার; কোন্ খাদ্যের সঙ্গে কোন্ খাদ্য মেশালে ভালো হয় তাও; খাদ্যনীতি নিয়ে অনেকখানি আলোচনাসহ 'বৃদ্ধা' তা জানিয়েছেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শারীর সংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের জন্য। ঘর-পরিষ্কার রাখা থেকে শুদ্ধ জল পানের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কিছু বাদ যায়নি, কারণ—"ছোট ছোট জিনিস নিয়েই জীবন।"

তৃতীয় প্রবন্ধ : গৃহ নির্বাচনের অধিকার : সেবা ও কাজের পরে স্বতঃই আসে শাসনাধিকারের প্রসঙ্গ। তার বদলে এগিয়ে আনা হয়েছে গৃহ সন্ধানের ও গৃহ নির্বাচনের প্রশ্নটি।

যাঁরা প্রাসাদ কিনবেন তাঁদেরও জানা দরকার কী কিনছেন। কিন্তু সেই মহাভাগ্যবতীদের সাহায্য করার অভিপ্রায় নেই 'বৃদ্ধা'র,—তাদেরই সাহায্য প্রয়োজন যাদের স্বামীরা সংসারের বোঝা বইছে ধুঁকে ধুঁকে, কিন্তু সংসারের দিকে দৃষ্টি দিতে পারছে না কোনমতে। ফলে দায়িত্বটা প্রধানতঃ পত্নীর।

বাড়ি বাছবার সময়ে বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে ভাল কি নয়, সেদিকেই বড় নজর দিলে চলবে না, যদিও তার মূল্য যথেষ্ট। একথা সত্য, যদি শুধু সুন্দর একটি বাড়ি আর আলোবাতাসপূর্ণ বাড়ির মধ্যে বাছতে দেওয়া হয়, খুব কম জনই শুধু সুন্দরকে বাছবে। এটুকু স্বাস্থ্যবিধি সকলেরই জানা হয়ে গেছে, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু নয়। সীমাবদ্ধ আয় যেখানে, সেখানে বাড়ি বাছবার সময়ে বাড়ির আকার বা অবস্থান নিয়ে (তা উঁচু কি নীচু জায়গায়, কোন্ মুখো বাড়ি তা) খুঁতখুঁতুনির বিলাস সম্ভব নয়, কিন্তু খুব কম জনই জানে জমির প্রকৃতি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ;

জল হলে কি জমিতে কাদা হয়, নাকি অবিলম্বে শুকিয়ে যায়?—এইসব কথা। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, বড় শহরে বাড়ির জমি তৈরী হয় নোংরা জিনিস দিয়ে ভরাট করে, যাতে রোগ-জীবাণুর সীমাসংখ্যা থাকে না। গৃহিণীরা এসব জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হলে যা-তা বাড়ির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

দরজা জানলা আছে কি না, গৃহিণীরা দেখেন, কিন্তু ভেণ্টিলেশন সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টি নেই। মেঝে কি রকম কেউ লক্ষ্য করে না; যদি স্যাঁতসেঁতে হয়, কার্পেটে ঢেকে রাখে; ফলে রোগের সহজ শিকার হয়। নর্দমা-ব্যবস্থা উপযুক্ত না হলে মহামারী ঘটতে পারে, এ সম্বন্ধে কতজন সচেতন? চিমনীতে ধুলো বা কম্বল শুকোচ্ছে দেখা যায়। তার মানে শুদ্ধ বাতাস সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণারও অভাব। একথা সত্য যে, সব রকমের দোষ ধরতে হলে অনুবীক্ষণের দরকার হবে, এবং, ঐ যন্ত্রটি হাতে নিয়ে কোনো গৃহিণী বাড়ি খুঁজতে বেরুবেন কেউ আশা করে না, কিন্তু তাঁরা জীবাণুশোধক জিনিস দিয়ে বাড়ি ও পারিপার্শ্বিক বৎসরে একবার শোধন তো করিয়ে নিতে পারেন।

পুরুষেরা ধরে নেয় মেয়েরা ললিত লবঙ্গলতা। সে ধারণা ত্যাগ করে যদি তারা মনে করে যে মেয়েদের মন নামক পদার্থ আছে এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তাহলে দেখা যাবে মেয়েরা নিজেদের কাজ নিজেরাই চালিয়ে নিচ্ছে।

আর 'বৃদ্ধা', মেয়েদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পুরনো কথাটা—অধিকার মানে দায়িত্ব।

চতুর্থ প্রবন্ধ : অগ্রগতির অধিকার : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, এই বক্তব্য দিয়ে প্রবন্ধের সূচনা।

'বিবর্তন' হল ইতিহাস-নগরীর সমুচ্চ মিনার, যেখান থেকে সব কিছু লক্ষ্য করা হয়। ঐ বিবর্তন-মিনার যেহেতু ইতিহাস-ভিত্তিতে উত্থিত, সেই কারণে 'নারীর অগ্রগতির অধিকারে'র আলোচনায় অবশ্যই ইতিহাসের পর্যালোচনা আসবে। 'বৃদ্ধা' অগ্রগতির ইতিহাস নিয়ে কিছু বিস্তৃত যে-আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ইতিহাসজ্ঞান।

নারীর স্বভাব লক্ষণের আলোচনায় জানিয়েছেন—দুটি লক্ষণ অধিকাংশ নারীতে প্রধান, কিন্তু সাধারণতঃ দুটি গুণ পূর্ণ ব্যক্ত হয় না এক দেহে। গুণ দুটি হল—আত্মমর্যাদা ও আত্মবিলয়। প্রথমটিকে নষ্ট করে আবির্ভূত হয়, ফ্যাশান, পোষাকের নানা ঢঙ ইত্যাদি; দ্বিতীয়টির বৃদ্ধিতে পাওয়া যায় ক্যাথারিন ডগলাস, জোয়ান অব আর্ক, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল; এবং গৃহজীবনের শান্ত বীরাঙ্গনাদের, যাঁদের গুণাবলী সংসারসীমার বেষ্টনী অতিক্রম করে না।

নারীর এই দুই শ্রেষ্ঠ গুণের ব্যতিক্রম চেষ্টা 'বৃদ্ধা'র কৃপার হাসি উদ্রিক্ত করেছে। আত্মমর্যাদাহীনতার বহু হাস্যকর দৃষ্টান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় রয়েছে। যথা, ইংলণ্ডের এক রানীর শিরোভূষণ এমনই উচ্চ ও প্রশস্ত ছিল যে, তাঁর জন্য দরজা উঁচু ও চওড়া করতে হয়েছিল!

অতঃপর 'বৃদ্ধা' ইংরেজের গৃহজীবন-ব্যবস্থার স্তর-পর্যায়ের উৎকৃষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। তাতে নানা কালের ঘর-দোর, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, দৈনন্দিন কর্ম ও অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জীবন্ত ছবি পাই। অ্যাংলো-স্যাক্সন কালে

শোচনীয় অবস্থা—তখনকার কাঠের বাতা বা মাটিতে তৈরী খুপরি-ঘর, আলো-বাতাস আসার জন্য তাতে গর্ত, সেই গর্তে বাইরের জল-বায়ু আটকাবার ব্যবস্থা নেই, ঘরের মাঝখানে আগুন, চিমনি নেই, ফলে দেখা যায় ঘরের ধোঁয়া ঐ গর্তটি দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে এবং বাইরের বৃষ্টি ও বরফ ঢুকবার চেষ্টা করছে,—সেই মৃত্যু-নরক! গৃহসজ্জাও অনুরূপ—ভেড়ার চামড়ার বা খড়ের বিছানা, কাঠের বালিস। তারপরে নর্ম্যান যুগ, টিউডর যুগ ; মধ্যবর্তীকালে লণ্ডন শহরের বিবর্তন, বিখ্যাত ইংরাজ মধ্যবিত্ত সমাজের উদয়। লেখিকা, গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও তথ্যজ্ঞান-সহ বিস্তারিত বর্ণনার শেষে জানিয়েছেন, অতীতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারীকে 'প্রাথমিক' (ইনি 'বন্য' 'বর্বর' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে অনিচ্ছুক) জীবন যাপন করতে হয়েছে। *দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে সেই জীবনকে নারী অতিক্রম করে এখন 'যথার্থ* প্রগতি ও জ্ঞান লাভের' অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

পঞ্চম প্রবন্ধ : জ্ঞানের অধিকার : নারীর জ্ঞানের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে জ্ঞানী 'বুদ্ধা'র স্থবিরত্ব নাড়া খেয়েছে, কাব্যিক না হয়ে পারেন নি, কারণ পৃথিবীর মিষ্টতম, দারুণতম শব্দ—'To know'। জ্ঞানের বিষয়ে ভাবগাম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন : আত্মার মানমন্দির—যেখানে মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের নক্ষত্র-ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়। নির্বাকে অনন্ত আকাশের পারে, হিসাবহারা অতীতের ক্ষীণালোক থেকে বিশ্বগণ শান্তি ও আলোকের বিরাট তরঙ্গ পাঠাচ্ছেন, তাকেই মানবমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যে সংহত করে আমরা বলি—'আমি জানি!' আর তা বলার কী অসীম যাতনা ও আনন্দ!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ঐ অনুভূতি ক্ষণিকের। যদিও বলি, পরিক্রমণশীল গ্রহ থেকে আমাদের বুদ্ধি নামক লক্ষ্যবস্তুতে চিন্তা-শর-নিক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্ধ হয়েছে, —তবু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, জ্ঞান নয়, অজ্ঞানেই আমাদের অধিকার।

এর পরে জ্ঞানের অসীমতা এবং মানববুদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে পুনশ্চ গভীর কাব্য।

তারপরে 'বুদ্ধা' বলছেন—অতএব সেই বিরাট চৈতন্যের সামনে মানবজাতির মহানতম আত্মাও প্রণত হয়ে নম্রকণ্ঠে বলে, 'আমি জানি না',—যখন বলে তখনই নিঃসন্দেহে বোঝা যায় সে জানে—আগের থেকে অনেক বেশী জানে।

জ্ঞানের যেখানে এই অপূর্ব উন্মাদনা, সেখানে শতাব্দীর মুক্তিতে আনন্দে পাগল-হওয়া নারীরা যদি ছুটে যায় মানবপ্রজ্ঞার পুণ্য, মহাপুণ্য লাভের জন্য, তথাকথিত গৃহকর্ম বা সজ্জাব্যবহারের চর্চা-দাসত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে—তাহলে অবাক হবার কী আছে!

জ্ঞানচর্চায় নারীর উপর 'প্রতিভার' অবতরণ ঘটতে পারে, আর প্রতিভার কোনো আইন নেই, নিজের রাজকীয় নিয়ম সে নিজেই তৈরী করে নেয়। এই 'প্রতিভা'-কন্যাদের বাদ দিয়ে 'বুদ্ধা' মাঝারি ধরনের নারীদের কথাই বলতে চান, যাদের জ্ঞানের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠেছে।

ফল কিন্তু সর্বক্ষেত্রে উত্তম নয়। জঘন্য পরীক্ষাযন্ত্রের পেষণ। তার বদল চাই। "আমাদের নারীদের জন্য দুর্বোধ্য-জটিল বিষয়ে নির্বিচারে শিক্ষাদানকে কখনো সোচ্চারে সমর্থন করতে পারি না।" বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতেই নারীশিক্ষা

চাই। মনে রাখতে হবে, মুখ্যবিগ্রহের কতকগুলো তারিখ মুখস্থ হলেই অশিক্ষার অপরাধ দূর হয় না।

সুতরাং আসল প্রয়োজন যুক্তিচালিত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনবোধ। সে যুক্তিবোধ সঞ্চারিত হলে নারী তার আলোকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ বিচার করে নিতে পারবে। তা যে, সে করতে পারে, এই নৈতিক ধারণা নারীর আচরণ এবং পারিপার্শ্বিকের উপর অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্বনিয়ম, যা অভ্রান্ত অভঙ্গ, জীবন তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে নিয়ম ভাঙা যায় না। যে ভাঙতে চায়, সে কোনো না কোনোভাবে তাকে পালন করে। নারীকে এই সত্যটি তার কর্মজীবনের সর্বত্র প্রয়োগের কথা শেখাতে হবে।

অজ্ঞান পরিব্যাপ্ত বলে দায়িত্ববোধের অভাব চতুর্দিকে। যেমন স্বাস্থ্যনীতি ও বংশগতি সম্বন্ধে নারীর ধারণা বদলের দরকার আছে। পারিপার্শ্বিক কী প্রচণ্ডভাবে মানসিক ও নৈতিক কর্মকে প্রভাবিত করে!

ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ মানে নৈতিক নিষ্ক্রিয়তা নয়, সম্ভাব্য সকল পাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ : শাসনের অধিকার : এই শেষ প্রবন্ধে মূল কথাগুলি লেখিকা একসঙ্গে বলতে চেয়েছেন। বহির্জীবনে নারীর অধিকার অস্বীকার করা নয়, গৃহ-জীবনে অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য। রাজা লেমুয়েলের মায়ের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—শক্তিতে প্রচণ্ড, মনীষায় বিরাট মহিমান্বিতা রাজ্ঞী হওয়ার চেয়ে শান্ত সমর্থ ব্যস্ত গৃহিণী হওয়া বাঞ্ছিত।

এর বাইরে যদি নারী কিছু চায়, তার বিয়ে করা চলে না।

সেণ্ট লিউক অঙ্কিত 'ক্রাইস্ট অ্যাজ্ দি গ্রেট ফিজিশিয়ান' ছবিটির মর্মকথা লেখিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। খ্রীস্ট ব্যথাদুর্বল দেহের নিরাময় করছেন, তেমনি নিরাময় করছেন পৃথিবীর ভারাতুর আত্মাদের।

'বুস্থা' নারীর আবেদন—এই আলোকপ্রাপ্ত যুগে, যেখানে মানবজীবন গতিশীল পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় আক্রান্ত, সেখানে নারীর দায়িত্ব গভীর, সে দায়িত্ব যেন তারা পালন করে। যদি তারা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেদের কর্তব্য পালন করে, তাহলে গৃহ-পরিবার-নগর-জাতি হয়ে উঠবে শক্তিপূর্ণ সমর্থ পুরুষে পূর্ণ, বুদ্ধিমতী, সৎ স্বভাবা, সুন্দরী নারীতে পূর্ণ, স্বাস্থ্যবান শিশুরা অখাদ্যের সঙ্গে সেখানে অপরিচিত এবং সমাজ বদমাস ও উন্মাদদের কবল থেকে মুক্ত।

'বুস্থা' সবশেষে তাঁর মূল বক্তব্যকে সংহত আকারে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। সেগুলি, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূলতঃ নাগরিক কর্তব্য সম্বন্ধীয়। 'সিভিক এণ্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস্'-এর লেখিকা ভগিনী নিবেদিতাকে পূর্ব জীবনেও সমভাবে জীবন্ত দেখি। সমাজ গঠন করতে হলে শুধু উচ্চ কথার ফানুস ওড়ালেই চলে না, বাস্তব সংসারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, এবং অন্যের উপর দায় না চাপিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করতে হয়। ভলটেয়ারের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন—মানব-সম্পর্কিত সব কিছুই মানবের মনোযোগের যোগ্য।

সুতরাং 'বুথা'র মোট নিবেদন—

(ক) মানব সমাজের সমস্ত কিছুই—ব্যক্তিগত বা সামাজিক, শারীরিক বা মানসিক—যে-সব প্রাকৃতিক নিয়ম এদের নিয়ন্ত্রিত করে তাদের অনুযায়ী অবিরত পরিবর্তন, প্রগতি বা অধোগতির অধীন। এই প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বাস্থ্যনীতি বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলা যায়।

(খ) প্রতি শহরে বৃহত্তর মানবশ্রেণী অতি নিম্নস্তরের জীবন যাপন করে। তারা উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে, কারণ অবিরত তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যনীতি ও অন্যান্য নীতি লঙ্ঘন করছে। এই শ্রেণীর মানুষেরা শারীরিক ও নৈতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত।

(গ) বিষয়টি সম্বন্ধে আইন-প্রণেতারা এতই স্থিরনিশ্চয় যে, সর্বত্রই আমরা স্বাস্থ্য-সংস্থা, পরিদর্শক ও নিয়মাবলী পাই—প্রয়োজনীয় নিয়ম পালনের জন্য বাধ্যতামূলক বহুল নির্দেশও।

(ঘ) এইসব বাধ্যবাধকতা যে যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়নি, নিম্নতম শ্রেণীসমূহের যে-কোনো সতর্ক পর্যবেক্ষকই অবিলম্বে স্বীকার করবেন। রেক্সহ্যাম শহরের অঞ্চল-বিশেষে এমন দৃশ্য দেখা যায়, যা লজ্জা ও ঘৃণায় মন ভরিয়ে দেয়।

(ঙ) ধরে নেওয়া যাক, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাদি যথেষ্ট কার্যকর নয়। সুতরাং আশা করতে হয়, শিক্ষিত ও বিবেচক নারীর পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব এমন হয়ে দাঁড়াবে যাতে নিম্নশ্রেণীকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করবে।

(চ) এর জন্য, না বললেও চলে, স্বাস্থ্যনীতির সতর্ক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ শিক্ষাদান সবিশেষ প্রয়োজন।

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 1

THEIR RIGHT TO BE BEAUTIFUL

By an old, old woman

(Reprinted from the *"North Wales Guardian"*, August 18th 1888)

Once upon a time, a very long while ago, perhaps as far away as Persia—somewhere near the Caucasus at least, and in the midst of primeval forests—a small hairy urchin—an advanced Radical had he only known it!—climbed on a woman's knee to play. They must have been alone; indeed she, perhaps, as women are apt to be, was somewhat lonely, for she did not repulse the child, though he was many months too old to be her nurshling. She let him gambol on, and, too ignorant for much language, may have given him a rude caress, with an indistinct but meaning fraught vocable now and then; some instinctive bond was touched, and the child laid his shaggy little head down on her shoulder, curled himself up within the encircling arms, and—not in the tender "Mutter!" of the north, not in the rich, broad "Madre!" of the south, but —in some fond sound, never heard till then, looking up into

her eyes, said "Mother!" The woman's heart beat faster, and that night each star as it came out, and peeped down between the trees, saw her still watching with love that knew no weariness, beside the sleep of the child who had called into her life a new intensity of passion.

At least it was in some such sweet fashion, doubtless, that in those far-off days arose the mighty question which, passing through all the stages of Radical, Liberal, moderate and extreme Conservatism has finally become part of history (of Mr. Herbert Spencer's history at any rate) under the name of the *Mutterrecht*, the woman's right. And holy the word has continued to be. True, "Right" is often confounded with "monopoly." Are woman's monopolies always holy? But it is not for an aged spinster (herself not free from the faults of her sex) to scold the scolds, and harangue the gossips! Spinsterhood brings with it the great blessing of peace, and who knows how far the *man* has desecrated his rights ere the *woman* degenerates into the virago? Sacred be the secrets of matrimony! Over *some* of the rights of women we will draw a veil. Nevertheless an old maid who has gone about the world with eyes in her head, and a note book in her pocket, may be pardoned if, at the end of half a century or so, she claims to be able to advise the young around her, if she gird her to the battle, and even attempts to deal the blows that are sharper than sword strokes in defence of the rights of her sex. Fear not, gentle reader, your task shall not be interminable. We only at present enter upon one ground of combat.

Inspired, then by all the passion of the wronged, all the bitterness of the cheated; by the vision of sculptured Venuses and pictured Madonnas; by jealousy of Persian Vashti and Alexandrian Hypatia, of Greek Helen and Roman Lucretia, of Austrian Theresa, and all the fair host of dead Stuarts and dead Bourbons, whose loveliness made all hearts its kingdom; so inspired and so envenomed, we would first claim, for each and every sister-woman, *the right to beauty*.

What! are we, women, to raise a tempest for the use of pearl-powder and rouge-pots, of hair-dyes and corsage-machinery merely? "Lo, all these have I used from my youth up," many a one of us may truly answer, "and behold what more or less of beauty they may have given."

This is *not* the beauty for which we contend. A very different, yet, a very brief definition have we of that perfectness of form and colour which men call beauty. Our definition lies in one word, but the word is ever expressive of the idea. Beauty, we believe, will be found a synonym for *Harmony*, and harmony is to us a term which expresses the fascination alike of women and worlds, of flowers and poems.

Had Shakespeare assigned to Lady Macbeth the sparkle of Rosalind, or the sweetness of Desdemona; had Dante written

the Divina Commedia in a style combining his own with Spenser's, or with Bunyan's, we might, indeed, have recognised the genius of the writers; but the glory of their works would be gone, since there would no longer be the profound union of all the parts to one another, nor that sublime Unity of Idea which stamps these creations as those of masters. Yet, Englishwomen and girls expect, by cramping their feet into boots tight enough to be very wearying "for the first few days," and their hands into gloves which cause them to be, or appear to be, the size which they happen to admire; by wearing many pounds of clothing on one part of the body, and leaving it most thinly clad in another, and by continuing this treatment for years or for generations, to produce a self or a descendant, who shall meet the national and artistic ideal of beauty. As well teach a kitten to be supple by putting it into corsets, or a child to be graceful by making it wear crinoline.

It may be urged that such abuses in clothing are not so common as they were a few years ago. This is true enough, but the reason is one which ought to put them out of existence altogether. Surely it is not incorrect to say that the present advance in opinion is due to more thorough and more scientific education in general. Let us go further and give all women the special education which is their undeniable right—an education in the principles of health. This teaching might and ought to be given by a woman. Let it be so, and while the first consequence would, doubtless, be to release them from the slavery of fashion, and the second would be their exchange into the larger, freer, more glorious, yet less dangerous, service of beauty and art.

For it is not to the Catholicity of Art that Fashion bows; she is a schismatic, the goddess of those who worship the artificial; she is local, frivolous, timeserving, and while to Art we owe the enduring loveliness of the Hellenic deities, and ladies of Raphael's saints, and Ruben's children, to Fashion we owe little more than an aesthetic art, parody, and the crinolines and dress absurdities of the Victorian era.

The Natural, the Free, the Proportionate, these are the Beautiful in women as in statues, and it is only when these are recognised by the devotees, as well as the leaders, of fashion, that the race will stand a chance of due progression of form. When that time comes, however, the women of England may well hope to be as fair and graceful as those of ancient Greece.

After all, thank God, it is not every woman—especially if the internal organs are in good condition—who can produce a waist of one-third the girth of her shoulders, or can ruin her vital capacity by tight lacing. But these, and other like evils, do prevail to such an extent, and are already entailing such disastrous consequences, that an old woman with very good spectacles may be pardoned for the suggestion that only

knowledge brings safety, and that neither present nor future generations of the English race will attain to their full physical possibilities, until English girls are taught what really are hygienic errors, why they are errors, and how they are to be avoided. How many girls—and it is to girls that all these things are chiefly applicable—how many girls are aware that tight lacing injures the liver? All, we trust, know that bilious attacks ruin the complexion. How many could show that high heels were a probable source of weak sight? Many more, doubtless, have heard that they engender curvature of the spine. How many of these will recollect they must thus interfere with the pose of the head and figure? How many realise the evils consequent upon bad circulation, and know at the same time that this is often an outcome of inequalities in the weight of clothing? And many who could answer some or all of these questions would be appalled were it clearly and truthfully demonstrated in how far physical development is retarded by bad ventilation; how greatly disease and death result from imperfect sanitary arrangements; or to what extent the remedies for these things lie unused in the hands of women.

For it is they who are the priests in the communion of humanity. It is they who bear the Chalice of Life to the race, and if they have not first sacrificed at the altar of health the wine is but a polluted offering, and by no means may they wash from their hands the guilt of blood, or put from their souls the bitter regret of having robbed the encharist of its glory, and mutilated a finer sculpture that was ever the Venus of Milo.

Transcendently does the great boon stand in the gift of the wife, of the mother, and of the housekeeper, yet even an old maid may make herself useful in these early hours of the battle, by pleading for what we all need so sorely—*an organised system of instruction where women shall be taught by a woman the principles of health.*

Hygiene classes of this nature ought to be established in every town; and if as a result of such teaching, women acquired higher ideals of beauty and grace, of form and proportion, along with the knowledge of how to attain to those ideals, the praise of future generations would be only part of the great reward of those who had thus promoted the health, happiness, and power of posterity.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 2

THEIR RIGHT TO SERVE

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian", August 25th, 1888.

Eighteen hundred years ago, in a small province on the shores of the Levant, there dwelt a gracious personage, whose

wondrous intuitions of sweetness and sympathy reached forward through more than twice nineteen centuries, and told truths, the perfect development of which as laws remains even to-day in the far distant future. We fear that too much of what passes for Christianity amongst us the lips of the Chirst would utter the words, "I never knew you" ; yet one saying of His was God-like in such human fashion that we humbly believe that amongst women, at least, the Galilean Teacher would see verified the exceeding insight of His words, would find the due fruits of His precept—"He that will be great among you, let him be your servant."

"Servant of the servants of God," says Lord Macauley, "was the proudest title ever claimed by the Roman Pontiffs," and "Servant of the servants of God" is the queenly dignity of every woman who faithfully takes her place in the home-throne that comes to almost all of us at some period or other of our lives.

It may, perhaps, be said, that on this ground of service the question of "women's rights" passes into the current slang of the day. In the usual acceptation of the phrase forms a deep socio-logical problem which our own inferior cerebrum must confess its inability to solve. Ever we study this great subject; never do we see a girl enter upon a clerkship or on some other branch of service once exclusively masculine, without thinking of the father whose bread-winning is being made a sharper struggle, of the young men who are thus being retarded from progress ; and as we muse, there recurs to us the thought of that tremendous growth of pauperism, and the terrible keeness of taxation for the support of the idle nobody's-poor, that make it impossible for a man to support adequately his own poor, and drives out daughters along with sons to take part in the baneful "struggle for existence," but—

"The life so short, the craft so long to learn," sings Chaucer of old. The poet is right. For us, with the snows of many winters upon us, the subject is too large, and under her grey hair an old, old woman is fain to give up its pursuits, and to turn her feeble and very feminine brains to a simpler aspect of "Woman's right to serve."

Woman's home. Rule and home service (for the two ideas are to some extent inseparable) have their root in her power of self-forgetting, in her devotion, and her greater craving for something to lavish tenderness upon, than for love itself. This spirit can only be satisfied by the performance of little loving offices, and the home life is the more fair and perfect in its broader outline, the more accurately and anxiously these details are carried out.

We have all seen homes of the greatest elegance and refinement, presided over by woman of cultured mind and polished manner; and the least observant must have noticed that the more prominent have been these traits, the

surer has been the discovery on better acquaintance that the mistress held the household reins in her own hands, and did not think it beneath her to make dinners that were miracles of ingenuity, to mend and darn in private, and to superintend housework in person. It is so, throughout the various degrees of middle-class life. The instinct of a gentle-woman will never allow these things to be prominent, but they are there all the same, and to us it seems that the lady who can arrange a Table prettily, set the cooking of a dinner on foot, see that every room is ready for use, and can then receive and entertain a guest with frankness and courtesy, without "fuss" or ostentation of one sort or another, is of infinitely higher type than any mere *grande dame* or *femme savante* whom we have ever met.

Indeed, it seems to us that she who can plan a supper at once elegant, simple, and wholesome, that she who can keep a house in order, and control a servant with wisdom, better upholds the rights of her sex than some more learned member of it, who may discuss the matter with more depth than she. The tact of a woman in adapting herself to her circumstances, will often prove enough; after more or less experience, to make her a tolerable cook and house-wife. In days gone by, girls were more under the training of their mothers in domestic matters than is now the case, and in those days we learnt to darn stockings and make bread at increadibly early ages. But our plea is not for enforced home-life for women; it is rather that the home-life which does devolve upon a large proportion of them sooner or later, should be rendered freer and higher by the infusion of the important element of knowledge.

At the occurrence of some domestic fatality, for instance, how great would the mother's relief sometimes be, had she any but vague ideas of the treatment to apply to a serious cut or burn, or of the value of such accessible remedies as strong coffee, green tea, vinegar, lime-water, or soap-suds, in various cases of accidental poisoning! How sad is it that she should so seldom understand even so simply a matter as tendency to headache, restlessness, and viritability in her own children!

And this knowledge, so useful in emergencies, is almost equally valuable in the ordinary routine of life. One may never need to practise artificial respiration, but how useful to every one would be a proper explanation of the science of mixed diet!

Different causes call for occasional variation in quantity, kind and combination of foods. We practise the necessary change, but could two women in fifty explain their own conduct in so doing? For instance, we would all provide ham or bacon to be eaten with veal and chicken, and not with beef or mutton; how many of us know why we would make the provision "Liver and bacon" forms one dish; we regard the oil as part of the

salad; it is a Lancashire habit to include a small piece of cheese amongst the ingredients of an apple pie. These things all have their reasons, but we no more seek for their motive than we make question of such customs as the throwing of a shoe for luck, the raising of the hat as a form of salutation, or the freedom of the mistletoe-bough at Christmas, all matters which likewise have their reasons. It would almost seem as if some of us found it impossible to think at all; nine out of ten people not previously instructed on the point, will be found ready enough to state that mastication is the only operation performed on food in the mouth.

Possibly we are all acquainted with the position of the tongue and teeth; not too many can point out likewise, the locality of liver, heart, and lungs, not to mention such more abstruse (!) matters as sweetbread, duodenum, and spleen.

We would that the wonderful story of alimentation were only half as widely conned as that of every murder and every execution that takes place on English ground!

The benefit to be derived from teaching girls the science of food is not altogether visionary, neither does this subject cover the whole of the ground which they must traverse, in preparation for high and holy household service.

Take the use of soap and water for instance. Few of us fully appreciate the *importance of these two commodities*. If servant girls were taught that careless washing of floors, paint, and furniture, laid themselves and their employers open to disease; if mothers knew how many childish illnesses might be prevented by the use of hot baths; and if all house-keepers understood the true nature of *dust*, there might indeed be no apparent change in the cleanliness of houses unimpeachable before, but there would be an influence at work beneath the surface doing undreamt-of service in stamping out zymotic disease.

Again, it is part of the matron's duty to provide her household with pure water. That this is important may be seen from the fact that typhoid and scarlet fevers; cholera, diphtheria, erysipelas, and skin diseases generally have all been clearly traced to impurities in drinking water. The difficulties in the way of obtaining the required liquid are not however, so easily perceived. The filter does not obviate the danger of disease germs, and on occasion of doubt of epidemic perfect security is only attained after boiling. It will, then, be readily acknowledged that the mistress of a house should understand the nature of pure water, and should be able to compare that which is supplied to her house with the true type. The educated eye can detect in water the taint of organic matter, mineral impurity, or sewage, just as the educated eye can at a glance realise the healthiness in position and sanitation of a given house. Why should not all women possess this power?

In wall-papers and curtains, clothing materials and unguents, parasites, mineral waters, kitchen utensils, and a hundred and fifty other commonplace objects, may be found similar food for thought and interest.

Life is made up of little things. Dinners and suppers, soaps and wall-papers, modes of cooking and composition of beverages, are not in themselves great matters. We all look down upon the natures that consciously and voluntarily yield to their sway. Yet, there is no doubt that in the subtle interactions of body and mind we are dependent on them. It is for the loving and conscientious service of mothers, wives, and sisters to make the dependence basis of gain and not of loss. *It is for the study of Hygiene.*

* * *

But here the old woman will put on her considering-cap, lest in her zeal to read a lesson she should be launching forth into a sermon, illustrative of the loguacity of old age.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 3

THEIR RIGHT TO CHOOSE (HOUSES)

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," September 8th, 1888.

After their right of service, it would have seemed fitting perhaps to have treated of women's right to rule, which forms the outcome of her service, but it seems to us that we have hardly given due share of gossip to the very ground of all their labours, the essential preliminary of all the home duty and family love of society. Let us then talk of *house hunting* and women's right to choose their homes.

It is hardly to the woman of fortune, whose assent is required in the selection of some mansion or villa, that our remarks apply, though even to her a more scientific mode of house valuation, a clearer and more definite idea of the merits of buildings, would doubtless be valuable. At the close of a long life, however, it is not such favourites of heaven that one longs to aid; rather do we aim at bringing the knowledge of health laws to those homes where the wife may be indeed the housewife, where the husband, worried by commercial or professional pressure, cannot look to servants for domestic comforts, where there is room and need for womanly tact, economy, and regulation, to those families who are most likely to be sufferers by the modern practice of jerry building.

In choosing a house, more has to be thought of than

prettiness or the lack of it. This plays an important part in the moral functions of the house, still, were we asked to take as alternatives, beauty on the one hand, and lofty, well-lighted rooms on the other, few of us would hesitate about taking the second. So much of hygiene we all formulate for ourselves in the ordinary routine of life. But beyond this few of us have adequate knowledge. Of limited purse, we may not think it reasonable to be fastidious as to position and aspect of the house we take, whether it stands high or low, faces north or south, and so on; but too few of us know how important is the nature of the *ground* on which our home is built. Let us take an illustration. In our own little town every reader has noticed that on a rainy day the Rhosddu roads get muddy, and that Pools of water remain standing long after the shower that caused them has passed off; the Erddig road and the elevated Part of Hightown, on the contrary, become dry immediately the rain is over; even a considerable downpour will leave no trace in half an hour's time. The difference arises from the diverse characters of the soil, and in one, being built on clay, will be found frequent instances of consumption, neuralgia, and rheumatism, while in the others, which are situated on gravel or sandstone, these maladies will not be nearly so rife. This is not all. There is a terrible custom of "making" soils for building purposes, common in large towns. Ground is often "made" in this way of dust, containing organic matter in a state of decay, disease germs, vermine, &c. The house built on rubbish and filth of this kind is in worse case than that built on sand, and the catastrophe attendant on its existence is likely to be correspondingly more terrible. The selection of houses by careful, well-informed women would be sufficient to drive such fraud out of the trade, and produce the survival only of the fit. This is one danger of ignorance.

Again, few matrons would take a house where doors and windows did not fit well in there frames, yet these crevices often form the only ingress for fresh air, and if they are not to be allowed (their discomfort and inconvenience are very real), some substitute must be found for the due performance of this function. Hence the househunter requires scientific knowledge of the *Principles of ventilation.*

At the same time we doubt that the draught from the floor of an unfurnished house would receive as much attention from most woman, as that from the door. She would cover the floor with a carpet, and never know, as might probably be the case, that through the carpet drain-air was filtering, and that the seeds of illness were possibly lodging in carpet and furniture, till some systemic weakness in those who lived in the room should make them an easy prey.

Most would be eagar to pitch their tent in some district of complete and air-tight sewers. Few would realise all that

fact was worth. It would simply mean that since sewer-gas could not escape into street or park, *it was all the more to be dreaded within the dwelling.* Cesspools are not good in themselves, but a case of epidemic has been known, where disease attacked houses in connection with a drainage-system that was the pride of its town, and altogether passed over certain cottages which each possessed a cesspool of its own (Spencer). It is comparatively easy to detect the commoner faults of this nature, but surely every householder would have a right to require diagrams of its sewage arrangements before taking any house, and that this knowledge might be effectively used, it is scarcely necessary to point out that women, as a rule, ought to know something of the *principles of drainage.*

Another class of difficulties falls under the head of *accommodation.* A small house for one family is doubtless a better rule for a population than a larger house for two families. This implies many things, and its discussion involves no little research, of a kind which no woman ought to omit. Legislation on the subject influence which might be brought to bear on the point, its physical and hygienic aspects, are matters which ought to be familier to every lady. They are not, perhaps, so important as others which we have mentioned, in the choosing of a house—not so theoretically important—because they are more likely to be carried into practice. Other knowledge there is, which all woman should possess, knowledge bearing on woman's right of choice, knowledge calculated to make wondrous increase of weight on the sorrowful side of the scales of the "might have been," but since it might also fall under another heading, and will be perhaps more palatable in a later paper, we will defer its discussion for the present.

Women are often blamed for being superfinal. We believe that no more unfounded opinion was ever current. When men will condescend to regard us as having minds, and when they will allow us free and sensible scope for our powers, in the form of solid education for our particular functions, we shall have pleasure in proving that we can discharge those functions unusually well. To an old maid we wish to give our opinion for what it is worth. The preservation of human health would seem one of the most important of those functions, and we believed that women only equipped with due knowledge to start from, would bring to bear on it the highest motives, besides keen faculties of reasoning and observation. In the particular matter which we have been discussing, their judgment would seem all important. There can be no doubt of the tremendous infiuence on life and function, exerted by ventilation and good or faulty drainage. It should be remembered that a population changes three times in a century ; hence any process of degradation or development will be comparatively quick in taking effect. At the same time the recent rapid growth of towns tends to

cause such influence as we have noted above, to make uniformly for degradation. We see but one remedy. If women cease to take ill-built houses, builders will cease to build them. The thin walled, damp, egg-shell dwellings so lamentably common at present, no longer finding tenants, would no longer find existence. The spread of hygienic science would indeed bring about that most desirable end—the survival of the fit.

At the same time, we have endeavoured to indicate—this did not seem the place to do more—the almost incredible ignorance which prevails on these matters. It is no uncommon thing to find a bag of shavings or rags stuffed up the chimney of a lodging-house bed-room, which could only be done in most utter ignorance of the value and management of pure air.

To detect many perils which lurk in walls, wall-plasters, wall-papers, and mortar, microscopical examination is often necessary. We do not claim that she who wishes to take a small house should go round, armed with visual and chemical apparatus, but we do claim that all should be taught the value of a yearly wash with disinfectants, and of the disinfectants which would be advisable to use.

But, enough; there is but one thing to be remembered, and we have done. It is that "Right" means "Responsibility!"—that she who claims must be prepared to act; and that she who wishes to know must be ready to learn.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 4

THEIR RIGHT TO ADVANCE

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," September 29th, 1888.

"What has been, what is, and what shall be."—All are summed up in one brief space of time. So intimately are connected the future and the past.

"Evolution" is but the watchtower of the city of history: without foundation in that city, the tower could never have been built, and only can we reach the conception of what progress in any direction may mean, by a careful survey of what progress has hitherto meant in the same direction. It is thus that we come to look at the question of "Women's Right to Advance". Her "right" must depend on the meaning of "Advance," and that, again, will be most clearly realised when we look at her past history, and see in what way her circumstances have already furthered her development.

First and foremost, it will perhaps, be well for us to examine into her *character*, that beginning with something like a true estimate of what she *is*, it may be the easier for us to find out what she has been.

We find, then, two traits strongly brought out in most women but not capable of their fullest display together—self-respect and self-forgetfulness. To the abuse of the first may be ascribed the frivolities of fashion in dress or other matters; to intensity in the second, such stories as that of Catherine Douglas,[1] of Joan of Arc, of Florance Nightingale, and of many a quiet domestic heroine, whose virtues have never transpired beyond the circle of her home-life.

History has many comical things to tell of that weakness which we have called the abuse of self-respect. For instance, we may all remember the story of our childhood, where a certain Queen of England is said to have adopted a head dress so broad and high, that the royal doorways had to be raised and widened for her accommodation.[2] In another age[3] bonnets were worn so tall, that a fashionable divine threatened his fair hearers with the vials of Divine wrath, for striving to add a cubit to their stature! To the frivolities of fashion, also we charge the abortive attempts which women make at intellectual cramming, the Lady Jane Greys and bluestockings of history.

But these freaks, proceeding from undue prominence of one feature, have had little to do with the historical progression of woman. That is based on the gradual blending and balancing of the two activities; the rest is mere excresence, eliminating itself age by age, from the economy, in the natural course of things. Again, we must remember that nothing can be viewed without due regard to the conditions which surround, and modify it—its environment. Thus, it is necessary that we should give a glance, however cursory, at the home customs of women, throughout the past centuries of English History.

In Anglo-Saxan times we find the houses of the "people" to be mere huts of lathes and earth, with holes in the wall to admit light. There was no protection against stress of weather, in these premitive windows, and as the fire was in the middle of the room, and there was no chimney, it is easy to picture the conflict of smoke escaping, and rain or snow entering by one aperture!

The houses of the higher ranks were sometimes built of stone, and were only one storey high. In the centre of the building was the hall, of which the dais was sometimes tesselated, while the lower floor was of clay. Benches sometimes ran round the walls, but sitting on the floor was quite admissible. Chairs were a mark of the highest rank; candles were made of grease plastered round a stick; the fire was in the middle of the room; the windows at best were only spaces filled with trellis work; masters and servants dined together (above

or below the salt), and the cooking was often done at the lower end of the dining-hall!

The sleeping apartments or "bowers" opened off this central room, and were very simply furnished, beds then and for long after consisting usually of straw, sheepskins, and a log of wood for a pillow. Such roughness was, of course, merely indicative of the state of its owners; but the main point for us is that even so we find in the women of those days many attractive and redeeming features. True, it was not thought unwomanly for the pretty coquette of the dining hall to act the virago and the slave-driver in her own bower, but this was a savagery to be expected of the age. It is somewhat wonderful to find that Anglo-Saxon ladies rejoiced in clean table-linen, in decorating their walls with tapestries and so on, and in cunning needle work and embroidery. It is something to be proud of, that, though our ancestresses used no forks, they atleast washed their hands after every meal; that they used the bath with Roman frequency, and made an essential of personal cleanliness. Curiously enough, too, we find that they studied physic, and cultivated herbs and flowers.

In Norman days, great ladies gained much in position and refinement, as mistresses of fudal castles. Their girlhood was almost invariably passed in convents, which we may suppose to have been open to the influence of whatever culture existed on the Continent. Later in life, the baron's wife was left in charge of his fortress during her lord's absences, as commander of troops and representative of his honour. At the same time, the warlike practices of the age required of every woman a knowledge of surgery, salve making, and sick nursing, and amongst the peaceful arts, of course, embroidery was the most prized. [Even during the reign of Edward the Confessor, we hear of an estate being left to a certain person, on condition that he taught this accomplishment to the testator's daughter.] This continued to be the case for centuries, so much so that the lace worn by Elizabeth in the authorised portraits, was worked by the fingers of Mary, Queen of Scots. With all that would seem to us gloomy, revolting, and brusque in the woman life of these far-off days, it is amusing to remember that the great S. Dunstan, *in the tenth century* had made himself fashionable by his talent for designing ladies' robes! It must be borne in mind (lest their should seem no sufficient occasion for the display of finery) that at least after the coming of the Normans, every English castle was in truth a college for pages, a school of embroidery for gentlewomen, a garrison for troops, and a hostel for king's messengers, guests, and chance travellers.

In the fifteenth century, the nobility began to use manor houses or halls, built of oak, and several storeys high. Strange to say, little advance seems to have been made in the decoration of the great hall, beyond the fact that it was strewed with

rushes or boughs in summer, and hay or straw in winter. It is curious to remember that not yet was the use of glass common, that chimneys were only beginning to be made, that thatched roofs were the rule even in London, and that forks were not used till more than two hundred years later. At the same time, owing to the fashionable habit of receiving calls in the bed-room, the furniture of that room began to be much improved. It is a comfort to hear that beds were made more healthy by being placed on bedsteads, and that the mattresses and curtains grew more modern in style.

Side by side with this civilisation of the highest ranks there was growing up, amongst London and other town populations, the great English middle class. This led to the building of substantial houses for their accommodation, and the form of building usually adopted was that of two or three storeyed houses, with each storey jutting out beyond the one underneath. The streets being originally narrow and lane-like, it may be imagined that this practice deprived people of air and light, even when out of doors, and when we add to this that the floors of these houses were usually clay, enamelled with dirt and rubbish of all kinds, and that the streets of London itself, up to the end of the seventeenth century, are described as "open sewers," it will be seen that there was a happy hunting-ground prepared for those disease-germs, which, under the names of "the plague," "the black death," and "the sweating sickness," seem to have ravaged the country so often during the mediaeval period.[4]

Civilisation having now advanced far enough to render societies infinitely more mobile than had been the case in Saxon or Norman days, women, as a whole, underwent many changes in ambitions, customs, status, and powers, between the end of the Plantagenet and the present days. During the thirteenth century, either they or the spiritual character must have been highly respected, for four abbesses were then summoned to Parliament![5] At the same time, old Chaucer tells, with less flattery two tales which throw greater light on the subject—"The Nun's Tale" and "The Tale of the Wife of Bath;" one worldly and frivolous, the other earthly and robust.

From this it is a startling transition to the "Higher education" of the Tudor period, when girls of rank were crammed with Greek and Latin, but were treated usually with a severity that forgot the weightier matters of parental love and mercy, and of a high ideal of family life.

Like all mere "fashions," this attack of the blues died out in time, and the next well-defined type that we meet with in English history is perhaps that of the Puritan struggle. Great times produce fine characters, and there can be no doubt that those years of turbulence, fanaticism, and gloom produced women of much purity and dignity; the more the pity that the reaction

was so strong. One thing is to be noted amongst all the littleness and modishness of Charles II's days, and that is, that while spelling was but dimly understood by ladies, they got up a great passion for the study of science, chemistry having become the rage at Court!

The life of the upper ranks during this reign, however, is best regarded as a frolic, and bearing this in mind, it is somewhat saddening to find, when the glare of French playhouses has passed off, and when the nation has blossomed into the literary elegance of Anne's reign, that the women of the period may scarcely be called participators in its pen and ink refinement, to find that they are not merely homely matrons pursuing a daily round of pastry making and cider brewing, but that they were illiterate, dull, and coarse in language and manners.

From the beginning of the Georges till now is a space that needs no elucidation from us. The spread of newspapers, the discovery of steam power, the use of gas, all the varied and extended activities of nineteenth century life, have been so many hands bringing to our doors that higher development which may well form the keystone of the arch of pure, natural existence.

That our lives are, to some extent, "natural" (we do not mean "wild" or "savage," which seems the popular notion of the word) results from the working out, however imperfectly, of nature's law. We are ready to believe, after our slight review of domestic habits in this country during the past, that life then was in all cases a "struggle for existence;" we are ready to acknowledge that we are now well on the uphill path. In the name of what has been done, then let us go still further, and let us take the first steps of all true progress in knowledge and understanding!

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 5

THEIR RIGHT TO KNOW

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," October 6th, 1888

"Women's Rights" is a battle-cry echoing so clearly the "higher education" turmoil that we feel that the task we have

---

[1] Catherine Douglas was the lady who replaced the bolt with her own arm, when the conspirators were forcing their way into James I.'s presence.

[2] Isabella, Queen of Richard II.

[3] Under the later Stuarts.

[4] This state of things was *only* done away with completely in 1665, the year of the fire of London. After this the city was rebuilt on more sanitary principles.

[5] Of Shaftesbury, Barking, S. Mary Winchester, and Wilton.

undertaken would be incomplete without an acknowledgment of the existence of that question, more especially as the particular "right" for which we have been pleading is neither more nor less than a branch of education which we do not consider widely enough disseminated in the feminine world. And so we come to talk about "Women's Right to Know."

Most sweet and awful word, "to know!" How we thrill with the mingled pain and rapture of the moment when, in the soul's observatory, in midnight solitude, we stand and gaze upon the star-wealth of our knowledge ; when across the silent Infinitudes of space, out of the dim reaches of the long-past ages, the world send their mighty waves of Force and Light, all the concentre in the tiny consciousness of our one human mind, and first we utter the words "I know."

It is but an instant, and it is gone ; exulting, we tell ourselves that our Intellect is the target to which an arrow-thought from a bow formed, mayhap, of the curve of some circling planet, has winged its way ; and even as we tell it, the rejoicing has died out, and in the humbler, truer fashion, we see that not Knowledge, but Ignorance, is ours. For there, in the solemn blackness of night, in the overarching majesty of the Eternal, our wisdom shrinks to nothing, and is seen hardly to exist, save in the fevered pride of our own brains. We find that all our problems and measurements, worked out with aching and weariness, all our guessings and calculatings, all our gleanings and hoardings, all our waverings and bewilderings, serve but to show us the true Gold-Dust of the Universe, that there, in the down-stretching space-depths, there, amidst the moving water-atoms of the oceans, nay, here, in our own minds and bodies, in the hoary rocks and in the sparkling icicles, in the rising mist and in the blushing leaves, there lives and works a Something, a subtle, impalpable Reality, not to be so much as conceived by us.

And thus, in silence and darkness, the grandest soul in our race must bow, and humbly, reverently, like a little child, in the presence of the Great All-Spirit, must say "I know not!" Nay, when he reaches the "know not',, it is incontestable that he does know, better than he ever did before!

It is a wondrous ecstasy, this blessedness of knowledge! And it is little marvel if women, in the larger freedom which this century has certainly brought them, should attempt to rush through the gates, at once to exchange the outer courts of duty and frivolity for the absorbing beatitude of the Holy of Holies of human wisdom!

Less excusable is the action of those who would force the mind of a girl into such a channel, when obviously uncongenial. "Even on Women" the mantle of Genius will fall sometimes, and genius is ever its own law maker, by its own Royal right. But while for genius we would have liberty to do all things,

we believe that for mediocrity also there ought to be liberty of another kind.

In these days of reaction, from the blindness and thraldom of the past—while it is plain that the present violence of examinational steam and cram will give way betimes to something wiser and gentler—it behoves us to do nothing to intensify the exaggeration of the hour, but to do all that in us lies to produce a sounded practice of education for those who come after us. Thus we would never, for our own part, lift our voice in favour of the indiscriminate instruction of our sex on abstruse subjects.

With a far different view have we been advocating women's right to the knowledge of a certain branch of science.

It seems an acknowledged conclusion amongst some of our greatest thinkers that to be acquainted with the date of the battle of Hastings can have no moral effect on a child, i.e., that the spread of elementary education cannot check crime. That this is true of the isolated facts of instruction we emphatically believe.

But it is on all hands allowed that the conduct of a well-ordered life is to be regulated by Reason. Now, there is one idea with which we wish to saturate the womanly reason; indeed, we wish so to imbue it with this notion that every question bearing on vital well-being shall be seen in its light, and we believe that thus moral conceptions will be formed which will have an undeniable influence on women's conduct and surroundings.

"He hath given them a law which shall not be broken."* It was in far away Israel, three thousand years, that the words were spoken, yet echoed as they have been ever since alike in Temple Ritual and Christian Memorial, almost without ceasing, it has taken so long for men, as a whole, to wake up to their meaning!

Law, rigid, immutable, unavoidable, is the Master-tone of the Universe, and the sooner we learn to sing our Life-catches in harmony with it, the better.

We talk of *breaking laws*, forsooth, as if laws could be broken! A deeper understanding would show us that he who suffers from the breach of law is only *keeping* it after the manner of his own choice. Laws keep themselves for the matter of that, and while the World-Father may *forgive*, as the Chirst's sweet voice long ago declared, His very omnipotence forbids that he shall abrogate the dignity of His own Empire.

This is the truth we would teach to women, this the idea—in all its practical bearing on the wide field of womanly cares and duties—that we would give them; and for our own part would be content to leave it to them to demonstrate that it is possible for knowledge to produce moral conceptions, which,

* Prayer Book Version.

in turn, it would become matter of conscience to carry into practice.

At present ignorance gives no room for responsibility. When women have heard proclaimed the Evangel of Health; when, for instance, they know what taints are hereditary, and must be attacked from that standpoint; when the tremendous effect of physical condition on mental and spiritual activity has been made evident to them; when, above all, they have learnt that resignation to the Divine will mean, more often than at present they dream, the vigorous prevention of possible evil, then and not till then will they have a fair opportunity for showing what value they attach to principles, and whether or not it is true that they are wholly inaccessible to the appeals of the abstract virtues. The only argument which we have ever heard advanced against a course of such study is best answered by silence; it is as shallow as it is contemptible, since "fearfully and wonderfully made" can have no meaning at all for one who has no knowledge of how she is made. This knowledge at least we believe that women have a "right" to receive. For the rest it is not our function to agitate. To the experience of time, and to individual capacity must be left to the determination of individual culture.

PAPERS ON WOMEN'S RIGHTS—No. 6

THEIR RIGHT TO RULE

By an old, old woman.

Reprinted from the "North Wales Guardian," October 13th, 1888

The words of the prophecy of the mother of king Lemuel are startling, both in their contempt for women as she sees them, and in their reverence for what she sees that women may become. The ideal of this old-time queen is not that of some Semiramis or Christina, mighty in power and great in intellect; she is, rather, a quiet, capable, busy burgher wife, looking well to the ways of her household, providing them thick clothing for the winter, and working willingly with her hands; she is mayhap, a king's daughter, for her garments are of silk and purple; but she is, at all events, the embodiment of our old Saxon notion of a lady—her children's loaf-server.*

The king's mother insinuates that only in this home-path can woman attain social distinction for herself or her family, and surely never were the political claims of the sex urged with

* The word Lady is derived from A. S. Hlaef—loaf, and Duggan—to serve.

more of strength or wisdom than when it is assigned to its type as her reward that men are to "give her of the fruits of her hands and let her own works praise her in the gates."

The prophecy is true all round, and after many a year of observation and experience we can but endorse the utterance of this royal woman of old and give it as our belief that the most wholesome, most practical, most realisable ambition for a woman is that which is pursued amongst the crowding duties of the home and the family. [If any woman have another, let her take a vow of spinsterhood 'ere she pursue it!]

How little those duties are generally understood, we have tried to show in our past papers on this topic. We will now consider what effect might be produced by a better comprehension of them. We do not wish to fall into the error of assuming that knowledge directly modifies conduct, but we think our case may be strongly made out in a few sentences:—

(a) Human organisation, individual as well as social, physical as well as mental, is subject to constant change, constant progress or constant degradation, in conformity with those laws of nature which directly control it, and which we call the laws of health, or the science of hygiene.

(b) Large classes in every town belong to a low type of life, and are undergoing the process of degradation, owing to the perpetual infringement of primarily health, and secondarily other laws. These classes are prolific of physical and moral diseases alike.

(c) So convinced is the legislative mind of these facts, that we have everywhere sanitary committees, inspectors, and rules, with a whole apparatus of compulsion for the observance of the necessary principles.

(d) That this compulsion is not fully effectual, will be readily admitted by any keen observer of the lowest classes, even in so small a town a Wrexham. For instance, he who will stand near the Wymstay Arms on Mayor's Sunday, will see sights which will fill him with shame and loathing (force at once convertible into sympathy and reform.)

(e) Granted that compulsion is not sufficient, we believe that in course of time the domestic and social *influence* of educated and conscientious *women* would prove all that is necessary to eliminate the low, and raise the existing higher types.

(f) For this, it seems superfluous to say that women, as a whole, must have careful and systematic training in Hygienic principles.

Yes, we aim at no woman-rule which shall transcend that of *inflence*. Her emotional strength gives her this—the most delicate, as it is the most enduring form of power—pre-eminently, and we believe that she needs no other sceptre. Obviously within her own family and indirectly outside it,

the influence may be made all powerful for good in the direction which we have been contemplating. How far her tact and goodwill can go in political and religious affairs, we have all proved. Something of Hygienic work she has already performed in the Temperance field. Her moral force might be tripled in the way which we have indicated. Women! Women! Oh, will they never come forward to claim and to do?

If any feel doubtful that women, seeing a path of high usefulness, would decline to tread it, we need only point to the amount of charitable work done by them, week by week, in the name of religion. The deepest wretchedness, the most abject squalor, have never proved too black for the ministrations of gentle ladies, who often, indeed, have loved humanity not wisely, but too well!

On the sacredness of this one question, of the highest humanity, religion and science are well agreed. "All that concerns man should interest men," said the doubt-embittered Voltaire, and to this day, whatever unhappy divisions may exist amongst the truth-seekers, to this creed, at least, they all hold true.

There is something inexpressibly beautiful in S. Luke's picture of the Christ as the Great Physician—at once healer and absolver—a royally-tender presence of strength and help to the pain-weakened body as to the world-weary soul. It is, then, in this name, as well as on the grounds of mercy and truth, that we would urge the supreme claim of womanhood to a knowledge of health-science.

There is a tremendous responsibility for us who live during these enlightened days in the fact that human life is a plastic and modifiable reality. If women would only act up to the rights within their grasp we might have homes, families, cities, and nations, composed of men at once able and vigorous, of women good, beautiful, and intellectual, of children strangers to posset and potion, and of societies free from criminals and lunatics.

And, visionary as all this sounds, it is none the less true that it lies with us to determine in great part whether and when these things shall be woman-rule, apart from the foregoing, needs no remark here. A blind man lately told us that a woman could get her own way so artfully as to make her husband think it his. Women may have talent of this sort, but it is not of it that we would speak. The true woman-rule is a will formulated only in the "law of kindness," but which, being so formulated, may be by a mother, goes with all who receive it, into the wide world, clinging to them like some subtle aroma, protecting, guiding, and moulding themselves, their associates, and their posterity with force that always

accumulates in direct ratio to the number and goodness of the women who reiterate it.

This is no fancy. An Old, Old Woman is long past the days of youthful romance and enthusiastic distortion. At the same time, she maintains that what she has said on this point is not merely the outcome of senile talkativeness.

In the course of a long life she has seen much evidence of the emotional power of womanhood, and if, as the greatest writer of our day asserts, emotion is the only pressure competent to produce moral effects, then it seems to her that here is the grandest engine imaginable, to be utilised for the benefit of mankind at large. Let us walk with our eyes open, let us seize all opportunities of learning, above all, let us be doers of the word, and not hearers only, and then hurrah for the days when doctors shall be almost unknown in the land, and when faultless medical pedigrees shall have stamped out toothache and bad temper, deformity and vice together!

THE WREXHAM FREE LIBRARY

[রেক্সহ্যামে থাকাকালে মার্গারেট নোবল সমাজকল্যাণে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, জীবনীকার লিজেল রেম' সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে যেসব রচনা উপস্থিত করেছি, তাদের মধ্যে, মার্গারেট নোবলের এই ক্ষেত্রে প্রয়াস, পরিশ্রম এবং পরিণত মননের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। 'রেক্সহ্যাম ফ্রি লাইব্রেরী' লেখাটির এবং 'অ্যাম্বুলেন্স ওয়ার্ক' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠির মধ্যে অন্য কিছু না থাক, লেখিকার সমাজসেবিকার ভূমিকাকে তা স্পষ্ট করে তুলেছে।]

Notwithstanding the present vigorous agitation on behalf of increased culture for Wrexham, we do not believe that there is as general an understanding as there might be amongst us of the advantages which we already possess in our Free Library. This institution was commenced under the Free Libraries' Act on the suggestion, originally, of the late Mr. J. C. Owen and the Rev. Canon Howell, B.D., and first saw working existence on December 10th, 1879. From that day it bore the name of the Wrexham Free Library and Museum—it is needless to say that it was at first merely a reading room and is not yet a museum—but for a long time no addition could be made to its functions owing to want of funds. By dint of private gifts and judicious expenditure of rates and subscriptions, however, the nucleus of a library was formed, and while the museum has only existed in name as yet, every day a vast extension of its scope comes nearer to those who are interested in the premises above the Guildhall. The Free Library at present consists of two parts, which it is earnestly desired to make into three. The two parts are—the reading room and the reference library. In the

first is a constant ebb and flow of visitors of all classes, but chiefly those who can snatch only short intervals, at the expense of hurried meals; and here one sees that finest and most distinctive of English sights—the eagerness of the working man for political news. Men bend over the *Times* and *Standard*, or sit and read *Punch*, the *Edinburgh Review*, the *Nineteenth Century*, or the Welsh and provincial news, with the zest which makes them, for the time, blind and deaf to all that goes on around them. So earnestly they read, so responsible and keenly interested they look, that one could almost imagine that the extended franchise was written on the face of each one there! The average daily number of these visitors comes close on three hundred and fifty persons, each of whom can, if he likes, receive the full benefit of the expenditure of £60 per annum on papers and magazines.

At the upper end of this fine room is a door, within which we find the library proper. Here sits the librarian, Mr. Gough, like the famous spider, demanding record of book received, name and address, from every visitor who comes within his toils. Mr. Gough is the "right man in the right place;" such is his personal devotion to abstract method, that we verily believe, had he walked in the life-path of the higher mathematics, he would have achieved a name and fame therein, comparable, perhaps, to that of the immortal Euclid or imperishable Newton. Mr. Gough's catalogue, arranged with painful accuracy, and written in a hand that rivals copper-plate, he that runs may read; and Mr. Gough's rigid observance of his committee's rules, is a phenomenon worthy of imitation, which is, as we all know, the superlative of admiration. Now, to this inner sanctuary we fear that comparatively few do penetrate. It is true that the ambition of the committee soars far beyond its present means with regard to the assortment of volumes provided for the student's delectation, but even at this moment there is an intellectual banquet available by a visit to the dingy little book-room, which is enough to make the lover of literature mad with hunger. In the department of fiction, for instance, are already collected the complete works of Dickens, the master of pathos and comedy alike; of Scott, the clear, penetrating expositor of historic drama; of Thakeray, the John Baptist of nineteenth century high life; of Kingsley, that most fascinating of scientists, and most sympathetic of novelists; and of the ruling mind of the modern novelist, our peerless, incomparable George Eliot. This is not all. Amongst works of more purely philosophical character, we have De Quinsey's essays; Emerson's complete works; a less complete set of Carlyle; twenty-two-volumes of Professor Morley's "English men of Letters," together with the same writer's "Burke" and "Diderot," and Fraude's "Short Studies on Great Subjects." In the domain of history Wrexham possesses, in its collective character, those of Macauley, Green, Prescott; translations of

Guizot and various biographies, such as Boswell's "Life of Johnson" for example. There is also a supply for reference in this same division, comprising "Ancient Laws and Institutions of Wales," supposed to have been enacted by Howell the Good; Pennant's "Tours in Wales;" and Blackstone's commentaries. Several rows of bound periodicals, like Cornhill, Temple Bar, Blackwood, Household Words, and Chamber's Journal, 20 volumes of the poets, some theological works, and a large and excellent reference department, make up the rough outlines of what must be acknowledged a thoroughly good start for any Municipal library. Of the reference department we have yet to speak; it is, perhaps, the most salient feature in the whole collection. Every work in it is *crime de la crime,* and it includes a number of excellent writings on local subjects, all of which have been printed in Wrexham, and which, put together, the librarian dubs "Our Local Library." The most costly work in the room belongs to this division, and consists of the twenty-four volumes of the "Encylopœdia Brittannica," obtained at a nett cost of not less than £ 32 8 s.; but besides this are also four volumes of the "Imperial Dictionary," "Haydon's Dictionary of Dates," "Smith's Classical Dictionary," "Smith's Latin-English," and "Pugh's Welsh-English Dictionaries," with other works of a similar character.

It will be seen that a place like this cannot be kept up—above all, cannot maintain adequate *growth,* without a considerable allowance for current expenses. As a matter of fact these reach the modest sum of about £ 230 yearly, of which some £ 190 or thereabouts is paid out of the rates, while about £ 12 a year is raised by private subscription. £ 12 yearly is not a great sum, considering the class of people who may be expected to give support to such an object as a Free Library, and the fact that the whole establishment is as yet but a means to an end, makes this paucity of the wherewithal the more felt.

The words "suitable for circulation," occurring in the Secretary's report of May last, mark the desire of the committee to establish in our midst a Free *Circulating* Library. This would indeed be an inestimable boon, and towards its achievement a large room has already been built, opening off the lower end of the reading-room. Now, it is a fact that the work here is for the present at a standstill, *because the committee have not the funds in hand necessary to furnish it with shelves.* Fifty pounds would be a sum sufficient for this work, after which the books, save and excepting the works of reference, would be moved from their present place into the new room. Fifty pounds! Why half-a-crown each from four hundred people would procure a constant supply of the best literature, to be read by their own hearthstone, not only by themselves, but by their children, their neighbours, and by a hundreds others who might perhaps have no other direct *claim* on them, save

that of belonging to the same town, and looking to the said half-crown people for their guidance and enlightenment, as we would look to the capacity of the tubes and burners to indicate in some degree the amount of gaslight which a room was to enjoy!

Fifty pounds, to be raised in half-crown subscriptions. Bah! We feel like suggesting a charity, when we are in truth pointing out a responsibility! More than four hundred of us would think ten, or twenty, or thirty shillings little enough if subscribed to some private library for our own and the proprietor's sole and individual profit and behalf, and too often for the feeding of our own and other minds on stuff as poisonous, pestilental, and vulgar as the lowest dregs of the most adulterated wine of literature can ever be! Can it be, that any such would grudge some slight donation or subscription in books or money, to an enterprise which brings picuniary profit to no private party; the highest kind of benefit to all; and which is in fact the common property of all of us, who live and work in the town, however much we ignore our proprietorship, however little we do for our own property.

It is to be hoped that the circulating library will be quickly followed up by a local museum; but that is perhaps to be looked for, rather in connection with the coming(?) science and art class than in the older institution, which is doing brave enough battle at present to keep its own head above water, to maintain its own way against the inertia of public (want of) opinion!

[নিম্নের লেখাটি খণ্ডিত আকারে পেয়েছি। প্রাপ্ত অংশ থেকে বোঝা যায়, স্থানীয় শিক্ষা আন্দোলনের পক্ষে এটি জোরালো রচনা। এতে বিজ্ঞান ও কলা-শিক্ষাকে সমন্বিত করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিবেদিতা ভারতের ক্ষেত্রে এই উভয় শিক্ষার যুগপৎ বিকাশ চেয়েছিলেন।]

Now popular Ignorance at the present time will be freely allowed to be decidedly on the wane. Are we in Wrexham taking any steps to decrease its influence in our own midst? After all that has been said in these columns during the last few months on this very subject, it could only be the happiest of tasks to us to record the action of the meeting assembled in the Council chamber of the Guild hall, under the presidency of the Mayor, last week. His Worship's speech on that occasion was a model of clearness and simplicity, explaining that there was a branch of Government (the Science and Art Department of the Council on Education, South Kensington) specially devoted to the provision of art and science culture for the nation at large, that this body gave instruction in more than a dozen branches of art and twenty-five of science, that it conducted

examinations and encouraged effort in these directions by grants and loans, and he proceeded to ask by what medium we could bring ourselves into receipt of all these good things. Having already set up a Free Library, our Corporation is entitled to add to itself further a local committee for the establishment of science and art classes and, if desirable, a museum in the town. The South Kensington session for this year began on the 5th of the present month of October. Hence it is to be feared that we are too late to have the work on foot, and examinations held in the town next spring. Whether this be so or not, however, is hardly the point at present. What we have to remember is that even when the classes are fairly commenced, popular support of a serious and steady nature will be necessary to make them a success. This will not be difficult to give, since the fees are arranged in regular proportion to the means of students. Will it be our choice to give it? In former years, as the Mayor properly remarked, similar attempts have twice been made, and both times have proved abortive, owing probably to the want of due publicity. It rests with us to see that the like failure does not again occur. The number of mutual improvement societies, and so on, which have existed in this town during the last few years, and died of inanition, or maintained but a feeble hold on life, will of itself be token enough of the need for some organised scheme of this kind. This system proposed is such as to bring Wrexham, the metropolis of North Wales, into scientific touch with the rest of the kingdom, and—truly a most important point?—such as to enable her youth to take full advantage of the natural wealth with which this district is so richly endowed. Of the life-enrichment which knowledge of this kind efforts we have already spoken. It is, surely, a strange anomaly that the Welsh—whose own country is a perfect earth-jewel of beauty, and who are themselves noted for their literature, their oratory, and their music—should utterly neglect the arts of form and colour, and the tremendous mental game of scientific education! Let us hope, then, that out of regard for our town and our neighbours, there will be a pull, a strong pull, and a pull altogether, to bring this matter to a favourable issue and that, once available, we shall, each for himself, hasten to secure the fullest participation in its golden benefits.

W. NEILUS.

AMBULANCE WORK

Sir,—In sending me Dr. Lawton Roberts' little book with the Red Cross shield on its covers the other day, you added one benefit more to six columns of consideration which you

have already accorded to my unworthy self. May I hope that you may allow me publicly to thank you for the same, and also to make a few remarks on the work in question. In a series of papers with which I encroached on your space a short time ago, I dealt under the title of "Rights; with woman's claim to a knowledge of the Laws of Health." One very important branch of that subject—Ambulance—is treated in an exhaustive and interesting style in the book you sent me. It is a strange thing that ambulance always seems a subject more attractive to the feminine mind than hygiene. Perhaps the need of gathering up split milk is more obvious to womanly intellect than the need for preserving it in a good, deep basin; and perhaps—yes, I am sure—that much of the reason lies in that large womanly compassion which is so quickly stirred at the sight of pain. At any rate, there they are—the need, and the will to supply it. Now, do we in this little town do our best even in this matter of learning ambulance? Alas, we have no lectures! The only lady of whom I have heard as studying the subject here at present has to go to Chester for instruction, and I know a few (myself for one) have been anxious for help nearer home. In the face of this need in comes Dr. Roberts' illustrated lectures on ambulance, and for my own part I have gratefully to record that, with the help of its clear illustrations, a few handkerchiefs and strips of linen, with the legs of tables and chairs to practise upon, I have been enabled to master many of the mysteries of the roller and triangular bandages.

One remark seemed to me eminently practical. Dr. Roberts considers that universal reference to some one ambulance system—as the St. John's—would be an advantage, as it would secure a kind of free masonry of method in giving first aid to the injured. Again, he frequently and strongly insists upon the need for ambulance training in *mining* and manufacturing districts like our own. Surely this need is obvious. But some few ideas ought to be even more widely circulated than a class or a book ensures. How many, for instance, know that a man lying "dead drunk" is really in a state of extreme danger from acute alcohol poisoning, and that to pass on without rendering aid or giving warning is a breach of Christian duty? Such knowledge as this ought to be universal. May I suggest to the readers of your valuable paper that, if they will only buy and read the book for themselves, they will find much information equally new, startling, and worth acquiring.—

Your obedient servant,
an old old woman.

A PAGE FROM WREXHAM LIFE

(From the Wrexham Advertiser, December 7th, 1889)

ভগিনী নিবেদিতাকে অনেকেই এদেশে কল্পনাবিলাসী বলেছেন। যাঁরা বলেছেন তাঁরা অধিকাংশই 'সাহেব'—বিলেতী বা দিশী। এ'দের মধ্যে সমাজ সংস্কারে উৎসাহী কিছু মানুষও আছেন। এ'রা জানতেন বা জানতেন না—মার্গারেট নোবল বা ভগিনী নিবেদিতা বাস্তবকে যে-আকারে দেখেছেন, স্পর্শ করেছেন, সমালোচকেরা তার থেকে বহু যোজন তফাতে ছিলেন। বাস্তবকে তার সমস্ত ক্লেদ-গ্লানির মধ্যে দর্শন ও অনুভব করেও সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে পারেন যিনি, তিনিই যথার্থ মানবতাবাদী, মানুষের কোনো পরাজয়কেই তিনি শেষ কথা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নন,—'আমি থামব না',—এই যাঁর জীবনবাণী। 'রেক্সহ্যামের জীবনের এক পৃষ্ঠা' বস্তী অঞ্চলের জীবন্ত সমীক্ষা—মার্গারেট নোবল যে 'লোকমাতা' হবার পূর্বেই লোকমাতা—তার প্রমাণ।

রচনাটির সূচনাতেই একটি মর্মভেদী প্রশ্ন—"অসজ্ঞান অন্যায়ের চেয়ে তিক্ত অন্যায় কিছু আছে, অজ্ঞানের মেঘের চেয়ে কালো মেঘ কিছু হতে পারে?" উত্তর—"আমাদের এই ছোট শহরে যারা তলিয়ে ডুবে আছে, তারা বলবে—'না'।" কারণ—"রেক্সহ্যামের চওড়া খোলা সোজা রাস্তার পিছনে আছে বস্তী ও সংকীর্ণ গলির গোলক-ধাঁধা, যেখানে বাস করে এমন এক শ্রেণীর মনুষ্য যাদের আচার-আচরণ ও পরিবেশ আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক, দুষ্ট ক্ষতের মত, আমাদের নাগরিক জীবনের প্রাণশক্তি তা কুরে খাচ্ছে। রেক্সহ্যামের অধিবাসীবৃন্দ, কান পেতে শুনুন, আমাদের শহরের ১২ হাজার অধিবাসীর ১২ ভাগের ৫ ভাগ লোকও মুক্ত বায়ু বা আকাশের আলোর তলায় বিচরণ করে না।"

আলোকিত ও অনালোকিত দুই জগতের পার্থক্যের রূপ ফোটাবার সময়ে দীর্ঘশ্বাসে দুলে উঠেছে মার্গারেটের লেখনী। অনালোকিত অংশের বর্ণনা—

"খোলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছি, না তো ওগুলি রান্নাঘর নয়, সবে-ধন শোয়ার ঘর! ভাগ্যবান যারা, তাদের আলাদা নিজস্ব শোয়ার ঘর আছে।" ঘরগুলি অন্ধ গুহার মত, পিছনের দিকে আলোবাতাস চলাচলের দরজা-জানলার লক্ষণমাত্র নেই। "প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং বৈজ্ঞানিক গৃহপরিকল্পনার কালে অবাধ বায়ু চলাচলের প্রয়োজন স্বতঃস্বীকৃত, কিন্তু এখানে একমাত্র যে বায়ু চলে, তা ডাস্টবিনের জঞ্জাল-গন্ধে পরিপূরিত, ত্রুটিপূর্ণ জঘন্য ব্যবস্থাসৃষ্ট বিষ-জীবাণুতে ভর্তি,—ঢুকছে খোলা দরজা দিয়ে, বেরুচ্ছে চিমনি-নামক বিচিত্র জিনিসটির ভিতর দিয়ে, এবং ঢেলে দিচ্ছে সর্বদিকে কৃমি-কীটের জীবাণু, রোগ ও বিষের সম্ভার, যার ফলে গহ্বরটি—স্থানীয় লোকদের ভাষায় গৃহটি—পাপ ও মৃত্যুর মৃগয়াভূমি।"

মার্গারেট নোবল বস্তী সমীক্ষায় বেরিয়েছিলেন, হাতে ছিল নোটবুক, মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন—স্বামী কখন ফেরেন, কি করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ধারণা কি ইত্যাদি। প্রশ্ন করছেন আর চোখের পটে ছবি উঠছে—"ভাঙা সিঁড়ি, ভিজে দেওয়াল, খসে-পড়া চুনবালি, মেঝের ভাঙা পাথর, চারদিকে ছড়ানো

সকালের এঁটো বাসনপত্র, এক কোণে আগুনের ধারে ময়লা নোংরা একটি শিশু কর্তৃক আর একটি শিশুর পরিচর্যা, চিমনি থেকে হঠাৎ ভক্‌ভক্‌ করে ধোঁয়া উঠে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়া—।" না, এই শেষ কথা নয়—"সেই স্থান ত্যাগ করেছি 'স্বামী আমার বেকার'—এই শব্দে ঝাঁ ঝাঁ-করা কান নিয়ে।" একটি পীড়াদায়ক চেতনায় মন ভরে ছিল—"যে-পর্যন্ত গৃহ বন্যের গৃহ, পারিপার্শ্বিক বর্বরের পারিপার্শ্বিক হয়ে থাকবে, সে অবধি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংস্কার বা প্রগতির চেষ্টা ময়লা নোংরা গোরস্থানের উপরে চুণ বুলানো ছাড়া কিছু নয়।"

কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িও অবশ্য দেখেছিলেন, যার গৃহকর্ত্রী কর্মপটু, দেখে মনে হয় সুযোগ পেলে তাঁরা দরজা জানলা খোলা রাখবেন, কিন্তু খুলে লাভ কি—সামনে বিদ্রূপের হাসির মত খোলা ডাস্টবিন, যার কয়েক গজ দূরে জঞ্জাল-ছড়ানো জায়গায় "ছোটরা স্ফূর্তিতে খেলছে, জানে না, হায়, শীঘ্রই হয়ত মমতাতুর একটি প্রাণ চেয়ে দেখবে, সন্নিকটের গির্জা-চত্বরে সংকীর্ণ কফিনের বিছানায় তারা শুয়েছে নিরাপদ বিশ্রামে—চির বিশ্রামে।"

সমীক্ষা আরও অগ্রসর হয়, উত্তম চেহারার একটি বস্তীর সন্ধান মেলে, যার মালিক কিছু বিবেচক, কিন্তু ঐ একটিই, বাকি সর্বত্র পুরনো চেহারা। সপ্তাহে ১ শিলিং ৬ পেনি ভাড়া এমন একটি ঘরের—সমগ্র পরিবার একটি ঘরেই থাকে—তার মধ্যে রয়েছে ব্রঙ্কাইটিসের রোগীও। পাশেই একটি বুড়ির ঘর, দশ বছর সেখানে আছেন, দশ বছর ঘরে মেরামতের হাত পড়েনি, মেঝের সর্বত্র গর্ত, ইঁদুরের স্বচ্ছন্দ বিচরণক্ষেত্র। একটি মুচি-পরিবার : স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে আট জন একটি ঘরে, সেই ঘরেই জুতোর 'কারখানা' ; রোজগার সপ্তাহে ১৬-১৭ শিলিং। এমনি নমুনার পর নমুনা। বিচিত্র অলসতার দৃষ্টান্ত : প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র অসুস্থতার ভান করে মায়ের কষ্টার্জিত উপার্জনের উপর জীবন কাটাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে নতুন জ্ঞানোদয় হল লেখিকার। এতাবৎ তাঁর ধারণা ছিল—"নারী অহঙ্কৃত সাজসজ্জার প্রতীক, যারা সাজতে—সাজতে—সাজতে—নির্ঘাত ট্রেন ফেল করে ;" কিন্তু বস্তীর অভিজ্ঞতায় জানলেন, ঐ "অমার্জিত প্রাথমিক পৃথিবীতে পোষাকের অধোগতি পুরুষের চেয়ে নারীরই বেশী।"

দীর্ঘ বর্ণনার শেষে মার্গারেট নোবল লিখলেন—

"দৈনিক পত্র মারফত জানছি যে, আগামী বছর ইউরোপে এশিয়াটিক কলেরার অভিযান ঘটতে পারে, তখন—!!!"]

Is there any wrong so bitter as unconscious wrong, any cloud so dark as the cloud of ignorance? He who dipped far below the surface of life in our little town, would almost, we think, be inclined to answer "no." For behind the open streets and thoroughfares of Wrexham lie networks of slums and alleys, wherein dwells a race whose habits and surroundings are a blot on our civilisation, a foul canker eating into the very heart of our Municipal life. For be it known unto you, O, men of Wrexham, that a population of twelve thousand are

we, of whom not more than some five twelfths dwell in the fresh air under the light of heaven!

A walk through these dismal regions behind our main roads carries with it much instruction. We come in from the country on some bright, fresh, morning, and plunge downhill, literally and metaphorically, into a fine wide roadway. In vain we look for traces of squalor and wretchedness here. The buildings are bright and large, the houses clean and fresh, or at most quaint and olden looking. A few steps further bring us, however, into a very different region, and a turn to the left, lands us into one of those courts where life is a perfect epitome of degradation and uncleanness. "Byron's Alley" is, we will suppose, its name, and in all that is miserable and ramshackle, it and its neighbour den, "Hill Square" are truly birds of a feather. Have we entered an assemblage of the back aspects of tumble-down dwellings we ask in amazement—for here are all the arrangements which could characterise a back yard, grouped together, face to face, with open kitchen doors, and bedroom windows. But no, we are in the *front* of these houses. The supposed "Kitchens" are their sole living rooms, and lucky are those dwellings with a single bedroom in addition for family use, while—worse and worse—there is no "back" at all save a blind wall, unbroken by window or door or other aperture for light and air on the other side. Thorough ventilation in these days of elementary schools and scientific buildings is to be taken for granted, but all the ventilation that exists here consists of air well saturated with the refuge of a dustbin, and the poison-germs of defective sanitation, going and coming, going and coming, through the open door up the crazy chimney, depositing here and there its load of parasites and vermin, its diseases and its poisons, till the hole these people call a home is little more than a hunting ground of vice and death.

We go into one of these houses, and say "Good morning" to the woman standing yonder at her wash-tub. "Does she happen to be the laundress patronised by our own better half?" We think with a shudder, and we take a mental resolution to make closer inquiries than we have ever yet done into the peregrinations of certain linen shirts and collars and cuffs from Saturday to Saturday. We want to know when her husband will be at home, and various little questions as to his ideas and predilections are asked and answered within a few minutes. Into our notebook go the particulars we have sought for; into a deeper memorandum within our brain go descriptions of the broken-down staircase, the plaster peeling off the damp walls in all directions, the broken stones of the floor, the unwashed breakfast things scattered about, the grimy child nursing the dirtier baby at the fire in one corner, the smoke that an occasional gust blows down the chimney into our faces, the—but

it is enough. We leave the house with "Husband out of work, sir," ringing in our ears, and a sickening consciousness that reform and progress for our working classes are but superficial white-washings of a reeking sepulchre, so long as their homes are the homes of savages, their surroundings those of barbarians.

Another house in the same vicinity shows a picture different, and yet the same. The thriftlessness and improvidence of the last are gone. A clean, neat woman, with tidy children, and well-arranged kitchen, stands at a table ironing; there are a couple of plants in the window; there is a bright fire in the grate, and, though the house is as dilapidated, the sanitation as bad, and the damp as obtrusive as before, one warms with the knowledge that while the windows will not open, here are people who would open them if they could. That though their privileges are a sinecure, the two shillings a week that pay for them are well-earned—that in short, there are families to be met with, even here, who have the energy and courage to better their condition if only they knew how, and that, at last, we have lighted on one case of the deserving poor. But the open dustbin, &c., of which there is one for the whole yard's use—still laughs in our face. A couple of yards away, and in the filth-breeding sunlight outside, little children still play merrily, all unknowing that a kind heart might sooner see them safe in their narrow coffin at rest in the churchyard yonder.

And, reader, did you ever notice that a gutter to drain the water off your roof was a luxury? Life is possible without it any way, for here, at least, is not one, and two shillings a week to pay. Is it any wonder that these people would fain sell a vote for a soup ticket, or a load of coal, that they would worship at any shrine for a charity blanket, or that the word "relief" has for them only the most material and degrading of meanings.

Out of Byron's Alley and Hill Square we go, up a hill to the right, and down a street—James or Charles or William, as the case may be—from which opens a slum or two, that in every respect presents a complete contrast to those we have just passed through. And subsequent inquiry shows us in the landlord's agent of these parts, a kindly, sensible man, who takes an interest in the cleanliness of his tenants, and who earns the respect and hearty goodwill of all who know him. Two or three hundred yards further on, however, lies a district which to some extent repeats the horror of our first dip. Here is a house in which the man lies ill of bronchitis. There is but one room—rent 1 s 6 d a week—and this is damp and close. There are a few pictures, though the bed at one side is by no means too clean, and there are the usual complaints to be made as to floor, walls, and roof. In the same neighbourhood we find an old woman who has been a tenant of the one domicile for the last ten years. The floor of course needs

repairing. Rats—those amiable heralds of imperfect drains—have been working their own sweet will beneath the surface. We enquire, and learn that the hearth was mended ten years ago, and that since then improvements have been simply nil.

Never mind! We are learning something as we go along this bright morning, pursuing investigations which are nauseous to the last degree. Hitherto, women have been to us symbols of all that is vain and beautiful in dress. We have associated with them the thought of two bonnets where one would have done, of trains lost through over-long toilettes, &c. The scales fall from our eyes here. Down in these habitations of the lower orders, where habits are more primitive, and instincts less modified, we find that the women sink into degradation in the matter of clothing infinitely sooner than the men. We find, too, that cats will live where dogs will not, and we respect cats less for ever after.

The next case has its comical side. A sharp, thin little woman, with spectacles, opens the door of a kitchen which is as clean and neat as a new pin. As we enter, a tall, pale, and melancholy-looking man stands up to salute us, while his mother proceeds to victimise us with an account of his illness and weakness. We hasten to depart, with her shrill words, "Nobody knows, sir, what that young man has suffered," following us. But we do not find that the neighbours have the same high opinion of him. When we hear more of him, the dreadful truth begins to dawn on us that he is dying of starvation because he is too idle to work, and prefers living on his mother! And she, poor soul, for and because every hen's chicken is the glory of the farmyard, supports him and does battle for him, when he would be far better pitting his miserable, puny little egotism against the world for her sake!

But our task is by no means done. In one place we come to an area, within which all the water has to be carried from a certain well. To do this, in some cases, must be the work of quite a quarter of an hour. To our common sense is left the imagination of how charily that water must be used, and how small a proportion of it is likely to be consumed in cleansing operations. But oh, we shudder to think of the merit which will accrue to that house-wife who can "do" with the smallest water supply! And our blood runs cold as we picture to ourselves the clothes, the dishes, the floors, that will remain unwashed, or semi-washed, to avoid the trouble of carrying water from the well?

Again, we find a home for seven, which consists of one room under a *provision warehouse*. The room is large, and bare, has an earthen floor, and no furniture save one small table, and seats formed of wood placed on a couple of bricks. There is something in the furthest corner which we do not at once recognise to be handful of rags—once, perhaps, clean,—

doing duty as a bed; and there needs no tongue to tell us of damp and vermin in every wall, while "no ventilation" is written in the building. In another abode near this eleven people live in a kitchen and two bedrooms, and pay two and six pence a week for the privilege. The house is damp, and is close to almost stagnant water, but half-a-crown a week is its rental nevertheless; and the eleven people—of whom from two to four are men-lodgers, and all at home on Saturday nights—continue to be its inmates also.

But all these are only types. Here for instance, live a cobbler and his wife with eight children. The income of the family is sixteen or seventeen shillings a week, which the father earns by working in the one bedroom. The mother has a scullery in a little shed across the yard. The children are clean, but the house is not, and the water supply consists of one tap for the common use of the yard. In another house, near, we find an old Irish woman, of—from her own showing,—a most violent temper, and evidently strong mendicant tendencies. This old dame pours into our ear a long tale about the way in which she has been pressed to enter "The House." We have not the pleasure of knowing much about "The House" ourselves, but it strikes us with a sense of something wrong that she appears to consider herself public property, whose life and fortunes are at the disposal of the corporation.

Our description is a long one, but meagre when compared with the facts. More than one problem has cropped up during the walk, but the great one, that of the direction in which to look for the progress of the masses, will need many another, ere it becomes elucidated. And meanwhile the daily papers tell us that next year Europe may look for the incursions of Asiatic cholera, when, woe be to the classes as well as the masses, where sanitation is not a little more highly developed than sanctification is apt to be!

PHRENOLOGY AND PHYSIOGNOMY

[মার্গারেট নোবলের ব্যাপক জ্ঞানসাধনার মধ্যে 'ফ্রেনলজি' অর্থাৎ মাথার খুলির আকার থেকে মানবপ্রকৃতি নির্ধারণ-বিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই বিদ্যার মূল ব্যাপারটি যে-রকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি আলোচনা করেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, এই বিদ্যাকে তিনি যথেষ্টই অধিগত করেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট বিশ্বাস করেছিলেন কি না সন্দেহ। অন্ততঃ এর বিষয়ে তিনি যে কৌতূহল ও কৌতুক দুই-ই বজায় রেখেছিলেন, তা বুঝতে পারি। এই বিশেষ বিদ্যায় আকৃষ্ট ব্যক্তিরা রচনাটি থেকে আনন্দের খোরাক পাবেন।]

O, the amateur Phrenologist! How many of us know what it is to spend a week in the same house with him? At

first he pleases by his constant reference to and elucidation of that fascinating subject—self; but gradually this palls on us, and ere long we would do anything to escape him and his reflections, his scepticism as to our motives, his reiterated assertions of the strength of our vanity, indolence, or love of approbation. There is no doubt, however, that to have a smattering of the art oneself is a great stimulus to the power of observation. To be able, or to think yourself able, to trace the irregularities of your friend's character according as his cranial contour varies from the curve of beauty is, beyond dispute, a powerful incentive to the habit of analysing features and characters alike. The neophyte finds it easy to gather a general impression, as of greed, but hard to localise the trait; the believer, however wanting in penetration, is at once able to point out that this lies in the closeness of the inner corner of the eyes. Of course, the truth of this conclusion is a further question on which our most ingenious consideration is adduced. If the craniologist, in his voyages amongst our billowy locks, chances to make some glaringly false statement, he can always find some "neutralising bump" to pacify our outraged experience. We once saw a clever amateur astonish a lady whom he had known for half-an-hour by telling her that she was fond of dress, but was not gratified by brilliant colours. Notwithstanding his explanation that she had "love of dress" (or whatever means that) largely developed but "colour" very slightly, we could not help a suspicion that a glance at her attire had really been the ground of his statement. Still, such an incident is apt to suggest a good deal. Evidently, after the map of the head and face has been well-memorised, the thorough-going physiognomo-phrenologist finds a heavy balance of training still to be traversed. He has to master all this counteraction-neutralisation branch of the subject; any slips in his practice will be laid to the charge of imperfection here, and is it possible to delineate a character correctly after this fashion, if it is not, to some extent, covered by one's own? Is it possible for the lower to analyse the higher nature?

Thus far, we have taken no note of the idea that the system is but elaborate quackery. The facts of the case appear to be these. In form, the human brain (i.e., the part with which craniology is chiefly concerned) is uncommonly like a walnut covered with a grey, instead of a brown layer. In the walnut, the more the twisting and contortion of the surface, the larger the area of brown skin which the nut will possess. Just so in the brain. The more the dippings and convolutions of the organ (sulci and gyri, as they are called), the greater the extent of grey surface .... depend the intelligence and perceptive power of the brain; in the man of genius there is great surface, in the idiot comparatively little. It may be supposed, then, that each of these walnut-like protuberances of

grey matter produces a corresponding protuberance of the skull. The phrenologist further maintains that each protuberance is the seat of a peculiar power, and we thus get the "bumps,' and their associated faculties of craniology. The idea is plausible, but by no means proven; and in the present state of the science of brain-function, a positive judgment is perhaps impossible. How many good folks, halting between two opinions, will tell you that "they do not exactly believe in it, but they think it comes true sometimes!"

Meantime we must speak of people as we find them, and for our own part we have found the amateur, for an evening's amusement, capital; but for a week's society—well, quite too knowing! At the beginning of this century the system was the fashionable craze. A clever schoolboy, named Gall, had been in the habit of comparing and conclating the heads and characters of his schoolfellows. On leaving school he pursued his investigations amid prisons and lunatic asylums, blossomed forth into essay writing and became the fashion. He was soon joined for a time by a man named Spurzheim, and in a few years the partnership was dissolved. Spurzheim, however, continued to believe and expand the system, and thus it is commonly spoken of as founded by both. In the course of our researches into the matter, we have found some curious items. For example, Gall had a pious brother, the top of the front of whose head (just above the coronal enture) was uncommonly well developed. Gall watched the people who prayed with most fervour in church. Noting that they were all more or less strong here, he assigned the region to the organ of veneration. Order was determined by examining the head of a methodical idiot. Conscientiousness, we are told, was recognised by its absence, and constructiveness by comparing the head of an unusually skilful milliner with a skull said to be Raphael's; while love of approbation was first localised from the head of a lunatic who imagined herself queen of France. A strange idea held by the founders was that the particular functions of a bit of brain surface belonged also to the outside of the skull in some way. Thus, friends who were much attached were supposed to lay their heads together in the line of the organ of adhesiveness; poets, when composing, to lay the hand on ideality, and musicians to press the "bumps" of time and tune!

The art of physiognomy seems to us infinitely more fascinating than its kindred science. Here at least, we cannot go far wrong, since the salient points in all faces are explained and made prominent by the whole expression. How many phases of character, for instance, may be denoted by the shape of the forehead. That narrowing of breadth at the middle, which indicates cruelty; that expansiveness which betokens culture; that prominence that shows reasoning faculty, are all

traits. familiar to each of us. Another feature that at once stamps its impression on the beholder is the mouth. Coarseness, acidity, amiability, weakness, that peculiar long, straight lippedness, so often to be noticed in members of Parliament and others who may be supposed to have a "power o' talk," and the full, sensitive lips of talent, are qualities which impress themselves at a first glance on many ordinary beholders. For these things, doubtless, some of us have long ago compiled unwritten codes of our own; few would need Wells and Fowler, we think, to tell them that one whose eyebrows form a single arch possesses a sullen temper. One *feels* that is so, without any theory. Can anything be more interesting than the lower jaw? This according to physiognomists, is a great index to character. Does anyone possess a friend whose lower maxillam is square in the front? Let him take note that his friend is of iron will. But is the line of greatest breadth set far back, nearer the neck! Then it indicates generosity of temperament. Phrenology, comes in, however, if the line of greatest breadth of the head be just above the ears, and says that so foxlike a formation can only indicate craftiness. Almost involuntarily association with those who are deep in this kind of knowledge will leave in the mind a residuum of something that is not science, and yet is scarcely superstition. Physiognomy, as allied to astronomy, is a very ancient art, and really a week with the amateur skull-diviner is apt to produce in one the tendency for ever after to "tell people's fortunes" by their faces. One has heard that small ears are a sign of ambition and power; one goes away just a trifle inclined to label all the small ears one sees with the word "success!" We have been told that a dimpled chin points out a nature that desires love, rather an object of love, while dimpled cheeks indicate a power of lavishing, rather than receiving, affection. What romances do we henceforth weave around that distinction! One or two points of physique—as the small, arched foot, the shapely hand, and the little shell-like ear—have so long been theory, that we accept them as tokens of "blue blood" as a matter of course. Others, the facial angle, heaviness of eyebrow and fulness of the eye, are by this time so thoroughly part of ethnological science, that Darwin himself devoted time and labour to their observation. But a large remainder are of purely hypothetic virtue. This is chiefly the case, indeed, with phrenology or "skull-doctrine," as Carlisle translates its German name. And in this branch of character divination, uncertainty is increased vastly by its dependence on the individual interpreter. Has he much sympathy, much comparison, much power of deduction? Without all these, and we may add, a very large endowment of intuition, even the professional will not be able to do justice to the system of Gall and Spurzheim.

But as for the amateur under those circumstances—Flee him! Beware of him! Come not near him, as you value your peace of mind! Oh, the agony which that misguided individual is capable of causing to anyone who possesses any self-esteem at all! Oh, the number of times a day that he will attribute your vituperation to jealousy, or your amiability to weakness, your courage to conceit, or your kindness to love of approbation, your partiality for chocolate caramels to an epicureanism, or your fondness for tobacco to a want of intellect. And the delight with which the malicious creature views your faint applauding smile!

Gentle reader, should you ever know what it is to be tormented thus, remember that phrenology is only an ingenious form of idle speculation, that some amateurs are very amateurish, and that it is a case of "More shame for 'em, has honly shows their hignorance."

W. Neilus.

পরিবর্তন যুগ

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের অপরাহ্নে স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শনের পরে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতে আগমন পর্যন্ত সময়কে আমরা 'পরিবর্তন যুগ' বলতে চাই। এই কালে মার্গারেট নোবল কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছেন, নানা সূত্র থেকে তার সংবাদ আমরা পেয়েছি, যদিও এই সময়ে তাঁর অন্তর্জীবনের রূপ একান্তভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে, এমন কোনো চিঠিপত্র পাইনি। মার্গারেটের মত প্রতিভাদীপ্ত সামাজিক নারী, যাঁর প্রচুর বন্ধু-বান্ধবী ছিল—সেই বন্ধুরা এই অভিপ্রায়ে কতখানি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট ছিলেন, বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করতে তাঁকে কতখানি যাতনা পেতে হয়েছিল—তার পূর্ণ ইতিহাস বোধ হয় আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

নিবেদিতা পরবর্তীকালে 'আচার্যদেব' গ্রন্থে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন, আগেই জেনেছি তা। এই কালে নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর পত্রগুলিও উদ্ধৃত হয়েছে পূর্বে। নিবেদিতা দু'একবার বক্তৃতায় এবং চিঠির মধ্যেও স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কিভাবে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, বলেছেন।

নিবেদিতার জীবনীকার প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতা, ক্লাস এবং ঐসব ভাবণাদিতে নিবেদিতার উপস্থিতির ও অংশগ্রহণের বিষয় যথাসম্ভব বিস্তারিত জানিয়েছেন। নিবেদিতার বোনের স্মৃতি-কথা থেকে পেয়েছি—নিবেদিতা যদিও প্রথম থেকে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলেন—জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিরোধ জাগিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘ দিন। প্রতি বক্তৃতার শেষে তিনি কিভাবে—'স্বামীজী, কিন্তু—' বলে উঠে দাঁড়াতেন, তার কথা জেনেছি।

স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে চলে আসার পরে নিবেদিতা কিছুদিন লণ্ডনের বেদান্ত সোসাইটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ই, টি, স্টার্ডি, এরিক হ্যামণ্ড, বিশেষতঃ মিসেস অ্যাশটন জনসন এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। এই সমস্ত কার্যাবলীর কিছু বিবরণ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় মিস মার্গারেট নোবল প্রেরিত লেখা থেকে পাই। ব্রহ্মবাদিনে নিবেদিতার এইরকম চারটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, ১ অক্টোবর, ১ নভেম্বর, এবং ১৬ ডিসেম্বরে।

১৫ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত লেখায় মিস নোবল জানিয়েছেন, গত ডিসেম্বরে (১৮৯৬) স্বামীজী চলে যাবার পরে উইম্বলডনে অল্পই বড় ধরনের বক্তৃতাদি হয়েছে। তবে স্বামী অভেদানন্দ কিছু ক্লাস নিয়েছেন, যাতে মিঃ স্টার্ডি সভাপতিত্ব করেছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য ক্লাস বন্ধ; লেখিকা আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে 'বেদান্ত ঘুমিয়ে পড়েনি।' শিক্ষায় বিরতি, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয়; বিশেষতঃ বর্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে তত্ত্বটি অভিনব এবং বিশাল। পাশ্চাত্ত্য মনের কাছে পুনর্জন্মবাদ এবং 'পাপ, অজ্ঞান ছাড়া কিছু নয়' এই তত্ত্ব এতই চমকপ্রদ ও সংস্কার-

বিরোধী যে অবিলম্বে তা আত্মসাৎ করা কঠিন। তথাপি অনুকূল মনের উপর এই শিক্ষার কি রকম চমৎকার প্রতিক্রিয়া ঘটে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত যোগে লেখিকা তা দেখিয়েছেন। বেদান্ত শিক্ষার সাময়িক বিরতিকেও লেখিকা অনুকূল ব্যাখ্যায় ভূষিত করেছেন—"এসব ক্ষেত্রে বিরতি ও নির্জনতা একান্ত প্রয়োজন। এমনই নিয়তি, তার সন্ধানে ধাবিত হতে হল না, শিক্ষকেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যাতে আমরাই আমাদের অজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই করতে পারি।"

১ অক্টোবর প্রকাশিত লেখায় পাই—স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা যাত্রা করার লণ্ডন কেন্দ্র সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য সদস্যদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। নতুন জায়গায় আরম্ভ করার জন্য অনেক আমন্ত্রণ পাওয়া গিয়েছে। আলমবাজার মঠ থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ সেবাকাজের যে বিবরণ পাঠানো হয়েছিল, তা পেয়ে লেখিকা অতীব উল্লাস প্রকাশ করেছেন, কারণ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন আলস্যের আকর—পাশ্চাত্ত্যের এই সমালোচনার উত্তর ঐ সেবাকাজের মধ্যে পাওয়া যাবে।

১ নভেম্বর সংখ্যায় লেখায় মিঃ প্যাসটন ব্রাউনির বাড়িতে মিঃ এরিক হ্যামন্ডের সভাপতিত্বে বেদান্ত-অধিবেশনের কথা পাই, যাতে জনৈক সদস্য প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধের উপর কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা মিস নোবল করেছেন, সেইসঙ্গে পুনরায় জানিয়েছেন, বিদেশীর পক্ষে বেদান্ত কী কঠিন অথচ গভীর আগ্রহের বস্তু। স্বামীজীর প্রতিভার প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলা হয়েছে—

"It is very difficult to some who have never dreamt of the genuine character of Christianity, to conceive of the Vedanta as a friendly and not a rival system It says worlds for the power of the Swami Vivekananda's teaching that, it drew many such to listen to him, and left thoughts with them which they have since unconsciously assimilated and used instead of rejecting."

এই লেখায় আবার রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ কাজ সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করে স্পষ্টই ইঙ্গিত করা হল—তিনি ভারতে কাজে যোগদান করতে যাচ্ছেন—

"Great interest was expressed in the work of famine relief and in the Ramakrishna Mission. These are developments which appeal to the West in a peculiar way, *and it may be hoped that eventually the English centres will do their share towards sending out those secular and spiritual educators who shall carry on Hindu work on Hindu lines as some slight acknowledgement of the great benefits conferred on themselves by the awakening missionary zeal of India.*"

(বক্রলিপি লেখক কৃত)

১৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় পাই, মিস নোবল জানিয়েছেন, মিসেস আশটন জনসনের তত্ত্বাবধানে আবার 'বিবেক লাইব্রেরী' খোলা হয়েছে। ইংলণ্ডে বেদান্ত আন্দোলনে মিসেস জনসনের ভূমিকার প্রচুর প্রশংসা করে লেখিকা জানিয়েছেন, এই শীতে যে মিঃ স্টার্ডি ভ্রমণের জন্য বাইরে থাকবেন, আন্দোলনের পক্ষে তা খুবই

ক্ষতিকর। রামকৃষ্ণ সংঘের কার্যাবলী যে ইংলণ্ডে বিশেষ সহানুভূতির উদ্রেক করেছে, এই লেখায় তা পুনর্বার জানানো হল।

ব্রহ্মবাদিনের লেখাগুলি থেকে এই সময়ে মার্গারেট নোবলের কর্মী-ভূমিকাকে পেয়েছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজে সক্রিয় সাহায্যের জন্য বেদান্তকর্মীরা ইংলণ্ডে সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করেছিলেন—রেম-সংগ্রহে তেমন একটি সংবাদপত্রের অংশ রয়েছে। আবেদনটি মিসেস জনসনের নামে প্রচারিত—বলা বাহুল্য এর পিছনে নিবেদিতারই মুখ্য তাগিদ ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের আদিপর্ব সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই সংবাদটি উদ্ধৃত করছি। আবেদনটি প্রকাশিত হয় ডেইলী ক্রনিকলে।

AN IDEAL RELIEF FUND

The Editor of the Daily Chronicle

Sir,—It is probably superfluous to remind your readers that the need for famine relief in India has not been ended by the recent rains. Hunger and disease will continue unwelcome guests in peasant homes until the next harvest is reaped, and one shudders to think of the terrible burdens of debt and enfeebled constitution that will leave their mark for years to come on human lives.

These things point to the desirability of continuing the aid so generously begun to our subject-Empire, and—to meet the objections of those who dislike giving money to a scheme, such as the Government's, in which a large proportion must necessarily be spent on mere machinery—it is my privilege to point out a means of contributing, where every penny will be applied directly to the purpose for which it is given. This agency has, further, the advantage of being entirely native, so that money given through it is really an encouragement to self-help.

It is, in fact, the Sannyasins—a religious order, much revered by the people, who are on the one hand without material needs or ambitions of their own, and on the other absolutely devoid of antagonism to any race or creed whatever, Christian, Mussalman, or Hindu—who have taken up the idea of organised assistance for the suffering populations and are now hard at work in the villages round Pabna, a town in the Moorshedabad district, giving food, medicine, and nursing to the disease and famine-stricken peasantry.

These particular Sannyasins form a brotherhood called the Alum Bazar Math, having its head-quarters at Baranagore, Calcutta, and their Superior is the Swami Vivekananda, who visited the Chicago Parliament of Religions in 1893, and who resided in London temporarily in 1895 and 1896; a man for whose ability and integrity many well-known people in this country and America would be willing to vouch. Their work

in the relief of distress began on May 21, and by June 22 they had dealt with some 9,429 cases.

Full accounts and many touching details are published in the *Brahmavadin* (an English paper printed in Madras and on sale in London) of June 19, and July 3 and 17 last. The Government depots quickly recognised the importance of fostering this effort, and undertook to supply grain to the Order at Rs. 3 per maund, as against Rs. 4½ current rate. It is by no means in food alone, but almost as much in medicine and personal attendance that assistance can be given, and the movement derives special significance from the fact that many young men of the highest castes have allied themselves to it and are now enthusiastically engaged in nursing cholera patients of the pariah and out-caste classes. This is a phenomenon probably not paralleled in India since the days of Buddha. But the Sannyasins depend on the donations of others. May I therefore appeal to the generosity of your readers—especially of those who are acquainted with Indian life, or who in any way have special cause to believe in the trustworthiness of this channel to assist them? Money, marked "Famine Relief Fund", may be transmitted direct to the Swami Vivekananda, Alum Bazar Math, Baranagore, Calcutta, or sent through Miss Margaret Noble, 84, Worple Road, Wimbledon. Cheques in the latter case should be crossed, London and South-Western Bank, Ltd., Wimbledon-hill Branch. All sums received in India will be acknowledged in the *Brahmavadin*.

Earnestly hoping for a sympathetic response to this appeal.
I am, Sir,

Yours faithfully,
Ethel Jonson.

28, St. Ermin's Mansions, Westminister,
September 8.

ই. টি. স্টার্ডির চিঠি

ইংলন্ডে বেদান্ত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ই, টি, স্টার্ডির বড় ভূমিকা ছিল। স্বামীজীকে ইনি আতিথ্য দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে ইনি বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। নিবেদিতা স্টার্ডির বিশেষ পরিচিত ছিলেন, এবং স্টার্ডির পরবর্তী আচরণ তাঁর কাছে বিশ্বাসভঙ্গের মত গর্হিত কাজ মনে হয়েছিল। যাই হোক, রেম-হারবার্ট নিবেদিতা-জীবনী লেখার পূর্বে মিঃ স্টার্ডির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। রেম-সংগ্রহে স্টার্ডির তিনখানি চিঠি আছে—১৬,৪,৩৮, ২৭,৬,৩৮ ও ১১,১০,৩৮

তারিখের। শেষের চিঠিতে জিন হারবার্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্টার্ডি, এক রাত্রি তাঁর আবাসে কাটাবার জন্য; এবং পথের নিশানা লিখে দিয়েছেন। আগের দুটি চিঠিতেও খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাই না। ইনি লিখেছিলেন—"এত দিন পরে আমার স্মৃতি অনিশ্চিত ; আর আমার ধরনের মন কদাপি অতীতের ব্যক্তি বা ঘটনার মধ্যে ডুবে থাকে চায় না বা তার রোমন্থন করতে পারে না" (২৭,৬,৩৮)। আগের চিঠিতেও (১৬,৪,৩৮) এই ধরনের কথা তিনি লিখেছিলেন—"দুঃখের বিষয়, আমার মনের যে ধাত, তা খুঁটিনাটিতে নিবিষ্ট নয়, বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণ-মননে আগ্রহী নয়।" তবু মিঃ স্টার্ডি কিছু পূর্বস্মৃতি জানিয়েছিলেন, কারণ—"একটি বিরাট কাজে আপনারা হাত দিয়েছেন।" এবং মিঃ স্টার্ডি যতই বিস্মৃতিপ্রবণ হোন—

"স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিত্ব ছাপ না রেখে যান না। যদিও আমুদে মজাদার স্বভাবের লোক তিনি ছিলেন, তবু সকল আনন্দের অবসরের মধ্যেও তিনি সর্বদা মর্যাদাময়। তিনি কেবল হাসিকেই জানেন নি, বেদনাকেও গভীর ভাবে অনুভব করতেন, এবং বেদনামথিত জীবনকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বিরাট সহানুভূতি স্পর্শ করত।" (স্টার্ডির চিঠি—১৬,৪,৩৮)

এই চিঠিতে মিঃ স্টার্ডি স্বামীজীর একান্ত ভক্ত শিষ্য গুডউইনের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। আবেগের সঙ্গে লিখেছিলেন—

"আপনারা কোনো এক জায়গায় যদি গুডউইনের নামোল্লেখ করেন।—তাঁর গোটা নামটা আমার মনে পড়ছে না—কিন্তু তিনি না থাকলে আমরা স্বামীজীর আমেরিকায় বক্তৃতাগুলি পেতাম না।

"আমেরিকায়, ইংলণ্ডে বা ভারতবর্ষে স্টেনোগ্রাফাররূপে তাঁর কাজের পিছনে কদাপি কোনো প্রতিদান প্রাপ্তির চিন্তা ছিল না, তা সম্পূর্ণতঃ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার কর্ম। তিনি নিজের ব্যয় নিজেই বহন করতেন এবং নিজের জীবন বলি দিয়েছিলেন।"

মিঃ স্টার্ডি নিজের দুর্বল স্মৃতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা বিনয়ের উক্তি নয়। রেম-হারবার্টকে প্রদত্ত তথ্যে স্পষ্টই ভ্রান্তি আছে। কারণ তিনি এমন পর্যন্ত লিখেছেন যে, নিবেদিতা ভারত থেকে কখনো ইংলণ্ডে ফিরেছেন মনে করতে পারেন না। এবং নিবেদিতা যে কখনো আমেরিকা গেছেন বা তার পিছনে পুলিশ লেগেছিল, এসব কথাও তিনি জানেন না। নিবেদিতার ছদ্মনামের বিষয়েও একই বক্তব্য। ভারতীয় কল্পনাবিলাস সম্বন্ধে কটূক্তিও আছে—"যদি আপনারা ভারতীয় সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি এইটুকু বলতে পারি, সে দেশ রূপকথার, বীরপূজার এবং উদ্ভট সৃষ্টির।"

নিবেদিতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান সংবাদ মিঃ স্টার্ডির পত্র থেকে পাই—

"ইংলণ্ডে শেষ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস নিবেদিতা যেন অবিচ্ছিন্নভাবে আধা সমাধির মত মানসিক অবস্থায় ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে যাওয়ার বিষয়ে আমার সঙ্গে যৎপরোনাস্তি আগ্রহ ও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আমি তাঁকে ভারতে যেতে উৎসাহিত করেছিলুম। তাঁর অনেক বন্ধু প্রস্তাবটি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন।"

শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে অন্য পত্রে লেখেন—

"অন্য কারো পরামর্শ তিনি নিয়েছিলেন বলে আমি জানি না।* তাঁর যাত্রা নিয়ে কেউ কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা মনে আছে। তাদের নাম করতে চাই না।"

লেডী ইসাবেল মার্গসনের চিঠি

নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু এস কে র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার সঙ্গে লেডী ইসাবেল মার্গসনেরা বিশেষ পরিচয়ের কথা বলেছেন। লেডী ইসাবেলের ড্রইংরুমে স্বামীজীর বক্তৃতাকালেই নিবেদিতা তাঁকে প্রথম দেখেন। নিবেদিতার বিশেষ বন্ধু লর্ড কুলেনডানের দ্বিতীয় পত্নী লেডী ইসাবেলেরই প্রথম কন্যা।

রেমণ্ড-হারবার্টের পত্রের উত্তরে লেডী ইসাবেল ৩০ অক্টোবর, ১৯৩৮, যা লেখেন, তাতে বিশেষ সংবাদ নেই, এবং সংবাদ দেবার উৎসাহও নেই। লেডী ইসাবেল জানিয়েছিলেন, মিস মার্গারেট নোবল তাঁদের বাড়িতে কখনই গভর্নেসের কাজ করেন নি, এবং দৈনন্দিনের গতানুগতিক জীবনে 'মিস নোবল আকর্ষণীয় আনন্দদায়ক চরিত্র।' এঁর চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

"Miss Margaret Noble was never our governess. At the time I first met her she had a little school at Wimbledon and a certain Miss Wiedeman, a young Dutch girl was on her teaching staff and applied to me for the post of governess. I saw her at Miss Noble's house and I engaged her then and there. This was the link between Miss Noble and myself and it happened in 1895. I wish I could tell you more but I only knew Miss Noble as a delightful and interesting personality in the come and go ordinary life."

এরিক হ্যামণ্ডের স্মৃতি

এরিক হ্যামণ্ড এবং তাঁর পত্নী নেল হ্যামণ্ড নিবেদিতার ইংলণ্ড-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তা পাঠকগণ ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন আশা করি। নেল হ্যামণ্ডকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি সেরা চিঠি আমরা পেয়েছি, যার মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত

---

* অন্যের সঙ্গেও নিবেদিতা পরামর্শ করেছিলেন। কিছু পরে এরিক হ্যামণ্ডের স্মৃতি-কথা থেকে তা দেখতে পাব।

† "লেডী ইসাবেল মার্গসন স্যার মার্টিমার মার্গসনের পত্নী। ইনি লর্ড হোবার্টের তৃতীয়া কন্যা। লর্ড হোবার্ট ছিলেন বাকিংহ্যামশায়ারের ষষ্ঠ আর্লের দ্বিতীয় পুত্র। লেডী ইসাবেল ১৮৮৬ সালে বিবাহিত হন। এঁর দুই পুত্র, বড়—ভাইকাউণ্ট মার্গসন। তিন কন্যা,—বড় মেয়ে লর্ড কুলেনডানের দ্বিতীয়া পত্নী।" (লেডী ইসাবেলের দেহত্যাগের পরে সংবাদপত্রের শোকলিপি থেকে)

মন খুলে ধরেছিলেন। নিবেদিতার চিঠি থেকে জেনেছি, তাঁর ইংলণ্ড ত্যাগের পরে হ্যামণ্ডদম্পতি নিবেদিতার পারিবারিক ব্যাপারে নানা সাহায্য করেছেন।

হ্যামণ্ডদম্পতি বেদান্ত আন্দোলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এঁরা স্বামীজীর শিষ্য, এবং তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের মহিমায় অভিভূত। নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই, ভারতে শিক্ষা-কাজের জন্য এই দম্পতির আসার সম্ভাবনা ছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে এরিক হ্যামণ্ড এই আন্দোলন ও আন্দোলনের কেন্দ্র-পুরুষদের কথা বহুবার বহু স্থানে উপস্থিত করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, বিদেশী পত্রিকাতেও। স্বামীজী সম্বন্ধে এঁর একটি চমৎকার কবিতা সমসাময়িক পত্রিকায় দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র এঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, এবং তাঁর বিষয়ে সুগভীর ভাবময় ভাষায় ইনি প্রবন্ধাদি লিখেছেন। স্বামীজীর ইংলণ্ড-জীবন সম্বন্ধে এঁর চমৎকার স্মৃতিকথা পাই।

বেদান্ত-আন্দোলনের এই ভক্ত লেখকের বিষয়ে দুঃখের কথা, উপযুক্ত তথ্য সংগৃহীত হয়নি। ইনি কবি ও প্রাবন্ধিক ছিলেন, ভাবকমনীয় ব্যঞ্জনাময় ভাষায় লিখতেন—লেখা থেকে সেটুকু বুঝতে পারি। মিসেস উইলসন, রেমঁ-হারবার্টকে দম্পতির সম্বন্ধে অল্প কিছু জানিয়েছেন, যার মধ্য থেকে এই দরিদ্র আদর্শবাদী লেখক দম্পতির চেহারা কিছু স্পষ্ট হয়েছে—কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় মোটেই।

এরিক হ্যামণ্ডের লেখায়, আমি যতদূর দেখেছি—নিবেদিতার প্রসঙ্গ দুবার মোটামুটি বিস্তারিত পেয়েছি, একবার স্বামীজীর স্মৃতি প্রসঙ্গে, অন্যবার নিবেদিতা নামাঙ্কিত একটি রচনায়।

বেদান্তকেশরী পত্রিকায় ১৯২২-এর মে মাসে স্বামীজী-প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিবেদিতার কথা ইনি বলেছিলেন। লেখাটি কিয়দংশে উদ্ধৃত করছি। নিবেদিতা কিভাবে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে ধাবিত হতেন, এই লেখা থেকে বোঝা যাবে।—

"স্বামীজীর আগমনে লণ্ডনে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হল। চিকাগোর ধর্মসভায় তাঁর সম্বন্ধে যে মহাবিস্ময় ও প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, তাঁর পদার্পণের পূর্বেই তা লণ্ডনে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর চেহারার চৌম্বকশক্তি, তাঁর বক্তৃতার ততোধিক মোহিনী আকর্ষণ বহু মানুষকে তাঁর দিকে টেনে আনল।...

অজস্র অভিজ্ঞতার শহর লণ্ডন। এর সহস্র প্রকৃতি।...লণ্ডন বাস্তবিকই নানা উদ্‌গিরণের আগ্নেয়গিরি স্বরূপ।...এইখানেই, এই লণ্ডনেই স্বামীজী এলেন নিজের স্থান গ্রহণের জন্য, বিরোধী ও সংঘাতশীল শক্তিসমূহের মধ্যে হিন্দুধর্মের বাণী-বাহকরূপে নিজেকে স্থাপন করবার জন্য।...লণ্ডন শীঘ্রই জানল, এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের উদয় হয়েছে। স্বামীজী ধারাবাহিক বক্তৃতা করে চললেন, অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন—এক কথায়, নিজেকে দেখালেন ও জানালেন। তাঁর বিশেষ ভক্তদের মধ্যে ছিলেন মিস মার্গারেট নোবল, যিনি ভাগ্যবশে পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যা হবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনীরূপে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বরণ করবেন এবং বেদান্তধর্মের এক অপূর্ব শক্তিশালী বক্তা ও লেখক হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরই সাগ্রহ নির্বন্ধে পড়ে বর্তমান লেখক একদিন পার্শ্ববর্তী এক জেলা-শহর থেকে স্বামীজীর বাসভবনের দিকে যাত্রা করলেন। স্বামীজী ঐখানে নির্দিষ্ট সময়ে

দর্শন দেন। অত্যন্ত বিশ্রী ও বিমর্ষ এক সন্ধ্যায় তাঁর দ্বারে হাজির হলাম। কিন্তু সেখানে আরও হতাশা—স্বামীজী বাড়িতে নেই। তবে আমাদের জন্য একটি বিশেষ সহৃদয় বার্তা রেখে গেছেন, তাতে আছে, আমরা তাঁর জন্য সিসেম ক্লাবে যেতে পারি, যেখানে নির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে হঠাৎ-আহ্বানে তিনি চলে গিয়েছেন। সাগ্রহে আমরা নির্দেশমত ক্লাবের অভিমুখে যাত্রা করলাম। হাজির হয়ে দেখি, মস্ত একটি ড্রইংরুম, যা হলঘর, সান্ধ্য পোষাকে সজ্জিত কেতাদুরস্ত মানুষে প্রায় ঠাসাঠাসি-ভর্তি। দু'একজন ভদ্র ও সহৃদয় ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মের একেবারে কাছে আমাদের ঠেলে এগিয়ে দিলেন, সেখানে দু'একটি চেয়ার খালি রাখা ছিল। আসন দুটি আকর্ষক, হায়, আমরাও তাই! আমাদের ওভারকোট থেকে জল ঝরছে, এবং এহেন সমাবেশে আসতে হবে জানা না থাকায় পোষাকাদিও আহা-মরি কিছু নয়। দেখলাম, উপস্থিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা জাতীয়। বক্তৃতার বিষয় —'শিক্ষা'। অল্প পরেই স্বামীজী আবির্ভূত হলেন। প্রায় কোনো সময় না দিয়েই, কিংবা একেবারেই কোনো সময় না দিয়ে, তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে, বক্তৃতা একেবারেই তৈরী নেই। তবুও তিনি, যেমন সর্বক্ষেত্রে, পরিবেশের উপরে নিজেকে স্থাপন করলেন। শান্ত, সংযত, আত্মস্থ—তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। একজন হিন্দু,—আর্য বিশ্বাসে ও বাণীতে পূর্ণ-হৃদয়, পূর্ণ-কণ্ঠ একজন উদ্দীপ্ত হিন্দু,—যাঁর পিছনে আছে সুপ্রাচীন সভ্যতার মহিমা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য। সে এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর শ্যাম বর্ণ, সুগভীর জ্বলন্ত নয়ন, এমনকি তাঁর পোষাক—সবই চতুর্দিকে মোহবিস্তার করল। সর্বোপরি তাঁর বাণী, তাঁর বাগ্মিতা—প্রেরণায় সেই উচ্চারিত ধ্বনি। ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর বিস্ময়কর অধিকার শ্রোতৃবৃন্দকে চমকিত ও আনন্দিত করে তুলল,—মনে রাখতে হবে, এই শ্রোতাদের অধিকাংশের বৃত্তি হল, আমি আগেই বলেছি, ইংরেজদের ইংরাজি ভাষা শেখানো, এবং সেই ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিদ্যা দান করা। এ ছাড়াও স্বামীজী শীঘ্রই দেখিয়ে দিলেন—তিনি ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমভাবে ব্যুৎপন্ন। ঐ মানুষগুলির মধ্যে, তাদের দুর্গভিত্তির উপরে তিনি সদর্পে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরম নির্ভয়ে, অনুগ্রহের কোনো প্রত্যাশা না রেখে, আঘাতের পর আঘাত করে তিনি হিন্দুনীতির মহিমা তুলে ধরলেন—যে-শিক্ষক টাকা তৈরীর কথা শেখান ছাত্রদের, তিনি উচ্চতম ও গভীরতম সত্যের নিকট বিশ্বাসঘাতক। 'শিক্ষা ধর্মের অঙ্গাঙ্গি বস্তু; শিক্ষা কিংবা ধর্ম, এই দুইয়ের কাউকেই বেচাও যায় না, কেনাও যায় না।'...তাঁর কথাগুলি প্রচলিত শিক্ষারীতির বর্মকে তীব্রভাবে ভেদ করে প্রবেশ করল।..."

লণ্ডনে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এরিক হ্যামণ্ডের কয়েকটি স্মৃতিচিত্র প্রকাশিত হয় ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ১৯০৭ সালে। তারই একটিতে (সেপ্টেম্বর, ১৯০৭) লণ্ডন থেকে স্বামীজীর বিদায় সংবর্ধনার ব্যক্তিগত বর্ণনা রয়েছে। নিবেদিতার নাম নেই এই লেখায়, কিন্তু ধরে নিতে বাধা নেই, এই অনুষ্ঠানের মুখ্য সংগঠকদের তিনি অন্যতম। স্বামীজীর বিদায় কী দারুণ শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, অথচ একই সঙ্গে কি অপরূপ আধ্যাত্মিক গভীরতায় অন্তরকে পূর্ণ করেছিল, এরিক হ্যামণ্ড তার

সুন্দর বর্ণনা করেছেন। এরিক হ্যামন্ডের মনের পাশেই অনুরূপ আর একটি মন ছিল—মার্গারেট নোবলের—একথা ধরে নিয়ে লেখাটি কিয়দংশে উপস্থিত করছি—

"ধূসর বিষণ্ণতার একটি দিন...রবিবার।...ধূসর, খানিক স্তিমিত, প্রায়-নীরব লোকগুলি চার্চ ও চ্যাপেলের দিকে মন্থর চরণে চলেছে। স্যাবাথ-দিনের মনোভাব ও আবহাওয়া সম্বন্ধে তারা পূর্ণ সচেতন। এই ধূসরতা ও নীরবতার সঙ্গে আমাদের মত কিছু লোকের মন এক তারে বাঁধা। ঐ অপরাহ্ণে আমরা চলেছিলাম 'বিদায়' জানাতে—সেই মানুষটিকে বিদায় দিতে যাঁর অভ্যুদয় আমাদের জীবনে বহু-কিছু তাৎপর্য এনেছিল। তাঁর প্রস্থান-দিন স্থির হয়ে গেছে। শূন্য হয়ে যাবে আমাদের জীবনের অনেকখানি, কিছুতে পূরণ হবে না তা।...

মাইল সাতেক দূরে আমাদের আবাস, সেখান থেকে শেষ নমস্কার জানাবার জায়গাটির দিকে চলেছি। হাঁ, আমাদের মুঠিতে শেষ বারের মত উষ্ণ চাপ পড়বে, সেই স্থির, প্রেমপূর্ণ, উন্নত নয়নের শেষ চাহনি—। আমাদের সম্মেলন গৃহটি শিল্পীদের ব্যবহারের গ্যালারি, দেওয়ালে লম্বিত চিত্ররাজি, ফুলে লতায় পাতায় সজ্জিত মণ্ড। এখান থেকেই, ইংলণ্ডের সুমহান রাজধানী-নগরীতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজ জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর বিদায় ভাষণ জানাবেন।

সর্ব ধরনের, সর্ব অবস্থার মানুষ সমবেত হয়েছে। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী, জাগতিক দৃষ্টিতে কেউ উচ্চ, কেউ নীচ, নানা শ্রেণীর মানুষ—সবাই কিন্তু একটি আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ—তাঁকে দেখবে, তাঁর কথা শুনবে, আর যদি সম্ভব হয়, তাঁর বসনপ্রান্ত স্পর্শ করবে, কেননা শীঘ্রই স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা বঞ্চিত করবে সে সৌভাগ্যে।

বক্তৃতা হল। নারী ও পুরুষেরা বললেন। সে সব বক্তৃতায় প্রকাশ পেল স্বামীজী কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন। প্রকাশ পেল—প্রাচ্যের ধর্ম ও দর্শনের অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি কী গভীর ও বাস্তব ঋণে আবদ্ধ করেছেন।... আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বক্তৃতা করতে সমর্থ, দেখা গেল অনেকেই সমর্থ, বক্তৃতা তাঁরা করলেন, প্রবল করতালিতে ও 'হিয়ার হিয়ার' শব্দে তাঁদের কথায় সানন্দে সমর্থন জানানো হল। আবার নীরব ছিলেন কেউ কেউ, ঠোঁট চেপে বসে, হৃদয়ে বিষাদ নিয়ে। কোনো কথাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।...সত্য কথা বলতে কি, চোখের পাতার তলায় টলটল করছিল অশ্রু।

যে-মঞ্চে তিনি অনুগত বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার নিকটেও আমরা যেতে পারিনি। তাঁদের মধ্যে গায়ক-বাদকেরা ছিলেন, যাঁরা অনুষ্ঠানের ফাঁকে সুস্বর ভরিয়ে দিচ্ছিলেন।...

আমরা জেনেছিলাম, শিখেছিলাম, স্থান ও কাল সামান্য বস্তু। আমরাই তাদের সৃষ্টি করি, কিংবা সৃষ্টি করে বলে অনুমান করি আমাদেরই প্রয়োজনে। সত্য কথা। তবু, এই বোধ আমরা দূর করতে পারিনি—যিনি আমাদের জীবনে মূল্যবান হয়ে উঠেছেন, তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের যাতনার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু নেই—আমাদের জীবন যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ!

তাই খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছি, ইতস্ততঃ নমস্কার ও সম্ভাষণ বিনিময় হচ্ছে, শুনছি কান খাড়া করে যতখানি শোনা সম্ভব......। কৃত্রিম আলোয় হলটি কিছু আলোকিত, কিন্তু ধূসর-বিষণ্ণ বাতাস, অনুরূপ অনুভূতিতে পারিপার্শ্বিক আচ্ছন্ন—সকলের মর্মে প্রবিষ্ট তা।

বাইরের ধূসর-বিষণ্ণতা অন্তরের ধূসর-বিষণ্ণতার দ্বারা ঘনীভূত।

এর মধ্যে একটি মূর্তি কেবল বেদনা-সংগ্রামে বিজয়ী। জ্বলন্ত পোষাকে মোড়া দেহটি। স্বামীজী সমবেত মানুষদের মধ্য দিয়ে চলন্ত সূর্যকরের মত সঞ্চরণ করতে লাগলেন। তাঁকে ঘিরে থাকার জন্য যখন তাঁর আকার দৃষ্টিগোচর হয়নি, তখনো মনে হল, যেন তাঁর উপরে, তাঁর ভিতরে, আলোকের তরঙ্গ—উত্তাপে, আনন্দে, উজ্জ্বলতায় এবং নবজীবনে তা উদ্ভিন্ন।

তারপর, অন্যান্য বারের মতই, তাঁর পদধ্বনি নিকটতর হল যখন, আমি অনুভব করলাম, আমার কিছুই বলার নেই, কোনো প্রশ্ন নেই, এমন কোনো চিন্তা নেই যা তিনি না জানেন। তিনি এগিয়ে আসতে আমি নত হলাম, কিন্তু এমন নত নয় যে চোখে না পড়ে। তাঁর চাহনি শোকের আবরণ ভেদ করে গেল, ছিন্ন ভিন্ন করে দিল তাকে, আর নিরাময় করে দিল তারই মধ্যে। সেই দুটি চোখের সৌন্দর্য ও শক্তি এ জীবনে ভুলবার নয়। তারা নিরাময় করেছিল, কেননা তারা সুনিশ্চিত দেখিয়েছিল,—আমাদেরই মত তাঁর বেদনা, এবং, সমবেত বেদনার মধ্য দিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত পরমা শান্তিকে লাভ করব। তিনি আমার হাত ধরলেন— দৃঢ়ভাবে ধরে রইলেন। সেই স্পর্শের মধ্য দিয়ে যেন তাঁর আত্মা—'যেন' নয়, সত্যই তাঁর আত্মা—আমাকে আলিঙ্গন করল। বললেন, "হাঁ, নিশ্চয়, আমরা আবার মিলব, হাঁ নিশ্চয়, আবার—।"

'পরিবর্তন যুগে' নিবেদিতার মনচ্ছবি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান লেখা এরিক হ্যামন্ড লিখেছিলেন প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ১৯২৭, ডিসেম্বর সংখ্যায়। লেখাটির নাম—Sister Nivedita: An impression of earlier years. নিবেদিতার মানস-প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মূল্যবান কথা এই লেখায় আছে, যা অন্যত্র পাই না। নিবেদিতার এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন,—

"Margaret Noble was essentially a woman's woman. Her temperament, her sympathies, her personality, all tended to attract persons of her own sex."

এই 'সবিশেষ উল্লেখযোগ্য' কথাটি জানিয়ে লেখক বলেছেন-"Thus it was, happily, plainly palpable, that her allegiance to the Swami was not in any way coerced by his masculinity. It was rather the spirit within him......"

নিবেদিতার প্রথম জীবন সম্বন্ধে এরিক হ্যামন্ডের লেখাটি এই—

"তিরিশ বছরের উপর কেটে গেছে। মিস মার্গারেট নোবল, পরবর্তীকালে যিনি সিস্টার নিবেদিতা হন, লন্ডনের শহরতলী উইম্বলডনে একটি মেয়েদের

স্কুল চালাতেন। জ্ঞান-সঞ্চারের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা তাঁর ছিল; অনুরূপ উল্লেখযোগ্য, উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ও তাঁদের নির্দেশাদি দানে তাঁর ক্ষমতাও। আপাদমস্তক জীবন্ত, বুদ্ধির তেজে স্পন্দিত বর্ত্তিকা—যুগপৎ আকর্ষণীয় ও আধিপত্যপ্রবণ—মার্গারেট নোবল ছাত্রীদের উদ্দীপনায় মাতিয়ে তুলতে পারতেন। বিস্তৃত পড়াশোনাতেই কেবল তাঁর সাহিত্যপ্রীতির প্রমাণ ছিল না, লেখকের অভিপ্রায়ের দ্রুত অনুধাবনেও তা সুস্পষ্ট হত। অসামান্য সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গি অনবদ্য। তার ছাত্রীদের আজও চিনে নেওয়া যায়—এমনই তাঁদের প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা—তাঁদের এই শিক্ষায়িত্রী প্রতিটি অক্ষর যাতে পূর্ণ মূল্য লাভ করে সে সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর স্যাহিত্যপ্রীতি সক্রিয়ভাবে ব্যক্ত হল যখন ১৮৯০-এর মত সময়ে তিনি 'সমপ্রাণ কতকগুলি মানুষকে জুটিয়ে নিয়ে 'উইম্বলডন লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন করলেন, যা হায়, এখন অল্পদিন হল নিজ ইতিহাসে 'সমাপ্তির' রেখা টেনে দিয়েছে।

মার্গারেট নোবল মৌলিকতার পূজারী, গতানুগতিক রীতি তাঁর হাসির জিনিস। তাঁর ছাত্রীদের অভিভাবকেরা অনেক সময় তাঁর ভাবে-গতিকে আহত হতেন, যেমন, ধরা যাক, নিজ স্টুডিয়োর ম্যান্টলপিসের উপরে ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি বসিয়ে রাখলেন, কিছুতে সরালেন না। যুক্তিতে, তর্কযুদ্ধে তাঁর মহা উল্লাস। যে বিতর্কের সময়ে বক্তারা উত্তেজিত ও উত্তপ্ত—সেই সময়ে তাঁর খুশী সীমাহারা। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে যোদ্ধাদের তেজীয়ান করে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে জ্বালা-ধরানো উক্তি ছুঁড়ে দিতেন, এবং যত প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত সংঘর্ষ ততই তাঁর সুখের বৃদ্ধি। ওয়াল্ট হুইটম্যান, এমার্সন, থরো তাঁর অনুরাগের জিনিস। শেষ দুই লেখকের রচনা থেকে প্রাচ্য দর্শনের সমর্থক যে-কোনো অংশ অতীব তেজের ও আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্ধৃত করতেন। বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। খ্রীস্টধর্মের প্রচলিত রূপ সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডনে এলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন—বড় ওস্তাদের হাতে বীণা যেভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনলেন নিজের ক্লাব সিসেমে, মিস্ মুলারের উইম্বলডনের বাসভবনে, লণ্ডনের ভিতরে বা কাছাকাছি স্থানের নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে। যেখানেই ইনি যেতেন সেখানেই তিনি স্বামীজীকে বর্তমান যুগের প্রফেট বলে ঘোষণা করতেন। বহু জায়গায় স্বামীজীর উপস্থিতির ব্যাপারে তিনি সহায়তা করেছিলেন; তার মধ্যে স্যার রিচার্ড স্টেপলি প্রতিষ্ঠিত ব্লুমসবেরী স্কোয়ারের 'ক্রিস্টো-থিয়জফিক্যাল সোসাইটি'ও ছিল, যেখানে, প্রসঙ্গতঃ বলে নিই, স্বামী অভেদানন্দ ইংরাজীতে তাঁর প্রথম বক্তৃতা করেন। নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়—এঁর প্রভাব ও স্থায়ী নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস, মিঃ ই. টি. স্টার্ডির দৃঢ় উদ্দেশ্য ও আর্থিক সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বামীজীর লণ্ডন-জীবনের সাফল্যকে বহুলাংশে সম্ভব করে। বেদান্তে পূর্ণ অবগাহন করবার পর থেকে ইনি এঁর সকল বাগ্মিতাকে বেদান্তের পক্ষে প্রয়োগ করলেন। বিবেকানন্দের অপূর্ব জালে ধরা পড়ার পরে তাঁর বিষয়ে ও তাঁর সম্বন্ধীয় বিষয়ে কথা বলায় ইনি অক্লান্ত। "স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন আপনি?"—জিজ্ঞাসা করতেন; "যদি

না দেখে বা তাঁর কথা না শুনে থাকেন, অতি অবশ্যই শুনবেন। তাঁর মত কেউ নেই, তাঁর সমতুল?—কেউ নয়, কেউ নয়।" বাগ্মী, জেদী, প্রভুত্বপ্রিয় এই মহিলাটি বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত এমনকি অপরিচিতদের পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতেন ভারত-পুত্রের কাছে, যিনি আর কেউ নন, ইনি আশ্বাস দিয়ে বলতেন—স্বয়ং সত্য-সূর্য। স্বামীজীর বাণীকে ইনি গ্রহণ করেছিলেন—ধরে রেখেছিলেন—সর্বাত্মকভাবে। অবশ্য যখন ভারতে গিয়ে সেখানকার কাজে নিজ শক্তি নিয়োগের প্রশ্নটি এল, তখন স্বাভাবিকভাবে দ্বিধা করেছিলেন। বর্তমান লেখকের সঙ্গে তিনি প্রস্তাবের পক্ষ ও বিপক্ষের দিকগুলি নিয়ে প্রায়ই কথা বলেছেন—ঐ উদ্দেশ্যে যদি তিনি ভারতে যান, তাহলে, মায়ের বয়স হয়ে গেছে, তাঁকে দেখাশোনার ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে; লন্ডন শহরের বহু দাবি তাঁর উপরে, সেগুলি পূরণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতাও তাঁর আছে—সেই সমস্ত আকর্ষণকে ত্যাগ করে যেতে হবে। সর্বোপরি, তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে, অধিকাংশ খ্রীস্টান বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনেরা অসন্তোষ ও সন্দেহ প্রকাশ করবেন—এই সমস্তই সহ্য করতে হবে তাঁকে। অপরদিকে তিনি অনুভব করেছিলেন "ডাক এসেছে"—মহাসাগরের। সে স্বর প্রবিষ্ট হয়ে গেছে অন্তরের গহনে। ধ্বনিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে—প্রহরে—দিবা ও রাত্রিতে। অবশেষে, তাঁর আধ্যাত্মিক সংঘাতের পরে তিনি অনিবার্য 'ত্যাগকে' বরণ করে নিলেন, জানালেন—'নৌকা পুড়িয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন'—সত্যই তাই। জানালেন—অতঃপর যাই হোক না কেন, পুরানো আবাসে, পুরানো জীবনে, পুরানো বন্ধুদের মধ্যে আর কখনো ফেরা সম্ভব হবে না—কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কিছু সময়ের জন্য ঘুরে যাওয়া অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। এই পরম অনুগত শিষ্যার জন্য স্বামীজীর ব্যাকুল স্নেহ ছিল—তিনি এক্ষেত্রে গভীরভাবে নিজ দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। অপরাজেয় তাঁর সাধুতা—এই শিষ্যত্বের ফল কি, কাজের জন্য তাঁকে অনুসরণ করলে কি ঘটতে পারে—কী কঠোর যন্ত্রণাময় সে জীবন—তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সর্বপ্রকারে। তাঁর এবং তাঁর দলের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সম্পর্কের কী কদর্থ করা হবে, কাজে ও কথায় তাঁর বিরুদ্ধে কতখানি গরল উদ্গিরণ করা হবে—সমস্ত ছবিই তিনি খুলে ধরেছিলেন।

এইখানে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সম্মুখীন হচ্ছি। মার্গারেট নোবল মূলতঃ নারীদের নারী। তাঁর মেজাজ, সহানুভূতি, ব্যক্তিত্ব—সব কিছু নারীকেই আকর্ষণ করত। সর্ব বয়সের নারী, শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক, প্রবীণেরাও, তাঁর গুণমুগ্ধ—সম্মান করত তাঁকে। অপরপক্ষে পুরুষেরা প্রায় কখনই এই আকর্ষণ অনুভব করেনি। আত্মার কোনো গূঢ় যাদুশক্তি পুরুষদের তাঁর থেকে দূরে ঠেলে রাখত।

তাঁর এই বিশিষ্ট গুণটিকে তিনি বাহ্যতঃ খুবই উপভোগ করতেন—তিক্ত সমালোচনার চাবুকে পুরুষদের ছিন্ন ভিন্ন করতে উল্লাস বোধ করতেন—তাদের বুঝিয়ে দিতেন, তাঁর চেতনায় নারীর স্থান মননের দিক থেকে অনেক উচ্চে স্থাপিত, পুরুষ যার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না। সুতরাং একথা খুবই স্পষ্ট যে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর আনুগত্যের পিছনে স্বামীজীর পুরুষ-প্রকৃতির প্রভাব ছিল না; অপরপক্ষে তা স্বামীজীর আত্মার শক্তির প্রতি আকর্ষণ

—ভারতের সুপ্রাচীন শাশ্বত আত্মা, যা সাম্রাজ্যের ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েও যুগ যুগ ধরে অব্যাহত, যা অখণ্ড বিশ্বাসে একটি সত্যকে আঁকড়ে আছে—"সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, নানা মানুষ তাকে নানা নামে আখ্যাত করে।" মার্গারেট নোবলের কাছে এই সত্যই দাবি উপস্থিত করেছিল, এবং একেই প্রবল শক্তিতে নাছোড় হয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ভায়োলিন-বাদকের বিধবা পত্নী মিসেস ওলি বুল এবং মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের আর্থিক সাহায্যে এবং স্যার জগদীশ বসুর বন্ধুত্বলাভ করে* তিনি হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন। অজানা পথে যাত্রার ইশারা তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল, অদম্য সাহস তাঁকে বহন করেছিল। ভারতে তাঁর কাজ সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, ভবিষ্যতেও বলা হবে অনেক কিছু। সেখানে এক বছরের শিক্ষানবিশী, তার পরে দীক্ষা। মার্গারেট নোবল সিস্টার নিবেদিতা রূপে সেই সব অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে যোগ্য স্থান লাভ করলেন, যাঁরা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর আবেদনকে সর্বোচ্চ বস্তু মনে করেন।

যাত্রাকালে তাঁর ছবি: তরুণী কিন্তু বিশিষ্ট নারী, নীল-ধূসর জ্যোতির্ময় আঁখি, হালকা সোনালি-পিঙ্গল কেশ, গাত্রবর্ণ স্বচ্ছ ও সমুজ্জ্বল, আর হাসি—করুণায় ও আকর্ষণে ভরা। উচ্চতা মাঝারি, শরীর সতেজ, চলায় ফেরায় ক্ষিপ্র, ব্যগ্র, উৎসাহী, অদম্য। আইরিশ রক্তের জন্য (যার জন্য তিনি গর্বিত) উদার আবেগ-ময়, উদ্দীপ্ত—কেলটিক জাতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলী তাঁর মধ্যে—তাদের বাক্‌পটুতা, প্রভাববিস্তারের সম্মোহন শক্তি। এই সব কিছুই তিনি সবুজ দ্বীপ† থেকে বয়ে এনেছিলেন, ইংলণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে—যে-দেশকে বরণ করেছিলেন স্বদেশ বলে।

* এইখানে কিছু তথ্যগত ভুল রয়েছে। নিবেদিতার প্রথম ভারতযাত্রার পূর্বে জগদীশ-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়নি, ভারতে পৌঁছানর অব্যবহিত পরেই তা হয়। মিসেস বুল বা মিস ম্যাকলাউড এই প্রথম ভারতযাত্রাকালে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন কিনা ঠিকভাবে বলা শক্ত। তবে এর ঠিক চার বছর পরে ইংলণ্ড থেকে তিনি যখন দ্বিতীয়বার ভারতযাত্রা করেন, তখন লেখক-কথিত ঐ কথাগুলি সত্য ছিল।

† *Emerald Isle* আয়ারল্যাণ্ডকে বলা হয় তার পান্না-সবুজ চেহারার জন্য।

ভগিনী নিবেদিতা

ও

ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু

ও

মিসেস ওলি বুল

মিস ম্যাকলাউড

শ্রীমতী অবলা বসু

স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রমেশচন্দ্র দত্ত

মিসেস ওলি বুল

মিসেস ওলি বুল জাতিতে আমেরিকান, বিয়ে করেছিলেন নরওয়েজিয়ানকে, এবং নরওয়ে ও আমেরিকার বহু সংস্থা ছাড়াও তাঁর বদান্যতা বিস্তৃত হয়েছিল দরিদ্র পরাধীন ভারতবর্ষের নানা কাজে। তিনি যথার্থই আন্তর্জাতিক মহিলা ছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য মিসেস বুল কী করেছেন তার আলোচনায় আসার আগে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিভাবে ঘটেছিল, এবং তখনকার আমেরিকান সমাজে তাঁর কি ধরনের স্থান ছিল, তা কিছুটা বলে নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে আমরা লুই বার্কের বিবরণের অনুসরণ করছি।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের কিছু আগে স্বামীজীর সঙ্গে মিসেস বুলের পরিচয় হয়। অল্প দিনেই সে পরিচয় প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। স্বামীজী তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করেন এবং তাঁর উপদেশ বা নির্দেশকে বহুমান দিতে থাকেন।

শ্রীমতী বার্ক লিখেছেন—

"স্বামীজীর সঙ্গে মিসেস বুলের প্রথম সাক্ষাৎকালে তাঁর বয়স চল্লিশের গোড়ার দিকে, তখন ১৪ বছরের মত বৈধব্যজীবন যাপন করছেন। প্রথমতঃ প্রকৃতিগত ভাবে মিসেস বুল সাহসী, স্বাধীনচিত্ত ও প্রাণোত্তপ্ত, স্বামীজী বলেছেন, 'অতীব আধ্যাত্মিক'; তদুপরি বিখ্যাত ভায়োলিনবাদক পতির সঙ্গে তাঁর ব্যাপক ভ্রমণ, নানা ম্যানেজার, শ্রোতা ও জনজীবন-সংশ্লিষ্ট বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয়—এক মহান শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো আছেই—এ সব কিছুই স্বামীজীর কাজে সাহায্য করার যোগ্য করে তুলেছিল তাঁকে, যার জন্য তিনি কেবল আমেরিকায় স্বামীজীকে যথোচিত পরামর্শই দিতে সমর্থ হননি, অধিকন্তু ব্যক্তিগত সহানুভূতি এবং সহ-মর্মিতা দান করতে পেরেছিলেন।"

অতঃপর শ্রীমতী বার্ক মিঃ মর্টিমার স্মিথ লিখিত 'দি লাইফ অব ওলি বুল' নামক গ্রন্থ থেকে যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়েছেন তা এই:

বিয়ের আগে মিসেস ওলি বুলের নাম ছিল মিস সারা থর্প। তাঁর পিতা মাননীয় জোসেফ জি থর্প, ধনী ব্যবসায়ী, ম্যাডিসনের স্টেট সেনেটর। ম্যাডিসনের সুন্দরতম প্রাসাদে তাঁরা থাকতেন। মিসেস থর্প জবরদস্ত মহিলা, শহরের সোসাইটি-সাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞীস্বরূপা, শোনা যায়, ম্যাডিসনের সামাজিক জীবনে তাঁর মত অবিসংবাদিত আধিপত্য করতে আর কেউ পারেননি। 'ইয়ান্কি-হিল'-এর সেই বিরাট প্রাসাদ ছিল শহরের স্বীকৃত সামাজিক সম্মিলনভূমি, এবং থর্পদের উদ্যান-পার্টি, সঙ্গীতের আসর, আয়োজিত নাট্যাভিনয় এবং বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক নৈশভোজ প্রভৃতিতে আমন্ত্রণ পেতে সকলে উন্মুখ, ব্যাকুল। ইয়াঙ্কি-হিলের এই বিরাট প্রাসাদভবনে বিখ্যাত ব্যক্তিরা স্বতঃই আসতেন, এবং এখানেই একদা-বিবাহিত ষাট বৎসর বয়সের পৃথিবীবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওলি বুলের সঙ্গে সারা থর্পের পরিচয় ও প্রণয়—সারার

বয়স তখন কুড়ি পেরোয়নি। কৃষ্ণকেশী সারা ঈষৎ গম্ভীর স্বভাবের, বিষণ্ণ-সুন্দর, মনে গভীর ছাপ রেখে দেন, সংগীতকে ভালবাসেন ব্যাকুলচিত্তে, আর মায়ের সতর্ক দৃষ্টির জন্য নিজ বয়সের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। সারা আদর্শবাদী, স্পর্শকাতর, অভিমানী, উত্তেজনাপ্রবণ বালিকা। কাহিনী আছে, ১৭ বছর বয়সে সারা যখন মায়ের সঙ্গে ওলি বুলের এক কনসার্টে গিয়েছিলেন, তখনই স্থির করেন মানুষটিকে বিয়ে করবেন ; তিন বৎসর পরে সামাজিকভাবে যখন মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হলেন, তখনো তাঁর মতি-পরিবর্তন হয়নি।

প্রথম দর্শনে এই প্রেমের, প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে এই রোমান্টিক আকর্ষণের হয়ত বৃথা-পরিণতি ঘটত, যদি না সারার জননী, সেই অসাধারণ মহিলা, এক্ষেত্রে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। স্বামীর প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে এই প্রণয়ে তিনি উৎসাহ সঞ্চার করেন। বিয়ে হয় ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে। বিচিত্র মিলন—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল ৪০ বছর বয়সের ব্যবধানই নয়—মেজাজ ও পটভূমিরও দুস্তর ব্যবধান। একজন, আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অতীব নিয়মতান্ত্রিক পরিবারের দুহিতা, অন্যজন, নিয়মহারা শিল্পীসম্প্রদায়ের অন্যতম। তবু প্রেম হয়ত সর্ব অসুবিধা দূর করে দিত যদি না মিঃ ও মিসেস থর্প প্রভৃতি পরিবারের সকলে এই দম্পতির উপরে সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখার চেষ্টা করতেন। কয়েক বৎসর ধরে থর্পদের পরিবারবাহিনী ঐ দম্পতির সঙ্গে থেকেছে, বেড়িয়েছে, তর্ক ও আলোচনা করেছে এবং উপদেশে উপদেশে ব্যস্ত রেখেছে। ফলে বিস্ফোরণ ঘটেছে অবিরত। শেষ পর্যন্ত, বহু চেষ্টাতেও যখন আবেগ ও উত্তেজনাপ্রবণ, বোহিসেবী ওলি বুলকে নিতান্ত বাধ্য, অনুগত, সভ্যভব্য জামাতায় রূপান্তরিত করতে অসমর্থ হলেন না, তখন মিসেস থর্প স্থির করলেন, লোকটি তাহলে তাঁর কন্যার উপযুক্ত স্বামী নয়। সুতরাং বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়ে সারা ও তাঁর শিশুকন্যা ওলিয়াকে (জন্ম ১৮৭১) নিয়ে তাঁরা ম্যাডিসনে ফিরে এলেন।

সারা এই অবস্থাকে দু বৎসর সহ্য করলেন, তারপর মায়ের মুখোমুখি হবার উপযুক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—ম্যাডিসন ত্যাগ করে চলে গেলেন স্বামীর কাছে নরওয়েতে। অতঃপর উভয়ের মোটামুটি শান্তির জীবন। 'মিসেস বুল বাস্তব-বোধহীন স্বামীর কাজকর্ম দেখাশানার ভার নিলেন, তাঁর কনসার্ট টুরগুলি কার্যতঃ পরিচালনা করতে লাগলেন ;...বার্ধক্যগ্রস্ত অস্থির স্বভাবের মানুষটির পরিণত-বুদ্ধি কর্মদক্ষ পত্নী হয়ে দাঁড়ালেন—লোকটিকে তিনি ভালবাসতেন, না, তারো বেশী—পূজা করতেন।'

ইতিমধ্যে মিসেস থর্প ম্যাডিসনের জীবনে সন্তুষ্ট না হয়ে পরিবারসহ কেমব্রিজে চলে এসেছেন। এখানেই তাঁর পুত্র জোসেফের সঙ্গে বিখ্যাত কবি লংফেলোর কন্যার প্রণয় ও পরে পরিণয় ঘটে। মিসেস বুলও কেমব্রিজে একটি স্বতন্ত্র আবাস নেন, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। শ্রীমতী বার্ক এর পরে 'দি লাইফ অব ওলি বুল' থেকে যা সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন, তা অনুবাদ করে দিচ্ছি—

"মিসেস বুল কেমব্রিজের সুপরিচিত চরিত্র হয়ে ওঠেন। ব্রাটল্ স্ট্রীটে তাঁর ভবনখানি, যেখানে তিনি ১৯১১ সালে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছিলেন, বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়ের এবং আদর্শবাদী নেতৃগণের সুবিখ্যাত সম্মেলনস্থল হয়ে ওঠে। শালীন, সংযত, কিছুটা বিষাদ-সুন্দর লাবণ্য নিয়ে তিনি সেইসব সমাবেশের নেত্রীত্ব করতেন। দেখা যেত, তাঁর এহেন সভাকক্ষে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বেদান্ত-দর্শনকে উপস্থিত করছেন সতর্ক ও প্রচ্ছন্নভাবে সন্দিগ্ধ কেমব্রিজের বন্ধুগণের নিকটে, উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করছেন, কিংবা জন ফিস্ক-এর চড়া ব্যারিটোনের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গতে নিযুক্ত আছেন। ভারতীয় সেগুন কাঠের প্যানেলযুক্ত বাসকক্ষে, যার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে ওলি বুলের আবক্ষ মূর্তি, সেই সঙ্গে তাঁর অগণ্য পোরট্রেট—এহেন পরিবেশে সমকালের বিতর্কমূলক সমস্যাসমূহ আলোচনা করতেন অন্য কেউ নন—অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস, টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিনসন, জোসিয়া রইস এবং জেন অ্যাডামস। সমাগতদের মধ্যে বিচিত্র মনুষ্যদের সাক্ষাৎ মিলত—অভিজাত মিস অ্যালিস লংফেলো, আরভিং ব্যাবিট, অধ্যাপক মান্সটারবার্গ, তখনো-সক্রিয় জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ, এমন কি সেই তরুণীটি পর্যন্ত—গারট্রুড স্টেইন, যিনি র‍্যাডক্লিফের শিষ্যা।"

মিসেস ওলি বুলের এই কেমব্রিজ বাসভবনে স্বামীজী আতিথ্য নিয়েছিলেন ১৮৯৪-এর অক্টোবরে, মিলিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজের এক প্রধান অংশের সঙ্গে এবং ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে, এবং এখানেই সম্ভবতঃ জেমস তাঁকে সমাধির অবস্থায় দেখেন।*

স্বামী বিবেকানন্দ ও মিসেস বুল

শ্রীমতী বার্কের গ্রন্থের বিবরণ এই পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে দেখব, মিসেস বুল ইংলন্ডে এবং তারও পরে ভারতবর্ষে স্বামীজীর সঙ্গী হয়েছেন। ভারতবর্ষেই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা। গঙ্গাতীরে বেলুড়ে 'ধীরামাতার ভালবাসায় মাখা কুটীরখানি', সেখানে স্বামীজীর অপূর্ব আধ্যাত্মিক রূপের সাক্ষাৎ-দর্শন, পরবর্তী-কালে মিসেস বুলের অতিথিরূপে উত্তর ভারত ও কাশ্মীরে সদলে স্বামীজীর ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে পূর্বে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'

---

* উইলিয়ম জেমস স্বামীজীর খুবই গুণমুগ্ধ ছিলেন। 'বৈদান্তিক শিরোমণি' বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জেমসের মনোভাব কি ধরনের ছিল, তা আমি 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে সংকলন করে দিয়েছি। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ কর্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত জেমসের এক পত্রে পাই, তিনি স্বামীজীকে 'মানবতার গৌরব' রূপে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক জেমস ২ অগস্ট, ১৯০০ তারিখে মিসেস বুলকে লেখেন—

"I have just been reading some of Vivekananda's Addresses in England, which I had not seen. That man is simply a wonder for oratorical power. As for the doctrine of the One. I began to have some talk with that most interesting Miss Noble about it, but it was cut short, and I confess that my difficulties have never yet been cleared up. *But the Swami is an honour to humanity in any case.*"

(বক্রলিপি লেখককৃত। চিঠিটি প্রবুদ্ধ ভারতের মার্চ ১৯৬৭, সংখ্যায় প্রকাশিত)।

অধ্যায়ে উপস্থিত করেছি। মিসেস বুলের অর্থসাহায্যেই বেলুড়ের পুরাতন ঠাকুরঘর ও সন্ন্যাসীদের আবাস নির্মাণ সম্ভব হয়। তাঁর উদারতা ও বদান্যতার জন্য স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন, মিসেস বুলই সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ইঙ্গিত আংশিক 'রসদদার'।

স্বামীজী মিসেস বুলকে 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন—এর মধ্যেই সারা বুলের চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য পাই। মিসেস বুল কেবল টাকাকড়ি দিয়েই স্বামীজীর কাজের সাহায্য করেন নি, ক্ষণে ক্ষণে জ্বলন্ত সন্ন্যাসীকে কিছুটা সংযত করে লোকজীবনের পক্ষে স্নিগ্ধকরভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ কখনো বাধ্য শিশুর মত তাঁর ধীরামাতার নির্দেশ মেনেছেন, কখনো ঝলসে উঠেছেন বেপরোয়া ভঙ্গিতে। স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে এই উভয় রূপেরই সাক্ষাৎ পাই। ১৮৯৫-এর ১৪ ফেব্রুয়ারীতে মিসেস বুলকে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন—"আপনি আমার ও আমার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন, সেজন্য কিভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, তা বলতে পারি না, এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন।" ঐ চিঠিতেই পাই—"আর এক কথা, মনুর মতে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সৎকার্যের জন্যও অর্থসংগ্রহ ভাল নয়। আমি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝছি যে, প্রাচীন ঋষিরা যা বলে গেছেন তা অতি ঠিক—'আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'—আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম সুখ।" এতৎসত্ত্বেও সন্ন্যাসীকে অর্থ সাহায্য নিতে হয়েছে, যদিও জানিয়েছেন, "হৃদয় ও মস্তিষ্ক দ্বারাই চিরকাল যা-কিছু বড় কাজ হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়", (২১.৩.১৮৯৫)। সাহায্যের জন্য এবং 'জননীর ন্যায় সৎ পরামর্শের জন্য' মিসেস বুল সম্বন্ধে স্বামীজীর কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না,* আবার আতঙ্কেরও সীমা ছিল না, পাছে সন্ন্যাসী বাসনায় বদ্ধ হয়ে পড়ে।†

---

* "আপনার উদার দানের প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন।...শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনাকে আমি সর্বদাই সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করে এসেছি, এবং আমৃত্যু তাই করব।" স্বামীজী এ চিঠি লেখেন ১৮৯৬-এর ৯ ডিসেম্বর। ১৯০০-এর ১২ মার্চ তারিখেও স্বামীজী লিখছেন—"আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি।...আপনি আমার ও আমার আত্মীয়দের জন্য মায়ের চেয়েও বেশী করেছেন।"

† ১৮৯৬-এর ২৩ অগাস্ট তারিখে মিসেস বুলকে স্বামীজী লিখেছিলেন—"দেখতেই তো পাচ্ছেন,.কাজটা চালিয়ে নেবার জন্য কিছুদিন টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তির সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে।...এখন আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমনকি ঐ কাজটার উপরও কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—পৃথিবীর এই নরককুণ্ডে আর ফিরে আসছি না।...সুতরাং এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। এ আপনাদের টাকা, আপনারা ইচ্ছামত খরচ করবেন।...আমি পারিবারিক বন্ধনরূপ লোহার শিকল ভেঙেছি, আর ধর্মসংঘের সোনার শিকল পরতে চাই না। আমি মুক্ত, সর্বদাই মুক্ত থাকব।...জগৎ রঙ্গমঞ্চে আমার যেটুকু অভিনয় করার ছিল, তা আমি শেষ করেছি।"

স্বামীজীর এই অনুভূতি আরও গভীর ব্যাকুলতায় প্রকাশিত হয়েছিল মিসেস বুলকে লেখা ১৮৯৫-এর ২৪ জানুয়ারীর চিঠিতে—"প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে, কালে তা অঙ্কুরিত হবেই।...বক্তৃতা এবং অধ্যাপনায় আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।...একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরেছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে—এবার একটি একান্ত

বিবেকানন্দের মত অনুভূতি-জগতের মানুষেরা সব সময়েই অতি স্পর্শকাতর। আমেরিকার সামাজিক জীবনে পথ চলার ক্ষেত্রে তিনি যেমন মিসেস বুলের সৎ পরামর্শের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন, অপরদিকে সেই উপদেশ বা নিয়ন্ত্রণ যখন সন্ন্যাসীকে মূল ধর্মে আপোষ করতে বলেছে, বিদ্রোহী হয়েছেন। মিস হ্যামলিন নামক জনৈক 'সম্ভ্রান্ত মহিলা' স্বামীজীকে 'নিউ ইয়র্কের ঠিক ঠিক লোকগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন।' এই মিস হ্যামলিন সম্বন্ধে মিসেস বুলের 'অতি উচ্চ ধারণা', এবং মিসেস বুল নিশ্চয়ই স্বামীজীকে মিস হ্যামলিনের পরামর্শ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজী তখন নিউইয়র্কের দরিদ্র পল্লীতে সাধারণের মধ্যে বিনা অর্থে ধর্মশিক্ষা দেবেন স্থির করেছেন। বলা বাহুল্য ধনী ও অভিজাত মিস হ্যামলিন দরিদ্র মানুষদের 'ঠিক ঠিক লোক' মনে করেন নি। স্বামীজীর সমস্ত অন্তরাত্মা ধর্মের এই নিয়ন্ত্রিত পণ্য চরিত্রের চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।* এছাড়া স্বামীজীকে আমেরিকায় ধর্ম-সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতেও বলা হয়েছিল। স্বামীজী যেভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় স্বার্থগুলিকে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন, তাতে মিসেস বুল যেমন শ্রদ্ধাবোধ করেছেন, ভয়ও পেয়েছেন তেমনি। তিনি সতর্কতা চেয়েছিলেন, মনে করেছিলেন, এই পৃথিবীতে স্বামীজীর একটা 'কাজ' আছে, সে কাজ হয়ত নষ্ট হয়ে যাবে এই বোহিসেবী বেপরোয়া আচরণে। কিন্তু, নিবেদিতার ভাষায় বলতে গেলে, এই প্রফেট এমন এক ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন 'যা সত্যে ভীত নয়।' মেরী হেলকে স্বামীজী

স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে। তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল।...নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। 'একাকী বিচরণ কর। একাকী বিচরণ কর। যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই ছিন্ন বস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন—হায়, এইগুলিই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়।" এই চিঠিতে স্বামীজী মিসেস বুলকে বলেছিলেন, "এদেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু।"

* মিসেস বুলকে ১১. ৪. ১৮৯৫-তে লেখা এক পত্রের কিছু অংশ—

"আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, দরিদ্র পল্লীতে একা এভাবে থাকলে ও প্রচার করলে কিছুই হবে না; আর কোনো ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস হ্যামলিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তাঁদের মতে যাঁরা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিদ্রোচিত কুটীরে নির্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, খাঁটি 'ঠিক ঠিক লোক' ঐস্থানে দিনরাত আসতে লাগল, তিনিও আসতে লাগলেন। হে প্রভো! মানুষের পক্ষে তোমার ও তোমার দয়ার উপর বিশ্বাসস্থাপন কি কঠিন ব্যাপার!!! শিব, শিব! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বেঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়! সবই যে তিনি!! হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর মধ্যেও তিনি। পাপীর ভিতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভিতরও তিনি। সবই যে তিনি!! সর্বপ্রকারে আমি তাঁর শরণাগত। সারাজীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়েছেন, এখন কি আমায় পরিত্যাগ করবেন?...হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনো কখনো একলা প্রবল বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্যের কথা ভাবি। চিরদিনের জন্য এসব দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা কর।...প্রভু, তুমি সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা—তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জানো, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে, যার ফলে অপরে আমায় ত্যাগ করবে বা আমি মন্দের দিকে ঢলে পড়ব? মা, তিনি কখনই আমাকে ত্যাগ করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫তে যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে শঙ্করাচার্যকেই নবরূপে দেখা গেল—অল্পাংশে তা উপস্থিত করছি :

"মধুরভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেরূপ হইতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে উহাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপোষ করিতে হয়, সেইখানে আমি পিছাইয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই—আমি সমদর্শিত্বের ভক্ত।

সাধারণ মানুষের কর্তব্য, তাহার 'ঈশ্বর'-স্বরূপ সমাজের আদেশ পালন করা। জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না।...যে-ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাবৃত। আর যিনি তাহা করেন না, তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।...

প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মহাশয়ের সঙ্গে আমার তর্ক, তৎপরে মিসেস বুলের সঙ্গে যে দীর্ঘ তর্ক, তাহা হইতে আমি সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি, কেন মনু সন্ন্যাসিগণকে 'একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে'—এরূপ উপদেশ দিয়াছেন।...হে মহা-পুরুষগণ, তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। যাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও,...জীবন কিছুই নয়, মৃত্যু ভ্রম মাত্র। এইসব যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সকলের অস্তিত্ব নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনী, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমাকে শীঘ্র ঘরে ফিরিতে হইবে।...জগৎকে মনজোগানো কথা বলিবার সময় নাই।...এই নির্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে নিম্নস্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়। মিসেস বুল ভাবেন আমার কোনো কার্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য জগতে আমার কোনই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব। ...কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব! ভগিনী, দুঃখিত হইও না, কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র, শিশুদের অপরের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনো সেই উৎসের সন্ধান পাও নাই, যাহা 'হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পরিণত করে, এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়।' শক্তি থাকে তো লোকে যাহাকে 'জগৎ' নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস।...যাহারা আভিজাত্য নামক ঝুটা ঈশ্বরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, যদি তুমি তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে না পারো, তবে চুপচাপ থাকো, কিন্তু আপোষ ও মনস্তুষ্টি করা-রূপ মেকী অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিবার চেষ্টা করিও না।"

বিবেকানন্দের জীবনের গৌরব ও অভিশাপ এইখানে—তিনি এই অসংসার বৈরাগ্যে ডুবে থাকতে পারেন নি সর্বক্ষণ। 'মিথ্যা জগতের' যাতনা তাঁর মন থেকে 'সত্য ঈশ্বরকে' বিতাড়িত করেছে বার বার। মিসেস ওলি বুলের মত আধ্যাত্মিক

মানুষেরও এক্ষেত্রে বিচারে ভুল হয়েছে—বুঝি বিবেকানন্দও কর্মে আসক্ত, সংসারে লিপ্ত! মানবপ্রেমিকের আহত অভিমান তখন বলে উঠেছে—

"আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ খুব বেশী ভালবাসা।...হায়, যদি আমায় একটুও ভালবাসা না থাকত।...হায়, যদি আমি নির্বিকার, কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম।...

"বহু বৎসর আগে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে আমার বোন আত্মহত্যা করল, সে সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছল। আমার দুর্বল হৃদয় আমাকে শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সেই দুর্বল হৃদয়ই আবার—আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়। শান্তি আমি চেয়েছি, কিন্তু ভক্তির আধার সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা থেকে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ও সংগ্রাম! তাই যখন আমার নিয়তি, তাই হোক।...আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছেড়ে দেবো না। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য যদি ভগবান আমায় তাঁর ছ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" (মিসেস বুলকে লেখা—১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯)।*

মিসেস বুল, তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবান এবং প্রতিভার ঐশ্বর্যে খেয়ালী স্বামীর সাহচর্যের জন্য নিশ্চয়ই বিবেকানন্দের মত মানুষকে বুঝতে অন্যের তুলনায় অধিক সমর্থ ছিলেন, তাহলেও শিল্পীর যাতনা ও অস্থিরতার সঙ্গে অধ্যাত্ম-শিল্পীর ব্যাকুলতার ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত চেতনার পার্থক্য আছে, সর্বক্ষেত্রে তা অনুভব করতে পারেন নি। ফলে ভুল বোঝাবুঝি এবং মানসিক সংঘাত হয়েছে, অতিক্রান্তও হয়েছে তা। স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের এবং ভারতের জন্য কাজের দায় ঘাড়ে নিয়েছিলেন, সে কাজ তাঁর স্বভাবসঙ্গত নয়, কর্মভার তিনি ত্যাগ করতে উৎসুক, অথচ দুশ্চিন্তা—যদি গড়ে-ওঠা জিনিস ভেঙে পড়ে! মঠের কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে উৎকণ্ঠিত, কিন্তু কর্মীদের যথেষ্ট উপযুক্ত দেখছিলেন না। এইসব সময়ে

---

* স্বামীজী তাঁর ধর্মীয় মানবতার প্রকৃতির কথা মিসেস বুলকে অগস্ট, ১৮৯৫-এর এক চিঠিতে বলেছিলেন—

"যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি সেই জগতের জন্য, যার কাছ থেকে ভাবসম্পদ পেয়েছি সেই দেশের জন্য, যার একজন আমি সেই মনুষ্যজাতির জন্য আমি কিছু করব। যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী'—হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য বুঝতে পারছি। মুসলমানেরাও তাই বলেন। আল্লা এঞ্জেলদের বলেছিলেন আদমকে প্রণাম করতে। ইবলিশ করেনি, তাই সে 'শয়তান' হল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ, ইহাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্চয় আমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর—তারা যখন আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করতে পারে না। তথাকথিত উচ্চ প্রাণিগণ, পরলোকগত অন্য দেহধারী ব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়; ঐ দেহ সূক্ষ্ম হলেও বস্তুতঃ হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানবদেহই। তারা এই পৃথিবীতে অপর কোনো আকাশে বাস করে, একেবারে অদৃশ্যও নয়। তারাও চিন্তা করে, আমাদের মত তাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সব কিছুই আছে—সুতরাং তারাও মানুষ। দেবগণ, এঞ্জেলগণও তাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয়, এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করে তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করতে পারে।"

তাঁর অন্তর্বাতনার শেষ ছিল না, পরামর্শ চাইতেন বিশেষভাবে মিসেস বুলের কাছে, অভিমানে বলতেন—বিষয়ীর হাতে সন্ন্যাসীর মৃত্যুই তাহলে হোক। এই সময়ে স্বামীজীকে লেখা মিসেস ওলি বুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির নকল রেম'-সংগ্রহে রয়েছে, যাতে দেখা যায়, মিসেস বুল সত্যই মায়ের ভূমিকা নিয়ে সন্তানকে চালিত করতে চাইছেন (সন্তানটি যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ অধ্যাত্মপ্রতিভা তা কিছুটা মনে রেখে এবং কিছুটা ভুলে গিয়ে)। ১৯০০ খৃীস্টাব্দের ১ মে তারিখের সেই চিঠিটি উদ্ধৃত করার আগে স্বামীজীর মানসিক অবস্থার কিছু অংশ, মিসেস বুলকে লেখা পত্র থেকে—

"এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে।...আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্ব ও যশের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে।...আমি এখন জো ও নিবেদিতার কল্পনাবিলাসকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছি। তারা আমার হয়ে তাদের কল্পনাকে রূপ দান করুক।...আমি একটা ট্রাস্ট-দলিল করতে চাই,...শরতের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই তা করে ফেলব।...আমি চাই বিশ্রাম, এক মুষ্টি অন্ন, খানকয়েক বই এবং কিছু লেখাপড়ার কাজ। মা এখন আমাকে এই আলোক স্পষ্ট দেখাচ্ছেন। অবশ্য আপনাকেই তিনি এর আভাস প্রথম দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু তখন বিশ্বাস করিনি।...আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় বেশী বিশ্বাস করি।...এখন আমাকে চালিয়ে নেবার আলোক মা আপনারই হাতে তুলে দিচ্ছেন।......আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না।...আমি বিশ্রাম চাই। আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়—কথা নয়, অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।......" (১৭ জানুয়ারী, ১৯০০)

"আপনাকে আমি আমার জন্য আর কিছু করতে বলছিনা, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি যা করেছেন, তাই যথেষ্ট, আমি যতটার উপযুক্ত, তার চেয়েও ঢের বেশী করেছেন।......আপনিই আমার একমাত্র বন্ধু যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারারূপে গ্রহণ করেছেন। আপনাকে আমি যে এত বিশ্বাস করি, তার রহস্য ঐখানেই। অন্যেরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে। কিন্তু তাদের ধারণাও নেই যে, তারা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যই আমাকে ভালবাসে। তাঁকে বাদ দিলে আমি শুধু কতকগুলি অর্থহীন ও স্বার্থপূর্ণ ভাবুকতার বোঝা মাত্র। যাই হোক, ভবিষ্যতে কি হবে, এই দুশ্চিন্তা, এবং ভবিষ্যতে কি হওয়া উচিত, এই আকাঙ্ক্ষার পীড়া বড়ই ভয়ানক। আমি সে দায়িত্বের অনুপযুক্ত—আমার অযোগ্যতা আজ ধরা পড়ে গেছে। আমাকে এ কাজ ছেড়ে দিতে হবে। এ কাজের যদি কোনো নিজস্ব জীবনীশক্তি না থাকে তো মরে যাক। আর যদি থাকে, তবে আমার মত অযোগ্য কর্মীর জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।......আমি সারাজীবন মায়ের কাজ করেছি। এখন তা হয়ে গেছে—আমি আর তাঁর চরকায় তেল দিতে নারাজ। তিনি অন্য কর্মী বেছে নিন, আমি ইস্তফা দিলাম।"(৭ মার্চ, ১৯০০)

"আমি সম্পূর্ণ গা ভাসিয়ে দিয়েছি। মা-ই সব জানেন। আমার ভিতরে একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসছে, আমার মন শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। আমি

জানি মা-ই সব ভার নেবেন। আমি সন্ন্যাসী-রূপেই মৃত্যুবরণ করব।" (১২ মার্চ, ১৯০০)

এই পটভূমিকায় মিসেস বুলের ১ মে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের চিঠিটি পঠিতব্য। এখানে পাঠকদের পূর্বে উদ্ধৃত নিবেদিতার ১ নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখের চিঠির বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,—স্বামীজী, মিসেস বুল ও নিবেদিতাকে গৈরিক বস্ত্র দিয়ে, কিভাবে নিজ কর্মের উত্তরাধিকার তাঁদের উপর অর্পণ করেছিলেন—সেই বিষয়টিকে। মিসেস বুলের পত্র—

My dear child,

I have been glad to speak of your Math accounts in London, and, as I anticipated, found, it made a most favourable impression upon Miss Soutter and others to know that Brahmananda had kept detailed accounts, as any of our workers in an organised effort with subscribers would do. And I have been thankful that I could by dealing with the accounts myself make it a clean record for you by means of my own subscription—placing it as a gift to you personally and thus making the 30,000 rupees in my copied report to the Math, stand as a balance in your favour as a Math fund. This leaves you some 4,000 rupees over and above, which, with your additions from California, puts it up some 2,000 or 3,000 rupees more, besides your present credit in New York with Mr. Leggett and what you have since earned in California.

The securities given your cousin and the amounts paid into the purchase of the Calcutta house now in litigation, were from the Sevier gift, I believe you told me, except for the amounts you took from Brahmananda for payments charged in his account.

I suggested to Saradananda to see what could be done for 4,000 rupees at Belur for building purposes, and he writes that you sent to him to request an estimate and plan to be made out. These have just come to me to forward to you. As I expected, an ordinary estimate would not do much with 4,000 rupees.

I am glad of this 25,000 rupees estimate for such a villa. It confirms me in the good results obtained by the engineer at the Math, both in the amount returned in work and materials for the amount of expenditure and the good taste also.

It was indeed a labour of love on his part and Brahmananda's. I have had experience in these matters of in Norway and the U.S., sufficient to make me appreciate what they so heartily gave you and the Math-work in their service.

If you pay a nominal rent for rooms in some such place on the Ganges as that where Gopala-Ma lives, for your mother and grandmother, would be practicable now?

I would advise you now to have no further dealings with money expenditure either for buildings or gifts or for any purpose whatsoever. But to hold in strict economy what remains in addition to your earnings, spending only the income of these except for necessities. This seems to me beyond doubt the only right way for you now. We will hope that your law-suits may soon be disposed of and your worried expenditure for these be determined. Your sad experience in these resulting from your efforts to benefit others by money dealings from yourself directly is sufficient evidence that whatever of good a blessing you have for any person or persons or work hereafter, will best come of your *sannyasin* freedom strictly held to. Now, thank Heaven! that you are so placed that you may be free and also may rest assured that you will bless others thereby.

Whatever Saradananda does for me is strictly carried out on a basis of accounts—while I appreciate the personal love and service which he adds by his care, thus blessing the little I can do—and what I have done for his family has but left him freer for the work in general, just what I have desired to do for you.

Now I see the time has come for you indeed to be the free *sannyasin*, blessed by your *Guru* and the peace that comes of that blessing. If at this point you choose the permanent—the spiritual—making no attempt to build upon material foundations, but look like a child for the daily influx of love and joy that shall flood your own life and the lives of all those who love you, all will be well.

I say this not from any abstract theorizing of fanciful notion, but after a patient study of you, your *Gurubhais*, and the environment of all. It seems to me a very critical time—where the choice is made possible to you now.

The object lesson A—gave me in New York was timely in enforcing all this which I have been coming to understand as the result of my study of your problem and your life. I can see that should you choose the external method and desert the spiritual, your failure would be greater than his, inasmuch as your powers are greater proportionately. And the wish or impulse to deal with any on the ordinary basis for the protection of them by yourself by means of money or even personal service that should remove you from the end for which you were born,—the message of Ramakrishna's joy, would be such a fatal mistake on your part. . . . .

But for you, now that you are standing with a clean record as regards your obligations for work undertaken and carried out, and have added your own good efforts for which you have received a modest return in California, it would be a tragedy were you not to choose the freedom of the *sannyasin* and be done with organisation and ambition.

Should you not choose the best, we will be ever grateful for all that has been given and know that the Mother's work will not, as you say, suffer for any fault of our's, who, whether we will or no, are her servants.

Mother*

বিবেকানন্দ ও মিসেস বুলের সম্পর্কের যে-চিত্র উপস্থিত করলাম, তা নিতান্ত খণ্ড চিত্র সন্দেহ নেই। তবে নিবেদিতার জীবনে এবং জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে

---

* স্বামীজী মিসেস বুলকে 'ধীরা মাতা' বলতেন তাঁর ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য। তাঁর নির্দেশ চাইতেন—সন্তান যেমন মায়ের নির্দেশ চায়। 'ভারতীয় কাজের' জন্য মিসেস বুলের অর্থসাহায্যও তাঁকে নিতে হয়েছে। এই 'ভারতীয় কাজ', মঠ-সংগঠন প্রভৃতিকে স্বামীজী নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলে নিজেই সমালোচনা করেছেন। এ সবকথাই সত্য কিন্তু সেই সমালোচনা যদি বাইরে থেকে আসত, তাহলে তাঁর স্পর্শকাতর মন আহত হতই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যের প্রয়োজন ছিল না অন্য কোনো সূত্র থেকে বৈরাগ্যশিক্ষার। নিজের তথাকথিত 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার' বিরুদ্ধে আত্মসমালোচনা আধ্যাত্মিক অসন্তোষ ভিন্ন আর কিছু নয়—যা অধ্যাত্ম-ব্যক্তিত্বের সাধারণ স্বভাবের মধ্যে পড়ে—একথা অনেক সময়ই বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মিসেস বুল বিবেকানন্দকে অনেকখানি বুঝতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতেন না। ফলে ভুল বোঝাবুঝি হত।

স্বামী সারদানন্দের এই কালের একটি পত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য। পত্রটি ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-তে লেখা।—

"My dear Granny, yours of the 20th Aug. enclosed with Swamiji's and of the 23rd Aug. addressed directly to myself have both reached me this mail. I thank you very much for them.

It seems there is between yourself and the Swami some mis-understanding just at present and I am wondering how there can be such a thing between you two, who know each other's life by the light and grace which Sri R. (Ramakrishna) has bestowed on each. I can only hope that it will pass off soon and you will come to an understanding about each other's method of procedure. I believe all our mis-understandings arise from this different methods of procedure towards the same goal. I am glad to know you have worked out a plan for a sense of freedom for both sides, but my dear Granny, you know I am always averse to plans which do not run smoothly instilling peace and light and love on both sides rather than doubts and disappointments and mis-understanding and mis-interpretation of each other's motive of action. Whenever there is the latter there you can well rest assure of some defect in our plans. If these come to be results of my querry to you, I will never be able to excuse myself for having over done that which has brought this sad state of affairs between two persons, to whom above all (next to Sri R.) I ought to be grateful and thankful for all my days viz., Swamiji and yourself. But I am sure of your motherly solicitude for the Swami and I am sure too it will never come to pass. . . ."

মিসেস বুল যে স্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার তাৎপর্য বুঝবার জন্য এই বিবরণের প্রয়োজন আছে, কারণ বিবেকানন্দ-সূত্রেই ভারত-সম্বন্ধে মিসেস বুলের সক্রিয় আগ্রহের সৃষ্টি।

কর্মী বিবেকানন্দ অপেক্ষা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মিসেস বুলের অধিক পূজার বস্তু ছিলেন। নিবেদিতার একটি পত্র থেকে আমরা আগেই দেখে এসেছি, ধীরামাতা বিবেকানন্দকে মাতা মেরীর কোলের শিশুরূপে ভালবাসতেন। সেই চির শিশু এবং চির সন্ন্যাসী তাঁর শেষ পত্রে ('বাণী ও রচনা'র পত্রসংকলন অনুযায়ী) মিসেস বুলকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন—

"ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন, সকলে মায়ামুক্ত হোক, এই আমার চির প্রার্থনা।"

মিসেস বুল ও নিবেদিতা

ভারতে আসার পরেই নিবেদিতার সঙ্গে মিসেস বুলের যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে তা তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত বজায় ছিল। মিসেস বুলের কাছ থেকে নিবেদিতার প্রাপ্তির শেষ ছিল না, আবার জীবনের সবচেয়ে ভয়ানক আঘাত মিসেস বুলের সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন। স্বামীজীর কাজে মিসেস বুলের অর্থসাহায্যের বিষয় আমরা দেখে এসেছি; নিবেদিতার বিদ্যালয়ও প্রথমাবধি মিসেস বুলের অর্থ-সাহায্য পেয়েছে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতার গ্রন্থাদির এবং জীবন-যাত্রার জন্য মিসেস বুল অর্থব্যয় করেছেন। জগদীশচন্দ্র বসুর কাজেও মিসেস বুলের সাহায্য অপরিসীম। সেই ইতিহাস পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কিছুটা উদ্ধার করব।

মিসেস বুলের সঙ্গে নিবেদিতার আত্মিক সম্পর্ক সুগভীর। নিবেদিতার মননশীল প্রকৃতিকে মিসেস বুল অনুধাবন করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁকে লেখা নিবেদিতার যে-সব পত্র পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে উভয়ের মানসিক ও আত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে বহু সংবাদ পাওয়া যায়। সে ইতিহাস এত ব্যাপক যে, এখানে সামান্যই মাত্র উপস্থিত করতে পারি।

ভারতে আসার পরে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরে নিবেদিতা মুগ্ধভাবে লিখেছিলেন—"মিসেস ওলি বুল প্রেমময় পবিত্রতার এবং মিস ম্যাকলাউড অগ্নি ও সাহসের অবতার।"* কিছুদিন পরে তিনি ম্যাকলাউডকে লিখছেন (৭. ২. ১৮৯৯)—"শ্রীমা বললেন, ধ্যানের সময়ে তিনি সর্বদা সারাকে (মিসেস বুল) তাঁর বামে এবং জয়াকে (ম্যাকলাউড) সামনে দেখছেন।" ২৬.৪.১৮৯৯-তে নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখলেন—"ঐশ্বর্যময় জীবন তোমার—আমেরিকা, নরওয়ে এবং ভারতবর্ষকে এহেন ভালবাসতে পেরেছ।" একই বছরে ৩ অগস্টে ম্যাকলাউডকে—"সেন্ট সারাকে বলো, স্বামীজী তাঁর বিষয়ে বললেন, 'ঐ মহিলাকে বোধহয় আমি নিজের মায়ের চেয়েও ভালবাসি। ওঁর কেন্দ্রের

* মিসেস হ্যামণ্ডকে ৬. ৬. ১৮৯৮ তারিখে লেখা চিঠি।

জন্য আমি শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত—উনি এতই ভালো আর সাহসী।'" পুনশ্চ (২৭. ১০. ৯৯)—"তিনি (সারা) মহীয়সী নারী। স্বামীজী হয়ত বলবেন, 'বোধহয় মহত্তমা।'" পুনশ্চ—"স্বামীজী জানালেন—তাঁর মতে মিসেস বুল 'সর্বোচ্চ ধরনের মহিলা।'" (৬. ৬. ১৯০০)

নিবেদিতার জীবনে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের স্থান অতি উচ্চে। উভয়েই তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং সাহায্য করতেন। উভয়েই নিবেদিতাকে নিকটে পেতে চাইতেন। এবং নিবেদিতার ভালবাসা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ঈর্ষার ভাব ছিল। নিবেদিতা মিসেস বুলের কাছ থেকে বহু আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা মিসেস বুলের মনের সান্নিধ্যে অধিক তৃপ্তি পেত, কিন্তু মনে হয়, মিস ম্যাকলাউডকেই তিনি প্রাণের আরও নিকটে পেয়েছিলেন। তাই বলে মিসেস বুলের প্রতি তাঁর ভালবাসা সামান্য ছিল না, এবং উভয়ের মত-সংঘর্ষের ক্ষেত্রে নিবেদিতা খুবই বিব্রত হতেন ও মধ্যস্থতার ভূমিকা নিতে চেষ্টা করতেন।

১৯ জুলাই, ১৯০১, *মিসেস বুল সম্বন্ধে ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন*—

"উনি বড় বেশী মননপ্রধান; যাচাই করতে, যুক্তিবিচার করতে অতিরিক্ত ব্যস্ত। ফলে কেবল সুসংগঠিত কিছু হয়ে ওঠেন—হাত বাড়িয়ে দিয়ে হৃদয়োত্তাপে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটান না। মনে হয়, তা তিনি বোঝেন।"

ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা একবার লিখেছিলেন (১৯. ৭. ১৮৯৯)—"জীবনের পথে যা আমি একমাত্র ভয় করি তা হল—যে-দুজনকে (যেমন তোমাদের দুজনকে) আমি সবচেয়ে ভালবাসি তারা দুজন দুটি ভিন্ন আদর্শ গ্রহণ করবে এবং আমার উপরে ভিন্ন কর্তব্য আরোপ করবে।" নিবেদিতার এই আশঙ্কা বারবার সত্য হয়েছে। ম্যাকলাউড ও মিসেস বুলের এক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সান্ত্বনা দিয়ে বড় সুন্দরভাবে নিবেদিতা লিখেছিলেন (২৪. ৮. ১৯০৫)—

"প্রিয় সেণ্ট সারা, এই পৃথিবীতে কোনো আদর্শ বা আদর্শবাদী বর্তমান থাকবে না *যদি না প্রথমে* ভালবাসার *উদয় হয়। তাই আমি* সুনিশ্চিত যে, তোমার জন্য মানবিক স্নেহানুরক্ত যুমকে (ম্যাকলাউডকে) তোমার কাছে এনে দেবে। আর আমি বিশেষভাবে আশা করি, তুমি তোমার আদর্শগুলিকে কিছু সময়ের জন্য ছুটি দিয়ে যুমকে ভালবাসায় এবং যুমের ভালবাসায় নিজেকে ছেড়ে দেবে। যতক্ষণ দেহে আছি ততক্ষণ কোনো আদর্শের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেবার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি না বুঝতে পারিনা! ওহেন সমুচ্চ ঋষি-পদবীর কি সত্যই আমরা যোগ্য? জেদ ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের দ্বারা আমরা আদর্শ বস্তুটাকেই কি দুঃসহ করে তুলি না? প্রিয় সারা, বিশ্বাস করো, জীবন যখন সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত, তখন বিপুল ভালবাসায় তোমার অধিকার, যার থেকে আনন্দ ও সান্ত্বনা পাওয়া তোমার ভবিতব্য। কেন নিঃসঙ্গ বোধ করবে—এত মহান, এত নিঃস্বার্থ তুমি! তবে স্বভাব, মেজাজ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কোনো ত্রুটি যদি পুনঃ পুনঃ ফিরে দেখা যায় তাহলে তা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, মস্ত অপরাধও তা করতে সমর্থ হয় না।"

মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের এই মনান্তর স্থায়ী হয়নি, হওয়া সম্ভব

ছিল না কারণ উভয়েই বিবেকানন্দের সন্নিকট, সেকথা সংঘর্ষের অবসানে আনন্দিত নিবেদিতা ২২ নভেম্বরের চিঠিতে লিখেছিলেন। ম্যাকলাউডকে লেখেন—"ভারতবর্ষের সেই অপূর্ব বৎসরটিতে (১৮৯৮) যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে গভীর আর কিছু সম্ভব হতে পারে না।"*

মিসেস বুল নিবেদিতাকে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, তার সমগ্র ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে না, এ বিষয়ে আরও কিছু বিবরণ জগদীশ বসু প্রসঙ্গে আমরা দেব, কিন্তু অপরপক্ষে বলা চলে, নিবেদিতাও তাঁকে কিছু কম সাহায্য করেননি। সে সাহায্য নিশ্চয়ই অর্থের নয়,† এবং অর্থের থেকে ছোট নয়—নিবেদিতা মিসেস বুলের বিক্ষত জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মিসেস বুল সেজন্য গভীর কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং নিবেদিতাকে একান্ত আপনার করে ধরে রাখতে চাইতেন, সেখানে অন্যের দাবিকে প্রসন্ন মনে নিতে পারতেন না, এই জন্য মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে তাঁর কখনো কখনো মনোমালিন্য হয়েছে।

মিসেস বুলের জীবন সুখের বা শান্তির হয়নি। তাঁর মত সক্রিয় ভাববাদীর জীবন কখনো তা হয় না। তাঁর যে জীবনকথা আমরা আগে দেখে এসেছি—তীব্র কল্পনাশক্তি, সঙ্গীতপ্রিয়তা ও আদর্শবাদের জন্য প্রথম যৌবনে বৃদ্ধকে বিবাহ, তার ফলে পারিবারিক জটিলতা, পরিবার-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বৃদ্ধ স্বামীর দায়দায়িত্ব তুলে নেওয়া— এহেন জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক দুঃখ-নিয়তির সম্মুখীন

---

* ওলি বুল ও ম্যাকলাউডের মধ্যে ম্যাকলাউডের সঙ্গে নিবেদিতার অন্তরঙ্গতা বেশী ছিল মনে হয়। নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে এ বিষয়ে আরও কিছু অংশ আমরা গ্রন্থের অন্য খণ্ডে 'ম্যাকলাউড' রচনায় উপস্থিত করার ইচ্ছা রাখি। মিসেস বুলের কাছ থেকে এত বেশী সাহায্য নিবেদিতাকে নিতে হয়েছিল, যে একটা গোপন কুণ্ঠা নিবেদিতার মনে থেকে গিয়েছিলই। ৮ এপ্রিল, ১৯০৭-এর এক চিঠিতে ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছেন—"টাকার বিষয়ে আমার চিঠিকে তুমি এমন উদার মনে গ্রহণ করেছ—সে তোমার মহত্ত্ব। তোমাকে চিঠি লেখার পরে সেন্ট সারার অ্যালাউন্স এবং আর একটি জিনিস, যার বিষয়ে তুমি জানো, এসে গেছে, সুতরাং আগামী কয়েক মাসের স্বাচ্ছন্দ্য। তদুপরি তোমার ৪৮৬৭—রীতিমত সহায়ক।......

সারা ধনী, এবং এত সাহায্য করেন যে, তাঁর কাছে হাজির হলেই মনে হয় টাকা চাইতেই গিয়েছি।...আর তোমার কাছে—প্রয়োজন জানাচ্ছি।"

† ব্যক্তিগত কাজে মিসেস বুল নিবেদিতার অনেক সাহায্য নিতেন। ১৯০৪ সালে নিবেদিতার অনেক চিঠি থেকে দেখতে পাই, নিবেদিতার উপর মিসেস বুল তাঁর স্বামীর জীবনচিত্র রচনার ভার দিয়েছেন, এবং নিবেদিতা বেশ কিছুদিন সে বিষয়ে কাজ করেছেন। নরওয়ের ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ওলি বুলের আগ্রহ ও অংশগ্রহণের কথা এইসব চিঠিপত্র থেকে পাই। এই বিষয়টি লিখতে নিবেদিতা খুবই উদ্দীপনা বোধ করেছেন, এবং নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীত চেয়ে পাঠিয়ে তিনি মিসেস বুলকে বলেছেন—তোমাকে গদ্যে যুদ্ধসঙ্গীত দেব। ওলি বুল নরওয়ের ইতিহাসে এবং সঙ্গীতের ইতিহাসে যে মহামর্যাদার অধিকারী, সে বিষয়ে ভারতবর্ষে কোনো ধারণাই নেই। এমনকি য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত রমেশ দত্তও তা জানতেন না। ১৯০১ জুলাই মাসের এক চিঠিতে নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখেছিলেন—"মিঃ দত্তর কোনো ধারণাই ছিল না (নরওয়েজিয়ান) জাতির হৃদয়ে তোমার এমন স্থান, এবং 'নিজ-অজ্ঞতাহেতু' তিনি মিউজিক সম্বন্ধে এত অল্প জানতেন যে, এমনকি তোমার স্বামীর নাম যে সমগ্র পৃথিবীতে এত পরিচিত, তাও তাঁর কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার ছিল।"

মিসেস বুলের মৃত্যুর পরে অমৃতবাজার পত্রিকার এক লেখায় দেখতে পাই, তিনি তাঁর স্বামীর জীবনী লিখেছেন। আমাদের অনুমান, সে লেখাটি নিবেদিতারই।

তাঁকে হতে হয়েছিলই। তার সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য তাঁকে যুদ্ধিকে অস্ত্র করতে হয়েছিল, না করে উপায় ছিল না, বিচিত্র প্রেমের ও বিবাহের যে জীবন্ত স্মৃতিটিকে তিনি পেয়েছিলেন সেই একমাত্র কন্যা ওলিয়া মানসিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল না। মেয়েটিকে নিয়ে তাঁর অসীম যন্ত্রণা। মেয়েটির মধ্যে গুণ ও বদগুণ, দুইই ছিল প্রচুর। স্বামীজী মেয়েটিকে জানতেন, স্নেহ করতেন, তার শুভাশুভ নিয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট চিন্তা ছিল।

এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে নিবেদিতা মিসেস বুলের আর্ত হৃদয়ে শান্তিসঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা জানতেন, "ওলিয়ার সঙ্গে থাকলে সারার মধ্যে জীবন নেই। অপরদিকে এখানে যখন থাকেন, তিনি অনেকের কাছে প্রাণ ও আলোক,"* কিন্তু ওলিয়াকে পরিহার করাও সারার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন জ্বালায় অস্থির হয়েছেন, নিবেদিতা স্নিগ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে লিখে পাঠিয়েছেন—"কখনো ভুলো না যে, তোমার ও ওলিয়ার জন্য স্বামীজীর প্রাণে সর্বদা গভীর করুণ মমতা ছিল," (৩১. ১০. ১৯০৫)। আর একটি চিঠির সান্ত্বনাবাণীতে গভীর সত্যের উদ্ভাস—

"প্রিয় সেণ্ট সারা, আমি জানি তোমার বিচ্ছিন্নতা ও আধ্যাত্মিক নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা সুগভীর। আরও জানি তা হবেই, হতে হবেই। যেখানে তুমি সবচেয়ে সুখী ও আশান্বিত, সেখানেও ও-জিনিস থাকে। এ তো সর্বদাই দেখা যায়—যাঁরা পৃথিবীর কাজ করবার জন্য আদিষ্ট, ব্যক্তিজীবনে সুখী হতে দেওয়া হয়না তাঁদের—সে সুখে পাছে তাঁরা মগ্ন হয়ে পড়েন। আমার কথা শুনবে? আমার মতে, যদি তুমি এই অবস্থা মেনে নাও, শান্ত সমাহিতভাবে মেনে নাও, এবং অন্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখো, তাহলেই ওলিয়ার জীবন দীর্ঘায়ত হবে, হয়ত সুখীও হবে।" (১২. ১. ১৯০৬)।

মিসেস বুলের সুখশান্তির জন্য নিবেদিতা কতখানি ব্যাকুল ছিলেন ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি (৭. ৬. ১৯০৬) থেকে বোঝা যায়—

"আমরা সেণ্ট সারাকে এখন থেকে এখানে পেতে চাই, বয়ে নিয়ে নিয়ে যেতে চাই—আর বুক-ভাঙা নৈঃসঙ্গ্য ঘটতে দেওয়া চলবে না।......কিন্তু—কিভাবে তিনি তাঁর কেমব্রিজ-ভবনটি বন্ধ করে দেবেন? তবে ভাবনার কারণ নেই, যেভাবে হোক ব্যাপারটা সামলে নেওয়া যাবে।"

নিবেদিতার ব্যাকুলতার কারণ, তিনি সারার মহিমাকে সর্বসময়ে অনুভব করেছেন, যাঁর পরিবেশে বিকীর্ণ থাকে 'যথার্থ সঙ্গীত, মর্যাদা, উচ্চ চিন্তা, মনন, বুদ্ধি-বিনিময় ও আদর্শবোধ।' (১৮. ১২. ১৯০৬)

মিসেস বুলের জীবন নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল। শুভ কর্মপথে যখন সে জীবন চলেছে, তখন নিবেদিতার চলার পথ সুগম হয়েছে, আবার যখন জটিল চক্রে তা আবর্তিত হয়েছে, তখন মথিত হয়েছে নিবেদিতার ভাগ্য। মিসেস বুলের জীবনের শেষ পর্যায়ে একটি করুণ অধ্যায় আছে, যার শোক-গরলকে পান করতে হয়েছিল নিবেদিতাকেই। সে অধ্যায়ে আমরা

* ম্যাকলাউডকে লেখা, সেপ্টেম্বর ৪, ১৯০২

পরে প্রবেশ করব। এখন মিসেস বুলের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতার লেখা প্রবন্ধটি উপস্থিত করছি। তার পূর্বে মিসেস বুলের দেহত্যাগে অমৃতবাজার পত্রিকার লণ্ডন সংবাদদাতার রচনাংশটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য, যার মধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে মিসেস বুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে বলা আছে।—

"There will be many in India, perhaps particularly in Calcutta, who will feel that another good friend has passed out of sight when they receive tidings of the death of Mrs. Ole Bull, which took place at Cambridge, Massachusets, last Sunday (18th January). It was Mrs. Bull's close friendship with Sister Nivedita—whose name is a household word now in India—that brought her into intimate touch with the people of India, and her interest in the thoughts and movements of the country was particularly keen and sympathetic. It was simply an evidence of her beautiful character, for everywhere that her name is known she is remembered as a generous friend to serious thinkers and workers. A delightful personality and a renowned musician, her life had its great love romance. She was not twenty years of age when Ole Bull, a Norwegian musician of great ability and renown, and a great patriot as well, met her in America and heard her play. He not only admired her musical talent but loved her for herself, and the young girl in her teens married the musician of sixty, then at the height of his fame. Mrs. Bull has been a widow since 1880, but her Life of her husband, published long ago, shows how deep was the devotion of their married life. To Sister Nivedita the sincere sympathy of Indian and European friends will be extended."

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারী, ১৯১১)

নিবেদিতা-রচিত 'সারা চাপম্যান বুল' প্রবন্ধ

(In Memoriam: Sara Champan Bull, Modern Review, June 1911)

সারা চাপম্যানের (মিসেস ওলি বুলের) দেহান্ত হয়েছে গত ১৮ই জানুয়ারীতে, কেম্ব্রিজের (ম্যাসাচুসেটস্) বাসভবনে—যাঁরা তাঁকে তাঁর কোনো একটি ভারত-ভ্রমণকালে দেখেছিলেন তাঁরা কতখানি না বেদনাবোধ করবেন! মিসেস বুল সেই সকল বিশিষ্ট আমেরিকান মহিলাদের একজন, যাঁরা জীবনের পথে যে-সকল সুমহান কর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সে সকলকেই সহানুভূতি ও সাহায্য দান করেছেন। পাশ্চাত্যের দিকে তাকালে এই বিচিত্র ব্যাপারটি দেখতে হয়—ইদানীং এই কর্তব্য পুরুষের তুলনায় নারীরা কত বেশী গ্রহণ করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপ, এবং অদ্যাবধি ভারতবর্ষ, সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় সব কিছুর জন্য মহান পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ঋণী। একথা ইটালীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য যেখানে

খ্রীস্টীয় ধর্মসংঘের অবস্থিতি এইসব শিল্প ও সংস্কৃতিগত প্রয়াসকে এমন এক শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টির সামনে এনে হাজির করেছিল, সমাদর করবার মত শক্তি এবং পোষণ করবার মত সামর্থ্য যাদের ছিল। সাম্প্রতিক আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা-সংস্থা, বা পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন প্রধানতঃ নারীদের দ্বারা সহানুভূতি ও সাহায্য বিস্তৃত হয়েছে। যাঁরা দিয়েছেন—মিসেস বুল তাঁদের মধ্যে মহাদাত্রী। তাঁর দান গোপন, নিরন্তর, এমন এক ন্যায়বুদ্ধিতে নিয়ন্ত্রিত যা গ্রহীতাদের দাবির অধিকারকে কখনো বিস্মৃত হত না এবং তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থাকে সর্বাবস্থায় বিবেচনা করত। শেষোক্ত ব্যাপারটিই তাঁর পরিচিত জনদের কাছে তাঁর স্মৃতিকে এমন সমুচ্চে স্থাপিত রেখেছে। যদি যশের কোনো বাসনা থাকত, তাহলে এঁর পক্ষে কত সহজে তাকে অধিকার করা সম্ভব হত! অথচ অন্যপক্ষে তাঁর ব্যাপক দানের বহু শাখাবিস্তারের রূপ কেউ জানেনি, সন্দেহ করেনি। তাঁর দানগুলি গ্রহীতাদের চরিত্র এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর ব্যক্তিগত ধারণার রূপ অবিরত ব্যক্ত করেছে। তাঁর দান, গ্রহীতাকে নিজের কাছে মহীয়ান করে তুলত, এমনই বিরল অপরূপ গুণ তার মধ্যে ছিল, কেননা তিনি জানতেন দানের মধ্যে কিভাবে অন্তরঙ্গতা, মর্যাদা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করে দিতে হয়। তাঁর বদান্যতা বড়র মত ছোটতেও পৌঁছত, কিন্তু সর্বদা তাতে সেই একই গোপনীয়তা, অভাবের মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তি সম্বন্ধে একই প্রকার সতর্ক বিবেচনা। হিন্দুর গীতা বলে, 'সাত্ত্বিক দান, যা শ্রেষ্ঠ দান, কেবল সেই দানই সঠিক মানুষের দিকে, সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে প্রসারিত হয়।'* খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বলে, 'যিনি দেবেন, তিনি যেন সহজে দান করেন।'

---

* মিসেস বুলের 'সাত্ত্বিক দানের' সম্বন্ধে নিবেদিতার এই কথাগুলি স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি। এই প্রবন্ধ লেখার প্রায় ১২ বছর আগে, ১০ জুলাই, ১৮৯৯-তে ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন—

"তারপর অন্য এক ক্ষণে স্বামীজী বললেন, 'গীতা বলেন, তিন রকম দয়া রয়েছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসিক দয়া আবেগপ্রবণ, অন্য কিছু চিন্তা না করে, পরিণতি বা অন্য কিছুর কথা না ভেবে, কেবল সাক্ষাৎ ইচ্ছাচালিত হয়ে সাহায্য করে। রাজসিক দয়া সাহায্য করে গৌরবের জন্য। আর সাত্ত্বিক দয়া—', তিনি বললেন—'যতই মিসেস বুলের কথা ভাবি ততই সাত্ত্বিক দয়ার কথা মনে হয়, কারণ ও-দয়া করতে হয় ঠিক মানুষকে, ঠিক উপায়ে এবং ঠিক সময়ে। মিসেস বুলই মনে হয় একমাত্র মানুষ যিনি জানেন ঠিক কিভাবে দিতে হয়, কত নিঃশব্দে অথচ কদাপি ভুল না করে। আর মার্গট, তোমাদের সব দয়া তামসিক ইত্যাদি ইত্যাদি।' "

নিবেদিতাকে জীবনে বহু দান নিতে হয়েছে এবং দিতে হয়েছে। এই দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের যোগ ছিল না। তবু পাছে স্বার্থ-সম্পর্ক ঘটে যায়, তাই নিজের মনকে বিচারে ও বিবেকে জাগ্রত রাখতে চেষ্টা করতেন সর্বসময়। ২৫ আগস্ট, ১৯০৪-এ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"আর একটি জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। ভ্রান্ত দান ধ্বংসের কারণ। বাস্তবিক, গীতা সেই কথাই শেষের দিকে তামসিক দান সম্বন্ধে বলেছেন। স্বার্থের ইন্ধনরূপে প্রদত্ত সকল দানই ভ্রান্ত। যখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, 'ধর্মান্তর' ঘটেছে যেন, ঐকান্তিকতা এসেছে, কিংবা বলা যায়, এমন একটি প্রয়াস করা হয়েছে সবকিছুই সেই প্রয়াসে, আত্মস্বার্থে নয়, উৎসর্গীকৃত, কিংবা যখন আত্মা চালিত করতে বা আত্মসাৎ করতে না চেয়ে সাক্ষীর ভূমিকা নিয়েছে, কেবল তখনি কিংবা তারও বহু পরে ক্রমে দান করার অবস্থা আসে।"

১৯ বছরের তরুণী ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বিবাহের দ্বারা মিসেস ওলি বুল হয়ে বিশ্বের ইতিহাসে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্বামী নরওয়ের মহান বেহালাবাদক, ইউরোপ-জোড়া খ্যাতি তাঁর। তারও বেশী তিনি। এখন নরওয়ের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরা এ'রই তীব্র-ব্যাকুল দেশপ্রেমের স্বপ্নে লালিত হয়ে জাতীয়তাবোধ লাভ করেছিলেন। সকল প্রতিভাবান ব্যক্তির মতই ওলি বুল জাগতিক বিষয়ে সহজে প্রতারিত হতেন। স্বদেশের মঙ্গলের পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে বারবার বিরাট অর্থোপার্জন করেছেন, এবং বারবার অসাধু উকিল, ঝগড়াটে ম্যানেজার, কিংবা দুর্ভাগ্যের প্রবাদোক্ত গহ্বর সে টাকা স্বচ্ছন্দে তাঁর নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেলেছে। তথাপি এখনো তাঁর সেইসব অপূর্ব উচ্চাশার কিছু কিছু অংশকে স্মরণ করা হয়। নরওয়েবাসীদের কলোনি করবার জন্য আমেরিকায় তিনি বিশাল ভূখণ্ড কিনেছিলেন। তাঁর নেশন থিয়েটার,—উদ্বোধন করেছিলেন ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে—তার প্রথম তরুণ ম্যানেজার হেনরিক ইবসেন, দ্বিতীয় ম্যানেজার বিয়র্নস্টার্ন বিয়ার্নসন। নরওয়েবাসীদের ঘৃণা করে ডেনিশদের প্রতি পক্ষপাত দেখাত, এমন উচ্চম্মন্য রুচিকে বাতিল করে দিয়েছিল এই থিয়েটার। এখানে যে-ভাষা ব্যবহৃত হল তা স্থানীয় উপভাষা, রসিকতা গ্রামীণ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ থেকে সংগৃহীত। গানের ও কৃষক-বাদকদের ভার নিলেন ওলি বুল। আর নাটক?—ইবসেনের বিরাট সব প্রথম জীবনের নাটকগুলি কি এই কথাগুলি বলবার জন্য বর্তমান নেই যে, জাতীয় ইতিহাসে বীরকাহিনীগুলির সূত্রপাত এখান থেকেই! এ সবই সেইকালে ঘটল যখন বহু যুগ ধরে নরওয়েবাসীদের ভাষাকে ভদ্র সমাজের কথাবার্তার পক্ষে চাষাড়ে ভাষা বলে গণ্য করা হত।

রাজনৈতিকভাবে ওলি বুলের জীবন দুটি উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে নিয়োজিত ছিল, এক 'বিশুদ্ধ পতাকা' আন্দোলন, দুই 'নরওয়ে-দিবস' পালন। ১৭ই মে তারিখে নরওয়ে-দিবস; ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ঐ দিনটিতে নরওয়ে সুইডেনের কাছ থেকে স্বাধীন সংবিধান লাভ করে। ওলি বুল কিন্তু ঐ দুই উদ্দেশ্যের কোনটিকে সম্পূর্ণ সিদ্ধ দেখে যেতে পারেন নি। একথা ঠিক যে, বহির্বাণিজ্য বা দূতাবাসের ক্ষেত্র-ভিন্ন নরওয়ের পতাকার একাংশে নিজ চিহ্ন বজায় রাখার চেষ্টা থেকে সুইডেনকে নিবৃত্ত হতে হয়েছিল; এবং কয়েকটি ঐকান্তিক হৃদয় ও মন ঐ পতাকার প্রশ্ন ও জাতীয় দিবস পালনের প্রশ্নে সংঘবদ্ধ হয়েছিল; তথাপি স্বয়ং ওলি বুল কিংবা তাঁকে যাঁরা ঘিরে থাকতেন এমন কেউ কল্পনানেত্রে দেখতে পাননি, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী দিবসের উৎসব পালিত হবে স্বাধীন নরওয়েতে, স্বনির্বাচিত এক রাজার অধীনে। ব্যক্তি-পূজার ক্ষেত্রে নরওয়ে ইউরোপে অনন্য; আর এই শতবার্ষিকী উৎসব আমেরিকায় অবস্থিত বিধবা নারীর হৃদয়ের সর্বশেষ বিজয়োৎসব—স্বামীর স্মৃতি-রক্ষায় যাঁর প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ দীর্ঘ তপস্যার কাল প্রায় সমাপ্ত। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০-এর প্রভাতে প্রথম যে টেলিগ্রামটি তিনি খুলেছিলেন—শেষ রোগশয্যায় তখনই তিনি শয়ান—সে টেলিগ্রামটিতে স্বাক্ষর ছিল 'হাকন'। নরওয়ের রাজার প্রেরিত সেই টেলিগ্রামে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা ছিল—"এই দিনটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে সমগ্র নরওয়েতে।"

অতুলনীয় সৌভাগ্য আমেরিকান তরুণীটির—১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ওলি বুলের

পত্নী হবার পরে তিনি স্বামীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা-ভাবনার অংশ নিতে পেরেছিলেন। মিসেস ওলি বুল পরবর্তী জীবনে যে-ধরনের চিন্তা বা কাজেই নিজেকে প্রকাশ করুন, সব কিছুরই গভীরে নিহিত ছিল সুমহান স্বামীর কাছ থেকে লব্ধ প্রেরণা ও শিক্ষা। ওলি বুল ছিলেন জাতি-নির্মাতাদের শ্রেণীভুক্ত মানুষ। মৃত্যুকালে যে-পত্নীকে রেখে গেলেন, তিনি একই সঙ্গে তাঁর শিষ্যা। তাঁর জন্য শোক করতে রয়ে গেল যে-হৃদয়, তা লোকমাতার হৃদয়। মিসেস বুলের পরিণত জীবনের বৎসরগুলিতে সর্বাত্মক কল্পনা এবং এক ধরনের গৃহস্বামিনীসুলভ মিতব্যয়িতার বিচিত্র সংমিশ্রণ। বিশ্বজনীন মনের অধিকারী এক ভায়োলিন-বাদক (ওলি বুল নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "নরওয়ের বুড়ো বেহালা-বাজিয়ে") এক মহান জাতির জন্য কি করতে পারেন, তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাই তিনি যেমন জাতির মূল্য অনুধাবন করতে সমর্থ ছিলেন, তেমনি ব্যক্তির মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যও। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যেহেতু জাতি-সংগঠক প্রতিভাকে সেবা করেছেন, সেইজন্য মহান পুরুষেরা কোন্ ভাবের প্রতিনিধিত্ব করেন তা বুঝতে পারতেন ; মাতৃসুলভ কৌশলে তাঁদের অবকাশের বা ভ্রমণের ব্যবস্থা করে, বা তাঁদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বা উপহার দিয়ে এমন অবস্থা এনে দিতেন যার ফলে নানা সংকট তাঁরা অতিক্রম করতে পারতেন ; তাঁদের ভগ্নহৃদয়ের যাতনা ভুলিয়ে ইনি নূতন আশার সৃষ্টি করে দিতেন। গোপনে হয়ত এমন একজনের উদ্দেশ্যে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছেন যাঁর সঙ্গে তাঁর মননের সাধর্ম্য নিতান্ত ভাসাভাসা—সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আত্ম-সমর্থনের ভঙ্গিতে হয়ত একান্তে বললেন, 'কি করব, এমন একটা কণ্ঠ হারিয়ে যাবে, সে তো হতেই পারে না!' কোনো মানুষ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে কতখানি মূল্যবান, সেই দিকেই তাঁর নজর ছিল, ব্যক্তিগতভাবে সে মানুষটি তাঁর পছন্দের কি না সে বিচার করতেন না। যে-কোনো দেশের মানুষ, তিনি ডাক্তার, সাংবাদিক, শিল্পী, দরিদ্র লেখক, অভাবী শিক্ষক—যে-কারো ভবিষ্যতের জন্যই তাঁর উন্মুক্ত উদারতা ; যেন লোকজননীর সঞ্চয়-ভাণ্ডারের চাবিখানি রয়েছে তাঁর হাতে, তিনি বিতরণ করছেন প্রয়োজনের সামগ্রী। আর তাঁর দানে কোনো শর্ত ছিল না। যাদের রক্ষা করতে চেয়েছেন তাদের জন্য নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার ঠাঁই ও কাজের সুযোগ সংগ্রহে তিনি স্বতঃই প্রয়াসী। অথচ কি ধরনের কাজ তাঁরা করবেন, সে বিষয়ে কথাটি নয়, তাঁদের সংগ্রামের লক্ষ্য নির্দেশে বিন্দুমাত্র বাসনা নয়। এসব ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব এক রীতি ছিল। "আমার পরম গৌরব", মৃত্যুশয্যায় তিনি বলেছিলেন, "আমি সেবা করতে পেরেছি।" তবে সেবার বস্তু নির্বাচনে, এবং মূল্য নির্ধারণে তাঁর স্বামীই নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রেরণা দিয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

বিবাহ-ব্যাপারটি তাঁর সঙ্গীতপ্রীতিরই ফলশ্রুতি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ম্যাডিসনে (উইসকনসিনে) জাত ও লালিত বালিকাটি যেভাবে হোক পিয়ানো বাজানো শিখে নিয়েছিলেন ; এমন কম্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সুর তাঁর হাতে উঠত যে তাঁর পিতৃ-ভবনে অতিথিরূপে আগত সেই মহান ভায়োলিন-বাদকের সানন্দ মনোযোগ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং প্রভাতের অনুশীলনকালে সঙ্গত করবার জন্য তিনি বালিকা-টিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রভাবেই এঁর সঙ্গীত-প্রতিভা অধিক বিকশিত হয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে এঁর বাজনায় এক নিজস্ব মীড় ও মূর্চ্ছনার

সঞ্চার হয়েছিল, অতীব সুন্দর তা। সন্ধ্যায় অগ্নিকুণ্ডের পাশে যখন তিনি বাজাতেন, কত মহান সৃষ্টির রীতি-সৌরভ ঘনীভূত হয়ে উঠত সেখানে। সুপরিচিত এক পিয়ানো-বাদিকা কুড়ি বছর আগে জাহাজে এঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেন, তখনকার পাঁচ মিনিটের আলাপে এঁর কাছ থেকে যে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, তার থেকে তিনি অতঃপর গ্রে'র সুর বাজানোর রীতিই বদলে নিয়েছিলেন। বিবাহের মধ্য দিয়ে ইনি ওলি বুলের সঙ্গীতজীবন ও জাতীয় জীবন, উভয়েরই অংশী হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গতকারিণীরূপে ইনি ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন, এবং ভিয়েনা, প্যারিস, ব্রাসেলস্ ও অন্যত্র লিস্‌জত্, রুবিনস্টাইন, স্ট্রাকেরস্‌থ্ প্রভৃতি স্বামীর সঙ্গীত-বান্ধবদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে লিস্‌জত্-এর চেহারার অসাধারণ ঐক্যের কথা প্রায়ই শুনেছেন। সে ঐক্য এত বেশী ছিল যে, ভিয়েনায় উপস্থিত হয়ে তাঁরা যখন লিস্‌জত্-এর আবাসে দেখা করার জন্য গেছেন তখন লিস্‌জত্-এর পরিচারক তাঁদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে দৌড়ে ভিতরে গেছে—'কর্তার যমজ ভাই এসেছেন' জানাতে। ইউরোপের বহু বন্ধুরই ধারণা ছিল, অনেক দিন আগেই ওলি বুলের মৃত্যু হয়েছে। তাই ওলি বুলের শেষ বিরাট সফরের সময়ে তাঁর বাজনা শুনে বন্ধুদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে করমর্দন করে বলেছিলেন, 'কী আশ্চর্য। একথা তুমি ঘৃণাক্ষরে জানাও নি তুমি আগের মতই অপূর্ব বাজাও!'——তরুণী বধূর পক্ষে তা ছিল এক পরম গর্বের ক্ষণ।

স্বামীর জীবনের শেষ তিন বৎসর উভয়ে প্রতিদিন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে একত্রে বাজাতেন। যে-ঘরে তাঁরা বাজাতেন পত্নীর কাছে সেই ঘরখানি উপাসনা-মন্দির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরওয়েতে স্বভবনের সুন্দর সঙ্গীতকক্ষে পত্নী বাজিয়ে গিয়েছিলেন মোৎসার্টের বিদায়সঙ্গীত, চরম আনুগত্যের মহান শক্তিতে—যখন স্বামী চলে যাচ্ছেন চিরতরে। তারপরে—সারা বুল অনুভব করলেন সুরের মহারাজ্যের উপর যবনিকা-পাত হয়ে গেল আগামী বহু বছরের জন্য। তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ের উপরে এই মৌন-নির্জন যেন ভাবী শান্তি ও নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি। সঙ্গীত? সে যে তখন তাঁর কাছে অসহ্য যাতনা! শেষ শয্যায় যখন শুয়েছেন, তখন তাঁর চারপাশের মানুষেরা গভীর বেদনানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন, তিনি বার বার বলেছেন—"আমি নিশ্চিত অনুভব করছি, আবার সেই মহাসঙ্গীত শুনতে পাব!"

পরবর্তী বৎসরগুলিতে আমেরিকাবাসী নরওয়েজিয়ানদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে অনুভব করেছে—ওলি বুলের বিধবা পত্নী অন্তরে নরওয়ের মানুষ। প্রশ্নাতীত বিশ্বস্ততা সম্পর্কবন্ধনকে যতখানি দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ রাখতে পারে, এখানে তাই ছিল। কিন্তু কালগতে নিজ কন্যা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হল, তখন নরওয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে ক্রমেই তিনি সচেতনভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন যাতে করে কন্যা অধিক সুযোগ পায়। এই কারণেই কয়েক বৎসর আগে বার্গেন-এ অভিষেক উৎসবে উপস্থিত হতে রাজি হননি। সেখানকার জনগণের সমক্ষে তিনি শেষবার আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৭ মে, ১৯১০-এ সিণ্ডিং-কৃত ওলি বুলের মূর্তির আবরণ-মোচন সভায়। পরে, একই বৎসরে তিনি মিঃ আর, সি, দত্তকে (রমেশচন্দ্র দত্ত) অতিথিরূপে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

ভারত সম্বন্ধে মিসেস ওলি বুলের আগ্রহের সূত্রপাত ১৮৮৬-৮৭ সালের

শীতকাল থেকে, যখন তিনি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে বস্টনে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত ভগবদ্‌গীতায় পাঠ শোনেন। এই ধর্ম-সাহিত্যের অনুশীলন তিনি আরম্ভ করেছিলেন,—এর মধ্যে দুটি জিনিস তাঁকে আকৃষ্ট করে : প্রথমতঃ, অমরত্বের গোটা সমস্যাটির বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা, দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ধর্ম-ধারণার অবাধ স্বাধীনতা। তিনি প্রায়ই বলতেন, এই হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েই তিনি খ্রীস্টধর্মকে ভালবাসতে শিখেছেন। মানবাত্মার নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। স্বামীর দেহত্যাগের পাঁচ বৎসরের মধ্যে গীতা তাঁর জীবনে অবতীর্ণ হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহী হন, এবং ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারত ও কাশ্মীরে এক বৎসর কাটান। এর অধিকাংশ সময় স্বামীজী তাঁর অতিথি ছিলেন। তার ফলে তিনি ভারতীয় জীবনকে যেভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তার তুলনা নেই। যে-বস্তুতে একবার আগ্রহী হয়েছেন, তার প্রতি তাঁর বিপুল নিষ্ঠা পরিচিতমহলে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগাত ; রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে তিনি 'ধীরা মাতা' নামে পরিচিত ছিলেন। এই সময়ের পর থেকে ভারতবর্ষ তাঁর জীবনে অগ্রাধিকার পেয়েছিল ; ভারত ও ভারতীয়দের তিনি একনিষ্ঠ উৎসাহী বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। বিবেকানন্দের কর্মোদ্দেশ্যের সঙ্গে মিসেস বুলের সহানুভূতির সংযোগ স্বামীজীর আমেরিকা-জীবনের সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করেছিল একথা বলা যায়। গৈরিক বসনাবৃত সেই সন্ন্যাসীর বক্তৃতাসভায় উপস্থিত নারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই গরীয়সী নন, তাঁর থেকে অনেক বেশী ধনশালিনীরা পূর্বেই বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু বিবেকানন্দ যে-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তার প্রতি তাঁর তুল্য গভীর নৈর্ব্যক্তিক উদারতা ও স্নেহানুভূতি আর কেউ দেখাতে পারেন নি, সে দায়িত্ববোধ আর কারো ছিল না, শ্রদ্ধার বস্তুকে সেবা ও রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁর তুল্য অনুশীলিত সামর্থ্যে আর কেউ অধিকারী ছিলেন না। অতঃপর বিবেকানন্দের আদর্শ ধাত্রী-মাতা পেয়েছিল কিংবা তারো বেশী। একদা জনৈক আমেরিকানের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত হলে সমাগত সকলে একজোট হয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করেছিল, 'ঋষির সংজ্ঞা কি?'—স্বামীজী তখন এক মুহূর্ত থেমেছিলেন, তারপরে শ্রদ্ধাঘন মৃদুস্বরে বলেছিলেন—'মিসেস ওলি বুল।'*

বন্ধু ও সেক্রেটারী ডাঃ লুইস জি জেনসের তত্ত্বাবধানে মিসেস বুলের গৃহ পরবর্তী কয়েক বৎসরে দার্শনিক আলোচনার স্বীকৃত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এইসব আলোচনার মধ্যে ভারতীয় এবং বৈদান্তিক বিষয়সমূহ যাতে যথাযোগ্য মনোযোগ পায়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। মিসেস বুলের দূর-ব্যাপক দৃষ্টি ও উদার মনস্বিতার কাছে একদেশদর্শিতা অসহ্য ব্যাপার। ধর্মান্তর সম্বন্ধে তাঁর আতঙ্ক ছিল। তাঁর মতে, যথার্থ বিকাশের ধর্ম যা, তা একদিকে পুরাতনের স্বীকৃতি ও সমর্থন নিয়েছে, অন্যদিকে একই সঙ্গে নূতনকে উন্মোচন করেছে। যে-কোনো জিনিস সম্বন্ধে আগে-ভাগে বরং তিনি সর্বাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবেন, পাছে অংশকে পূর্ণ বলে গ্রহণ করার মত প্রচলিত ভুল করে বসেন।

---

* এই সূত্রেই বোধহয় নিবেদিতা তাঁর চিঠিপত্রে 'সেন্ট সারা' লিখতেন।

ভারত-প্রীতির ক্ষেত্রেও তিনি নিজ স্বামীকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন। ওলি বুলের একটি ক্ষুদ্র লেখায় দেখা যায়, তিনি সন্ধান করে দেখিয়েছেন, ভায়োলিনের সৃষ্টি ভারতেই। ভারতের কাছে নিজ স্বামীর কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকারে মিসেস বুল আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তা নিশ্চয় প্রায়ই জানাতেন, কারণ ১৮৯৮-এর মে মাসে আলমোড়ার বাংলোয়—হিমালয়ে তাঁর গৃহস্থালীর প্রথম দিনটিতে—স্বামী বিবেকানন্দ নিজের আবাসস্থল থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁকে একটি খেলার বেহালা উপহার দিয়েছিলেন (সেইসঙ্গে সেটিকে বাজাবার জন্য খেলার ধনুকও), যেটিকে মিসেস বুলের মনে হয়েছিল তাঁর স্বামী কর্তৃক উল্লিখিত আদি ভায়োলিনের রূপ। ঐ ভঙ্গুর জিনিসটিকে সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুদিনে তাঁর ড্রইংরুমের টেবিলের উপরে সেটিকে রাখা হয়েছিল।

স্বামী তাঁর কাছে প্রেরণাদাতারও অধিক। ভারতবর্ষীয় বস্তু বা ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি যে মনোভাব বোধ করেছেন, বা যে সাহায্য করেছেন, সেক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকও তাঁর স্বামীই। মিসেস বুলের দৃষ্টি সম্মুখ-প্রসারিত, তাঁর মনোবৃত্তি সংগঠনী। সহৃদয় তিনি, আবার প্রাজ্ঞও। ভারতীয় নারীর মধ্যে তিনি প্রথম থেকেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন, অবহেলায় হারাবার যোগ্য নয় যা। তাদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ অসীম, কিন্তু সে শিক্ষার আকার-প্রকার যাতে ঠিক পথে ঘটে, সে বিষয়ে সমধিক সতর্কতা ছিল। ভারতীয় মানসের সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা থেকেই তাঁর মধ্যে কৌতূহল জেগেছিল—এহেন ভারতীয় চরিত্র ভারতীয় মাতৃগণ সৃষ্টি করেছেন কোন্ শিক্ষায়? বাস্তব পরিচয়ের পরে তাঁর মনে কৌতূহলের স্থানে সুগভীর পরিতৃপ্তি এবং শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। ভারতীয় নারীরা তাঁদের এই শ্রেষ্ঠ সুহৃদের কাছ থেকে যে মর্যাদার দৃষ্টি, সহানুভূতিপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছেন, তার তুলনা নেই।

জনগণের ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বপ্রকারের মননগত প্রচেষ্টার গুরুত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা—সব কিছুই তাঁর অবিচলিত আশা ও বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী ছিল। এক্ষেত্রে নিখুঁত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দৃঢ় প্রত্যয় ও উৎসাহের সঙ্গে অপরূপ সংযমের সংমিশ্রণ, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতার গভীরতা ও প্রাজ্ঞ বিচার-শক্তি—এর তুলনা বিরল।

মিসেস ওলি বুল এদেশে দ্বিতীয়বার আসেন ১৯০২ সালে এবং তৃতীয়বার ১৯০৩ সালে। তাঁর অনেক বন্ধুই আশা করেছিলেন তিনি আবার আসবেন—দীর্ঘতর দিনের জন্য—কিন্তু তা হবার নয়। গত ১৮ই জানুয়ারীর প্রত্যূষে এক নিদ্রা থেকে অন্য নিদ্রায় চলে গেলেন, মৃত্যুসায়রে অবতরণ করলেন সর্বোত্তমা এক আমেরিকান নারী।

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র

নিবেদিতা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রোড়পত্রে (২৮ অক্টোবর, ১৯৬৭) প্রকাশিত বর্তমান লেখকের রচনাটির নাম ছিল 'আলোকদূতী'। ঐ নামটি বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারপথে স্থাপিত নিবেদিতার মূর্তির আখ্যা—*The Lady of the Lamp*-এর ভাবান্তর ছাড়া কিছু নয়। জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনসাধনার পূর্ণাহুতি দেবার সময়ে নিবেদিতার উদ্দেশ্যে কেন সর্বোত্তম নমস্কার জানিয়েছিলেন, সে ইতিহাস পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের কথা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষিপ্ত ক্ষীণস্মৃতির মধ্যে থেকে গিয়েছিল। তার গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই জনসমাজে ছিল না। প্যাট্রিক গেডিস লিখিত জগদীশচন্দ্রের জীবনীতে নিবেদিতার ভূমিকার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, রবীন্দ্রনাথ বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচার্য বসুর সাধনায় নিবেদিতার সাহায্যের কথা মাঝে মাঝে বলেছেন, এই পর্যন্ত। এই ঐতিহাসিক ঔদাসীনতার পরিবর্তন ঘটেছিল লিজেল রেম'র নিবেদিতা জীবনী প্রকাশিত হবার পরে। বইটির নারায়ণী দেবীকৃত বাংলা অনুবাদ পড়ে বাঙালী পাঠক চমকিত হয়ে জেনেছিল এবং জেনে চমকিত হয়েছিল—সত্যই নিবেদিতা এতখানি করেছিলেন। সেই বিস্ময়ের চমক্ গ্রাহ্য ধারণায় পর্যবসিত হয় মুক্তিপ্রাণা ও আত্মপ্রাণা-রচিত নিবেদিতার বাংলা ও ইংরেজী জীবনী দুটি প্রকাশিত হলে।

তবু স্বীকার করতে হবে, নিবেদিতার ভূমিকার ব্যাপ্তির তুলনায় প্রকাশিত ইতিহাস সামান্যই। তা কুয়াশা সরে যাওয়ার পরে হারানো নিমজ্জিত জাহাজের মাস্তুল-দর্শন মাত্র। ক্রমে নূতন নূতন তথ্য উপস্থিত হয়েছে এবং আমরা নূতনতর প্রাপ্তির সম্ভাবনায় উচ্চকিত হয়েছি। যেমন ধরা যাক, নিবেদিতা স্মারকগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষের অনুরোধে নিবেদিতার মারাঠি জীবনী-কার সুপণ্ডিত ডক্টর ভি ভি পেন্ডসে যখন গোখলেকে লেখা নিবেদিতার অনেকগুলি চিঠির নকল পাঠিয়ে দিলেন, তাতে দেখা গেল, কাউন্সিল-সদস্য গোখলের মারফত কিভাবে নিবেদিতা সরকারী মহলে ডাঃ বসুর বিরুদ্ধে অবিচারের প্রতিবিধান চাইছেন।

কিন্তু পাইনি কত তথ্য তারও সীমা-সংখ্যা নেই। যিনি উজাড় করে সাহায্য করেন, তিনি ইতিহাসের কল্যাণের জন্য ইতিহাস রেখে যান না, বিশেষতঃ যদি নিবেদিতার মত আত্মবিলোপী চরিত্রের মানুষ তিনি হন। তথাপি—নিবেদিতা প্রচুর চিঠি লিখতেন, ডাঃ বসুকেও লিখেছেন—সে চিঠিগুলি গেল কোথায়? চিঠি লেখার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র হয়ত স্বভাব-সন্ত্রস্ত, তবু নিবেদিতাকে লেখা তাঁর চিঠি সংখ্যায় কম হওয়ার কথা নয়—সেগুলিই বা গেল কোথায়? জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রক্ষিত নিবেদিতার ডায়েরীগুলি—যার মধ্যে ডাঃ বসুর কাজের নোট ছিল—তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু তথ্য ইতিপূর্বেই দিয়ে এসেছি। সে ডায়েরীগুলি অপ্রকাশিত কিংবা লুপ্ত। জগদীশচন্দ্রের জীবনে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে

সর্বাধিক তথ্য যে-সূত্রে থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল সেই বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে প্রায় কিছুই করেননি বলা চলে।

তথ্য উদ্ধারে নানা অসুবিধা। তথাপি সৌভাগ্যের বিষয় ভূমিকার তুলনায় সামান্য হলেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছি। এক্ষেত্রে মুখ্য উৎস নিবেদিতার পত্রাবলী। অন্যান্য সূত্র থেকেও সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ অল্প নয়। ইতিপূর্বেই আমরা এ বিষয়ে নানাজনের সাক্ষ্যবিবরণ দিয়ে এসেছি। নিবেদিতার বোন এবং ভাই, মে উইলসন ও রিচমন্ড নোবল, সিস্টার দেবমাতা, র‍্যাটক্লিফ প্রভৃতির সাক্ষ্য উল্লিখিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও আরও নানাজনের সাক্ষ্য দেওয়া হবে। এই সমস্ত উপাদান থেকে একটি খসড়া-চিত্র পাওয়া যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই চিত্র উপস্থিত করার কালে পাঠকদের কাছে একটি বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। বর্তমান লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র নন, অথচ বৈজ্ঞানিক বিষয় তাঁকে উপস্থিত করতে হচ্ছে। কিছু কিছু ভ্রান্তি ঘটবেই।

১৮৯৮ সাল পর্যন্ত ডাঃ বসুর জীবনের রেখাচিত্র

১৮৯৮ সালে নিবেদিতার ভারতে আসার কিছুদিন পরেই ডাঃ বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আমাদের বিবরণের মূল অংশের সূত্রপাত সেখান থেকেই। কিন্তু যেহেতু আধুনিক ভারতবর্ষের প্রধান বৈজ্ঞানিক পুরুষের সংগ্রামময় জীবনে এক মহীয়সী নারীর সেবা ও সাহায্য আমাদের উপজীব্য হবে, সে কারণে ঐ সংগ্রামের সূচনাপর্বের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনী, গভীর লজ্জার বিষয়, যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত নয়। বিবরণ দেবার কালে আমরা প্রধানতঃ প্যাট্রিক গেডিস রচিত 'দি লাইফ এ্যান্ড ওয়ার্ক অব স্যার জগদীশ সি, বোস' গ্রন্থটির উপর নির্ভর করব। সেই গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় যে-জীবনচিত্র দেওয়া হয়েছে, তারও সাহায্য নেব।

জগদীশচন্দ্রের পৈতৃক বাস বিক্রমপুরে, কিন্তু তাঁর জন্ম হয় মৈমনসিংহে, ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। ঐকালে তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ওখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম বামাসুন্দরী বসু।

ভগবানচন্দ্র উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মানুষ। তিনি দেশপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর জাতীয়তা-বোধ ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়নি, বহু উদ্যমে তা সক্রিয় ছিল। সমাজ-উন্নয়নে তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ভিন্ন দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়, বিশ্বাস করেছিলেন। নানাপ্রকার কারিগরি শিল্পে ও বাণিজ্যে নিজের সমস্ত অর্জিত সম্পদ নিয়োগ করার পরে আদর্শবাদী ব্যবসায়ীর সাধারণ ভাগ্য, বিপুল ঋণের বোঝা, বহন করেছিলেন জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকাররূপে জগদীশচন্দ্র ঋণের বোঝার অতিরিক্ত আরও কিছু লাভ করেছিলেন। মানবচরিত্রের মহত্ত্বের উত্তরাধিকারও তিনি পেয়েছিলেন।

সাহসী, উদ্যমী, আদর্শবাদী ও কল্পনাপ্রবণ পিতা পুত্রের চরিত্র গঠন করে দিয়েছিলেন। পুত্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, "সময়ের পূর্বে তাঁর জন্ম ; তাঁর মত বহু জীবনের ভস্মাবশেষের উপরেই ভাবী বৃহত্তর ভারতের ভিত্তি নির্মিত হবে। কেন এমন হবে, তা জানি না, শুধু জানি যে, ধরিত্রী-মাতা বলির জন্য ক্ষুধার্ত।"

পরের জন্য আদর্শবাদ এবং নিজের জন্য সুবিধাবাদ—বলাই বাহুল্য এ নীতি ভগবানচন্দ্রের নয়। সুতরাং সকলকে চমকে দিয়ে তিনি বালক জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজী স্কুলের পরিবর্তে ফরিদপুরে নিজের স্থাপিত দেশী বাংলা স্কুলে। জগদীশচন্দ্র এর ফলে নিজ রক্তের মধ্যে স্বদেশ এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে পান। বহু পরে তিনি বলেছিলেন—"আজ বুঝতে পারছি, কি উদ্দেশ্যে বাংলা স্কুলে বাবা আমাকে ভর্তি করে দেন। সেখানে শুরুতে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে হয়েছে, সেই ভাষায় ভাবতে হয়েছে, জাতীয় ভাবার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, আমি নিজেকে জনগণের একজন বলে ভাবতে শিখেছি, উচ্চম্মন্যতা আমাকে সরিয়ে রাখেনি।"

স্বদেশ তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে বালকের মনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। যাত্রার আসরে রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ও তাদের প্রতি আকর্ষণ, ডাকাত-ভৃত্যের কাছে ভয়ঙ্কর কাহিনী শোনার রোমাঞ্চকর উত্তেজনা, প্রবাহিত নদীতটে নির্জন দুপুরে বসে গতিশীল নদীতরঙ্গের সঙ্গে স্বপ্ন-কল্পনা মিশিয়ে দেওয়া এবং সন্ধ্যায় পিতার কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্নে বস্তুরহস্য সম্বন্ধে স্বভাব-কুতূহলী মনকে মেলে ধরা—বালকের এই জীবন।

তারপর ১১ বছরের ছেলে মফঃস্বল থেকে কলকাতা শহরে এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। সে স্কুল থেকে অল্প পরেই সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে, এবং প্রথম দিনেই ক্লাসের চ্যাম্পিয়ান মুষ্টিযোদ্ধার চ্যালেঞ্জের উত্তরে লড়াইয়ে নেমে পড়া।—"বক্সিংয়ের তখন কিছুই জানতাম না, তাহলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম, প্রচণ্ড মার খেয়েছিলাম, তবু ছাড়িনি, শেষ পর্যন্ত জিতেছিলাম, এবং শিখেছিলাম, বাধা যত বড়ই হোক অনতিক্রম্য নয় ; এই মনোভাব পরবর্তী জীবনে মনন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিল"—জগদীশচন্দ্র বলেছেন।

১৮৭৫ সালে বৃত্তি নিয়ে এনট্রান্স পাশ করে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন, বিজ্ঞান গ্রহণ করেন এবং ফাদার লাফোঁর শিক্ষায় বিশেষ প্রেরণা পান। প্রথমে তাঁর ঝোঁক ছিল 'প্রাকৃতিক ইতিহাসে', ফাদার লাফোঁ তার মোড় ফিরিয়ে দেন পদার্থবিদ্যার দিকে। ১৮৭৭ সালে এফ-এ এবং ১৮৭৯ সালে বি-এ পাশ করেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তিনি ল্যাটিন ও সংস্কৃতও শিখেছিলেন।

বি-এ পাশের পরে তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ এল যখন স্থির করলেন ইংলণ্ড যাবেন আই, সি, এস হতে। পিতার আর্থিক বিপর্যয় তখন চূড়ান্ত। আই, সি, এস হয়ে পিতার কষ্ট দূর করবেন, সেই অভিপ্রায়। আই সি এস হতে না পারলে ব্যারিস্টারী। কিন্তু যাবেন কি করে—খরচের প্রশ্ন বাধা হয়ে দেখা দিল। তখন তাঁর মাতা, রক্ষণশীল হিন্দু রমণী, যিনি পুত্র-বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় ও সমুদ্রযাত্রার প্রশ্নে আতঙ্কিত, তিনি যখন দেখলেন পুত্র যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন নিজের সমস্ত

অলঙ্কার এনে তার হাতে তুলে দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অলঙ্কার বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়নি।

পিতার মহত্ত্ব এখানে আর একবার উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। তাঁর দুঃখ দূর করার জন্য জগদীশচন্দ্র শাসনকর্তার চাকরী নেবেন? পিতার কাছ থেকে পত্র পেলেন চরম নির্দেশ : "আমি জানলাম, আমি অপরের শাসক হব না, আমি শাসন করব শুধু নিজেকে ; বিদ্বান হতে হবে আমাকে, প্রশাসক নয়।"

ইংলণ্ড গিয়ে তিনি প্রথমে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কালাজ্বরে এমনই কাহিল হয়ে পড়েন যে, ডাক্তারী ছেড়ে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ১৮৮১-তে বৃত্তিসহ প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠ্যরূপে গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞানের কোন্ শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন তা গোড়ার দিকে নির্ধারণ করতে অসুবিধা হওয়ায় যত বেশী বিষয়ে সম্ভব ক্লাস করতে ও যত রকমের সম্ভব ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে থাকেন। এর ফলে ভবিষ্যতে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পদার্থ বিদ্যার দিকেই ঝোঁকেন লর্ড র‍্যালের উচ্চাঙ্গের শিক্ষাগুণে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভাইনস্‌ও তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পরবর্তী জীবনে তাঁরা এঁর বিশেষ সহায়ক হন। জগদীশচন্দ্র প্রায় একই সঙ্গে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ন্যাচারাল সায়েন্স ট্রাইপস্' এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এসসি ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

সম্মানের সঙ্গে ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করে জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরছেন, তাঁর সামনে সফল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিশ্চয় উজ্জ্বল, বিশেষতঃ যখন বিখ্যাত উদারনৈতিক ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্দেশ্যে লেখা অর্থনৈতিক অধ্যাপক ফসেট-এর সুপারিশপত্র তাঁর আছে। লর্ড রিপন স্বভাবসুলভ ঔদার্যের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে গ্রহণ করে তাঁকে যোগ্য চাকুরি দেবার জন্য অবিলম্বে লিখে পাঠালেন ডি পি আই স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌টের কাছে।

এর পরেই জগদীশচন্দ্রের স্বর্গ হইতে বিদায়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন লর্ড রিপনের নির্দেশে। তিনি নিম্ন থেকে অনুরুদ্ধ হতে অভ্যস্ত, উপর থেকে আদিষ্ট হওয়া তাঁর খুবই অপছন্দ, বিশেষতঃ ব্যাপারটা যদি নেটিভ-সংক্রান্ত হয়। ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে কোনো চাকরি খালি নেই, তিনি জানালেন, তবে প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদানের পথ খোলা আছে। সে চাকরি নিতে জগদীশচন্দ্র অস্বীকার করলেন।

ব্যাপারটার ইতি সেখানেই হত যদি লর্ড রিপন ছাড়া অন্য কেউ ভারতের ভাইসরয় হতেন। চাকুরীপ্রাপ্তদের তালিকায় জগদীশচন্দ্রের উল্লেখ নেই দেখে তিনি প্রশ্ন করে পাঠালেন, এবং মহামান্য ভাইসরয়ের প্রশ্ন বলেই উত্তরে শিক্ষা-ডিরেক্টর অগত্যা তাকে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে অস্থায়ী পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের চাকরি দিলেন।

ভারতীয়কে বাধ্য হয়ে চাকরি দিতে হয়েছে, এই অসম্মান ইংরাজের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। জগদীশচন্দ্রের মাহিনা স্থায়ী বৃটিশ চাকুরিয়ার তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম, এবং পদ যেহেতু অস্থায়ী সেই কারণে মাহিনা স্বাভাবিকেরও

এক-তৃতীয়াংশ। জগদীশচন্দ্র কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু প্রতিবাদে মাইনে নিতে অস্বীকার করলেন, যখন তাঁদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা শোচনীয়তম।

পিতার ঋণশোধ উপযুক্ত পুত্রের কাছে তখন বড় সমস্যা। গ্রামের পৈতৃক ভবন তিনি বেচে দিলেন, পিতৃপিতামহের ভিটার প্রতি ভারতবর্ষীয় সংস্কারবন্ধন সবলে ছিন্ন করে। তার দ্বারা এক-তৃতীয়াংশ ঋণশোধ হল। পুত্র এইবার মায়ের অলঙ্কার ভিক্ষা করলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে আরও এক-তৃতীয়াংশ শোধ হল। স্তম্ভিত সম্মোহিত মহাজনেরা বললেন, আর প্রয়োজন নেই, যথেষ্ট শোধ হয়েছে। না, পুত্রের দেয় অংশটুকু বাকি ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর যুদ্ধজয় হয়েছে, তিন বছর চাকরির পরে তাঁকে প্রথমাবধি স্থায়ী বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং একসঙ্গে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই টাকার অবশিষ্ট পিতৃঋণ শোধ করে জগদীশচন্দ্র জানালেন, পিতৃঋণ অপরিশোধ্য।*

চাকরি জীবনে সূচনা থেকেই জগদীশচন্দ্র দুইটি লড়াই আরম্ভ করেছেন। প্রথম, চাকরির ক্ষেত্রে ইংরাজ ও ভারতীয়ের যে-বৈষম্য তা দূর করবেন, দ্বিতীয়, প্রমাণ করবেন যে, ভারতীয়রাও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে, বৈজ্ঞানিক হতে পারে। ইংরেজ মহলে এর বিপরীত ধারণাই বলবৎ ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সি এইচ টনী ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন (তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন), কিন্তু গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় যোগ্যতা স্বীকারে মোটেই রাজি ছিলেন না।†

বিলেতী ডিগ্রির সাহায্যে হয়ত বিজ্ঞান পড়ানোর অধিকার পাওয়া যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। জগদীশচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানের শিক্ষক নয়, বৈজ্ঞানিক হতে

---

* বহু বছর পরে জগদীশচন্দ্র ফরিদপুরে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার বিষয় ছিল—'ব্যর্থতা—সুমহান!' পিতার বহু উদ্যমের অপ্রাপ্তি বহু ব্যর্থতার কথা বলবার পরে তিনি বলেছিলেন—

"ব্যর্থতা? হাঁ, কিন্তু অপমানজনক নয়, নিরর্থক নয়। তাঁর সংগ্রাম দেখে পুত্র সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে; এই কথাই সে বুঝেছে, কোনো কোনো পরাজয় জয়ের চেয়ে বড়। আমার কাছে তাঁর জীবন আশীর্বাদের, ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন কৃতজ্ঞ স্মরণের। প্রত্যেকেই বলেন, তিনি নিজ জীবনকে ধ্বংস করেছিলেন, আরও বড় কাজের যোগ্য ছিল তা। কিন্তু অল্প লোকই বোঝেন যে, অগণ্য জীবনের পঞ্জরাস্থির উপরেই মহাদেশ নির্মিত হয়। আর এমনই সব জীবনের ধ্বংসাবশেষের উপরেই ভাবী বৃহত্তর ভারত নির্মিত হবে। কেন এমনই হবে তা জানি না, শুধু এইটুকু জানি, ধরিত্রী-মাতা সর্বদাই বলি চাইছেন।" (গেডিস-লিখিত জীবনী)

† প্যাট্রিক গেডিস এ বিষয়ে লিখেছেন—

"There was also a strong doubt, not to say prejudice, against the capacity of an Indian to take any important position in science. Intellectual acuteness in Metaphysics and Languages had always been frankly acknowledged, but it was assumed that India had no aptitude for the exact methods of science. For science, therefore, India must look to the West for her teachers. This view was accepted by the Government, and so strongly maintained in the Education Department that when Bose was appointed Officiating Professor of Physics in the Presidency College, its Principal protested against this appointment on the above grounds."

চাইলেন। পঁয়ত্রিশতম জন্মদিনে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'নূতন জ্ঞানের সন্ধানে এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত হবে।' তখন ভারতবর্ষের যা অবস্থা তাতে বৈজ্ঞানিক হতে চাইলেই তার সুযোগ পাওয়া যায় না। কলেজ-কর্তৃপক্ষ পড়ানোর চাকরি তাঁকে দিয়েছিলেন, সে কাজটা যাতে যথাসম্ভব করা হয় তার জন্য সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়ানোর দায় চাপিয়ে দিলেন। সেই কাজ সেরে তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। তাছাড়া ল্যাবরেটরীর অবস্থা শোচনীয়। গবেষণার জন্য কোনো অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা নেই। অগত্যা নিজের পকেট ছিদ্র করে জগদীশচন্দ্র কুড়ি স্কোয়ার ফুট মাপের ল্যাবরেটরীতে আধুনিক ভারতের প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে লাগলেন।*

জগদীশচন্দ্রের প্রথম রিসার্চ হল—'হার্টজান ওয়েভ'-এর উপর। আলোকতরঙ্গের উপর ফ্যারাডের ফলিত গবেষণা, তার উপর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের, এবং তারপরে হার্টস্-এর কাজ যে-পথ উন্মুক্ত করেছিল, জগদীশচন্দ্র সেই পথেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণা-প্রাপ্ত ফলকে প্রকাশ করেছিলেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের বিজ্ঞান-পত্রে, মে, ১৮৯৫ সালে (paper "On the Polarisation of the Electric Ray") । এই পেপারটি 'ভারতে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছিল।' এর পরে জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় বিজ্ঞান-পত্র পাঠালেন লর্ড র‍্যালের কাছে, এবং সেটি 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হল ১৮৯৫ ডিসেম্বরে। তৃতীয় পত্রও লর্ড র‍্যালের সুপারিশে রয়াল সোসাইটি গ্রহণ করে প্রকাশ করল।

জগদীশচন্দ্র এইকালে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং টাউন হলে বেতারে বার্তা প্রেরণের পরীক্ষা দেখালেন সাফল্যের সঙ্গে। টাউন হলের সভায় লেফটন্যাণ্ট গভর্ণর উপস্থিত ছিলেন।†

---

* এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের মনোভাব তাঁর নিজের ভাষায়—

"কোনো ল্যাবরেটরী ছিল না, কোনো যন্ত্র-নির্মাতাও মিলত না। সবাই বলত, ভারতে কোনো মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার কাছে এই কথাটাই ঝলসে উঠেছিল—পুরুষমানুষ অবস্থাকে বিরূপ দেখলে তার সঙ্গে ঝগড়া করে না, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে মোকাবিলা করে, তার উপর আধিপত্য করে। তাছাড়া, আমরা সেই জাতির মানুষ, যে-জাতি সামান্য উপাদানে বৃহৎ বস্তু সম্পাদন করেছে।"

(শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

† "Now a new marvel was silently preparing to break upon the world—the application of Hertz's waves to wireless telegraphy, *towards which Hertz seemed to have some* premonition and various later investigators were feeling their way, as notably Lodge, and above all Marcony. Bose himself had as early as 1895, in a public lecture in Calcutta, demonstrated the ability of the electric rays to travel from the lecture-room, and through an intervening room and passage, to a third room 75 feet distance from the radiator, thus passing through three solid walls on the way, as well as the body of the Chairman (who happened to be the Lieutenant-Governor)."

অধ্যাপক গেডিস এক্ষেত্রে এইসময় জগদীশচন্দ্র কতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তা বিশদভাবে বলেছেন।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে যখন জগদীশচন্দ্র লন্ডন থেকে ডি এস্‌সি ডিগ্রি পেলেন এবং তাঁর গবেষণা লর্ড কেলভিন প্রমুখের সমূহ প্রশংসালাভ করল, তখন সরকারের কিছুটা টনক নড়ল, তাঁরা বাৎসরিক ২,৫০০৲ টাকা অনুমোদন করলেন গবেষণা-কাজের জন্য।

লর্ড র‍্যালে ইতিমধ্যে ডঃ বসুকে ইউরোপ যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ডঃ বসু সরকারের স্বারস্থ হলেন আর্থিক সাহায্যের জন্য। আমলাদের অসাড় কর্ণে সে আবেদন প্রতিহত হয়ে ফিরে এল, সেই অবস্থাতেই থাকত, যদি না আমলা-প্রধান গভর্নর অগ্রণী হয়ে নিজ দায়িত্বে ডঃ বসুকে ইংলন্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতেন।*১

'একালের কোনো ভারতবর্ষীয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায়' বেরিয়ে জগদীশচন্দ্র বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। লিভারপুলের ব্রিটিশ অ্যাসোশিয়েশনে বিদ্যুৎ তরঙ্গের উপর তাঁর প্রথম অভিভাষণ এমনই বৈদ্যুতিক হয়েছিল যে, বিখ্যাত পদার্থবিৎ লর্ড কেলভিন ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে ভারতে পূর্ণসজ্জিত বিজ্ঞানাগার স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে ভারত-সচিবকে পত্র দিয়েছিলেন। 'টাইমস' পত্রিকায় রীতিমত-প্রশংসা বেরিয়েছিল। রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পরে 'স্পেকটেটার' পত্রিকা তাদের অভ্যস্ত ভারত-বিদ্বেষ পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য পরিহার করে এঁকে জ্ঞানতপস্বী ভারতীয় বিবেচনা করে ফেলেছিল,*২ এবং ইংলন্ডের বিজ্ঞানী-সমাজ যুক্তভাবে বিজ্ঞানাগারের পক্ষে আবেদন জানিয়েছিলেন।**+*

জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি ভারতের বিজয়ী বিজ্ঞানপুত্র।

---

*১ লেফটন্যান্ট গভর্নর প্রথমাবধি ডঃ বসুর কাজের প্রতি প্রশ্রয়পর। ডঃ বসু যখন দার্জিলিঙয়ে তাঁর সঙ্গে ইংলন্ড যাওয়ার ব্যাপারে দরবার করতে গিয়েছিলেন, তখন চমৎকার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। ডঃ বসু তাঁর কাছে এক বছরের 'ফার্লো' চাইলে গভর্নর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর আর্থিক সঙ্গতি এমন কী যে, তিনি এত বড় ঝুঁকি নিতে চাইছেন? ডঃ বসু বলেছিলেন—সেক্ষেত্রে সরকার কি তাঁকে বৈজ্ঞানিক 'ডেপুটেশনে' পাঠাতে পারেন না? গভর্নর দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্ট কখনই নিছক শিক্ষাগত ডেপুটেশনে রাজি হবে না। সেকথা শুনে জগদীশচন্দ্রকে কাজে-কাজেই কিছু সত্য কথা বলতে হয়েছিল: সিমলার এডুকেশন বোর্ড বড়ই দুঃখপ্রকাশ করে প্রস্তাব নিয়েছে, সরকারের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের পশ্চাদ্ধাবন কেউ করছে না!—জগদীশচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন, সরকারের কাজে ও কথায় এত বৈষম্য কেন? বিজ্ঞানচর্চা না করলে সরকারের মর্মপীড়ন, করতে চাইলে শীতলতা! এতখানি সুবিনীত সত্যে অভ্যস্ত ছিলেন না গভর্নর, আলাপের সাঙ্গ সেখানেই হয়েছিল; ব্যর্থ জগদীশচন্দ্র পরদিন ট্রেনে উঠছেন কলকাতা যাবেন বলে—স্টেশনে তাঁর হাতে ডি পি আই-এর চিঠি পৌঁছে গিয়েছিল,—সরকার ৬ মাসের 'ডেপুটেশন' অনুমোদন করেছেন, গভর্নর মহোদয় ব্যক্তিগত দায়িত্বে তাঁকে ইংলন্ড পাঠাচ্ছেন, কারণ 'তাঁকে সাহায্য করা মানে পৃথিবীর বিজ্ঞানকে এগিয়ে দেওয়া।' অর্থাৎ দেখা গেল সবাই আমলা তবে কেউ কেউ আমলা নয়।

*২ 'আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বাধিক জটিল শাখাসমূহে' এই 'সম্বংশজাত বাঙালী'র সহজ বিচরণে লন্ডন স্পেকটেটার এমনই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল যে, খাত্রী ভারতবর্ষ পর্যন্ত কিছু উচ্চ কথা শুনেছিল—

"The people of the East have just the burning imagination which could exhort a truth out of a mass of apparently disconnected facts; a habit of meditation without allowing the mind to dissipate itself, such as has belonged to the greatest mathematicians and engineers; and a power of persistence—

it is something a little different from patience—such as hardly belongs to any European."

ধ্যানে অভ্যস্ত এশিয়ার সন্ন্যাসী-মন যদি বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তাহলে ভাবী পৃথিবীতে কী অসাধারণ ব্যাপার ঘটবে সে বিষয়ে সহর্ষ উদ্দীপনা প্রকাশ করে এই পত্রিকা লিখেছিল—

Nothing would seem laborious to him (Dr. Bose) in his enquiry, nothing insignificant, nothing painful, any more than it would seem to the true *Sanyasi* in the persuit of his enquiry into the ultimate relation of his own spirit to that of the Divine. Just think what kind of addition to the means of *investigation would be made* by the arrival within that sphere of enquiry of a thousand men with the *Sanyasi* mind, the mind which utterly controls the body and can meditate and enquire endlessly while life remains, never for a moment losing sight of the object, never for a moment letting it be obscured by any terrestrial temptation."

[৪৩] ভারতে ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন, অধ্যাপক ক্লিফটন, অধ্যাপক ফিটজিরাল্ড, ডঃ গ্লাডস্টোন, অধ্যাপক পর্নটিং, স্যার উইলিয়ম রামজে, স্যার গ্যাব্রিয়েল স্টোকস, অধ্যাপক সিলভেনাস টমসন, স্যার উইলিয়ম রুকার প্রভৃতি। প্রেসিডেন্সী কলেজে 'সুমহান সাম্রাজ্যের উপযুক্ত পদার্থবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী' স্থাপনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত স্বদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের এই আবেদনে বিচলিত ভারত-সচিব ভারত সরকারের কাছে আবেদনপত্রটি সমর্থনসহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষেও সহানুভূতির অভাব ছিল না, ব্যাপারটির 'পরম গুরুত্ব' স্বীকৃত হয়েছিল এবং 'উপযুক্ত ভাবী মনোযোগের জন্য' সযত্নে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই সময়কার সহানুভূতিসম্পন্ন ভাইসরয় লর্ড এলগিনের পরে উদ্যমী লর্ড কার্জন এসে বিষয়টি সম্বন্ধে উদ্যোগী হয়ে চারজন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর কাছে মত চেয়ে পত্র দিলেন। দুই পদার্থবিজ্ঞানী বিশেষ সমর্থন করলেন, দুই শারীর-বিজ্ঞানী (যাঁরা জগদীশচন্দ্রের বিরোধীপক্ষের) বিরোধিতা করলেন। স্বদেশীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই লর্ড, ভোট সমভাগ হয়ে যাওয়ায় কাস্টিং-কর্মরূপে জগদীশ-চন্দ্রকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের দিল্লী দরবারে ও-বি-ই উপাধিতে ভূষিত করলেন।

[৪৪] ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দেই যে জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিলেন না, তা বোঝা যায় বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্রিকা 'বোম্বে গেজেটে'র ৪ নভেম্বর, ১৮৯৬-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। যে-সরকার জগদীশচন্দ্রকে উপযুক্ত সাহায্য করছে না, ভারতের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি সেই সরকারের মমত্ব যে কুম্ভীরাশ্রু—তা খুলে লিখেছিল পত্রিকাটি :

"Dr. J. C. Bose, the young Professor of Physical Science, at Calcutta, whose researches have filled Lord Kelvin with "wonder and admiration" has left London on a short visit to that illustrious man of science, and will afterwards proceed to the Continent with the object of inspecting the principal laboratories in foreign countries. All who have come in contact with him speak of Dr. Bose's modesty, and it is well that he possesses such a quality, otherwise his head might be turned by all the praise bestowed upon him by some of the greatest intellects in the United Kingdom. It will not surprise anyone to hear that Prof. Bose has been approached by more than one learned society anxious to include him amongst their

lecturers during the coming lecture season. Unfortunately his stay in Europe is very short and he may not be able to comply with those requests for other reasons connected with his work, he would like to remain a little longer. He is due in Calcutta shortly before Christmas, perhaps the most interesting and busiest part of the whole year for scientific works. He is meditating an application for an additional months leave. So reasonable a desire, ought, if possible to be gratified, but there is, we fear, sufficient Philistinism in Whitehall to refuse any thing asked for in the name of science. And, yet, one of the most common complaints we hear is that the educated youth of India cares for nothing except the overcrowded profession of law and medicine. If the aspirations of Prof. Bose, and those who agree with him were fully realised, the industrial resources of India would be developed in a more systematic and scientific way that they are at present, and important new career offered to the graduates of our Indian Universities. It is to be hoped that he will have an opportunity before he returns to India of explaining how in his opinion the desired object may be attained."

অমৃতবাজার পত্রিকায় এই বৎসরেরই আর একটি মন্তব্যে (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) দেখা যায়, এলাহাবাদের জবরদস্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা পাইয়োনীয়ার, বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুকে পাঞ্জাব সরকার কোনো বিদায়ী ইংরাজ অধ্যাপকের পদে বসাবার প্রস্তাব করলে ঘৃণায় আঁতকে উঠেছিল। পায়োনীয়ারের এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের প্রতিবাদ করে মাদ্রাজ টাইমস যা লেখে অমৃতবাজার মন্তব্যসহ তা উদ্ধৃত করে :

"We certainly appreciate British scientists but with a Bengali scientist like Professor Bose knocking about—a man whom the whole world of science is delighting to honour, and whom British scientists are seeking to tempt to forsake Bengal, it is ridiculous to be making out that none but the European science professor can be the genuine article".[Madras Times.]

Dr. J. C. Bose, Bengali Professor of science at the Presidency College, Calcutta, is verily a giant among science professors, but one would imagine that the *Pioneer* had never heard of his existence. Our contemporary goes on to say that the new Bengali Professor is a disciple direct of Dr. Bose's and if his discipleship under such a teacher has been distinguished, which by the fact of the selection we may suppose to be the case, the Punjab Government may be congratulated on having secured his service."

প্রথম পর্ব : ১৮৯৮ থেকে ১৮৯৯-এর জনু

বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের সাফল্য ও ভারতে উন্মাদনা

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব, সাফল্য, এবং তার ফলেই যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়—সমসাময়িক সাক্ষ্যের দ্বারা তা প্রমাণিত হতে পারে। তিরিশ বছর বয়সেই বিবেকানন্দ বিশ্ব-চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকায় দেড় বৎসর ধর্মপ্রচারের পরে তিনি ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য ইংলণ্ডে আসেন, তারপর আমেরিকায় ফিরে যান, পরের বৎসর আবার ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ডেও তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন, সেখানকার সংবাদপত্রে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে লণ্ডন টাইমসের মত রক্ষণশীল কাগজও তাঁকে 'দুই গোলার্ধের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক' বলে উল্লেখ করে।

ঠিক এই সময়েই জগদীশচন্দ্রের নামও সংবাদপত্রে ও বিশেষজ্ঞমহলে বড়ো আকারে উল্লিখিত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে সন্ধান করার কালে আমরা জগদীশচন্দ্রের প্রচুর উল্লেখ লক্ষ্য করেছি। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দেই যে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-সাফল্য সংবাদপত্রের আলোচ্য বস্তু হয়েছিল, তা দেখতে পাই 'থিয়জফিস্ট' পত্রিকার নিম্নের মন্তব্যে—

"For the honour of India, let us all hope the rumour is true that Professor J. C. Bose, of the Bengal Presidency College, has made an original discovery which, if demonstrated to be all that is claimed for it, will place him in the front rank among modern scientists. It is said that Prof. Bose has been experimenting on the theory that the etheric waves may be used for telegraphing and all conducting wires dispensed with. It is alleged that he has achieved the result of sending signals of sound and light between two points with the help of ether only."

(১৬ মার্চ, ১৮৯৫-এর বেঙ্গলীতে উদ্ধৃত)

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে আছেন, তখন জগদীশচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। লর্ড কেলভিন প্রমুখ ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসা ভারতবর্ষে তখন আত্মশ্লাঘার কারণ ঘটাচ্ছে। তিলকের 'মারহাট্টা'র মত রাজনৈতিক পত্রিকা মন্তব্য করেছে—ইংরেজরা যেখানে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ঘা না খায়, সেখানে তারা গুণের সমাদরে অকুণ্ঠ।*

---

* মারহাট্টার ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৭-এর মূল্যবান মন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি—

PROF. BOSE'S TRIUMPHAL PROGRESS THROUGH EUROPE:

Every one will be sincerely glad to hear that Prof. Bose is winning golden opinions and receptions and honours wherever he is going in Europe. From the United Kingdom, Prof. Bose proceeded to Germany and from Germany he went by invitation to France. In the course of his triumphal progress he is delivering lectures to appreciative and learned audiences, and is being

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দকে ইংলণ্ডে ভারতের গৌরবের উপনিবেশ স্থাপনের বৎসর বলা যায়। এই বছর কুমার রণজিৎ সিংজী (রণজি) তাঁর ক্রিকেট দিয়ে প্রমাণ করেন, বিদেশীর পক্ষে ইংরেজকে তাদের জাতীয় খেলায় অতিক্রম করা সম্ভব। এই বৎসরই অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হন। জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে প্রমাণ করেন এবং ভারতের সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে উদ্ঘাটিত করেন লণ্ডনের ড্রইংরুমে ও নানা সভাকক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতবর্ষীয়দের বিলেতী সংবর্ধনায় পরাধীন দেশের অপমানিত বিবেক স্বভাবতঃই কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল। দেশের পত্র-পত্রিকা এই সংক্রান্ত নানা মন্তব্যে পূর্ণ ছিল।* এক্ষেত্রে সমসাময়িক উন্মাদনার কারণ বোঝা যাবে লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের ৯ অক্টোবরের রচনা থেকে। সেটি 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটার' পত্রিকায় ১ নভেম্বর, ১৮৯৬-তে উদ্ধৃত হয়। এই রচনায় রনজিৎ সিংজী ও অতুল চ্যাটার্জী সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল তার কিছু অংশ—

"The head of the English cricket for the year, and the head of the India Civil Service Competition for the year are both Hindus. Mr. Chatterji's achievement is not less remarkable in the arena of intellectual athletics than is Prince Ranjitsinghji's in the world sport. Probably no career open to Englishmen exerts a more powerful attraction on the clever youth of our public schools and Universities than the India Civil Service and the competition for its appointments has been elaborated into the most searching test that the wit of the examiners can devise.

---

highly eulogised by the leading scientists of every country. Our readers are aware that he was even requested to reside in Scotland, and the request was made the most acceptable by a simultaneous offer of a well-equipped laboratory. The sincerity and warmth of the feelings of the English scientific world towards Prof. Bose shows that the fact of his being a foreigner, and what is more, one of the race of the ruled, does not come in the way of their appreciation and sympathy. The man of science in this respect offers a notable contrast to the man of politics at home. . . The man of politics takes stand on the narrow basis of the good of the country. . . The English politicians cannot but feel that the native of India with his aspirations for political eminence is a rival of himself. . . . These considerations of jealousy never or very rarely enter into the heart of men devoted to science. . . The honour which Dr. Bose or Dr. Bhandarkar before him got in the European countries can be explained. A native politician, of equal merit, cannot hope to command such treatment at the hands of the English people at home."

ইংরাজ রাজনীতিকদের চরিত্র সম্বন্ধে মারহাট্টা যা লিখেছে, তা প্রায় সর্বাংশে সত্য, কিন্তু ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের উদারতা সম্বন্ধে পত্রিকাটির সাধুবাদ সর্বথা সত্য নয়। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকরাও কি পরিমাণে ঈর্ষাকাতর ও স্বার্থপর, তা আমরা ক্রমে দেখব।

* এইসব মন্তব্যের কিছু কিছু *Vivekananda in Indian Newspapers* গ্রন্থে আমরা চয়ন করে দিয়েছি।

The distinguished academic careers of many of the 61 gentlemen who follow Mr. Chaterji in the list show the class of rivals among whom he has won the first place. . .

The service which Prince Ranjitsinghji has performed for India is not that he has proved one of his race to be capable of the highest achievement in our national sport but that the fact known to the whole British people. The few Englishmen who know the Indians well, readily admit that the Rajputs are brave at athletics, and the Brahmins clever at learning. But to the mass of your countrymen who pay get-money, Prince Ranjitsinghji's performances amount to a new discovery of India. It brings home to them the fact that among our fellow-subjects in Asia, these fellow-subjects whose very hundreds of millions turn them into numerical abstractions, there are men who can take the lead in the national sport which all Englishmen love and more or less understand. Prince Ranjitsinghji's victory has enabled *the average Englishmen to realise India, and has made* him respect Indians to a degree that no other triumph could have secured. But it merely is the crest of the wave of a movement which has long been going on in India, and which is there producing striking results. That movement is from the old pursuits of the East to the new pursuit of the West."

স্যার উইলিয়াম হান্টার ভারতে নবযুগোদয় দেখছিলেন, যেহেতু প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য পন্থায় পারদর্শী হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে এইকালে বাঙালী যুবক লেফটন্যান্ট সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিলের গৃহযুদ্ধের সময়ে যে বিরাট সাহস ও সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাও তাঁর উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ অর্জন করেছিল। অতঃপর জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম বলেন—

"Among the most interesting features at the British Association this year was the paper on Electrical Waves by Professor J. C. Bose. This gentleman, an M.A. of Cambridge, Doctor of Science of London, and a graduate of the Calcutta University, had already won the attention of the scientific world by his strikingly original researches on the polarisation of the electric ray. His later papers on the Indices of Electric Refraction and the Wave-length of Electric Radiation were published with high tributes, by the Royal Society. Lord Kelvin declared himself 'literally filled with wonder and admiration for so much success in these difficult and novel experimental problems.' The originality of the achievement is enhanced by the fact that Dr. Bose had to do the work in addition to his incessant duties as Professor of Physical Science in Calcutta and with apparatus and appliances which in this country would be deemed altogether inadequate. *He had to construct for himself his instruments* as he went along. The paper which was read before the British Association the other day "On a Complete Apparatus for the Study of the Properties of Electric Waves" forms the outcome of this twofold line of labour—construction and research. Pro-

fessor Bose is not only an example of the change from the old philosophical and a prioré pursuits of learned Indians to the experimental science of the West, but he has also persuaded the Government to recognise that change. He has been deputed to visit the chief laboratories in Europe, with a view to forming a well-equipped laboratory in Calcutta for physical and electrical work. The position which Professor Bose has attained among British men of science, while himself still in the first energies of manhood is as significant as the successes of Prince Ranjitsinghji and Mr. Chatterji in their widely diverse fields of effort."

স্বামীজী ও ডঃ বসু একই কালে ইংলণ্ডে ছিলেন। প্রশ্ন উঠবে উভয়ে উভয়ের সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না? সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ পাইনি কিন্তু পারস্পরিক সচেতনতা ছিল তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ আছে। স্বামীজী সম্বন্ধে বিপুল আগ্রহের কথা জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার কাছে বলেছেন (কিছু পরেই তা দেখব), কিন্তু বিবেকানন্দ? আমাদের ধারণা, স্বামীজীও অপরপক্ষে ডঃ বসু সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন ছিলেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, বিবেকানন্দ ধর্মাচার্য হলেও স্বজাতির ঐহিক উন্নতির জন্য অতীব উদ্‌গ্রীব। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁর রচনায় ভারতবর্ষীয়ের অতীন্দ্রিয় অভীপ্সাকে জাগতিক কৌতূহলের যেরকম বিরোধী ব্যাপার করে দাঁড় করিয়েছেন, তা করতে পেরেছেন বিবেকানন্দ-জাতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অভাব থেকেই। খেলাধুলো, ইতিহাস ও শিল্পচর্চা এবং বিজ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যগ্র মনোযোগের বিষয়ে তথ্যযোজনার স্থান এ নয়,—সে বিষয়ে প্রচুর তথ্য আছে—এখানে শুধু জানানো যায়, বিবেকানন্দের আদর্শ-ভারতবর্ষে বীরকর্ম এবং বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বিবেকানন্দের চোখের সামনে যে-ভারতবর্ষ ছিল, তা উকিল-ব্যারিস্টারে ভর্তি দেশ নয়, তা অধ্যাত্মসেবক ও জনসেবক, কর্মী ও বৈজ্ঞানিকের দেশ। স্বামীজী জানতেন, ভারতের পতনের মূলে ঐহিক জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা। ইহ-জ্ঞানে ঘাটতি থাকলে জাতীয় জীবনে সমতা আসবে না কখনো। তাছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, অধ্যাত্মজ্ঞানের মতই সত্যসন্ধানী, সুতরাং তিনি যখন জগদীশচন্দ্র নামক ভারতীয়ের মধ্যে বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় দেখলেন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাঁর গর্বের সীমা ছিল না, যদিও এবিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

কিন্তু অনুমান করবার উপযোগী কিছু উপাদান আছে বলেই বিশ্বাস করি। সংবাদপত্রে স্বামীজীর বিষয়ে তথ্যসন্ধানের কালে অতীব আকর্ষণীয় একটি সংবাদ আমাদের চোখে পড়ে। কেমব্রিজের 'ইণ্ডিয়ান মজলিস' রণজিৎ সিং ও অতুল চ্যাটার্জিকে সংবর্ধিত করার জন্য একটি সভার আয়োজন করে। এই সভার বিবরণ প্রকাশের পরে (সমগ্র বিবরণটির জন্য *Vivekananda in Indian Newspapers* দ্রষ্টব্য) অমৃতবাজার পত্রিকা ৮ জানুয়ারী, ১৮৯৭-তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলে—বড়ই দুঃখের বিষয়, ডঃ বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ঐ সভায় সংবর্ধিত করা হয়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য ঐ সভায় স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতা করেছিলেন।

কেমব্রিজের ইণ্ডিয়ান মজলিসের ঐ সভায় বক্তার পর বক্তা উঠে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মঙ্গলগানে সভাকক্ষ ঝংকৃত করেছিলেন। বক্তাদের কণ্ঠ এক সুরে বাঁধা ছিল—

"It would be a proud day when India would be completely made one with England, one whole, one heart, one soul and one throne."

উচ্চ হর্ষধ্বনিতে ঐসব ভাষণ সংবর্ধিত হয়েছিল। সভায় উপস্থিত ইংরাজেরা তৃপ্তির সঙ্গে ভারতীয়দের রাজানুগত্যের খাদ্য-পানীয় আস্বাদন করেছিলেন। ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ চলেছে; তা সত্ত্বেও যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের মানুষ শাসকদের প্রতি এই জাতীয় ভালবাসায় অভিভূত হতে পারে, তার থেকে তৃপ্তিকর কি থাকতে পারে?

বক্তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে একটি শব্দও তিনি উচ্চারণ করেননি। 'সাম্রাজ্যের স্বার্থই সর্বাগ্রে'—রণজির এই উক্তি সাম্রাজ্যবাদের শত্রু এই মানুষটির মনে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। অতুল চ্যাটার্জির ছিল ইতিহাসে পারদর্শিতা; স্বামীজী তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ভারতের যথার্থ ইতিহাস আপনি রচনা করুন—সে ইতিহাস অসুস্থ দাসত্ববোধের মধ্যে আত্মমর্যাদা আনবে। স্বামীজী গম্ভীরকণ্ঠে অধঃপতিত ভারতের উচ্চাঙ্গের রাজভক্তদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ভারতের এই পতনই শেষ কথা নয়, ভারত আবার উঠবে।

কিন্তু কাদের দ্বারা? নিশ্চয় তাঁদের দ্বারা, যাঁদের একজনের নাম জগদীশচন্দ্র বসু; সেই সভায় অনিমন্ত্রিত বা অনুপস্থিত সেই বৈজ্ঞানিকের কথা স্বামীজীর মনে না উঠে পারে না, যাঁকে ভবিষ্যতে মুক্ত অভিনন্দন জানাবার সুযোগ তিনি পাবেন।

নিবেদিতা—জগদীশচন্দ্র—বিবেকানন্দ—ওলি বুল

রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে নিবেদিতার উক্তি অনুযায়ী তিনি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ডঃ বসুর সঙ্গে পরিচিত হন।* পৃথিবীবিখ্যাত এক প্রতিভাকে কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে, তা দেখে তিনি শিহরিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় প্রতিভা—সত্যকার প্রতিভা—এতখানি দুর্দশায়! স্বভাবতঃই ভগিনী নিবেদিতার সহানুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, এবং আমরা সকলেই জানি, নিবেদিতা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি কিভাবে সম্ভব, বুঝতেন না। অতঃপর জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবনে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, অন্য কোনো মানুষের সে ভূমিকা ছিল না। বর্তমান অংশে আমরা

* আত্মপ্রাণা বলেছেন, নিবেদিতা ভারতে আসার অব্যবহিত পরেই তাঁর সঙ্গে জগদীশ-চন্দ্রের পরিচয় হয়। কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য নয়, অন্ততঃ নিবেদিতার উল্লিখিত পত্র অনুযায়ী।

জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ের প্রথম পর্ব, ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে বসু-প্রসঙ্গ চয়ন করব। এই ৬ মাসকে একটি পর্ব করার কারণ এর পরেই নিবেদিতা য়ুরোপ যাত্রা করেছিলেন, বসুও য়ুরোপে গিয়েছিলেন, এবং প্যারিস কংগ্রেসে স্বামীজী, জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আদানপ্রদানের ফলে নূতনতর ভাব ও কর্মসম্পর্কের সূচনা হয়।

নিবেদিতার ভাবজীবনে আলোচ্য সময়ের গুরুত্ব আমরা বহুভাবে দেখে এসেছি। কর্মজীবনের পক্ষেও তা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কলকাতার শিক্ষিত সমাজে তাঁর এই কালের কার্যাবলীর দ্বারা অপূর্ব এক ইমেজ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বাগবাজার পল্লীতে তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, এবং লেডী অবলা বসুর সাক্ষ্য অনুযায়ী বুঝতে পারছি, তাঁর কাজের সাফল্য সম্বন্ধে সমস্ত সংশয়ের নিরাকরণ কিভাবে করেছিলেন। রক্ষণশীল বাগবাজারও ম্লেচ্ছ নিবেদিতাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। এই সময়েই তাঁর প্লেগ-সেবা (যার ইতিহাস আমরা পরবর্তী খণ্ডে উন্মোচন করব), যা স্তম্ভিত করেছিল জনগণকে; এবং বিভ্রান্ত হয়েছিল আধুনিক কলকাতা যখন তিনি কালীবক্তৃতা করেছিলেন। কালীবক্তৃতার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। নিবেদিতার এই সর্বপ্রকার রূপকেই জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেসব বিষয়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া নিবেদিতা জেনেছেন। নিবেদিতার পত্র থেকে একদিকে যেমন আমরা স্বামীজী সম্বন্ধে ডঃ বসুর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি, অপরদিকে তেমনি আশাভঙ্গও, কারণ ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র তাঁর ধর্ম-সংস্কার অনুযায়ী কালীপূজা বা গুরুপূজাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। নিবেদিতার পত্রে সেইসব মানসিক সংঘাতের দলিল-চিত্র আমরা পাই। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্র, এই দুই শ্রেষ্ঠ মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করার নিবেদিতার আগ্রহ (নিবেদিতার ধারণা, সন্ন্যাস ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল), এবং দুই তীব্র প্রবাহের সংঘর্ষের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার গৌরবময় বেদনার অসাধারণ পরিচয় আমরা পত্রগুলি থেকে পেয়ে যাই।

এই সময়টি জগদীশচন্দ্রের জীবনে বড়ই সংকটকাল। সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর মুখের চেহারাটা তিনি এইকালেই ভালভাবে দেখতে পান। ইংরেজ সম্বন্ধে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়ের অভ্যস্ত শ্রদ্ধাবোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁকে জীবনে সংগ্রাম করে উঠতে হয়েছে, এবং কোনো কোনো ইংরেজের শত্রুতাও পূর্বে পেয়েছেন, কিন্তু সেটাকে জাতিগত আচরণ বলে মনে করার কারণ ঘটেনি—সাহায্য ও সহানুভূতি তো কম পাননি! প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরির যথাপ্রাপ্য সময়ে না পেলেও পরে পেয়েছেন, এবং ডিরক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন যেখানে বাধা দেন, সেখানে স্বয়ং ভাইসরয় বা লেফটন্যান্ট গভর্নর তো সাহায্য করেন! তাঁর বৈজ্ঞানিক পেপারগুলি ইংলণ্ডে বিপুল প্রশংসা পেয়েছে, এবং বৈজ্ঞানিক-সফরে যে সংবর্ধনা পেয়েছেন, তা যে-কোনো প্রত্যাশার অতীত। যখন ফিরে এসেছেন, সারা দেশ তাঁর জয়ধ্বনি দিয়েছে।

তারপরেই শুরু হয়েছে অন্তঃস্রোতের কুটিল বিপরীত গতি। ইংরেজ আমলাদের এবং কিছু ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের ঘৃণা ঈর্ষা ও পদে পদে বাধা দেওয়ার সে এক নারকীয় কাহিনী। 'পরাধীন দেশে জন্মানো যে কত বড় অভিশাপ', তা তিনি বুঝেছিলেন, এবং পরাধীন মনুষ্য হয়েও মাথা তুলে দাঁড়ানোর মত আত্মঘাতী

ঔদ্ধত্য যে নেই, তাও অনুভব করেছিলেন মর্মে মর্মে। নিবেদিতার চিঠিতে রয়েছে সেই আহত উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিভার বেদনাকরুণ চিত্র।

আর নিবেদিতা? 'মুহূর্তে জননী হলে হৃতভাগ্য দুর্গত জনের'।* জগদীশচন্দ্রের বেদনাভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন, সর্বপ্রকারে সেবার ব্রতও। নিবেদিতার ঐতিহাসিক ভূমিকার যবনিকা-পশ্চাতের রূপ দেখতে পাই যেখানে তিনি মিসেস ওলি বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছেন। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, মিসেস ওলি বুলে প্রতিভার ধাত্রী-জননী। ধনী ও সমজদার এই মহিলার উদার হস্ত সর্বদাই মহৎ ব্যক্তিত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে প্রসারিত। তাঁর সাহায্য পেলে জগদীশচন্দ্র সবিশেষ উপকৃত হবেন; তাঁর অর্থে গবেষণার সুবিধা হবে, তাঁর প্রতিপত্তিতে বিরোধী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজসাধ্য হবে। এই উদ্দেশ্যে নিবেদিতা একটি কাজ করেছিলেন, যাকে সুমহান কৌশল বলা যায় : জগদীশচন্দ্রকে তিনি মিসেস বুলের পুত্র করে তুলতে চেয়েছিলেন। মিসেস বুলের জীবনের নিঃসঙ্গতার কারুণ্য নিবেদিতার মনে গভীরভাবে বেজেছিল ; তাঁর বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে কন্যা ওলিয়া শান্তি আনতে পারেনি। বিবেকানন্দ তাঁকে 'মা' বলেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এত বৃহৎ যে, সত্যই সর্বসময়ে তাঁকে সন্তান ভাবা যায় না। তিনি 'চাইল্ড' বটে, তবে 'হোলি চাইল্ড'। অপরপক্ষে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানতন্ময় সমাহিত রূপের প্রতি জাগতিক স্নেহ বোধ করা যায় ; নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে, জগদীশচন্দ্র যদি সন্তান-রূপে একবার গৃহীত হন, তাহলে মাতার সব কিছুতে সন্তানের অধিকার থাকবে। পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র সত্যই মিসেস বুলের দ্বারা সন্তানরূপে গৃহীত হয়েছিলেন, এবং মিসেস বুলের দাক্ষিণ্য অজস্রধারে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল (সে ইতিহাস হায় সামান্যই লেখা হয়েছে), কিন্তু এই সমস্ত কিছুই অলক্ষ্যে থেকে ঘটিয়েছেন যিনি, তিনি কী অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। নিবেদিতা মিসেস বুলকে বলেছিলেন, ভারতে তোমার একটি পুত্র আছে, যার স্নেহ চাই, সাহায্য চাই, তাকে পুত্র বলে তুমি গ্রহণ করো, আর জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, মিসেস বুলের মাতৃ-হৃদয় সন্তান চায়, তুমি তাঁকে মা বলে ডাকো।†

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৮৯৯ পর্যন্ত

৩ জানুয়ারী, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে—"আমার মঠযাত্রার কথা তোমাকে জানাতে চাই, স্বামীজীর ঘরের মিষ্টি ছোট্ট চায়ের টেবিলের কথা, পড়ানোর পরে যাতে বসে চা খেয়েছিলাম। আমার পড়ানো হিসাব—

বুধবার তিনটেয় উদ্ভিদবিদ্যা ; চারটেয় অঙ্ক ; পাঁচটায়
চা এবং 'হোম' ;
শুক্রবার তিনটেয় শারীরবিজ্ঞান ; চারটেয় সেলাই ;
পাঁচটায় চা এবং 'হোম'।

---

* নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট কবিতার ছত্র।

† এখানে উল্লেখযোগ্য, মিসেস বুলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মৌখিক পরিচয় ১৮৯৮-এর শেষভাগেই ঘটেছে।

'হোম' বলতে আজ স্বামীজীর সান্নিধ্য; শুক্রবার—সেই প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গ, যাঁদের আমি নিতান্ত ভালবাসি।"

২১ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে: "ডার্লিং য়ুম, তুমি বলো যে, হিন্দু জাতির প্রতিনিধিরূপে দু' একজন হিন্দুকে ভালবাসব, তাই যথেষ্ট। কিন্তু কী অপূর্ব সব মানুষই না তারা সৃষ্টি করেছে! এখানি তিনজন মনুষ্য-দেবতার একটি দলকে পেয়ে গেছি—স্বরূপানন্দ, মিঃ সাদ্‌লা এবং ডঃ বসু।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে, তা ঠিকই করতে পারিনি। প্রত্যেককেই আমি সময়ান্তরে বন্দনা করি। তবে মিসেস বসু অধিকন্তু তাঁর স্বামীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে রয়েছেন, যেমন মিসেস অ্যাপেনন করেছেন। আবার ডঃ বসুর আত্মা অতি সুন্দর-সুকুমার, যে-বিশেষ গুণটির খানিক দেখেছি মিঃ অ্যাপেননের মধ্যে, খানিক মিঃ অলিভের মধ্যে, যার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে মনে হয় না। এক সন্ধ্যায় আমি বোকার মত বকবক করে শিকারীদলে যোগদান করব বলেছিলাম, যদিও জানতাম—ও জিনিস আমি করতে পারি এই চিন্তা তাঁকে ভয়ানক আঘাত করবে। অর্ধসচেতনভাবে আমি নিজের অবস্থা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছিলাম, আর তার যা তিনি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন—মুখ রাগে শাদা, প্রচণ্ড আবেগে শিহরিত—"এত নিষ্ঠুর কেন তুমি;"—চেঁচিয়ে উঠলেন—"অত সব সুন্দর সুন্দর জিনিস পড়ার কী ফল, যদি না অন্তর দিয়ে তা পড়ো?" এই বলে বারান্দায় চলে গেলেন ধূমপান করতে। এতে আমার চোখের উপরকার আবরণ যেন সরে গেল, দেখলাম কথাটা সত্য। আমি যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছি তাতে আমি আনন্দিত, কারণ তার ফলে মানুষটির পূর্ণ মহত্ত্বের এই ঝলক দেখা গেল! সে অনুভূতি পরে ত্যাগ করেনি আমায়। শব্দ কত দীন! মুহূর্তটির কোনো আভাস তোমায় দিতে পেরেছি বিশ্বাস হয় না; কিন্তু তুমি বুঝে নেবে। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল—এটা য়ুমের জন্য।*

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই তোমাকে গ্রাহাম ট্রাভেসের 'ফেলো ট্রাভলার্স' (ব্ল্যাকউড, এডিনবরা প্রকাশিত) জোগাড় করে নিতে বলতে হচ্ছে। এটি একটি ছোট গল্পের সংকলন; এটিকে যাতে নিজের কাছে রাখি তার জন্য ডঃ বসু জেদ করেছেন, কারণ বইটি তাঁকে খুবই 'সাহায্য করেছে।' তুমিও নিশ্চয় বইটিকে ভালবাসবে।"

---

* শিকারের নিষ্ঠুরতার প্রতি ডঃ বসুর এই বিতৃষ্ণা কতদিনের? আমরা আগেই দেখেছি, আসামে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি শিকার করতে গিয়ে কালাজ্বর বাধিয়েছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহসের নানা কাজে তাঁর উৎসাহের কিছু বিবরণ প্যাট্রিক গেডিস দিয়েছেন। তাঁর শিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"His attendant, now an old Rajput Sepoy, taught the boy shooting; whence hunting expeditions as often as might be. A college vacation at nineteen culminated in a month in the Terai, with first experience of big game, and vivid impressions of jungle and forest. Then six months later came a fascinating invitation to a hunting holiday in Assam, from a friendly zemindar—a crack shot and distinguished hunter; and not only with wild buffalo in his forest, but rhinoceros."

১২ মার্চ, ম্যাকলাউডকে : "ডঃ বসু এমনিতেই হঠাৎ সেণ্ট সারার কথা বলেন।"

১৫ মার্চ, ওলি বুলকে : "আমি তোমাকে ডঃ জে সি বসুর কথা, এবং তোমাকে তাঁর পত্র লেখার ইচ্ছার কথা জানাতে চাই। খুবই আশা করি, তুমি শীগগিরই তাঁকে ছোট্ট একটি চিঠি লিখে ফেলছ, সেইসঙ্গে মিস উইলকিনসের দুটি ছোট্ট বই পাঠাচ্ছি, যার কথা যুমকে আমি বলেছি, মনে হয় ডঃ বসু ও-ব্যাপারে লিখতে খুবই সংকোচ বোধ করবেন। তিনি তোমার সম্বন্ধে সর্বদাই বলে থাকেন—'তুমি এমন একজন, যাঁর কাছে গভীর লোকের সময়ে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়।' সুতরাং আমি তাঁকে তোমার নরওয়ে-ভবনের অনেক কথা বললুম, তার আচ্ছাদিত আলোক এবং তার সঙ্গে জড়িত সুন্দর কিছু স্মৃতির কথা। জানি, ওগুলি তাঁর মনের উপরে শান্ত-সান্ত্বনার মত নামবে, কারণ উনি এখন দারুণ অবসাদে আচ্ছন্ন। ওসব কথা বলেই আমি চলে গেলাম, কারণ ঐ সূত্রে যেসব ভাবনা জাগবে, তার সমাচ্ছন্ন অনুভূতিকে তুলনায় অল্প পবিত্র যে-কোনো জিনিসই ভেঙে দেবে।......

ডঃ বসুর প্রতি আমার ভালবাসা মিঃ অ্যাপারসনের প্রতি ভালবাসার তুল্য। অল্প সময়ই তাঁকে জানতে পেরেছি। আমার কালী-বক্তৃতার পর থেকে স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর তুল্য ব্যক্তির মনোভাব আমাকে বিশেষ দুঃখ দিয়েছে। এখন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি যা বলো, তার যথার্থ মূল্য উদ্‌ঘাটিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এইসব জিনিসকে আমরা যে চোখে দেখি, তার থেকে ভিন্ন কোনো ধারায় তাঁর (বসুর) পক্ষে দেখা বস্তুতঃ কতখানি অসম্ভব, সেকথা যখন বললাম, তখন তাঁর বিভ্রান্ত ভাব দেখেই তা বুঝেছি। অন্য ক্ষেত্রে তিনি বিরাট পণ্ডিত, চিন্তাবিৎ, কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীর সঙ্গে তুলনায় তাঁর অবস্থা বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে তুলনায় অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অবস্থার তুল্য।

এসব ক্ষেত্রে কিভাবে কথা বলব বলো? খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে বেশী করে বলব, তার সর্বজনীন দিকটিকে প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করব কি? কারণ মনে হয় তুলনামূলক ধর্মের ব্যাপারটি সরাসরি উপস্থিত করা কার্যতঃ অর্থহীন।"

১৬ মার্চ, ম্যাকলাউডকে : "বসুদের কাছে আগামী সন্ধ্যায় না গিয়ে আজ সন্ধ্যায় যাব মনে করছি।......

একটি জিনিস চাই, মিস উইলকিনসের দুটি ক্ষুদ্র পুস্তক, বসুদের জন্য। তুমি বা লেডী সারা কি ভালবাসাসহ ওগুলি ৮৫ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতায় পাঠিয়ে দেবে? সেইসঙ্গে লেডী সারা যদি কিছু লেখেন, তাহলে বরফ গলবে।"

২৬ মার্চ, ওলি বুলকে : "আমি চাই, তুমি একথা জানো, আমি বসুদের কি রকম ভালোবাসি। আমি অবশ্যই আশা করব যে, তুমি ডঃ বসুকে অন্তরে গ্রহণ করবে পুত্র বলে, কারণ তিনি সদাই তোমার কথা বলেন।" (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

এই শিকারযাত্রার ফলেই কালাজ্বর ধরে, যা তাঁকে রীতিমত কষ্ট দেয়। এরই প্রতিক্রিয়ায় তাঁর শিকারে অপ্রীতি এসেছিল, কিংবা পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিশ্বাত্মবোধের ফলে তা হয়েছিল, কিংবা পুরুষের পক্ষে যাই হোক নারীর পক্ষে, বিশেষতঃ নিবেদিতার মত নারীর পক্ষে, শিকার অনুচিত—কিজন্য তিনি নিবেদিতার কথায় আঘাত পেয়েছিলেন বলা শক্ত।

৫ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : "এ সপ্তাহের বড় ঘটনা, ডাঃ বসুর সঙ্গে শুক্রবার রাত্রে আমার কথাবার্তা। মানুষটিকে আমি ভালবাসি। বেশ কিছু তিক্ততার সঙ্গে তিনি বললেন, আমাকে মিস নোবলের বদলে সিস্টার নিবেদিতা বলতে তাঁকে যথেষ্ট আত্মশাসন করতে হয়েছে। অতঃপর আমাকে মানবিক কিছু ভাবতে তিনি অসমর্থ। বর্তমানে আমার ভয়ঙ্কর সংকীর্ণতা তাঁকে অসহ্য আঘাত করে। (খুব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে ঘোরাফেরা করছে—যাঁকে আমি ভালবাসি ও বিশ্বাস করি এমন কেউ পূর্বে কি আমাকে 'সংকীর্ণ' মনে করেছে—তুমি বা সারা?)। আমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় বলবার জন্য তাঁকে মিষ্ট কথায় উস্কে দিলাম। তখন বেরিয়ে পড়ল। স্বামীজীর গুরুদেবের উপর দেবত্বারোপ।—"সংকীর্ণ ছাঁচে গড়া একটি মানুষ, যিনি নারীকে প্রায় শয়তানী মনে করতেন, যে-কারণে নারী দেখলে মূর্চ্ছা যেতেন!!!" শুনেছ এমন কথা! আতঙ্কে ও হেসে ওঠার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আমি বললাম, ও-বর্ণনা মেনে নিতে পারি না। স্বীকার করলাম, আমিও পূজো করি অন্ধভাবেই, তবে আমাদের কেউই তাঁর পূজো অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে চান না—স্বামীজী তো ননই। ও-পূজোটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।—"ভারতের বর্তমান প্রয়োজন এমন ধর্ম, যা সকলকে আলিঙ্গন করবে, সকল সম্প্রদায়কে একত্র করবে, অবতারবাদ তা পূরণে অসমর্থ" ইত্যাদি। (বিচিত্র! আমার কাছে উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ও-জিনিসটিই একমাত্র উপায়, সম্প্রদায়ের শেষ জানাবার জন্য একজন অবতারেরই প্রয়োজন)। অবতারতত্ত্বে যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি স্বরূপানন্দের মত তাঁকে অবতার বলবেন না।—"এর দ্বারা নূতন ধর্মের উদয় প্রমাণিত হয় না।" আমি বললাম, কেউ তা চাইছে না। সংঘের সামনে এই যে অল্প কিছু শিক্ষামূলক কাজ রয়েছে, তার বেশী কেউ পরিকল্পনা করছে না বা করতে ব্যস্ত নয়। পূজোর প্রশ্ন বা ধর্মের ব্যাপারটা ভবিষ্যৎই ইচ্ছামত ঠিক করবে (আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম, তাঁরা ইতিমধ্যে যা করেছেন তাই যথেষ্ট)। তারপর তিনি জানালেন, কী বিরাট শিহরণের সঙ্গে তিনি স্বামীজীর উক্তি শুনেছিলেন—"আমার জীবনোদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা", এবং একই শিহরণের সঙ্গে ইংলণ্ডে থাকতে স্বামীজীর কলকাতা-ভাষণগুলি পড়েছিলেন, দেখেছিলেন, মানবের যথার্থ কল্যাণ ও সত্যের জন্য কী গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে নিজের জনপ্রিয়তা ছিঁড়ে টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর যখন তিনি দেখলেন, নিজ গুরুপূজোর এবং অন্যান্য ব্যাপারে (যথা আমার কালীপূজো) উনি অগ্রসর তখন যাতনার সঙ্গে পিছিয়ে গেলেন। যে-মানুষ ছিলেন বীর, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন নতুন সম্প্রদায়ের ব্যাপারী!......

আমি তর্ক করতে পারতাম, কিন্তু ভাবলাম, তার সময় এখনো আসেনি। পরিবর্তে আমি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ পত্র লিখলাম, তাতে জোর দিয়ে বললাম, তাঁরা যদি আমাদের ক্ষেত্রে না পারেন, তাহলেও আমি যেন তাঁদের দেশপ্রেমের সমাদর করি। উভয় দলেরই প্রয়োজন আছে, তা স্বতঃস্পষ্ট, ইত্যাদি। একটি মিষ্ট উত্তর এল। এক্ষেত্রে এই পর্যন্ত।......

......প্রিয় বন্ধু মিঃ ঘোষ (গিরিশ ঘোষ) বলেন, ডাঃ বসু শীঘ্রই আমাদের একজন হয়ে যাবেন, কারণ তিনি উদাসীন নন।"

৮ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : "এখন তোমাকে অনেক কিছু বলতে ও তোমার দৈবী সাহায্য পেতে চাইছি। গতকাল বসুদের সঙ্গে কাটিয়েছি, সমস্ত দিনটিই ; এ যেন তোমার কাছে বাসীতে, যেন প্রায় বেলুড়ে যাওয়ার মত ব্যাপার। কারণ, যে বসুকে আমি ভালবাসি, পেতে চাই—তিনি আমারই। কী বিরাট! কী সরল! আর কী যন্ত্রণাসহন! যন্ত্রণাসহনের ক্ষেত্রে আমার নিজের অধৈর্যকে আমি কিভাবে না ঘৃণা করেছি যখন দেখলাম—যথার্থ বিরাট মানুষের মুখের কাছে তিক্ততায় ভরা জীবন-পাত্র। শুধু সুখী হওয়া কী সামান্য!—যদিও নিম-এর কথায় অপূর্ব সত্যতা রয়েছে—'উজ্জ্বল হওয়া অতীব ঐশ্বরিক ব্যাপার।' গতকাল বারান্দায় যে-কাহিনী তিনি বলেছেন, উৎকর্ণ বাতাসের কাছেও তার পুনরুচ্চারণ করলে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে। ইউরোপ থেকে গৌরবোচ্ছ্বাস নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় সহকর্মীদের আচরণে জাতি-পার্থক্যের বোধ যে-বৈষম্য ঘটিয়েছিল তার বিষয়ে অল্প উল্লেখ করে তিনি শেষ করেছিলেন, সে জিনিসটা তাঁর কাজের সমস্ত প্রাণ যেন শুষে নিয়েছে, 'কারণ, তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না ভালবাসা পাওয়া আমার পক্ষে কতখানি প্রয়োজন'। এসব কথা যদি তোমাকে জানাই, তোমার দিব্যভাবে তুমি ব্যাপারটাকে বুঝবে, যদিও কখনই তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করবে না। এই দুটি মানুষের কাছে কিভাবে লিখতে হয় তুমি জানো—মিস উইলকিনসের বই দুটি (তার একটা মোটামুটি রোমান্স এবং দূরাগত সঙ্গীতের মাধুর্যসিক্ত) বা অন্য ছোটখাট জিনিস পাঠিয়ে, তাদের বন্ধুত্ব প্রাপ্তিতে তোমার প্রীতি ও গৌরব-বোধের কথা লিখে—কি করতে হবে সে তো তুমি জানোই। তুমি শুনলে সত্যই গর্ববোধ করবে : জনৈক ইংরেজ (একেবারে গোপনীয় কথা) অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে বললেন (ইংরেজটি সম্বন্ধে আমি গর্বিত, কিন্তু তাঁর মনের লড়াইটা যে দরকার হল তার জন্য লজ্জিত)—'একদিন ভাইসরয় এ'র জুতোর ফিতে খুলে দেবেন, যদি ইনি যেভাবে আরম্ভ করেছেন সেভাবে চালিয়ে যেতে পারেন।'

না করে পারলাম না—নোটবইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে যতখানি ভালবাসা ও সাহস ঢেলে দেওয়া যায় ততখানি দিয়ে তা ভরালাম, এবং তার উপরে প্রেসিডেন্সী কলেজের ঠিকানা লিখলাম, যাতে আগামীকাল সকালে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশের পথে সেটি পান। আমি লিখেছি—'আমার বন্ধুত্ব তোমার ও সেণ্ট সারার বন্ধুত্বেরই অভিব্যক্তি এবং রাজার (স্বামীজীর) ভালবাসার ও গর্বের প্রকাশ ; এর যোগ্য আপনি।' তুমিও, আমি তোমাকে বলেছি এই ভাব না দেখিয়ে তাঁকে আশা ও উৎসাহ-ঝঙ্কৃত কিছু শব্দ লিখে পাঠাতে পারো, ওগো আমার প্রিয় শক্তিমতী যুম! সারার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাতের প্রয়োজন নেই। তিনি (বসু) তো তাঁকে লিখতে ও তাঁর কাছ থেকে লেখা পেতে প্রাণান্ত-ব্যাকুল। গতকাল আমাকে তিনি বলেছেন, আমি যেন তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না জানিয়ে কদাপি সারাকে পত্র না লিখি, কেননা তার স্রোত সদাই প্রবাহিত।'"

৯ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : [প্লেগ সেবার ব্যাপারে একেবারে প্রাণের ঝুঁকি নিতে নিবেদিতাকে স্বামীজী নিষেধ করেছিলেন।] "কিন্তু প্রিয় ডঃ বসু আমি চালিয়ে যাইনি বলে মর্মপীড়িত, এবং সেকথা খোলাখুলি বলবার সুযোগ তাঁকে



মায়াবতীতে (বামদিক থেকে), নিবেদিতা, মিসেস সেভিয়ার, সিস্টার ক্রিস্টিন, অবলা বসু।



লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম ভাষণ দিচ্ছেন।



আমেরিকান সংবাদপত্রে মিসেস ওলি বুলের উইলের মামলার সংবাদ।

দতে পেরেছি বলে গর্বিত, আত্মসমর্থনের চেষ্টা প্রায় করিনি, নিজের বিবেকের খাঁচা এড়াতে পেরেছি এমন গর্ব যে এখনো বোধ করতে পারছি না।*......

গত সপ্তাহে তোমাকে যা লিখেছি, ডঃ বসুর সেইসব কথা, খুঁটিনাটি পর্যন্ত স্বামীজীর গুরুপূজা, সম্প্রদায়-পত্তন) স্বামীজীকে বললাম। তিনি বললেন, তথাপি 'খোকাটি' তিন দিন ধরে আমাকে প্রায় পূজো করেছে—এক সপ্তাহের ধ্যে সে আমাদের লোক হয় উঠবে।" আমি বললাম, "হাঁ, সত্যই পূজো করেন" প্রিয় য়ুম, কী গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আত্মসংযমের সঙ্গে সেই অপরূপ পূজো নবেদিত, তা যদি জানতে!)। রাজা বললেন, "ঠিক! আর এরাই ব্যক্তিপূজার বরুদ্ধে হৈ চৈ করে। এরা নিজেদের চেনে না। যা নিয়ে তাদের অন্তঃসংঘাত, পরকে তাই করতে দেখলে তাদের ঘৃণা করে!" হঠাৎ আলোক। মহারাজাধিরাজ য়ুরোপে) যাত্রা করার আগে যদি আমার বসুকে একবার মঠে নিয়ে যেতে পারি, দ—যদি—যদি—শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ তুলে চান—যদি না চানও তবু এক সুন্দর দবসে তাঁর বিষয়ে এই ডায়াগনোসিস তাঁকে আমি জানিয়ে দেবই।......

তারপর—স্বামীজী বিশেষ ধরনের মাছ রাঁধবেন সুতরাং মধ্যাহ্ন ভোজনে আমি সব কি? এর সমাপ্তি সেখান থেকে সোজা প্রত্যাবর্তন এবং বসুদের ওখানে মন।......সুতরাং দেখছ, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহায্য করছেন। ওঁরা শ্মশানঘাটের কাছে ম্ভবতঃ দেড়টা নাগাদ আমার সঙ্গে মিলিত হবেন।......

বুধবার সন্ধ্যা। আমরা একত্র হয়েছিলাম। বসুদের ভালবাসি। ওখানে (মঠে) তাদের নিয়ে যেতে খুবই আনন্দ পেয়েছি। রাজাও সেই নিজস্ব প্রিয় স্বভাবে, একটু ষ্ট-বিকারের ভাবে; আসল কথা তিনি সত্যই ভাল নেই; লক্ষ্য করলাম প্রায়ই ক হাত বুলোচ্ছেন।......

মিসেস বসু এবং আমি সারা মাঠ হেঁটে জলের ধারে আমাদের সেই ঘাসে ঢাকা ঢালু জমিতে বসলাম। মিসেস বসুকে বললাম, আমাদের মধ্যে তুমি ম্যাকলাউড) আছো অদৃশ্য রূপে, যখনি ওখানে যাই তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে ওয়া-আসা কর। সুতরাং তুমি, এবং মিসেস বুল, যিনি প্রিয় ডঃ বসুর বিশেষ জামন্দির,—বিস্মৃত হওনি—হওনা কখনই।"

১৯ এপ্রিল, ওলি বুলকে: "য়ুমকে এই লিখছিলাম, কিভাবে গত রবিবার দের সঙ্গে কাটিয়েছি। একেবারে স্বর্গীয়। এই প্রথম আমার প্রিয় ডঃ বসুর র্ণ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছে অন্তর, আর পূর্বের য় অনেক বেশী পরিমাণে ভারতস্থ ইংরাজদের লজ্জার বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

---

* প্লেগ সেবার ব্যাপারটি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। কিন্তু প্লেগ-পারটি তখন কী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা এর অল্পদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশ-ন্দ্রর পত্র থেকে পাই—

"উপরের ঠিকানা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি পলাতক—প্লেগের অনুগ্রহে। মার একজন ভৃত্য ছুটি লইয়া একদিন বড়বাজারে গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া দিন পরেই প্লেগ হয়। আর ৩০ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু। বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া উক্ত কানায় (১৩৯ ধর্মতলা স্ট্রীট) আছি—কতদিন পলায়ন জানি না।"

(প্রবাসী আষাঢ় ১৩৩৩)

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলে সব কথা বলতে পারব, কিন্তু এখন মোটেই নয়। এমনকি তাঁর শেষ কথাগুলিও উদ্ধৃত করা সঙ্গত হবে কি না সন্দেহ (কিংবা, তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে বলা সঙ্গত নয়।)—"ভালবাসা পাওয়া আমার পক্ষে কতখানি দরকার তা বলে বোঝাতে পারব না।"

অনবদ্য তিনি—কিভাবে এবং কেন—আমি না বললেও তুমি জানো। ইউরোপে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের জন্য সহকর্মীদের ভালবাসা ও সহানুভূতি হারাতে পারেন, যা পেয়ে এসেছেন যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত। 'আমি কি করে তাদের কাছে গিয়ে জানাবো যে, এর ফলে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটেনি? তুমি জানো, আমার ওধরনের কোনো অভিমান নেই।' মনোনিবেশের যে বিশেষ শক্তি তাঁর কাজকে এত বিরাট করে তুলেছে, তার জন্যই তাঁর পক্ষে ঐ ব্যবধান বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ফলে তাঁর কাজের উৎসাহ হারিয়ে যাচ্ছে, বাকি যা-কিছু, প্রিয় গ্র্যানী, তুমি জানই। তোমার প্রতি ওঁর পুত্রের ভালবাসা (ও'র ভালবাসা ও শ্রদ্ধা না জানিয়ে আমি যেন কদাপি তোমাকে চিঠি না লিখি, একথা আমাকে বলেছেন, কারণ তা সদাই প্রবহমাণ), ওঁকে নিশ্চয় তুমি চিঠি লিখবে এবং পুত্র বলে গ্রহণ করবে। কি করে বিরাট মানুষকে বিরাট কাজ করাতে হয়, তাতো তুমি জানই। এই মানুষটির মধ্যে তার নিজস্ব মধুর ও নিখুঁত রূপে যে মহিমা রয়েছে, তার থেকে বৃহত্তর মহিমা তুমি কখনো দেখনি, আমি জানি তুমি তা পরে বলবেই। জীবন এ'র কাছে বোঝা। তবু সাধুতার সঙ্গে তাকে ধরে আছেনই, শুধু তাঁর দেশবাসীর কাছে এইটুকু প্রমাণ করবার জন্য—প্রয়োগবিজ্ঞানে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা ইউরোপীয়দের তুল্যই বিরাট।

সারা সপ্তাহ ধরে ঐ অনুভূতি আমার হৃদয়ের মধ্যে কিভাবে বর্তমান ছিল কল্পনা করো। তারই মধ্যে এক ঘন্টা আগে পত্র-সংলগ্ন ঔদ্ধত্যটি যখন পড়লাম, তখন আমার মনোভাব কি হতে পারে বুঝে দেখ। (নিবেদিতা সে রকম কিছু একটা লেখা নিশ্চয় পাঠিয়েছিলেন, যা আমরা পাইনি।) মানুষের উপর কতখানি অসম্মান আমরা চাপিয়ে দিতে পারি তারি নিষ্ঠুরতায় শুধু কেঁদেছি আমি।

এখানকার যে ক্ষুদ্র ইংরাজ সমাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে সেখানেও যখন ডঃ বসুর নাম উল্লিখিত হয়েছে তখন দু'একবার কঠিন গলায় বলতে হয়েছে—'এই মানুষটি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন।' তার মানে নয় যে, কোনো কিছু তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদের বলার ভঙ্গি? ওঁর দোষ কোথায়? তা আর কিছু নয়, উনি উল্লিখিত হবার যোগ্য। কিন্তু অমন ভালবাসবার, সহ্য করার, বহন করার শক্তি আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না। অথচ সব কিছুকেই নিজের মধ্যে পুরে রাখতে হচ্ছে, প্রকাশ করা যাচ্ছে না—মূক যন্ত্রণানুভূতি—ভয়ঙ্কর! উন্মোচন তাঁর ভবিতব্য নয়, সহনই ভবিতব্য। এখন আমি সম্পূর্ণ অন্য জিনিসের কথা ভাবছি—যার বিষয়ে তিনি বলেছেন।

তাঁকে আমার অগ্নিময় চিঠির একটি পাঠিয়েছি, য়ুমকে বলেছি সেকথা, মনে হয় সে বিষয়ে শুনে তুমি হাসবে,—তাতে বলেছি: যে-বন্ধুত্ব তাঁর উপরে এত অনুপযুক্তভাবে আমি অর্পণ করেছি, তার মধ্যে আছে তোমার, য়ুমের ও স্বামীজীর গর্ব ও বিশ্বাস, তাঁর প্রতি।"

২৫ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে : "রাজা গতকাল আসেননি। কাল ছিল পূর্ণিমা। তিনি সারারাত দুটি সন্ন্যাস-অনুষ্ঠানের জন্য ধ্যানে কাটিয়েছেন। আর কেউই আসেনি। সুতরাং বসুদের সঙ্গে একলা একটি মধুর সন্ধ্যা কাটানোর গভীর আনন্দ উপভোগ করলাম। ওঃ য়ুম, সেখানে আমার পূজা ও ভালবাসা কতখানি! মানুষটিকে কখনো কখনো এত পুণ্যাত্মা মনে হয়—যেন তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়! শনিবার ওঁরা দু'মাসের জন্য বাইরে গেলেন। সুতরাং শুক্রবার রাত্রে বিদায় জানালাম। কিন্তু—নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠুরতা—পুনশ্চ নিষ্ঠুরতা আর নীচতা—বিজেতাদের। ডার্লিং য়ুম, তোমার বিরাট স্বর্গীয় হৃদয়কে আমি জানি, নচেৎ যে-জিনিসের সঙ্গে তুমি বিশেষ জড়িত নও, সে সম্বন্ধে বলে তোমাকে ক্লান্ত করে তুলতে সাহস করতাম না। কিন্তু হায়, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষকে' যদি যোগ করে দেওয়া যায় বিরাট কাজের শ্রান্তির সঙ্গে, সেইসঙ্গে আবহাওয়াঘটিত শারীরিক অবসাদ কিভাবে একজন ঋষি-মনীষীকে নিজ জীবনকে ঘৃণা করতে প্রণোদিত করে, তা কি বুঝতে পারো? জানো কি, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ' কথাটার মধ্যে অবজ্ঞা এবং অপমান জড়িত আছে! দেখতে পাচ্ছি, ইনি একদা ইংলণ্ডের যে মস্ত চাকরি প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন, তার জন্য যেন অনুতপ্ত। মনে হচ্ছে—ক্ষমতা ও নীচতা তার জঘন্যতম কাজে সফল হয় বুঝি! আমি গত রাত্রে মিসেস বসুকে তাগিদ দিয়েছি, তিনি যেন চাকরির অন্য অফার সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কারণ যদি একটা অফারও পান, নিন বা ছেড়ে দিন, তা তাঁকে স্বাধীনতার ভাব ফিরিয়ে দেবে, পরিত্রাণের মত হয়ে দাঁড়াবে। আর তুমি কি মনে কর, পৃথিবীর এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে তাঁর ধরনের কাজ মহাগৌরবের সামগ্রী বিবেচিত হবে না?"

২৬ এপ্রিল, ওলি বুলকে : "তোমার বিষয়ে তোমার নতুন সন্তানের গতরাত্রের উক্তি—(তুমি) সেই আত্মা 'যা শান্তি বিকীর্ণ করে।'......

বসুদের কাছে গতরাত্রে আবার গিয়েছিলাম। একটা পার্টি হবার কথা ছিল, সাদা ফ্রক পরেছিলাম, সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু মধুর সজ্জা, যার কিছু অংশ এই সপ্তাহে লণ্ডন থেকে এসেছে তুমি জানো। কিন্তু পার্টি হয়নি, তাতে আমি খুশি। পূর্ণিমা, গাছের তলায় আমরা বসেছিলাম। এতই পূত পরিবেশ যে, এক-এক সময় কথা কওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু কী বেদনা! বলো, কেন এই বিরাট আত্মাকে পীড়ন করে মেরে ফেলা হবে? কাপুরুষতা, স্বেচ্ছাকৃত অবজ্ঞা এবং অপ্রয়োজনে অসুবিধা সৃষ্টি। ইংলণ্ডে তিনি যে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন, তার জন্য তাঁর স্ত্রী তিক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন; আমি অনুনয় করে বললাম, তাঁর (ডঃ বসুর) ক্ষোভ করা উচিত হবে না, নচেৎ মানুষের জীবন যে দুষ্ট লোকের শিকার হয়ে দাঁড়াবে, হয়ে দাঁড়াবে নিষ্ফল সংগ্রামের ক্ষেত্র! কিন্তু আমি মিসেস বসুকে তাগিদ দিয়েছি, যদি পারেন ওঁর জন্য নতুন চাকরির অফার সংগ্রহ করুন, কারণ এই মুহূর্তে যদি তিনি বিকল্প কিছু পেয়ে যান, তাহলে জীবনের নৈতিক স্বাধীনতা পুনশ্চ ফিরে পাবেন।......ইংলণ্ডে শেষ যে ৯ মাস কাটিয়েছেন, সারাক্ষণ কাজ করেছেন, রবিবারও বাদ নয়, এমন বেগে যে

বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারে অসচেতন, ফলে সব কিছু মিশিয়ে ফেলতেন, সংবাদ, খাদ্য, ছোট জিনিস, বড় জিনিস। বৈজ্ঞানিক সত্য দর্শনের দিব্য ভাবাবেশ। তার পরেই *ফিরে এলেন এই ধীর ধারাবাহিক রুদ্ধশ্বাস জীবনের মধ্যে।* গ্যানী, আমি আমার স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করি। তাহলে তারা এত নীচ!

উনি এখন আর কাজ করতে পারেন না। আকাশ গুঁড়িয়ে গেছে, ঢুকতে হয়েছে বন্ধ কূপে। তবু—একটিও তিক্ত কথা নয়— সর্বদা সেই বেদনাহত বিস্ময়; এই কথাটাই মনে জাগছে তাঁর—নিশ্চয় এটা প্রাপ্য; সর্বদা মনে করার চেষ্টা : এ তো ইংলণ্ডের যোগ্য নয়, ইংরেজ চরিত্রের অনুরূপ নয়!

তোমার মনে পড়ে, আমি কিভাবে স্বামীজীকে বলেছিলাম—আমি কখনো ইংরেজের পতাকাকে নমিত করতে পারব না? কিন্তু আর আমি ইংরেজের পতাকার সঙ্গে একাত্ম হতে পারব না। আমার পক্ষে আকাশে ওড়া যেমন অসম্ভব, এও তেমনি। দেখতে পাচ্ছি, এদেশে ইংরেজের প্রতিপত্তির দিন এখনো শেষ হয়নি—কবে সেদিন আসবে, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাই চাইছি। প্রার্থনা করি, পুনর্জন্ম নিয়ে একদিন যেন ধ্বনি তুলতে পারি—"জয় তরুণ ভারত"—যেদিন আমাদের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় আসবে—যেমন করে ইতালীর স্বাধীনতার দিনগুলিতে মাৎসিনীর পাশে ধ্বনি ওঠাতে পারত তরুণতম, ব্যগ্রতম নবদলভুক্তেরা!

তোমাকে এই চিঠি লিখতে লিখতে যেন তোমারই কাছ থেকে পাওয়া একটি চিন্তা আমার মাথায় উঠেছে—আমি মিঃ মোহিনীর কাছে গিয়ে তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়ে তাঁকে দিয়ে মিঃ পাদশাকে চিঠি লেখাব এবং মিঃ পাদশার কাছ থেকে আমার বন্ধুর জন্য একটি উৎসাহসূচক উষ্ণ পত্র আদায় করে নেব, যাতে ভবিষ্যতের কথা, *পরিকল্পনাদির কথা থাকবে,* এবং ভারতের জন্য তাঁর (বসুর) দায়িত্বের কথা। এটা উপরপড়া কাজ হবে না, হবে কি, যদি মিঃ মোহিনী সাহায্য করতে স্বীকৃত হন! আমি জানি, তুমি অনুভব করবে যে, এতে কোনো ক্ষতি হবে না যদি এই ধরনের মানুষের মারফত তা করানো যায়। ইতিমধ্যে বলে নিই, আর কোনো বন্ধুত্ব থেকে আমি দুটি জিনিসের এহেন উপলব্ধি পাইনি—

এক, আমার মাতৃত্বের অনুভব ইত্যাদি, যা তুমি বুঝবে, এবং,

দুই, স্বেচ্ছায় নিম্নতর হওয়ার আনন্দ, যাতে অন্যের বিরাটত্ব ও ভালোত্ব উপভোগ করতে পারি। 'আমি চিনি হতে চাইনে মন, চিনি খেতে ভালবাসি।'

গতরাত্রে তিনি আমাকে একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর বন্ধুত্বের সমগ্র রূপকে প্রকাশিত করে। তিনি বলেছিলেন—

"আমি তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করেছি, যে-সীমায় তুমি হয়ত এখনো পৌঁছতে পারনি। কিন্তু আমাকে আশা করতেই হবে, একদিন তুমি সেখানে পৌঁছবে।"

সুমহান ব্যাপার নয়কি? প্রশস্তির নামে প্রার্থনা!

এখন এ বিষয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, কারণ তোমার হৃদয়ে উঠে গেছে বিষয়টি, যেমন আমার হৃদয়ে—এবং তুমি, য়ুম ও আমি মিলে এই দুইজনের চারিপাশে শক্তি ও প্রেমের উত্তপ্ত পরিমন্ডলী রচনা করব, যাতে পৃথিবীতে এই কথাটাই বজায় থাকে—এখানে এখনো আশ্রয় আছে।

১ মে, ম্যাকলাউডকে : "লাঞ্চের সময়ে তাঁকে (স্বামীজীকে) ডঃ বসুর বিষয়ে অনেক কিছু বললাম। তাঁকে ঐ সন্ধ্যায় বিদায়সম্ভাষণ জানানোর কথা ছিল। স্বামীজী এত মধুর ও সহানুভূতিপর! গোপন রাখতে হবে এই ইঙ্গিত করে তাঁকে (স্বামীজীকে) একটা বিষয়ে বললাম—"একথাটা আপনার কাছে বলছি যেমন পাদরীর কাছে লোকে বলে (কনফেশন রূপে)", তাতে তিনি বললেন, "না না, এখানে ওসব কনফেশনের ভাব রাখার দরকার নেই, আমরা এখন দেশপ্রেমিক হিসাবেই কথা বলছি।"

পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ন্যাসিনী হবার যোগ্যতার জন্য আমাকে কী ধরনের নিখুঁত আচরণ করতে হবে বলুন? 'তুমি যেভাবে আছ সেইভাবেই থাক,'—তিনি দ্রুত বলে ঐ বিষয়ে আমার অভিপ্রায়ের মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে বার করবার চেষ্টা করলাম, আমার ঘুরে বেড়ানো, নানা জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা তাঁর চোখে অপরাধ কি না, যেটা আমার নিজের চোখেই অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে। তিনি খোলাভাবে জানালেন; না, তা নয়। সুতরাং আমি সেই সন্ধ্যায় বসুদের বললাম, যতদিন তাঁরা চাইবেন আমি শুক্রবার-শুক্রবার আসছি।......

শনিবার কিন্তু তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখা গেল। চায়ের পরে তিনি আমাকে নিয়ে বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়ালেন।......ডঃ বসুর প্রশ্ন উঠল। তিনি কঠিনতম এক মনোভাবে ফেটে পড়লেন।—গৃহীর মুক্তি নেই। যদি সাহস থাকে, একথা যেন তাঁকে জানিয়ে দিই। তাঁকে বলো, যদি বিরাট কোনো ত্যাগ না করেন, তাহলে কখনই শক্তিশালী হবেন না। বিয়ে—জঘন্য!......এখন তিনি সেইসব সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দন লাভ করতে আরম্ভ করছেন যাতে তাঁর খাদ্য যারা স্পর্শ করেছে তাদের মনের চেহারা বুঝতে পারছেন।......অমুক অমুক কেন বিয়ে করল? এই মুহূর্তেও ঐ ধরনের মানুষের সংস্পর্শের জন্য শারীরিক কষ্ট অনুভব করছেন। তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। তা যদি নাও হয়, তবু আপোষ তিনি একেবারে ছেড়েছেন। আলমোড়ায় চলে যাবেন, ধ্যানে ডুবে থাকবেন। পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়বেন—চুরমার করে দেবে এমন সত্য প্রচার করবেন। মানুষের কাছে গিয়ে বলা যে, তারা ঠিক পথে আছে—এই মিথ্যের চমৎকার মজা কিছু সময়ের জন্য চলে, কিন্তু মিথ্যে মিথ্যেই। তারা ত্যাগ করুক। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগ কর।

তারপর অতি শান্তভাবে বললেন, 'মার্গট, এসব এখন তুমি বুঝবে না, কিন্তু আরও অগ্রসর হলে বুঝবে। এই জিনিসকে বিশ্বাস করবার মত করে আমাকে মানুষ করা হয়েছে।'

আমি ভয় পেলাম—তিনি পাছে আরও উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুতরাং আমি একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সুন্দর গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলাম, এবং তিনি মিঃ মোহিনীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তারপর প্রায় ফিসফিসানির স্বরে বিদায় জানিয়ে আমরা চলে এলাম।

তাঁর অধিকাংশ কথার উগ্রতা ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিকতা সত্ত্বেও তুমি জানো কী পবিত্র ও সঘন সেই মুড। আর, আমার যে-বন্ধুর উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হয়েছে, তাঁকে যখন জানাবার সময় আসবে তখন আমার সাহসের অভাব হবে না। কিন্তু

আমার যেন মনে হয়, ও-বার্তা কিয়দংশে পৌঁছে গেছে। আমি বিশ্বাস করি না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ মানুষটির মত একজনকে প্রত্যক্ষে বলেন না।......ব্রাহ্মরা কি সত্যই তাঁকে ভালবাসে না।*......

ডঃ বসু চলে যাবার পরে আমি নিজেকে বলেছিলাম, তাঁদের অনুপস্থিতিতে আমি ব্যক্তিগত কিছু করব না, শুধু করব নৈর্ব্যক্তিক বিষয়, এবং আমি প্রবন্ধ লেখার কাজ তুলে নিলাম।......

ডঃ বসু চান, আমি ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করি। আমাকে ও-বিষয়ে চেষ্টা করতেই হবে।......

ডার্লিং য়ুম, ডঃ বসুর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে যে-সব অপ্রকাশিত এবং অপ্রকাশ্য চিন্তা আমার মনে জেগেছে—ভারত বিষয়েই—তার সবগুলি যদি তোমাকে বলতে পারতাম! মনে হয় সেগুলি একটা বইয়ে বা ঐ জাতীয় কিছুতে ধরা পড়বে।"

২ মে, নেল হ্যামণ্ডকে: "কী সব বন্ধুই না মানুষ পায় এখানে! একজন বিরাট মানুষ—যাঁর থেকে বিরাটতর কাউকে জেনেছি কি না সন্দেহ—আমাকে কোন্ প্রশস্তি করেছেন বল দিকি?—শোনো—খুবই কোমল কণ্ঠে বলতে হবে, তা এমনই পবিত্র—

'আমি তোমাকে এমনভাবে কল্পনা করেছি, যে-সীমায় তুমি হয়ত এখনো পৌঁছতে পারনি, কিন্তু আমাকে এ আশা অন্ততঃ করতে হবে—একদিন তুমি সেখানে পৌঁছবেই।'"

৮ মে, ম্যাকলাউডকে: "বসুরা পথিমধ্যে। যাবার আগে তাঁরা বলেছেন, আমি যেন তাঁদের 'শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা পাঠিয়ে দিই আমার য়ুমকে।' আমি সানন্দে রাজি, এই অনুমান করে যে, য়ুমও তার শ্রেষ্ঠ ভালবাসা পাঠিয়ে দেবে ওঁদের।......

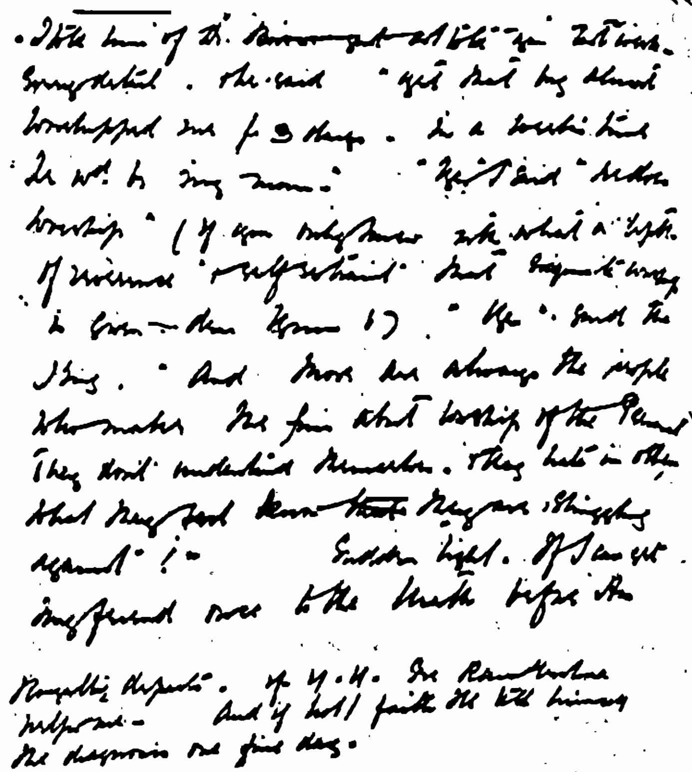
এক সন্ধ্যায় বসুদের সঙ্গে তোমার বিষয়ে কথা বলবার সময়ে আমি খুবই আমোদ বোধ করেছিলাম; কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, তোমার ভালোত্বে আমি ঈর্ষাতুর। এই কথায় ডঃ বসু আঘাত পান—এমনই তোমার ভালোত্ব!......

মিঃ স্টেড যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করেছেন, কি সুন্দর সেগুলি: 'যে আসন

---

* গৃহীদের মুক্তি নেই—স্বামীজীর এই ধরনের আপ্তের ঝলক সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছেন 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক' কিন্তু অপূর্ব আধ্যাত্মিক। স্বামীজী বড় ত্যাগ চেয়েছেন ডঃ বসুর কাছে। আর নিবেদিতা চেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা পৌঁছে যাক তাঁর কাছে। এসব ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করতে আমরা চাই না, শুধু জানাবো, জগদীশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে সত্যই ত্যাগ করেছেন, ত্যাগের বস্ত্রকে নিজের প্রতীক করেছিলেন। এবং দাম্পত্য-জীবনে, প্যাট্রিক গেডিসের জীবনী থেকে এই বিচিত্র তথ্য পাচ্ছি (যে-জীবনী স্বয়ং ডঃ বসুর অনুমোদিত)—তিনি শেষ পর্যায়ে ব্রহ্মচর্য পালন করে গেছেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা পৌঁছেছিল। গেডিস লিখেছেন—

"The advantages of celibacy to the intellectual life have so long been urged and acted on in East and West alike that it is as well that those whose experience and career have had the yet higher advantages of wedlock at its best should also bear their testimony."



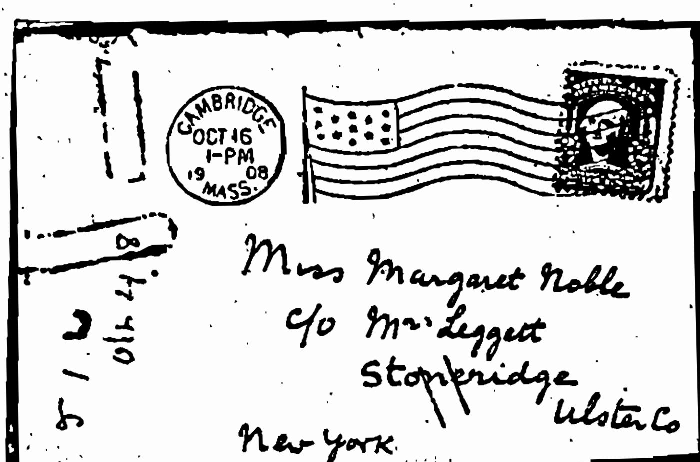
মতপার্থক্য সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র স্বামীজীকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন, যা প্রায় পূজার পর্যায়ে উঠত, নিবেদিতার ৯।৪।৯৯ তারিখের এই চিঠি থেকে তা বোঝা যায়।

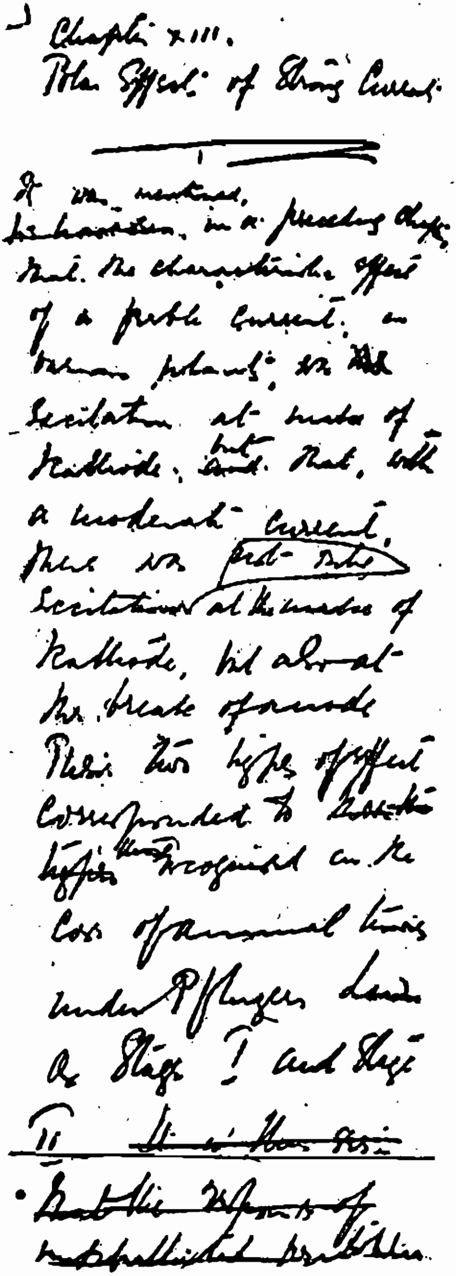
I told him of Dr. Bose—just as I told you last week—every detail, and he said, "Yet that boy almost worshipped me for 3 days—in a week's time he would be my man". "Yes", I said, "he does worship" (if you only knew with what a depth of reverence and self-restraint that exquisite worship is given, dear Yum!). "Yes", said the King, "And those are always the people who make the fuss about worship of the Personal. They don't understand themselves, and they hate in other what they had know they are struggling against!" Sudden light. If I can get my friend once to the Math before His Rayalty (Swamiji) departs—if if if—Sri Ramakrishna helps me—and if not, faith I'll tell himself the diagnosis one fine day.

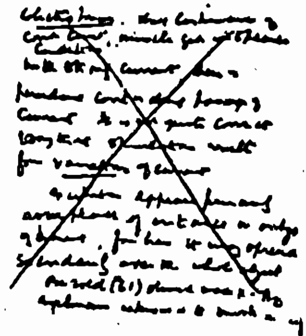
Friday
16th Oct. 1908

I hope the journey has been easy, and friends met you at the terminus.

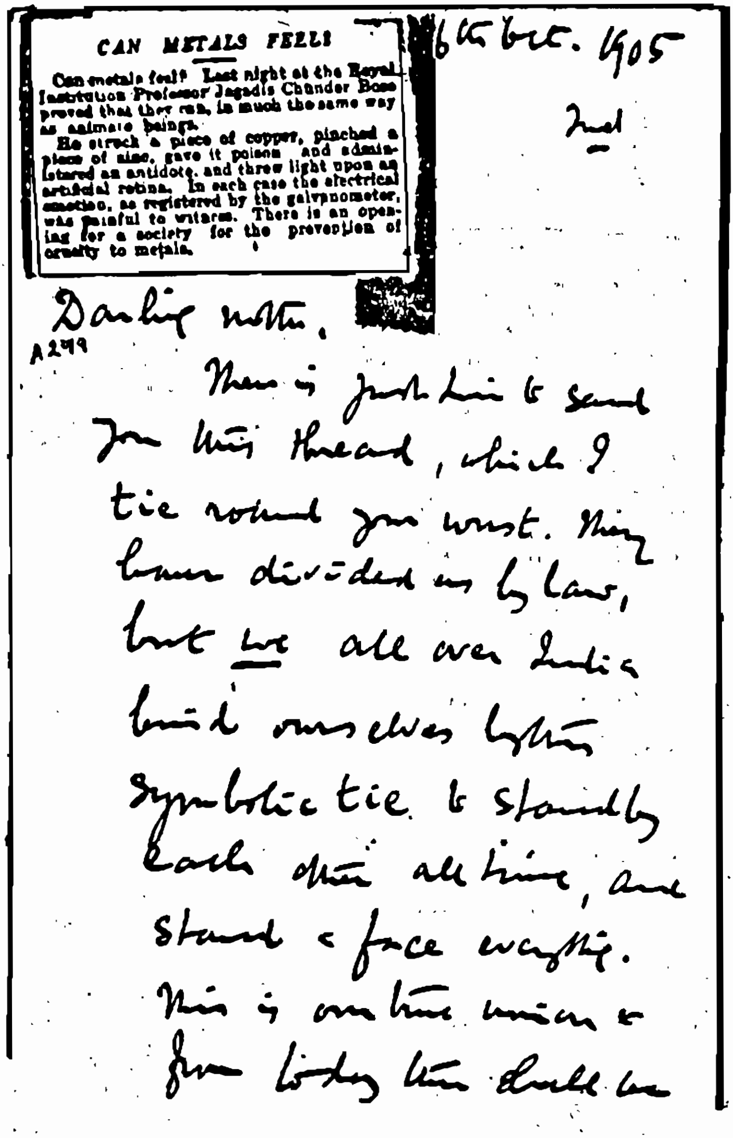
This is the great day of Consecration for the Mother Land. May we all be consecrated to her service! How many blessings have filled our life. The heart is filled to overflowing. May all the loved ones be in His safe keeping; God bless you and protect you always.




Chapter XIII.
Polar Effect of Strong Current.
It was mentioned, in the preceding chapter, that the characteristic effect of a feeble current on vegetable (polarity?) was the excitation at make of kathode, but that, with a moderate current, there was not only excitation at the make of kathode, but also at the break of anode. These two types of effect correspond to types recognised in the case of animal tissue under Pflüger's Law as Stage I and Stage II.



জগদীশচন্দ্রের 'আবিষ্কার' এবং নিবেদিতার 'রচনা'—এ বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হল—হস্তাক্ষর নিবেদিতার। এই পৃষ্ঠাটির উল্টো দিকে ডঃ বসু কয়েক লাইন লিখে কেটে দিয়েছিলেন। সেটিরও ছবি দেওয়া হল।



CAN METALS FEEL?

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadis Chunder Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poison and administered an antidote, and threw light upon an artificial retina. In each case the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was painful to witness. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.

6th Oct. 1905

2nd

Darling mother,

A২৭৭

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by law, but we all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand & face everything. This is our true union & from today the child [illegible]

বাংলা দেশের এক মহাপুণ্য দিনে জগদীশচন্দ্র এই চিঠিটি মিসেস বুলকে লিখেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রাখীবন্ধন দিবসে এটি লেখা। এক ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক হিসাবে পত্রটির বিশেষ মূল্য আছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন বলে সমালোচিত জগদীশচন্দ্রের হৃদয়-মন দেশাত্মবোধে কতখানি পূর্ণ ছিল, এই পত্রে তার পরিচয় আছে।

the beginning of new national life. We have turned back on ~~the~~ religion as strangers we for India and for ourselves. Dearest mo, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters.

Yours affectionately
Bon

N. is just packing off the to Mrs for work her love heartfull. Please direct the enclosed

SAMUEL T. D. JONES
COUNSELLOR AT LAW
60 WALL STREET
NEW YORK

June 20th, 1911.

Miss Josephine MacLeond,
12 Bruton Street,
London, England.

My dear Madam:

At the request of Mr. Whitmarsh I am writing you regarding the appointment of an administrator upon the will of Swami Vivekannanda, Deceased. On the 12th day of April I sent a letter to Miss Noble setting forth the situation, a copy of which letter I enclose you herewith. Mr. Whitrarsh heard in response to this that Miss Noble was to cable him as to what their desires were but he has not as yet received word from her and suggested that I write you in the hope that you will possibly get in touch with the necessary people and he would thus get a definite response which would enable him to proceed with the appointment of public administrator. There is a possibility of the public administrator's consenting to waive his right in favor of Mr. Whitmarsh but we cannot be sure of that as yet.

Hoping that I may hear from you I beg to remain,

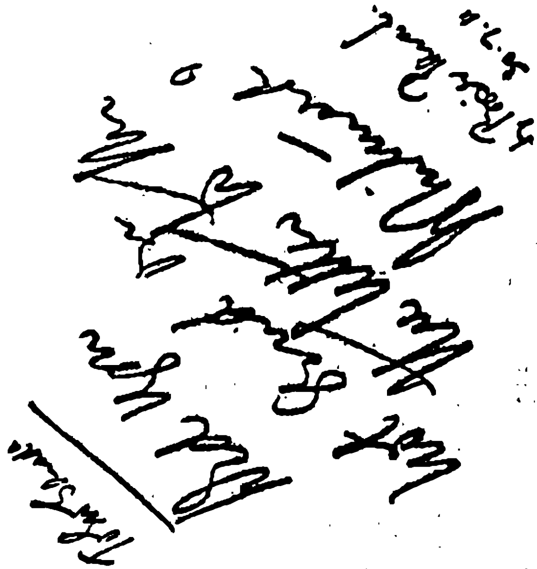
Very respectfully yours,

Samuel T. D. Jones

This has just come. [?] So try to get what is necessary to get this finished will you? & have Mr. Whitmarsh appointed. Perhaps you have already done this.

স্যামুয়েল টি ডি জোনস, 'কাউন্সেলার অ্যাট ল'-কর্তৃক মিস ম্যাকলাউডকে লেখা স্বামীজীর উইল সংক্রান্ত একটি চিঠির প্রতিলিপি। চিঠিটির উপর মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা এবং স্বামী সারদানন্দ নিজ নিজ বক্তব্য লিখে দিয়েছেন। ম্যাকলাউড লিখেছিলেন—

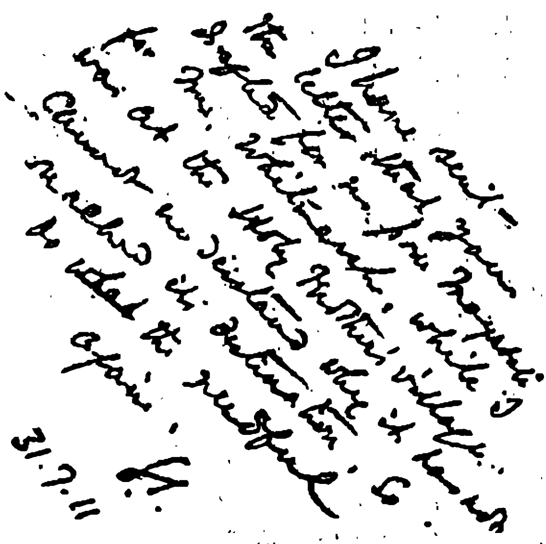
"This has just come [?] so try to get what is necessary, to get this finished, will you? And have Mr. Whitmarsh appointed. Perhaps you *have* already done this.



নিবেদিতা লেখেন—

To Sw. Sarda. Did you not send on the letter to Mr. Whitmarsh?

from Bose Para Lane. 30.7.11



স্বামী সারদানন্দ লেখেন—

I have sent the letter that you drafted for us from Mayabati for Mr. Whitmarsh, while I was at the Holy Mother's village. Cannot understand why it has not reached its destination. So do the needful again.

S.S. 31.7.11.

নিবেদিতার দেহান্তের পরে ইংলণ্ডের ডেইলী নিউজ, টাইমস এবং ভারতবর্ষের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শোকসংবাদ—

26 : 10 : 11 Daily News

MARGARET NOBLE.

A Tribute to a Remarkable Career.

(By S. K. Ratcliffe.)

News comes by a private cablegram from Darjeeling, in the Himalayas, that Miss Margaret Noble (known throughout India as Sister Nivedita) died there a few days ago, after a short illness. The announcement will bring profound grief to a large number of English and American people, to whom Miss Noble was known alike by her books and her vivid personality. It would be true to say that no Englishwoman has ever made for herself a similar place in the affections of the Indian people, or has tried to do the work to which she put her hand.

Irish by birth and family, the daughter of a Nonconformist minister, Margaret Noble was known in London twenty years ago as perhaps the most eager and brilliant member of a group of new educationists who, among other things, founded the Sesame Club. In the middle of the nineties she met the Swami Vivekananda, the first real missionary of Indian religion in the West. He had made a dramatic appearance at the Chicago Parliament of Religions two years before, had been astonishingly successful in his tour of the United States, and in 1895 was lecturing in London.

Margaret Noble became the most devoted of his followers, and in 1898 she went out to India to assist in the educational work of the Ramakrishna Brotherhood, of which Vivekananda was the head. She became, under the name of Sister Nivedita, an unattached member of the order, and began in her small house in Northern Calcutta a school for Hindu girls and classes for Hindu women—her aim being to provide modernised instruction on the true basis of Eastern feeling and ideals. She lived with extreme simplicity entirely among Indians. Her name became known far and wide; there were few Indians of distinction unknown to her; she identified herself with their culture and thoughts, and as a consequence her influence was incalculable. To Young Bengal she was an inspiration, for there can be no doubt it was through her words, spoken and written, that the ideal of Indian nationality grew to be a living and absorbing force.

Not on its metaphysical side, but in its vital social relations, Margaret Noble was a constant and intense student of Indian thought. Some years ago she spoke frequently to audiences large and small in many cities of India, and her power of speech was a wonderful thing. In later years, when fever had destroyed her fine physique, she was content to use her pen—for the most part in the Indian monthly reviews. To readers in the West she is known chiefly through her most ambitious book, "The Web of Indian Life" (which by no means reveals her full powers), or through the "Cradle Tales of Hinduism," published three years ago. She contributed a paper on "The Present Position of Woman" to the proceedings of the Universal Races Congress held in London last July. She was forty-four years of age, and to many of us her death means the passing of a rare intelligence and of a dauntless and most beautiful soul.

MISS MARGARET NOBLE.

A private telegram from Darjeeling announces the death on October 13, at the age of 44, of Miss Margaret E. Noble, widely known in India as Sister Nivedita, of the Order of Ramakrishna-Vivekananda. A correspondent writes:—

"Miss Noble occupied a remarkable position among the Englishwomen who have thrown in their lot with the Indian people. She was of Irish parentage and birth, the daughter of a Congregational minister, the late Rev. S. R. Noble. A trained teacher of exceptional gifts, she was one of a group of educationists who in the early nineties founded the Sesame Club. In 1895 she came under the influence of the Swami Vivekananda, who was then lecturing on Indian religion and philosophy in London, and in 1898 went out to India for the purpose of opening a school for Hindu girls in connexion with the Ramakrishna Mission, of which Vivekananda was the head. Taking a small house in the northern quarter of Calcutta, and living in the simplest Indian style, Sister Nivedita grew to exercise, partly through her classes for Hindu girls and women and more through her writings and addresses, a wide influence in India. Her house was visited by leading Indians from every province, and there were few English or Americans of distinction passing through Calcutta who did not make a point of seeing her.

"In 1904 she published 'The Web of Indian Life,' and three years later a volume of 'Cradle Tales of Hinduism.' Last year her record of the life and teachings of Swami Vivekananda appeared under the title of 'The Master as I Saw Him,' and latterly she was engaged in preparing the Swami's lectures and letters for publication."

The Times

Thurs. Oct 26th 1911

NOBLE.—On the 13th Oct., at Darjeeling, MARGARET E. NOBLE (SISTER NIVEDITA), eldest daughter of the late Rev. S. Richmond Noble.

For "Hospital Sisters" see foot of 2nd Column.

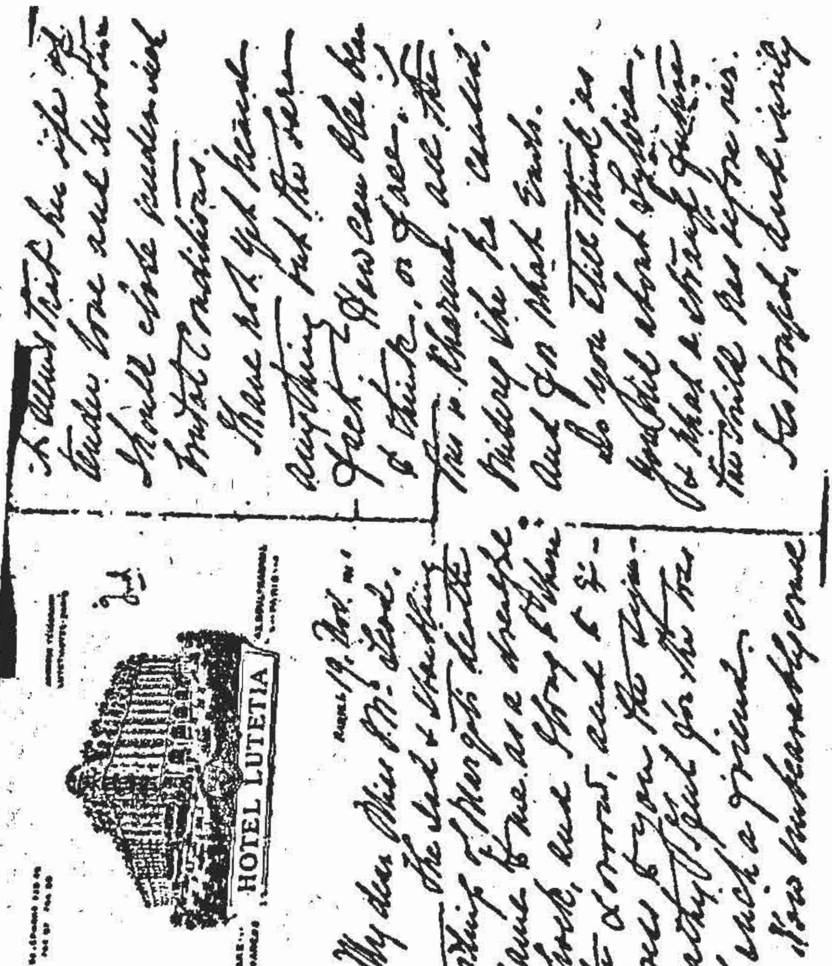
Thurs. Oct 26th 1911

The Times

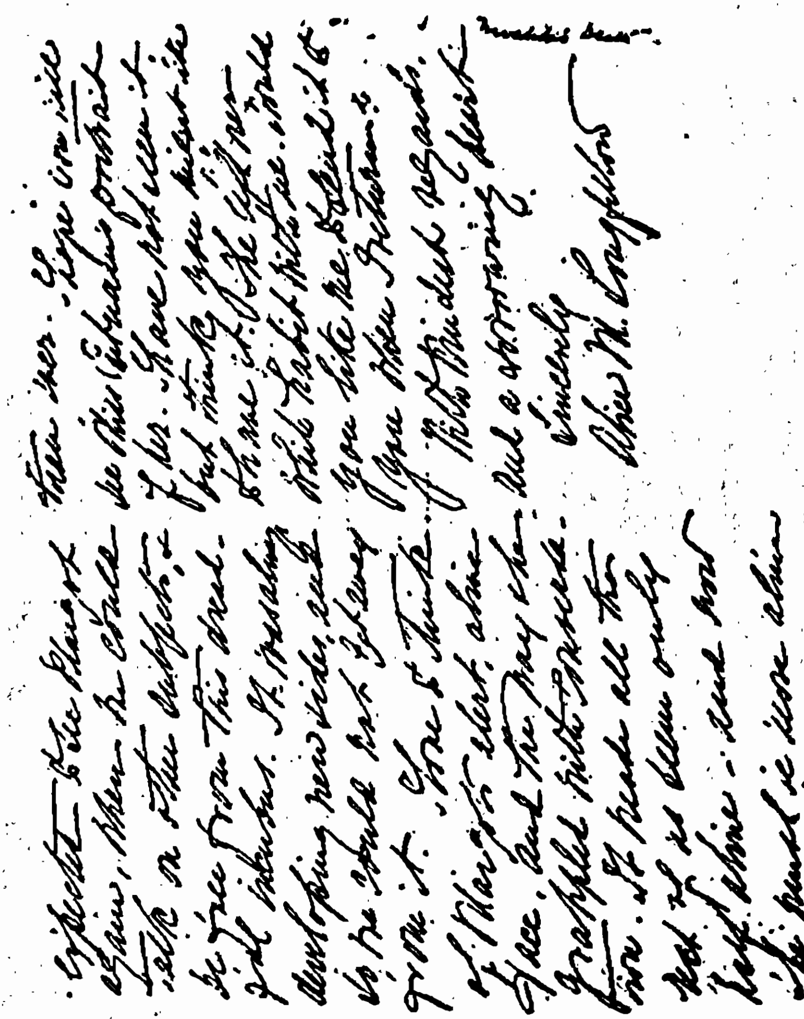
Amrita Bazar Patrika Oct 14/1911

One of the noblest and brightest souls has passed away. Yesterday morning Sister Nivedita departed this life at Darjeeling. She was an Avatar, so to say, of ideal self-sacrifice. No European, male or female, loved India so passionately and so sincerely as the deceased lady did. To the service of India, she dedicated her whole life, and hence she was called "Nivedita." As a matter of fact, she has sacrificed herself for the sake of her beloved land of adoption. She left her own country, her mother and brother, and all her early associations at home for serving the Indians

And how magnificently did she serve them! Her death will be mourned from one end of the country to the other, while the loss which poor India has suffered by this sad event is simply unspeakable. Perhaps it is not generally known that she maintained a considerable number of Hindu orphans and helpless Hindu women at her own expense


HOTEL LUTETIA

নিবেদিতার দেহত্যাগে মিস ম্যাকলাউডকে সান্ত্বনা দিয়ে মিস লংফেলো এই চিঠি লিখেছিলেন। ইনি বিখ্যাত কবি লংফেলোর কন্যা এবং নিবেদিতার অনুরাগী বান্ধবী। মিসেস বুলের উইলের মামলাই যে নিবেদিতার অকালমৃত্যুর কারণ, এই পত্রে তা ইঙ্গিত করা হয়েছে।



Paris 19, Nov. 1911

My dear Miss M—Leod,

The sad and startling tidings of Margot's death came to me as a dreadful shock, and I long to share to sorrow, and to express to you the sympathy I feel for the loss of such a friend.

How unbearably cruel it seems that her life of tender love and devotion should close under such brutal conditions.

I have not yet heard anything but the bare fact. How can Olea bear to think, or face, if this is Kharma, all the misery she has caused and for what ends.

Do you still think as you did about Sylvia, and what a strange future the child has before her.

I so longed, and surely expected to see Margot again, when she could talk on other subjects, and be free from this dreadful incubus. It was always developing new sides and so she could not get away from it. I love to think of Margot's alert, alive face, and the way she grappled with conversation. It made all the rest of us seem only half-alive—and now she must be more alive than ever.

I hope you will see Miss Putuam's (?) portrait of her. I have not seen it, but think you might like to have it. She left her while habit with me. Would you like me to send it to you when I return ?

Vith kindest regards, and a sorrowing heart,

Sincerely
Alice M. Longfellow

only I don't see the way just now. Christine is nervous this moment and is disinclined to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary 'nerve' or she does not feel herself up to it. now. Only one feels that we are letting time be wasted. If she had survived us she would not have allowed a single hour go by. But then she had no body, it was all mind. There was no such thing as despondency or despair in her composition.

Why did you not have another sister? I fear I shall never live to see your children grow up.

Yours ever
J.C. Bose

মিসেস উইল্সনকে ২. ১১. ১৯১১ তারিখে লেখা জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির বিষয়বস্তু গ্রন্থের ৭৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। নিবেদিতার মৃত্যুতে ডঃ বসু কিরকম অসহায় বোধ করেছিলেন, এই চিঠিতে তিনি খোলাখুলি তা জানিয়েছেন। 'নিবেদিতা শরীরিণী নন, মনোময়ী'—তিনি বলেছেন; পরম বিষাদে পরিহাস করে প্রশ্ন করেছেন—"তোমার আর একটি বোন নেই কেন? তোমার মেয়েদের বড় হয়ে উঠতে দেখব, সে ভরসা যে করি না।"

The Bose Institute will also be beautiful architecturally. As you enter there is a large stone lotus to the left - that is the basin in which water lilies will grow. Just overlooking that will be a bas-relief of a woman, with prayer beads and a lamp in her hand. ~~Through her prayer it was~~ The Institute is the embodiment of her prayer. On the 13th

The ashes were laid in a receptacle just by the side of the lotus. There will be two stone seats, and there will be a overhanging Shefali tree which sheds every morning lily white flowers, and makes a white carpet on the ground. The seed she brought from the Caves of Ajanta, and the plant was one of several which she planted in the School Grounds.

বসু বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের কিছু আগে ২৭. ১০. ১৬ তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা এই দীর্ঘ পত্রে (পত্রটির বিষয়বস্তুর জন্য গ্রন্থের ৭০৪-০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জগদীশচন্দ্র হৃদয় উন্মোচন করে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছিলেন নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে। "এই বিজ্ঞানমন্দির তাঁরই প্রার্থনামূর্তি", আচার্য বসু লিখেছিলেন। বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারপথে স্থাপিত সেই 'প্রার্থনামূর্তি'র নিত্যপূজা হবে শারদ প্রভাতে ঝরে-পড়া শুভ্র শেফালী ফুলে—মুগ্ধ মনে, প্রায় কবিতার ভাষায় জগদীশচন্দ্র তা বলে গিয়েছিলেন।

BOSE INSTITUTE

SIR J.C. BOSE, F.R.S.

93 UPPER CIRCULAR ROAD

Calcutta, the 7th October 1937.

Dear Mr. Herbert,

I received a letter from Mrs. Mary Wilson about your desire, in collaberation with Miss M.L.Reymond, to write a biography of Sister Nivedita. You ask for any documents left by the Sister. I may say that all Mss. left by her I collected and published through Messrs. Longmans, Green & Co. the two books named as "Footfalls of Indian History" and "Studies from an Eastern Home".

Sister Nivedita was also greatly interested in the revival of all intellectual advances made by India, and it was her strong belief in the advance of Modern Science accomplished by Indian men of Science that led me to found my Research Institute.

As regards the great devotion of the Sister in advancing women's education on national lines, the Nivedita School in the orthodox Indian quarters of Calcutta is a living example.

On the 26th September, 1937, Lady Bose performed the

মসিয়ে হারবার্টকে লেখা এই পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাঠক শুধু লক্ষ্য করবেন, ডঃ বসু কী অকুণ্ঠে স্বীকার করছেন—নিবেদিতার প্রেরণাতেই তিনি তাঁর বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করেছেন।

II.

BOSE INSTITUTE
DIRECTOR
SIR J. C. BOSE, F.R.S.
TEL. ADDRESS BOSINSTE
TELEPHONE: ... BARABAZAR

93 UPPER CIRCULAR ROAD
Calcutta, the ....193 .

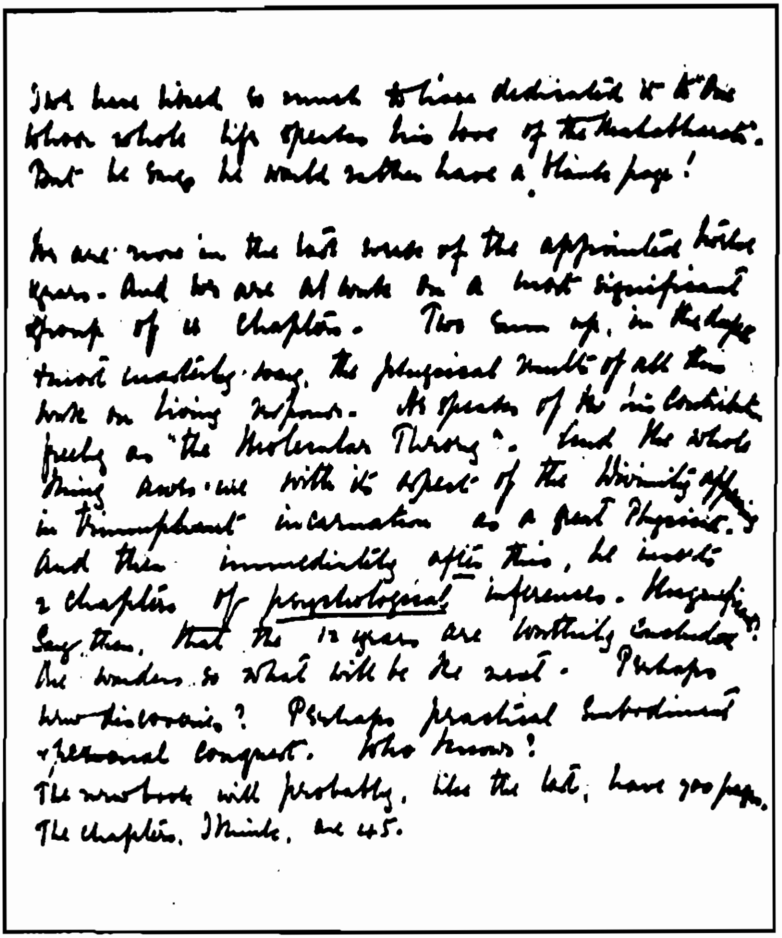
Opening Ceremony of Nivedita Hall about which the leading Indian Magazine says:

'The Nivedita Hall was built by the donation made by Lady Abala Bose, the Hall containing a beautiful painting of the Sister. This Hall will be a living memorial of Sister Nivedita's love of India and of her arts, as well as her great friendship with Lady Bose.'

It is difficult by mere correspondence to give any more information than the above. When Miss Reymond visits India, Lady Bose will give her every possible help.

Yours sincerely

J.C. Bose



I wd. have liked so much to have dedicated it *[Cradle Tales of Hinduism]* to 'One *whose whole life speaks his love of the* Mahabharata'[i.e., Dr. J.C.Bose]. But he [Dr. Bose] says he would rather have a blank page !

We are now in the last week of the appointed twelve years. And we are at work on a most significant group of 4 chapters. Two [To ?]sum up, in the deepest and most masterly way, the physical results of all this work on living response. He speaks *of his contribution freely* as "*the Molecular Theory*"—and the whole thing awes me with its aspect of the Divinity appearing in triumphant incarnation as a great Physicist. And then, immediately *after* this, he inserts 2 chapters of *psychological* inferences. Magnificent ! Say then, that the 12 years are worthily concluded. One wonders so what will be the next. Perhaps new discoveries ? *Perhaps practical embodiment and personal conquest.* Who knows ?

The new book will probably, like the last, have 700 pages. The chapters. I think, are 45.

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানে নিবেদিতার সাহায্য। মিসেস ওলি বুলকে নিবেদিতার চিঠি—২৪-৪-১৯০৭।

পেতে চাও জীবনে, সে আসন তোমারই সন্ধানে ফিরছে; তাই তার সন্ধানে বিরত হয়ে শান্ত হও।' শেষ পর্যন্ত এইটেই সমগ্র সত্য নয় কি? একদিন কোনো একটা ছুতো খুঁজে নিয়ে কথাগুলি ডঃ বসুর কাছে পাঠাব, কারণ এখন বুঝতে পারছি এই কথাগুলিই তাঁকে দেবার জন্য মনে মনে বৃথা সন্ধান করেছি।"

৩১ মে, ওলি বুলকে: "বসুদের কাছে লিখেছি। কী মিষ্টি তুমি। তোমার হৃদয়বত্তা ও মাতৃত্বকে নমস্কার করি। অবিলম্বে সবকিছু পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং জয় (ম্যাকলাউড) মনে হচ্ছে মিস উইলকিনসের বই একই মেলে পাঠিয়েছে। সন্দেহ নেই সবকিছু গতকাল পৌঁছেছে—বড় মধুর হবে তা।"

১৮ জুন, ম্যাকলাউডকে: "সে কি, নিশ্চয় ডঃ বসু ও তাঁর স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন।"

দ্বিতীয় পর্ব: ১৮৯৯ জুন থেকে ১৯০২

নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই হল দ্বিতীয় পর্ব। ১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহান্তের পরে নিবেদিতা কার্যতঃ জগদীশচন্দ্রের পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং আমরা ১৯০২ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বের ব্যাপ্তিকাল ধরেছি। জগদীশচন্দ্রের জীবনে এই সময়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ, হয়ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'বসু সমরের' ঘনঘটায় পূর্ণ এই কালের ইতিহাস আমরা যথাসম্ভব তুলে ধরব, তার আগে স্বামীজীর সঙ্গে ডঃ বসুর নবসম্পর্কের ইতিহাসে প্রবেশ করা উচিত, কারণ নিবেদিতার চিঠি থেকে ইতিপূর্বে দেখে এসেছি, পরেও দেখব, তিনি ডঃ বসুর কাজ করেছেন স্বামীজীর কাজ মনে করেই।

এই পর্বে বিবেকানন্দ জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের প্রথম সংযোগ এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখেছি ইতিপূর্বে। স্বামীজীকে জগদীশচন্দ্র যেমন বন্দনা করেছেন, তেমনি সমালোচনার মনোভাবও ছিল। স্বামীজীও জগদীশচন্দ্রের প্রতি প্রীতি বোধ করেছেন, তাঁর জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সহানুভূতিবোধ করেছেন, তেমনি একদেশদর্শী ধর্মদৃষ্টি সম্বন্ধে অভিযোগও বোধ করেছেন। ঐসব ক্ষেত্রে ধর্ম-ব্যাপারে সন্ন্যাসীর আপোষবিরোধী মনোভাবও দেখেছি। এইকালে জগদীশচন্দ্র মঠে এসেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে চা-পান সভায় মিলিত হয়েছেন, এবং স্বামীজী ডঃ বসুর বাড়িতে গেছেন বেশ কয়েকবার।*

---

* স্বামীজী ডঃ বসুর বাড়িতে এই সময়ে কয়েকবার গেছেন, এই সংবাদের পক্ষে জগদীশ বসু শতবার্ষিকী পুস্তিকায় প্রদত্ত বিবরণের উল্লেখ করতে পারি। সেখানে আছে, স্বামীজী চিকাগো থেকে ফেরার পরে উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর দুজনের

স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতার গুরু-ভক্তির প্রাবল্য ডঃ বসুর কিরকম কটাক্ষের লক্ষ্য হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথকে এইকালে লেখা অন্তরসপূর্ণ একটি চিঠি থেকে বোঝা যাবে। ১৮ এপ্রিল, ১৯০০ খৃস্টাব্দের ঐ চিঠিটি নিম্নোক্তপ্রকার—

"এবার আমেরিকা হইতে বিপিন বাবুর (বিপিনচন্দ্র পাল) একখানা চিঠি দেখিলাম। তাঁহার সহিত নিবেদিতার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। বিপিনবাবু এবং নিবেদিতা Mrs. Bull-এর বাড়িতে অতিথি ছিলেন। সেখানে বিপিনবাবু বিবিধ প্রকার pleasant কথাই বলিতেছিলেন, কিন্তু দৈবের নির্বন্ধ! সেখানে একটি meeting হয়, তাহাতে নিবেদিতা জাতিভেদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন, বিপিনবাবু চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নিবেদিতার মনে হইল যে, ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানে না এবং বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতি তাহাদের ভক্তি অপরিমিত নহে। অমনি বলিলেন, 'আমি জানি যে, এই meeting-এ একজন আছেন যিনি জাতিভেদ মানেন না, এবং সনাতন ধর্মের উপর যাঁহার আস্থা নাই।' তাহার পর বিপিনবাবুকে রণং দেহি বলিয়া challenge করিলেন। এইরূপ আকস্মিক-ভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপিনবাবু বলিলেন যে, জাতিভেদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। তবে কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। It keeps down men of genius; for example, Swamiji could not have had so much influence যদি জাতিভেদ থাকিত, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে নিম্নজাতির উত্থান দুরূহ হইত। আর কোথায় যায়! মনে করিতে পারেন (বিবেকানন্দ) স্বামীর সম্বন্ধে এরূপ কথা! অমনি এক scene। পরিশেষে ঘোরতর ঘৃণার সহিত নিবেদিতা বলিলেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দুও নহে, খৃস্টানও নহে, আর বিপিনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তুমি মৎস্যও নহ, মাংসও নহ!!!!'

যোগাযোগ স্বামীজীর দেহান্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপরে উক্ত পুস্তিকার সম্পাদক লিখেছেন—

"The editor of this brochure had more than once heard from lady Bose how Swamiji, in between his sojourns abroad, would call on his friend in Calcutta and amuse him with stories of his many odd experiences abroad and regale himself with East Bengal dishes—hot curries—cooked specially for him by her—the hotter the better. One particular visit Lady Bose vividly remembered—the surprise the Swami gave by turning up late one winter evening in complete European attire, driving from Belur in a coach and pair."(p. 50)

ছবিটি সুন্দর, এবং এটির জন্য আমরা সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ। কেবল ডঃ বসুর বাড়িতে স্বামীজীর যাতায়াত সম্বন্ধে যে সময় দেওয়া আছে, তাতে কিছু ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। স্বামীজী তাঁর নানা বিদেশযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে কলকাতায় থাকাকালে ডঃ বসুর বাড়িতে যেতেন—এটা ঠিক হতে পারে না, তিনি যেতে পারেন মাত্র একটি বিদেশযাত্রার ফাঁকেই—পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তন (১৮৯৭) ও দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যযাত্রা (১৮৯৯-এর জুন) মধ্যেই, কারণ স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে ফেরার পরে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি—যেহেতু ডঃ বসু তখন বিদেশে রয়ে গেছেন।



নিবেদিতার একটি ক্রেয়ন-স্কেচ ; নিবেদিতার দেহান্তের পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুমান, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তিটি এই স্কেচের আদর্শেই করা হয়।



বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশপথে স্থাপিত নিবেদিতার রিলিফ মূর্তি—'লেডী অব দি ল্যাম্প'।

আপনাকে সমস্যা দিতেছি; বিপিনবাবু তবে কি? সে যাহা হউক, এরূপ অসাধারণ ভক্তি অতি দুর্লভ।"*১

অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল কয়েক মাসের মধ্যে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট' আয়োজিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন এবং লেফটন্যান্ট গভর্নরের আনুকুল্যে ভারতের প্রতিনিধিরূপে সেখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পান।*২ সেখানকার ধর্মেতিহাস সভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীও আমেরিকা থেকে প্যারিসে গিয়েছিলেন। বলা চলে, জগদীশচন্দ্র এইখানেই বিবেকানন্দকে নিজ আকারে দেখেছিলেন, বিবেকানন্দও জগদীশচন্দ্রকে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল *স্থানীয় পরিবেশের সংকীর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার,* বিশেষতঃ জগদীশচন্দ্রের পক্ষে।

বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের প্যারিস গমনকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক ভারতবর্ষ বিশেষ প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে স্বামীজীর কিন্তু বিশেষ ভরসা ছিল না। মূলতঃ তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যই পাশ্চাত্ত্যে গিয়েছিলেন, প্যারিস-সম্মেলনের বেশ কিছু আগে। নতুনভাবে নাড়া দেবার মত শারীরিক অবস্থা তাঁর নয়। তাছাড়া প্যারিস কংগ্রেস চিকাগো ধর্মমহাসভাজাতীয় কিছু ছিল না, তা জনকয়েক পণ্ডিতের সমাবেশ মাত্র, যাতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করার কথা, কেননা ফ্রান্সের ক্যাথলিকমণ্ডলী চিকাগোর অভিজ্ঞতার পরে ঐ জাতীয় কিছু করতে ভরসা করেননি। স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন তাঁর চিরজিজ্ঞাসু মনের প্রেরণায়, যা য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করতে চেয়েছে, সে জন্য ফরাসী সংস্কৃতির *চাবিকাটি* আয়ত্ত করার প্রয়োজন ছিল তাঁর। প্যারিসে গিয়ে মিঃ লেগেটের অভিজাত বাসভবনের বিদগ্ধ সম্মেলনে এবং অন্যত্র নিজ মহিমার আসন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক—সকলের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল। সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডিস, বিপ্লবী ও দার্শনিক প্রিন্স ক্রপটকিন, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস, শিল্পী র‍্যদ্যাঁ, অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড, গায়িকা এমা কালভে, অভিজাত প্রিন্সেস ডেমিডফ,

---

*১ এই বর্ণনা সম্বন্ধে বক্তব্য—নিবেদিতা এখানে খুবেই ঘোলাটে আলোকের মধ্যে আছেন। তবে সংঘর্ষের এক পক্ষের প্রদত্ত বিবরণই এখানে পাচ্ছি, এবং বর্ণনাকারী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। এই ঘটনাটির বিবরণ বিপিনচন্দ্র পরবর্তীকালে নিবেদিতার চরিত্র চিত্র দেবার সময়েও দিয়েছেন।

*২ বেঙ্গলী পত্রিকায় ৩০ জুন, ১৯০০ তারিখে এ সম্বন্ধে বের হয়—

"We understand that the Bengal Government has deputed Dr. J. C. Bose to attend the Scientific Congress to be shortly held at Paris. That Dr. Bose should have been selected among the scientists in India to represent the Government is a great and singular honour done to him. He really deserves it, and for this recognition we are indebted to the initiative of Sir John Woodburn."

ধর্মনেতা পিয়ের হিয়াসান্থ, আবিষ্কারক হিরাম ম্যাকসিম, এবং আরও কত নাম, যা বার করা সম্ভব হয়নি।*

বিলাসের এই অমরাবতীতে বসেই স্বামীজী সকল সত্যের শেষ সত্য মৃত্যু বা অমৃতকে অনুভব করেছিলেন অতি তীব্রভাবে, তাই চলে গিয়েছিলেন লেগেটের বিলাস ভবন ছেড়ে তরুণ ফরাসী সাহিত্যিক জুল বোয়ার দরিদ্র আবাসে, যার অপরূপ স্মৃতিকথা জুল বোয়া রেখে গেছেন।

এই বিবেকানন্দই জগদীশচন্দ্রকে যখন প্যারিস কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রদীপ্ত প্রতিভায় দর্শন করলেন, তাঁকে শেষ নমস্কার করে গেলেন ভারত-আত্মার প্রতীক পুরুষটি—জগদীশচন্দ্রের কীর্তির মধ্যে যে পাঁচ অক্ষরের অপূর্ব শব্দটি জ্বল জ্বল করছিল—ভা-র-ত-ব-র্ষ।

প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখেছিলেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর (১৯০০); কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন-সংগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালি প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ-মণ্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির—নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ দান করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী—ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী-সাধ্বী, সর্বগুণসম্পন্না গৃহিণী যে-দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!"† (পরিব্রাজক)

---

* বিবেকানন্দের প্যারিস-জীবন সম্বন্ধে আকর্ষণীয় তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখেছেন স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় মার্চ, ১৯৬৭ সংখ্যায়।

† ডঃ বসুর সাফল্যে স্বামীজী আনন্দে আত্মহারা; বিবেকানন্দ-জীবনীতে তাঁর মহা-স্ফূর্তির কথা আছে—

"Once at a distinguished gathering, when a disciple of a certain celebrated English scientist laid claim to the fact that her master was experimenting on the growth of a stunted lily, the Swami replied humorously, 'O, that's nothing! Bose will make the very pot in which the lily grows respond!" ('Life'—P 687)

প্যারিস কংগ্রেসে ডঃ বসুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেও স্বামীজী তাঁর বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, নিবেদিতার পত্র-মারফত তা জেনেছি। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জুন মেরী হেলকে স্বামীজী লিখেছিলেন—

বিবেকানন্দ-জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা থেকে বিবেকানন্দের চরিত্রের একটি রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের যথার্থ যে-কোনো সেবককে তিনি নমস্কার করতে প্রস্তুত ছিলেন—তাঁরা জীবনের যে-স্তর থেকে যে-মত নিয়েই আসুন না কেন। তবে, সমসাময়িক ভারতবর্ষে সুপরিচিত নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রদ্ধেয় চরিত্র বিবেকানন্দ পাননি। তিনি যথেষ্ট বক্তা দেখেছিলেন, যথেষ্ট উকিল বা ব্যারিস্টার, যথেষ্ট শিক্ষিত স্বেচ্ছাদাস এবং স্বজাতি ও স্বধর্মদ্বেষী আত্মনিন্দুক, কিন্তু যথেষ্ট মানুষ নয়। কয়েকজনকে অবশ্যই তিনি শ্রদ্ধাযোগ্য দেখেছিলেন, যেমন ঈষৎ পূর্বের অজ্ঞেয়বাদী বিদ্যাসাগর, প্রবীণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কিংবা দেশপ্রেমিক তিলক, দায়িত্বশীল শিল্পপতি জামসেদজী টাটা, এবং জগদীশচন্দ্র বসু। বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব বাল্যবন্ধুত্ব বা ধর্মবন্ধুত্ব নয়, খ্রীস্ত বন্ধুত্বও নয়—তা পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার সম্পর্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ভারতবর্ষে মাত্র দুইজনই যথার্থ আন্তর্জাতিক চরিত্র ছিলেন—তাঁরা পরস্পরের হাত ধরেছিলেন একটি বিশেষ কারণে, বলা উচিত বিশেষ ব্রতে— মাতৃভূমি এবং বহু সভ্যতার ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষের জীবনসত্যকে বাইরে উদ্‌ঘাটনের জন্য। অথচ বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে জীবনের অন্য ভূমিতে পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। সে পার্থক্যের কথা পূর্বে অনেক বলেছি। তাহলেও তাঁরা যে পরস্পরকে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা দেখিয়ে দেয়, মহামানবদের একটি সভাকক্ষ আছে যেখানে তাঁরা তাঁদের পরিবেশ ও পার্শ্বচরদের বাইরে ত্যাগ করে এসে সৌহার্দ্যে সানন্দে মিলিত হতে পারেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিবেকানন্দের কৃতজ্ঞতার আর একটি বড় কারণ ছিল। স্বামীজী বিজ্ঞানকে কখনই ধর্মবিরোধী মনে করতেন না। ধর্মের মূল সত্য বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষিত সত্যরূপে গৃহীত হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত বিখ্যাত আমেরিকান বৈদ্যুতিক নিকোলা টেসলা স্বামীজীর সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক সত্যের ইঙ্গিত পেয়ে পুলকিত হয়েছিলেন। আর স্বামীজী পুলকিত হয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন পদার্থ বিজ্ঞানের বেষ্টনী অতিক্রম করে শারীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করল, এবং জড় ও জীবের মধ্যে অখণ্ড সত্যের আভাস পেতে লাগল,—অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তখন কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেন নি।

আর বিবেকানন্দকে জগদীশচন্দ্র কোন্ অপূর্ব রূপে শেষ পর্যায়ে দেখেছিলেন, তার স্মারকরূপে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা ও মিসেস বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র দুটির উল্লেখ করা যায়।

নিবেদিতাকে ডঃ বসু ৯ জুলাই, ১৯০২, লণ্ডন থেকে লেখেন—

"তুমি যদি মনে করে থাক যে হিন্দুরা বসুদের পরিত্যাগ করেছে, তাহলে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরেজ শাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোনমতেই চায় না। তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে। সেইজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।"

পরে ১৯০১-এ ইংলণ্ডে জগদীশচন্দ্রের অপারেশনের পরে স্বামীজী তাঁর স্বাস্থ্যের সংবাদ নিয়েছেন মিসেস ওলি বুলকে লেখা ৬ জানুয়ারী, ১৯০১ এবং ২৬ জানুয়ারী, ১৯০১-এর চিঠিতে।

"কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছু কিভাবে একজন মানুষ সম্ভব করল! আবার কিভাবে এখন সবকিছুর উপর স্তব্ধতা নেমেছে! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তার নিশ্চয়ই বিশ্রাম চাই। আমি এখনো যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দু'বছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি—সেই শক্তিধর পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা—তাঁর মধ্যে সবকিছুই বিরাট—সন্দেহ নেই।"

ওলি বুলকে লেখা—

"হারিয়ে যায়নি কিছুই। যে-সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান, তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহিরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকটি মহামুহূর্তের প্রতিধ্বনি—কালের মধ্যে যে-প্রতিধ্বনি চিরদিন অনুরণিত হয়।......সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কর্ম কী, যথার্থতঃ তা অনুভব করবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? একজন *মানুষ একলা কি করে ঐ সকল-কিছু সম্ভব করল তা কি আমরা উপলব্ধি করতে* পারব? যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল। কিন্তু জানি, তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে—তাকে জাগিয়ে তুলবে—শক্তি দেবে।"

প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র

প্যারিস কংগ্রেসে ডঃ বসুর সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজী যে-ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তাতে মনে হতে পারে স্বামীজী স্বদেশবাসীর সাফল্যে অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। তা কিন্তু সত্য নয়। প্যাট্রিক গেডিস, যিনি স্বয়ং প্যারিস কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর বসু-জীবনীতে জগদীশচন্দ্রের Response of Inorganic and Living Matter প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সাধারণভাবে এবং ডঃ বসুর গবেষণা-জীবনে বিশেষভাবে পেপারটির মূল্য নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন; তাঁর আলোচনা এবং অন্যত্র-সংগৃহীত তথ্য থেকে বুঝতে পারি, কতখানি দূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল এই ব্যাপারটির।

জগদীশচন্দ্র ৩১ অগস্ট, ১৯০০-তে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—

"একদিন (প্যারিস) Congress-এর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর Congress-এর Secretary ...আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ *বলিয়া উঠিলেন*— But, monsieur, this is very beautiful (but-এর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই)। তারপর আরও তিন দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষদিন আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। Congress-এর অন্যান্য

Secretary এবং President -এর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।"

প্যাট্রিক গেডিস প্যারিস-পেপার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার কারণ হিসাবে বলেছেন—

"So far, then, goes the story of this Paris paper, told at greater length than usual, alike on personal grounds and because of its importance *as including new departures.*"

(বক্রলিপি লেখককৃত)

এখানে 'দিক পরিবর্তনই' মুখ্য কথা। ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনে ইতিমধ্যে দিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, যার প্রথম প্রকাশ ঘোষণা প্যারিস-পেপারে। এর ফলে ডঃ বসু বিজ্ঞান-জগতে অতি বিতর্কিত চরিত্র হয়ে উঠবেন, এবং বাধায় বাধায় তাঁর গতিরোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে।

জগদীশচন্দ্রের জীবনীতে পাই—১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি বৈদ্যুতিক বিষয়ে গবেষণা করছেন তখনই পদার্থ-বিদ্যা ও শারীরবৃত্তের মধ্যবর্তী এক অংশে প্রবেশ করেন এবং দেখেন, এই দুই বিজ্ঞানতত্ত্বের সীমান্তরেখা অবলুপ্ত হয়ে এসেছে। 'জড়ের সাড়া'*—এই অসাধারণ গবেষণার সূচনা এখান থেকেই।"

গবেষণা ও সিদ্ধান্তের অভিনবত্ব প্যারিসে সমবেত বৈজ্ঞানিকদের চমকিত করেছিল সন্দেহ নেই, এবং যেহেতু তৎক্ষণাৎ তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থে বা জাতিস্বার্থে আহত হননি—মুক্তকণ্ঠে ডঃ বসুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁরা পেপারটিকে 'সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' বলে স্বীকার করেন এবং কংগ্রেস-বিবরণীতে প্রকাশ করেন যথাসময়ে।

'বসু সমর'

'বসু সমর' কথাটি নিবেদিতার সৃষ্টি। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকদের একাংশের জাতি-স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের ক্রূর আকারের সঙ্গে পদে পদে সংঘাতের সেই কাহিনী

---

* শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় বলা হয়েছে—

"This happened in 1899 in connection with the responsive phenomena in the parallelisms between the response of what is called 'inorganic' matter and the response of 'living' substances. He found that the curve of fatigue of his instrument closely resembled the fatigue-curve of an animal tissue. He was able to remove the 'tiredness' of his receiver by the application of rest and of suitable stimulants. He was thus, as he said later, unconsciously led to the border region of Physics and Physiology and was amazed to find the boundary line vanishing and points of contact emerging between the realms of the living and non-living. In his investigation of 'life'-phenomena Prof. Bose was also led to the study of the response of plants, the half-way house between inorganic matter and highly complex animal life.' (p. 15)

প্রথমে সংক্ষেপে বলে নেব, তারপরে আসবে ঐ সময়ে নিবেদিতার অংশগ্রহণের কথা। আমি কয়েকটি অংশে ব্যাপারটিকে ভাগ করে নিচ্ছি।

১। প্যারিসে ডঃ বসু যে পেপার পড়েছিলেন, প্রায় সেই একই পেপার পড়েন ব্রাডফোর্ড বৃটিশ এসোশিয়েশনে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। ডঃ বসুর বক্তব্যে প্রভূত উল্লাস বোধ করেন পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু শারীরতাত্ত্বিকেরা বিমূঢ় হয়ে নীরব থাকেন।[*১] বসুর গবেষণা এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে তাঁকে ইংলণ্ডে চাকুরি গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়।[*২]

২। ডঃ বসুর পেপার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করার জন্য স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ তাঁকে রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। এখানেও পদার্থবিদ্দের উচ্চ প্রশংসা পান, কিন্তু শারীরতাত্ত্বিকেরা তাঁদের পূর্বতন বিমূঢ়তা কাটিয়ে আপত্তি তোলেন : ডঃ বসু পদার্থবিদ্যার প্রমাণ প্রয়োগ করেছেন শরীরবিদ্যার ক্ষেত্রে।

৩। ডঃ বসুর পক্ষে তৎক্ষণাৎ ঐসব আপত্তির নিরাকরণ করা সম্ভব হল না, কারণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অপারেশন হল, দুমাস রোগশয্যায় কাটল। রোগশয্যাতেও মস্তিষ্ক বিশ্রাম নেয়নি। শারীরিক সামর্থ্য কিছুটা ফিরে পাওয়ার পরেই ডেভি ফ্যারাডে ল্যাবরেটরীতে কাজ আরম্ভ করলেন যাতে তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে শারীরবিজ্ঞানের প্রমাণই প্রয়োগ করতে পারেন।

৪। ১৯০১-এর এপ্রিল মাসের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণসহ ডঃ বসু বক্তৃতাদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। রয়াল ইনস্টিটিউশনে স্মরণীয় সভা হল ১০মে, ১৯০১। তার

---

*১ এই বক্তৃতার সাফল্য সম্বন্ধে ডঃ বসু পরে লিখেছিলেন—

"The reading of my paper at the Bradford meeting was a grand success. One of the leading physicists brought round his friends to see my apparatus and they were full of warmest congratulations."

বৈজ্ঞানিকেরা বলেছিলেন, বহু বৎসরের চেষ্টা ছাড়া এধরনের সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়।—

"They could never remember anything which had produced such a sensation among original investigators."

ডঃ বসুর পেপারটি 'ইলেকট্রিসিয়ান' পত্রিকা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিল—

"Physics and Chemistry, even perhaps biology, appear to be on the eve of a generalisation of unusual importance."

*২ জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এই চাকরি-প্রস্তাবের বিষয়ে ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০-তে লিখেছিলেন—"বক্তৃতার পর Lodge বন্ধুদিগকে লইয়া আমার steroscope-এ MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন। আমাকে "you have a very fine research in hand, go on with it!" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important". আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।"

মিঃ লজ্ যে ইঙ্গিত করেছিলেন অধ্যাপক ব্যারেট স্পষ্টই সেই চাকরির প্রস্তাব করেন। 'অত্যন্ত ভালো চাকরি—অধ্যাপনায়'—তাঁকে জানানো হয়েছিল।

আগে ৭ই মে তাঁর বক্তৃতার চুম্বক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রয়াল সোসাইটিতে। স্মরণীয় এই বক্তৃতা সভায়, বিস্ময়ের কথা, শারীরতাত্ত্বিকেরা কোনো প্রকাশ্য আপত্তি জানালেন না।

৫। 'মেঘ কিন্তু জমতে লাগল।' তাঁকে কেউ কেউ ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করে গেলেন। ঝড় ভেঙে পড়ল রয়াল সোসাইটির ৬ জুনের (১৯০১) সভায়। দুই প্রধান শারীরতাত্ত্বিক—বার্ডন স্যান্ডারসন এবং ডঃ ওয়েলার আপত্তি তুললেন বিশেষভাবে। ডঃ বসু সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি পদার্থবিজ্ঞানকে শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে বিজ্ঞানের জাতিভেদে আঘাত করেছেন।

৬। রয়াল সোসাইটি ডঃ বসুর পেপার মুদ্রিত করেছিল কিন্তু স্যান্ডারসন ও ওয়েলারের প্রতিবাদে পেপারটি প্রকাশিত হতে পারল না। তা প্রকাশিত হবে কি না-হবে, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা সমভাবে বিভক্ত হন, সভাপতি স্যার উইলিয়ম ক্রুকসের কাস্টিং ভোট ডঃ বসুর বিরুদ্ধে গেল।*

৭। রয়াল সোসাইটিতে পেপার প্রকাশিত না হওয়াও যথেষ্ট লাঞ্ছনা নয়, এই সব বৈজ্ঞানিকদের তদ্বিরে ভারতসরকার তাঁর ডেপুটেশন-কাল বৃদ্ধি করতে অস্বীকৃত হলেন। অথচ গবেষণা-সমাপনের জন্য আরও কিছু সময় ইংলণ্ডে থাকা প্রয়োজন। ডঃ বসু স্থির করলেন, ফার্লো নিয়েই ইংলণ্ডে থাকবেন।

৮। রয়াল ইনস্টিটিউশন ল্যাবরেটরীতে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর কাজের অগ্রগতিতে অধ্যাপক ভাইনস্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এতই খুশী হলেন যে তাঁরা জানালেন, রয়াল সোসাইটি দরজা বন্ধ করে দিলেও লীনিয়ান সোসাইটির দরজা খোলা আছে। সেখানে ডঃ বসু বক্তৃতা করলেন (২১ মার্চ ১৯০২) এবং সোসাইটির কাগজে তাঁর পেপার প্রকাশিত হলও।

৯। লীনিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা এবং সেখানে পেপার প্রকাশিত হবার পরে জনৈক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক চরম নীচতা দেখালেন। পূর্বকথিত ডঃ ওয়েলার দাবি করলেন, ডঃ বসুর আবিষ্কারের কোনো কোনো অংশের বিষয়কে তিনি আগেই নিজস্বভাবে প্রকাশ করেছেন। আসল কথা ডঃ ওয়েলার চুরি করেছিলেন। রয়াল সোসাইটিতে ডঃ বসুর বক্তৃতার প্রচুর নোট তিনি করেছিলেন, এবং রয়াল সোসাইটি অবিলম্বে ডঃ বসুর পেপার প্রকাশ না করায় সেগুলি ইনি পূর্বাহ্নে নিজের নামে চালিয়ে দেন। এ বিষয়ে তদন্ত করা হয় এবং ডঃ বসুর অগ্রবর্তিতা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

১০। রয়াল সোসাইটির পত্রিকার দ্বার বন্ধ থাকায় ডঃ বসু স্থির করেন তিনি গ্রন্থ-মারফত তাঁর গবেষণাফল সকলের গোচর করবেন।

---

* ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায় ইংলণ্ডে যান, স্যার উইলিয়ম ক্রুকস সহসা তাঁর গবেষণাগারে হাজির হন। "ডঃ বসুর কাজ দেখে তিনি প্রশ্ন করেন—ডঃ বসু জানেন কি যে,কার কাস্টিং ভোট রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় 'প্ল্যান্ট রেসপন্সের' পেপার-প্রকাশ বন্ধ করে দেয়? ডঃ বসু হতভম্ব। স্যার উইলিয়ম হাসিতে ফেটে পড়ে বলেন—'আমিই সেই ব্যক্তি।' পরে বলেন—'আমি বিশ্বাসই করিনি ও-জিনিস সম্ভবপর। মনে করেছিলাম, আপনার প্রাচ্য কল্পনাবিলাস আপনাকে বিপথে চালিত করেছে। এখন আমি সর্বতোভাবে স্বীকার করছি, আপনি প্রথমবধি ঠিক।"

বসু-সমরে নিবেদিতার নেতৃত্ব
ওলি বুল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহায্য

আলোচ্য পর্বের অধিকাংশ সময়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন। নিবেদিতার সাহায্য এবং সংগঠন ভিন্ন ডঃ বসুর পক্ষে ঐ লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। এ ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি, হয়ত কোনোদিন হবেও না, কিন্তু বর্তমানে আমরা যতটুকু আলোকসম্পাতে সমর্থ, তার দ্বারাই গোটা চিত্রের আভাস পাওয়া সম্ভব। এখানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, জগদীশচন্দ্রের জীবনীসমূহে এই অধ্যায়ে নিবেদিতার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়নি।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য যাত্রা করেন। প্রথমে ইংলণ্ডে পরে আমেরিকায় যান। প্যারিস কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে পর্যন্ত নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ নিম্নোক্ত প্রকার :

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ জুন ১৯০০ পর্যন্ত

২৬ ডিসেম্বর ১৮৯৯, ওলি বুলকে : "গতকাল বসুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। ডঃ বসু বাস্তবিকই প্যারিসে আমন্ত্রিত হয়েছেন।......

কিভাবে না চেয়েছি তিনি অধ্যাপনা পদটি পান! পেলে অতি অবশ্যই অবস্থাকে তা সরল করে তুলবে। যাই হোক, আশা করি তিনি আসবেন এবং কখনই ফিরে যাবেন না। তাঁর ধরনের স্পর্শকাতর মনে জাতি-মর্যাদা যে যাতনা দেয় তা অতি মারাত্মক। তাছাড়া (কলকাতার) আবহাওয়াও গবেষণার সহায়ক নয়। তবু, আমি খুশী এই ভেবে—সব কিছুই বিশ্বমাতার হস্তে, যিনি প্রিয় ভারতের জন্য সত্যই কোনটি উত্তম তা দেখতে পান।"

২৬ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে : "গতকাল......বসুর চিঠি......এল।......

ডঃ বসুর আবিষ্কারাদি মহা গতিশীল। পাঁচ মাস একাদিক্রমে কাজ করে চলেছেন, রবিবার পর্যন্ত ছুটি না নিয়ে। সায়েন্টিফিক কংগ্রেস তাঁকে প্যারিসে যেতে বলেছে, কিন্তু তিনি প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিত নন, বাস্তব অসুবিধা অনেক। আমার কথা বলতে পারি, আমি চাই তিনি আসুন; নিশ্চিত ধারণা তিনি ফিরবেন না। তাঁর চিঠি পাঠিয়ে দেব, এই ইচ্ছা আছে। স্বামীজী তাঁর (বসুর) চিঠি পড়তে ইচ্ছা করবেন; তোমাকে বলবেন সেগুলি মিসেস বুলের কাছে পাঠিয়ে দিতে। আহা, আমার কী যে ইচ্ছা হয়—আমেরিকার অধ্যাপনা তাঁর জন্য যদি জোগাড় করা যায়!"

১৩ জানুয়ারী ১৯০০, ম্যাকলাউডকে : "গত রাত্রে ডঃ বসুর কাছ থেকে একটা

চিঠি পেয়েছি।...স্বামীজীর পড়া হয়ে যাবার পরে ডঃ বসুর চিঠি তুমি কি সেণ্ট সারার কাছে পাঠিয়ে দেবে?"

১৫ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে: "সেণ্ট সারা বসুদের সম্বন্ধে আমার মতই নিশ্চয়তা বোধ করবেন—হৃদয়ে।"

২৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে: "সেণ্ট সারাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি, তিনি লেডী ইসাবেলের কাছ থেকে শুনেছেন কি না—লর্ড রিপন লর্ড র‍্যালেকে কিছু অনুরোধ করতে পারবেন না যেহেতু তাঁকে তিনি জানেন না!!! সেইসঙ্গে মিঃ লাওয়েলকেও নয়। কিভাবে ব্যাপারটা সমাধা করা যায় জানতে চেয়ে মিঃ গেডিসকে লেখার ইচ্ছা আছে। সেণ্ট সারাকেও কাজটা করতে বলো।

যদি সরকার ডঃ বসুকে পাঠায়—পাঠাবে বলেই বিশেষ বিশ্বাস—সেক্ষেত্রে মনে হয় সেণ্ট সারা চাইবেন লাওয়েল-পদটিই তিনি নেবেন।"

১৩ মে, ওলি বুলকে: "বসুদের সম্বন্ধে কত না সুখী আমি। এখন আমি নিশ্চিত যে তাঁরা (প্যারিসে) আসবেন।"

৬ জুন, ম্যাকলাউডকে: "সেণ্ট সারাকে তুমি বলবে কি যে, মিসেস চেনীর এক পালিত পুত্র আছেন, জনৈক মিঃ জ্যাক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, তিনি ওঁর সঙ্গেই থাকেন। অধ্যাপক সেজউইকের অধীনে ভদ্রলোক কাজ করেন। অধ্যাপক সেজউইক Lowell Inc. Trust-এর কার্যতঃ ব্যবস্থাপক। মিঃ জ্যাকের কাছে আমি লর্ড রিপনের চিঠি দিয়েছি যাতে তিনি সে চিঠি অধ্যাপক সেজউইকের কাছে পাঠাতে পারেন, এবং তাঁকে দিয়ে বাকি কাজ করিয়ে নিতে পারেন। মিঃ জ্যাক বলেন, তাঁর কোনো প্রভাব নেই এবং কাজটার ভার নিতে তিনি সংকুচিত, কিন্তু মিঃ চেনীর দৃঢ় মত— কাজটা সম্পন্ন করবার এই-ই পথ। ব্যাপারটা অবশ্য বেশী হৈ-চৈ করে বা মুখর্মিণ্টির ভাব না দেখিয়ে, সহজভাবে করিয়ে নেওয়াই দরকার। তাই আমি মিঃ জ্যাককে ব্যাপারটার বিবরণ দিয়ে সরাসরি ছোট একটি চিঠি লিখলাম, তার সঙ্গে লর্ড রিপনের চিঠিও দিলাম—আজ প্রাতরাশের সময়ে মিঃ জ্যাককে সব দিয়েছি। 'উড়ন্ত মোরগের মত' আমি কিছু বীজ ইতস্ততঃ ছড়াতে পারি হয়ত কিন্তু অধ্যাপক সেজউইক যদি ব্যাপারটা নিজে নির্ধারণ করতে মনস্থ করেন, তাঁর উপরে সমস্তটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তিনি ইতিমধ্যেই ইউরোপ যাত্রা করেছেন, এখন অনুমান করা সঙ্গত যে, তিনি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পদের উপযুক্ত লোকের সন্ধান করবেন। তিনি বায়লজিস্ট (টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের), সুতরাং তাঁকে জালবন্ধ করা সহজ বলে তোমার মনে হওয়া উচিত, এবং তারপরে সেণ্ট সারা ডঃ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করা উচিত হবে কি না!"

২৪ জুন, ম্যাকলাউডকে: "(নিউইয়র্ক থেকে) বসুরা তাঁদের নিজস্ব প্রিয় স্বরূপে। লেডী বেটী (মিসেস লেগেট) বলেন, তাঁরা চমৎকার। অনুমান করতেই পারো এতে আমার আনন্দ ও তৃপ্তি কতখানি।"

নিবেদিতার জীবনীতে (মুক্তিপ্রাণা রচিত) পাই, আমেরিকা থেকে ২৮ জুন ১৯০০-তে তিনি প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ বৎসর মার্চ মাসে প্যাট্রিক গেডিসের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়। গেডিস প্যারিস প্রদর্শনীতে 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর বৈঠক সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, নিবেদিতাকে তিনি সহকারিণীরূপে পেতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক গেডিসের নির্বন্ধে নিবেদিতা স্বামীজীর প্যারিসযাত্রার পূর্বেই সেখানে যাত্রা করেন। জুলাইয়ের শেষে স্বামীজী প্যারিসে যান। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউডও তখন প্যারিসে। অগস্ট মাসে ডঃ বসু সস্ত্রীক প্যারিসে গেলেন বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে। লেগেট ভবনে স্বামীজী, নিবেদিতা, ডঃ বসু, মিসেস বুল প্রভৃতি মিলিত হতেন। সন্দেহ নেই, এ'রা সকলেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ বসুর অসামান্য সাফল্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এবং এ'রা কাছাকাছি ছিলেন বলে নিবেদিতার পক্ষে বসুর সাফল্যের বিবরণ ম্যাকলাউড বা ওলি বুলের কাছে লেখার (যাঁদের কাছে লেখা চিঠিই প্রধানতঃ আমরা পেয়েছি) প্রয়োজন হয়নি। তাই এইকালের নিবেদিতার অল্প পত্রেই বসু-সংবাদ পাই। যা পাই তা হল—

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, অগস্ট ১৯০০ পর্যন্ত

১ অগস্ট ১৯০০, ওলি বুলকে : "বসুরা এসেছেন তোমায় জানাতে চাই। তাঁরা চমৎকার। মিঃ ম্যাভর মিসেস বসু সম্বন্ধে অতীব উৎসাহী। চমৎকার নয় কি? এত প্রাণোত্তপ্ত—গেডিসের আবাসে বসুরা যখন কফি খেতে এসেছিলেন তখন তাঁদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন। প্রিয় গেডিস! পণ্ডিতদের পরস্পর সম্বন্ধে এই উদার মহত্ত্ব এবং হৃদয়মাধুর্য আমি এত ভালবাসি! আজ সকালে মিঃ ম্যাভরকে যখন শুধোলাম, ওঁদেরকে (বসুদের) কেমন লেগেছে, তিনি বললেন, 'অত্যন্ত ভাল। শ্রীমতী বসু—খুবই পছন্দসই, সর্বাত্মক মর্যাদাময়ী মহিলা, তাঁর মত অল্পই দেখা যায়।' খুব মধুর আর বিচিত্র-সুন্দর নয় কি? কী যে ভালবেসেছি ব্যাপারটা।...

আজ রাত্রে বসুদের কাছে যাচ্ছি।...

[নিবেদিতা ভারতীয় পৌরাণিক গল্পগুলিকে পাশ্চাত্ত্য শিশুদের জন্য ইংরাজীতে রূপান্তরিত করতে আরম্ভ করেছিলেন, পরে যা 'ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্' হয়ে দাঁড়ায়। গল্পগুলি কিছু লেখা হয়েছিল, এবং ঘষা-মাজা চলছিল। এই প্রসঙ্গে—]

যদি তুমি সত্যই আসো, ওগুলি (গল্পগুলি) নিয়ে আসবে কি? তাহলে বসুদের উপর পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায়। ফ্ল্যাটে পৌঁছবার আধ ঘণ্টা পরে ডঃ বসু ও-বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি নিতান্তই চান—ভারতীয় গল্প পাশ্চাত্ত্য জগতে যাচাই করে নেওয়া হোক। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যে ভাবিত—এতে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত।"

[মুক্তিপ্রাণার রচিত জীবনীতে পাই, প্যারিসে স্বামীজী ও বসুদের সামনে নিবেদিতা 'দি স্টোরি অব দি গ্রেট গড' পড়েছিলেন—যেটি 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।]

২৯ অগাস্ট, ম্যাকলাউডকে : "ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা-দুই আগে ডঃ বসুর কাছ থেকে চমৎকার একটা চিঠি পেয়েছি। মিস উইলির সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়েছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি নিশ্চিত যে ডঃ বসু মিস উইলিকে দারুণ পছন্দ ও প্রশংসা করবেন। আমি তাঁকে অপরূপ মনে করি।"

২৯ অগাস্ট, ম্যাকলাউডকে : "ওয়েলারদের এবং বসুদের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছ—অপূর্ব তোমার মহিমা। য়ুরোপে ডঃ বসুর পূর্ণতার ছবিতে আমি আনন্দিত—পুণ্যাত্মা মানুষটি।"

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নিবেদিতা ইংলণ্ডে আসেন। ডঃ বসু অল্প কিছু আগেই এসেছেন। ব্রাডফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েশনে তাঁর বক্তৃতা এবং তার ফলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি প্রস্তাবের বিষয় আগেই উল্লিখিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে নিবেদিতার পত্র থেকে দেখেছি, ভারতে থাকতেই তিনি ইউরোপে ডঃ বসুর কোনো চাকরি-প্রস্তাবের জন্য কি রকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমেরিকায় কোথাও যাতে চাকরির অফার পান, সে বিষয়ে তার ব্যগ্র চেষ্টার কিছুটা আভাস তাঁর চিঠি থেকেই জেনেছি। জগদীশচন্দ্রের জন্য চাকরির প্রস্তাব কেন প্রয়োজন তিনি পত্রেই জানিয়েছেন—ঐ প্রস্তাব তাঁর মানসিক স্বাধীনতার, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির কারণ হবে। চাকরি নেবেন কি না-নেবেন, সেটা ভিন্ন কথা। তবে চাকরিসূত্রে বা অন্যভাবে ডঃ বসুর কিছুকাল ইউরোপবাস যে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার সাফল্যের পক্ষে প্রয়োজন, নিবেদিতা তা বুঝেছিলেন। ডঃ বসু চাকরি-প্রস্তাব যখন সত্যই পেলেন, তখন তাঁর মনের যে প্রতিক্রিয়া ঘটল—সেই প্রতিক্রিয়া ঘটবে নিবেদিতা জানতেন—জানতেন বলেই অত শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। ডঃ বসুর ঐকালীন মনের ছবি, বড় সৌভাগ্যের বিষয়, সরাসরি তাঁরই জবানীতে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথকে লেখা কতকগুলি চিঠি থেকে। মহাপ্রেম এবং মহাত্যাগের নির্যাস শব্দে শব্দে সেখানে—হিন্দুর আশা আকাঙ্ক্ষা গৌরব, ভারতবর্ষের ভাবনা। অনুমান করি, যে-দেশপ্রেম চিরদিনই তাঁর মধ্যে ছিল, বিবেকানন্দের 'মহান আত্মা', 'বিরাট আশা' এবং নিবেদিতার পাবক সংস্পর্শ তাকে জ্বালিয়ে তুলেছিল অজস্র শিখায়। জগদীশচন্দ্রের তেমনি কিছু পত্রের অংশ—

(চাকরি প্রস্তাবের কথা বলে) "এখন বলুন কি করি? একদিকে আমি যে-কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি, এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspiration -এর মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল।" (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯০০)

"জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না ; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না। তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরকালের জন্য মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ

করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে-থিয়োরী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্ধপরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এসব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যেদিকে দেখি, সেদিকেই অনন্ত আলোকরেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।" (৫ অক্টোবর)

"আজ প্রায় দু' মাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে—এখানে থাকিব কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

ভাবিয়া দেখ—যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?...

তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সেসব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যেসব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চলডোর ছেদন করিতে পারি না।...

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।" (২ নভেম্বর)

"গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে প্রস্ফুটিত হইল?—কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখদুঃখের অংশী, সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না, এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।" (২৯ নভেম্বর)

জগদীশচন্দ্রের এইকালীন জীবনের যে-রেখাচিত্র দিয়েছি তদনুযায়ী ব্রাডফোর্ডে বক্তৃতার পরে তিনি রয়াল সোসাইটিতে বক্তৃতা করেন এবং সেখানে পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রশংসা সত্ত্বেও শারীরতাত্ত্বিকদের আপত্তির সম্মুখীন হন। সেই আপত্তির নিরাকরণের পূর্বেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার পূর্ব অবধি—

নিবেদিতার পত্রে বসু সংবাদ, নভেম্বর ১৯০০ পর্যন্ত

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০০, ম্যাকলাউডকে : "আমার ছোট্ট মা (নিজের মা) এইমাত্র ডঃ বসু ও মিসেস বসুকে ঠাঁই দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর পক্ষে খুব প্রিয়

ব্যবহার নয় কি? আমি কিন্তু অপেক্ষা করতে বলেছি—যতক্ষণ না মিসেস বুল আসেন। ইতিমধ্যে আমি দায়ুণ বোহিসেবী খরচের মধ্যে যাচ্ছি—এক সন্ধ্যায় ওদের ঠান্ডা মটন সাপার দেব, যাতে তাঁরা ঘরোয়া পরিবেশ অনুভব করেন।"

১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে : "কয়েকদিন আমরা মায়ের পাইনবনে কাটিয়েছি, একেবারে স্বর্গে। আমার জন্মদিন সেখানেই কেটেছে—মা এবং বসুরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

প্রিয়তমা, তোমাকে বলে উঠতে পারব না—এই বন্ধুরা (বসুরা) আমাদের অভীপ্সার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের কাছে কতখানি হয়ে উঠেছেন। অদ্ভুত শোনাবে তবু সত্য মনে হচ্ছে—আমরা তাঁদের কাছে আবার গীতাকে এনে দিচ্ছি। ডঃ বসু অসতর্কে ঘন্টার পর ঘন্টা যখন একটানা বলে যান তখন শুনতে কত ভাল লাগে ; বলে যান ভারতের অতীত ত্যাগের প্রচণ্ড কাহিনীগুলি একের পর এক—তখন কেবল এইভাবেই—তত্ত্বের শুকনো পাঁজরে আঙুল বুলিয়ে নয়—আমরা খানিকটা ধারণা করতে পারি, এই ধরনের আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কোন্ উত্তরাধিকার পেয়েছে।

সুতরাং আমার কাছে খুবই মর্মস্পর্শী মনে হল যখন গতকাল সকালে প্রাতরাশের আগে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন তিনি পরিকল্পনা করতে লাগলেন যে, যদি সর্বাত্মক ক্ষমতা হাতে এসে যায়, তাহলে ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে দশ বছরের জন্য আমরা কয়েকজন কি করব? আমরাই শুধু ছিলাম, এবং তিনি শিশুর মত কথা বলছিলেন। চার বছরের পাঠ্যসূচী নিয়ে আমরা এহেন প্রাথমিক বিদ্যালয় করব, তারপরে চার বছরের জন্য এহেন মাধ্যমিক ব্যবস্থা, এবং তারপরে স্কলারশিপ প্রভৃতির চমৎকার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি শুধোলাম—'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি করাবেন?'

'আমি তাদের মিঃ কুকের আকাঙ্ক্ষামত আত্মবিকাশের শিক্ষা দেব (কুকি দু' দিনের জন্য এসেছিলেন, আমাদের বটানি পাঠ দিয়েছেন, যার জন্য তিনি ও ডঃ বসু পরস্পর প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধায় বাঁধা পড়েছেন), কেমন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে হয় তার শিক্ষা দেব, আর শিক্ষা দেব ঐ জিনিসটা—ঐ যে তুমি বলে থাকো—কি যেন সেটা—কাজ, কাজ।...কারণ সত্যকার মহান শিক্ষার এটা হল তৃতীয় দিক। সুতরাং আমার লক্ষ্য হবে—মাত্র একটি বিজ্ঞানের লোক তৈরী করা নয়—বিজ্ঞানের বিখ্যাত লোকগুলি তৈরী করা—বুঝতে পারছ?'

অনুভব করতে পারো কি, এই কথোপকথন আমার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে?"

১৫ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে : "এই সপ্তাহের প্রতি দিনই তোমার কাছে লিখবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু টাটা স্কীম ও ডঃ বসুর পেপারগুলির উপর এত বেশী সময় গেছে যে, আমি লিখে উঠতে পারিনি।...

আমি বসুদের সঙ্গে আছি। প্রতিদিন কাজে ভর্তি। পয়লা ডিসেম্বর বা কাছাকাছি সময়ে তাঁর (বসুর) অস্ত্রোপচার হবার কথা।...

(ক্লাব) এখন বক্তৃতায় রাত্রিগুলিতে যা-তা। আগে যা ছিল সে রকম নয় একেবারে। আর লণ্ডন লণ্ডনই নয় লেডী ইসাবেল ছাড়া। তবে লণ্ডনের চেয়ে কিছু অধিক উত্তম—বসুদের সঙ্গ।

মিঃ আর সি দত্তকে (রমেশচন্দ্র দত্ত) বেশ ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। তিনি বললেন, রাজার (স্বামীজীর) সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। সকলের প্রিয় হবার জন্য মিঃ দত্তের চেষ্টা দেখে ডঃ বসু খুব আমোদ বোধ করেন। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক তুললাম, যদি তরু দত্তের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তাহলে স্বামীজীর সঙ্গে নিশ্চয় আছে—তিনি সেই মৃদু অভিযোগ অস্বীকার করলেন না। এই ধরনের ছোটখাট দু' একটা ব্যাপার হয়ে যাবার পরে, যা কিছু তাঁদের (রমেশ দত্তের) বংশের পক্ষে গৌরবজনক হতে পারে, তাকেই কোলে টেনে নেবার ঝোঁকের উপরে থাবা বসিয়ে ডঃ বসু জানালেন—'তাহলে তো স্বামীজী আপনার সৎ-ভাই।' ঐ ধরনের কথাবার্তা আমার অন্তরে প্রবেশের পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য ছাড়পত্র—তাও তিনি বললেন।

আমি চিঠি লিখতে পারছি না।...গোটা দিনগুলি কেটে যায় বিজ্ঞানে, অনুবাদে এবং ভারতের কথায়।...

ডঃ বসু আমাকে উত্ত্যক্ত করছেন...স্বামীজী ও মিঃ মোহিনীর বিষয়ে। আমি বললাম, 'ঐ দুটি মানুষের মধ্যে এমন কোনো সমতা নেই যে তুলনা করা যেতে পারে।'

মিসেস বসু শান্তভাবে মধ্যপথে থামিয়ে বললেন, 'নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন ; তুলনার প্রশ্নটা উদ্ভট।'

অবশ্য এই ধরনের গভীরতম বিষয়ে কেউ কথা বলতে চায় না কিন্তু এইরকম খড়কুটো স্রোতের গতি বুঝিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্যে (স্বামীজী ও বসু) গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ আছে, তা বিশ্বাস করার কারণ প্রায়ই পেয়েছি। এক এক সময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবি—প্রতীক পূজার ব্যাপারেও বোধহয় মতভেদ আছে কি না সন্দেহ।"

২২ নভেম্বর, ওলি বুলকে : "দুটি জিনিস তোমাকে দিতে চাই, গতরাত্রের ডিনারসূত্রে—

১। ঈথার ও ঈথার-বোনা বিশ্বজগৎ,

২। সুতরাং তুমি দেখছ—ফুল বা পতঙ্গ বা তুমি বা আমি—আমাদের সকলের জীবন দুই অনন্তের মধ্যে সেতুস্বরূপ—পিছনে আকারিত বিরাট অনন্ত, সামনে সম্ভাবনাগর্ভ অসীম অনন্ত।

তোমার ভালবাসা সকলকে দিয়েছি—খোকাকেও (ডঃ বসুকেও)। তিনি বললেন—"আঃ, তাহলে আমরা সত্যই এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।"...

ডঃ বসুর জন্মদিন শুক্রবার, ৩০শে।

[জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে 'খোকা' সম্বোধন নিবেদিতার পত্রে 'বোধহয়' এই প্রথম পেলাম। ভবিষ্যতে চিঠিতে এই শব্দটি নিবেদিতা বার বার ব্যবহার করবেন। মূলে শব্দটি ছিল *'Bairn'*, স্কটিশ শব্দ, অর্থ, *A child*। জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার থেকে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তবু নিবেদিতার কাছে তিনি শিশুর মত প্রতীয়মান হতেন,

সেবা ও সাহায্য যার দরকার। নিবেদিতার বোন জানিয়েছেন, পূর্বে তা দেখেছি—যাঁর বিষয়েই নিবেদিতার *profound feeling* থাকত তাঁকেই সন্তানবৎ দেখতেন। অধিকন্তু মনে হয়, বিরাট প্রতিভাধর ঐ মানুষটির মধ্যে কোথায় একটা অবোধ শিশুসত্তা ছিল, যা গভীর চোখে ধরা পড়ত। স্বামীজীও ডঃ বসুর তুলনায় বয়ঃকনিষ্ঠ—তবু তিনি তাঁর বিষয়ে বলার সময়ে কখনো কখনো 'বালকটি' বলেছেন। অপরদিকে এও বলা যায়, সত্যকার প্রতিভা কখনই সম্পূর্ণ আত্মসচেতন হতে পারে না। সৃষ্টি রহস্যের সামনে তাঁরা এক ধরনের বিস্ময়পূর্ণ চাহনি মেলে থাকেন। নিত্য উৎসে নিত্যস্নায়ী বলে তাঁরা এমন এক নবীনতা বজায় রাখেন, যা চিরশৈশব বলে মনে হয়। বিবেকানন্দের কল্পনাতীত বিরাট ব্যক্তিত্ব—তবু তিনিই কি বহুজনের কাছে সন্তান বলে প্রতীয়মান হননি ?]

২৯ নভেম্বর, ওলি বুলকে : "তুমি এখানে নাও আসতে পারো—এই সংবাদে আমাদের সকলেরই মনোভঙ্গ—ডঃ বসুর সর্বাধিক। যদি তুমি আজ রাত্রে যাত্রা করতে না পার, তবু যে-কোনো ক্ষেত্রেই 'তোমার জন্য একটি চেয়ার প্রস্তুত রাখা হবে'—এই কথা লিখে দিচ্ছি।...তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না তোমার অভাব কিভাবে বোধ করছি।...ডঃ বসু হঠাৎ কয়েক মিনিট আগে মনে করলেন, একটি বইয়ে তিনি আমাদের সকলের স্বাক্ষর এবং প্রত্যেকের লেখা কয়েকটি কথা নিয়ে নেবেন ভবিষ্যতের জন্য স্মারক হিসাবে। আশঙ্কা হয়, তোমার নাম সেখানে থাকবে না এবং সে তো বিরাট ফাঁক।...

দ্বিতীয় পেপারটি বেশ দূর এগিয়েছে। এটি দারুণ।...তুমি নিশ্চয় শুনে অবাক হবে না—বৈজ্ঞানিক নকশা করতে, গণনা করতে, ভেবে জিনিস বার করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় ; শেষে ইনি বলবেন—'আরও একটা দিন বৃথা গেল। আমি এত অলস কেন ?' কিন্তু একটি মুহূর্তও নষ্ট করা হয়নি, বাস্তবিকই। গতকাল সকালে তার ফলে সোফায় শুয়ে কাটাতে হয়েছে। সোমবার আমি তাঁর প্রচণ্ড মনের তড়িৎ প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ড্রইং করেছি, ফল—ভেঙে পড়া। বিস্ময়ের কিছু নেই যে ওঁকে একটি পেপারকে সর্বাধুনিক করতে দিনের পর দিন কাটাতে হয়।

তুমি তো জানো, আগামীকাল তোমার এবং মিসেস বসুর জন্য পোর্টফোলিও তৈরী রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। যা করেছি তা হল ডঃ বসুর জন্য ছোট মলিন বুককভার।...

আজ সকালে শুধু আমরা ছিলাম। হঠাৎ তিনি রেখাগুলি—যা এইভাবে যায় (এখানে মূল চিঠিতে নিবেদিতা রেখার নক্সা দিয়েছেন)—তার বিষয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন—'ম্যাগনীশিয়াম এবং অন্যান্য জিনিসে যে-প্রকার ঘোরানো বাঁকানো রেখা, মানুষ সেইভাবেই যেন গভীরের গভীরে ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে, একই সঙ্গে উচ্চের উচ্চে অব্যাহতভাবে উত্থিত হতে পারে তার জীবনের সর্বত্র। জীবনপথে মানুষ অগ্রে পশ্চাতে, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় ধাক্কা খেতে খেতে অগ্রসর হবে—শৃঙ্খলমুক্ত—অবিরত—সর্বত্র। এরই নাম সত্যকার স্বাধীনতা।' শুনতে শুনতে আমি, কি বলব, রুদ্ধশ্বাস—একেবারে স্বামীজীর দর্শন।

আমার কাছে মহা সুখের বিষয়টি তোমাকে বলতে চাইছি। এখন জগদ্ধাত্রী—পৃথিবীর ধাত্রীমাতার—শুক্লপক্ষ। ভাবতে ভাল লাগে যে, এই আত্মা (ডঃ বসু) জন্ম নিয়েছিল জীবনের যা-কিছু মধুর, রক্ষাকারী—তার মধ্যে...

দুর্গা অক্টোবরের গোড়ায়,

কালী সেই সময় থেকে নভেম্বরের মধ্যে,

জগদ্ধাত্রী—এখন—

দেখতে পাচ্ছ, রুদ্র, নিষ্ঠুর, বিশ্বশক্তির (দুর্গার) আধিপত্য তাঁর উপর নয়, কিংবা ভয় ও মৃত্যুর প্রিয় মাতারও (কালীর) আধিপত্য নয়। পরন্তু যাঁর থেকে সকল মানবীয় মাতৃত্ব উদ্ভূত হয়, জন্মকালে তাই তাঁর নিয়ন্তা—শেষেও তাই থাকবে।

ঠিক এই মুহূর্তে হয়ত তুমি দারুণ এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছ। ডঃ বসু মনে করেন না যে, তুমি যাত্রা করতে পারবে, আর মিসেস বসু নিশ্চিত যে তুমি এখানে আগামীকাল আসছই। ইতিমধ্যে, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং শুভ আশা। এই চিঠি পাঠাবার কারণ—তুমি আসতে না পারলে যাতে জানতে পারো যে, আমরা তোমার জন্য স্থান করে রেখেছি এবং উৎসব করছি তোমারই নামে।...

ডঃ বসু জানালেন—আমি তোমার উপর 'উৎপীড়ন' করি। তাই কি? ইচ্ছে করে তো করি না। আমি অবশ্যই বলব না 'আমি অতিশয় দুঃখিত', কারণ এই উৎপীড়ন সুমধুর, যদি সত্যই তা করে থাকি। উনি বললেন, আমি তোমার উপর করি, তুমি কর তাঁর উপরে, কারণ তিনি তোমার কোনো অভিপ্রায় বোধ করতে সমর্থ নন, এবং অপরদিকে তিনি করেন আমার উপর।

দেখতে পাচ্ছ, আর একটি ত্রিভুজ।

ডঃ বসু বলেন, 'না, তুমি কদাপি যেন এখানে আসতে না পারার জন্য দুঃখবোধ করো না, কারণ তিনি অন্ততঃ মনে করেন তুমি এখানে আছই—তুমি আসো আর নাই আসো।

[ডঃ বসুর জন্মদিন উপলক্ষে চিঠিটি লেখা।]

জগদীশচন্দ্রের অপারেশন ও নিবেদিতার পত্র

জগদীশচন্দ্রের অপারেশন হয় ডিসেম্বর (১৯০০) মাসের প্রায় মাঝামাঝি। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তিনি ছিলেন এইকালে। মৃত্যুতমসা থেকে জীবনের আলোকে তাঁকে কার্যতঃ উদ্ধার করে এনেছিলেন যে-দুই নারী, তাঁদের প্রতি জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রীর কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না কোনোদিন। এ বিষয়ে নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেডী অবলা বসু যেকথা নিবেদিতার দেহান্তের পরে লেখেন, তা পরে উপস্থিত করব। এখানে মিসেস বুলের কাছে গেডিস জীবনীতে যে ঋণস্বীকার করা হয়েছে, তাই উদ্ধৃত করছি—

"After Bose's attendance at the International Science Congress at Paris in 1900, and subsequent cares, his health broke down, and he was in imminent danger, when Mrs. Bull, hearing of this, came over from the Continent, found him an expert

surgeon and helped to nurse him back to health. From this time a deep friendship grew up, and Bose found in her anew the great qualities of his own mother."

অপারেশনের পরে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠি থেকে ডঃ বসু এবং নিবেদিতার অন্তর্জীবনের গভীর রূপের সম্মুখীন হই। দেবদূতীর মত যিনি সেবাশুশ্রূষা করেছেন, তিনি তাঁর সহানুভূতিকাতর মনকে বিস্তৃত করেছেন রোগীর সর্ববিধ প্রিয় ভাবনার ক্ষেত্রে। দেখতে পাই নিবেদিতা ডঃ বসুর কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্ব অনুধাবন করতে গভীরভাবে প্রয়াসী। নিশ্চয় এর পিছনে ডঃ বসুর অনুভূতির উপর সমভাবনার স্নিগ্ধ প্রলেপ দানের বাসনা ছিল, কিন্তু সেই শেষ নয়—সর্বমতের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সত্যসন্ধানের ইচ্ছাও ছিল।

নিবেদিতার চিঠি—

২৫ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে: [ক্রীসমাস অপরাহ্ণ, ডঃ বসুর শয্যাপার্শ্ব] "আজ বড়দিন, কাল তোমার জন্মদিন। কতদিন হয়ে গেল তোমাকে একটা কথাও লিখে পাঠাইনি। চিন্তাশূন্যতার জন্য নয়, মূল কারণ, (ডঃ বসুর কাজে) শেষ শক্তি-বিন্দু ব্যয় করেছি, একেবারে তন্ময় হয়ে, পক্ষকাল পূর্ব অবধি। তারপর ১২ তারিখে ডঃ বসুর অপারেশন হল। অতঃপর আমরা সর্বদা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে আছি। তিনি বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। এই বাড়িতে একটি ঘরে তাঁর স্ত্রী থাকেন। আমরা পালা করে তাঁর সঙ্গে কাটাই। চমৎকারভাবে সেরে উঠছেন। আমার মনে হয় —আমরা সবাই আশা করি—অসুখের আগে তিনি যা ছিলেন, তার থেকে অনেক ভালো ও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। মাঝে মাঝেই তিনি খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত কাজের জন্য ছটফট করছেন।...

তুমি জানো, আমার সমস্ত হৃদয় উন্মোচন না করে তোমাকে কখনো কিছু লিখতে পারি না, তাই নীরব ছিলাম। প্রকাশের উপযোগী সুযোগ বা সামর্থ্য পাইনি। যা শিখেছি, শিখছি—তার অর্ধেক যদি তোমাকে বলতে পারতাম! অনেক কিছুই বলতে পারি না, কিন্তু একথা ঠিক, অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস—আমি সত্যই শিখেছি, এমন কিছু, যা অপরের সম্বন্ধে সর্বদা কোমলতর, মধুরতর এবং সশ্রদ্ধ করে তোলে। এখানে, প্রতি পদক্ষেপে, আমি তোমার জ্ঞানের কিছুটা আয়ত্ত করছি। কিন্তু হায়, এখনো জানিনা, কিভাবে আমার আত্মাকে অন্যের আত্মার সুরে বাঁধা যায় এবং প্রতি মুহূর্তে সুসমঞ্জস সম্পর্কে আসা যায়। আরও শ্রদ্ধা চাই—আরও —আরও—মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে—কতখানি যে প্রয়োজন তার!

এই ক্রীসমাসে আমি প্রথম 'লাবণ্য ও কারুণ্য-প্রতিমা' মেরীর পূজারী হয়েছি। প্রিয় য়ুম, এ যে কতখানি, কি বলব! যে আত্মাগুলি তোমার সান্নিধ্যে আসে তাদের প্রত্যেকের উপরে মাধুর্য ও সহানুভূতির বর্ষণে তুমিও লাবণ্য-কারুণ্য-প্রতিমা। কিন্তু আহা, মেরী! যে-মাতৃত্ব পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর মধ্যে, তার কণামাত্র যেন অন্যে পায়!

আজ অপরাহ্ণ কাটাচ্ছি ডঃ বসুর সঙ্গে। জাহাজের ডায়েরী (স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণের) স্বতঃই কিছু কিছু পড়তে চেয়েছি। ওঃ য়ুম, 'যোগসূত্র' হবার কোনো

ইচ্ছা নেই (স্বামীজীর পুরাতন বিভীষিকা—নিতান্ত সঙ্গত যা),* কিন্তু এই মানুষটি যদিনা তাঁর (স্বামীজীর) গোষ্ঠীতে এবং কাজে সবেগে প্রবেশ করেন তাহলে ভারতের ভবিষ্যৎ আমার কল্পনার অনুরূপ আকার নেবে না। ইনি স্বীকার করেন যে, কোনোকিছু আধাআধি করতে পারেন না। এ পর্যন্ত কর্মই তাঁর ধর্ম—আর সে কী ধর্ম! কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ কখনো ঘনায়নি এ'র উপরে এবং প্রতীক বিষয়ে ধারণা নানা 'না'-এর বেড়ায় বাঁধা। কিন্তু কি অপূর্ব শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে স্বামীজীর মহা নির্দেশের কথা শোনেন। সেগুলি সত্যই বিরাট। সেই ৬ সপ্তাহের জন্য (স্বামীজীর সঙ্গে জাহাজে কাটানো ৬ সপ্তাহ) আমার কৃতজ্ঞতার শেষ হবে না কখনো। এ'র (বসুর) হিন্দু-কৃতজ্ঞতা অপরূপ। আমাদের বন্ধুত্ব ও **একত্র কাজের বিষয়ে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন তিনি খুবই সহজভাবে বললেন—'এসব কাজ কার জন্য তা জানি', এবং সেই 'কে' হলেন আমার পিতা (স্বামীজী)।"** (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

৪ জানুয়ারী, ১৯০১, ম্যাকলাউডকে: "ডঃ বসু এখন প্রায় সুস্থ। মা তাঁর ছোট বাড়িটি তাঁদের ও আমার জন্য ছেড়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমরা উইম্বলডনে আছি।

আমি খুব ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমস্ত ব্রাহ্ম ঐতিহ্য ও অনুভূতি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি।† পাওয়ার পক্ষে এটি উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বস্তু—মনে হচ্ছে।

---

* এখানে স্বামীজী ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নিবেদিতার মধ্যস্থতাচেষ্টা এবং তার শোচনীয় ফলের দিকেই নিবেদিতা ইঙ্গিত করছেন। বিষয়টি পরে অল্পাধিক ব্যাখ্যাত হবে।

† ব্রাহ্মমতের প্রতি জগদীশচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল। 'দি ওয়ারল্ড্ অ্যান্ড দি নিউ ডিসপেনসেশন' পত্রিকার ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২-এর সংবাদে দেখতে পাচ্ছি লণ্ডনে জগদীশচন্দ্রের বাসভবনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে:

THE BRAHMO SAMAJ: SEVENTY SECOND ANNIVERSARY: For some years this anniversary has been observed by the little group of Brahmo students at Cambridge, but this year advantage was taken of the presence in this country of Professor J. C. Bose, M.A., D.Sc., of the Presidency College, Calcutta, to hold the celebration in London. Dr. Bose, who came over at the time of the Paris Exhibition, commissioned by the Indian Government, and is now carrying out some abstruse scientific investigations at the Royal Institutions, is residing with Mrs. Bose at Ealing, and at their house the anniversary celebration took place on Friday, Jan. 24. Nearly twenty Brahmos, who are studying in London or at Cambridge, and a few English guests were present.

At the request of Dr. Bose the Rev. V. D. Davis first offered prayer, and an address was then given by the Rev. W. Copeland Bowie, who dwelt on the close sympathies which unite the members of the Brahmo Samaj and the Unitarians England, which has been strengthened by the visits to India of the Revs. J. T. Sunderland and J. Harwood, and especially of the late S. Fletcher Williams. Messrs. B. C. Ghosh, B. C.

ইনি (ডঃ বসু) অনুভব করেন যে, তাঁর কাছ থেকে তাঁর মত আমার শোনা উচিত মর্যাদার বিষয় হবে না, সুতরাং বলার সময়ে মনের প্রচণ্ড বাধা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। অবশেষে মনে হয়, আমি পাচ্ছি। সম্পূর্ণভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি। আমার বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ চান আমি এই করি, এবং যদি সম্ভব হয় এই পথে ঈশ্বরের সমীপে যাই। তোমার নিশ্চয় মনে আছে আমরা (অন্ততঃ আমি) প্রথমে শিব ও কালীকেও ভালবাসিনি। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণও সকল ধর্মকে সমভাবে ভালবাসেন নি। সুতরাং বর্তমানে এই যে প্রয়াসে আমি নিরত আছি, এর প্রতি কোনো আনুগত্যের অভাব না দেখিয়েও বলতে পারি, এটি আমার বাল্যের পিউরিটানিজমের সঙ্গে ভয়াবহরকমে এক। কিন্তু দারুণভাবে এও অনুভব করছি—যতই যা হোক, আমাকে আরও চেষ্টা করতে হবে। এবং কখনো কখনো আমি খুব স্বচ্ছভাবে, নিশ্চিতভাবে বোধ করি—এই ডাক, এই চেষ্টার তাগিদ এসেছে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। অন্য সময়ে স্বামীজীর কথা মনে পড়ে আর কেঁপে উঠি, কারণ মনে হয় না ব্যাপারটা তিনি বুঝবেন ও অনুমোদন করবেন। এবং তাঁর অননুমোদন এখনো আমার কাছে গভীরতম ব্যাপার। অধিকন্তু, আমার যেন মনে হচ্ছে, যে-উদ্দেশ্যে আমি জীবনযাপন করেছি, এপর্যন্ত স্বাধীনভাবে যা-কিছু বরণ করতে পেরেছি—সব কিছুই ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু এইভাবে ভাবা আমার পক্ষে কী হীনতা! যেন নিজের হতভাগ্য ক্ষুদ্র সত্তাকে অন্যায়ে পতিত দেখা—এত ভয়ঙ্কর! বিস্ময়ের কিছু নেই যখন নিজেকে ক্ষুধার্ত, শীতল ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু দেখতে মানুষ এত সংকোচবোধ করে।

কী কাণ্ড! তুমি মাতাঠাকুরাণীকে ১৬ নং বোসপাড়া লেনে দেখতে পাবে। কী অপূর্ব তা—আহা!......

ডঃ বসু ও মিসেস বসু প্রায়ই বলেন, কলকাতায় শেষে স্থির হয়ে বসার আগে ভারতের নানাস্থানে ওঁদের পরিচিত নানা জনের কাছে আমি চক্র দিয়ে ফিরছি (মিসেস বসুর ভাষায়) 'অশ্বমেধের অশ্বের মত।' আমার মনে হয়, যদি সত্যই তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করেন, তাহলে তা করবার মত কাজ।"

১১ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে : "আগামীকাল এলে অপারেশনের পরে একমাস কাটবে—যেদিন ডঃ বসু টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে বলেছিলেন—'ভদ্রমহোদয়গণ! এবার আপনারা ছুরিকাঘাত করতে পারেন!' এই সপ্তাহে তিন দিন তিনি ল্যাবরেটরীতে কাজ করেছেন, ঐ সময়ের মধ্যে প্রচুর কাজ হয়েছে। অপূর্ব নয় কি? ভারতীয় রক্ত এবার নিজ মর্যাদা রক্ষা করেছে। এত দ্রুত আরোগ্যের একমাত্র কারণ

Chatterjea, A. Dutt, and Dr. Bose himself also spoke, and Mr. Ion Pichard, who referred to Mr. Fletcher Williams as having consecrated the good will, which unites our two communities, by his life and by his death.........

A cordial vote of thanks to Dr. and Mrs. Bose for their hospitable entertainment was also passed, and at the conclusion of the meeting the company adjourned for tea.

Inquirer.

হতে পারে তাঁর মিতাচারী স্বভাব। যে-ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন, তা তখন যা বুঝেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবং আমার ব্যক্তিগত কুসংস্কার অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীকে অধিক ধন্যবাদ—আমরা ভালয় ভালয় অবস্থাটা কাটিয়ে এসেছি। কলকাতায় মার্চ মাসে ফিরতে চাইছি। আশাকরি তোমার চিঠিগুলি এর পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। অনেক দিন ধরে মাতাঠাকুরাণী সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত। গত মেলে যে-সব চিঠি পেয়েছি তাতে আমার আশঙ্কাই সত্য বোধ হচ্ছে। সুতরাং দ্রুত যেতে ব্যগ্র।......

গত রবিবার আমি দুবার ব্রিজ ওয়েলস-এ বক্তৃতা করেছি।......সেখানে একটি অসাধারণ জিনিসের উদয় হয়েছে। তোমাকে বলেছিলাম—আমি ব্রাহ্মমতকে ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সারা বললেন, আমি তা মোটেই করছি না। যাই হোক, এক প্রার্থনানুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি দেখলাম, স্বামীজী এপর্যন্ত আমাদের যা দিয়েছেন, তারই সর্বোচ্চ অংশ অবলম্বন করেছি। এক ঝলকে তখন বুঝলাম, ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা এ-কাজ করতে আমাকে প্রণোদিত করেছে, যা আমি কখনই হয়ত করতাম না—অন্যের প্রয়োজনের আমন্ত্রণ ভিন্ন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম, আমি হয়ত প্রতীককে ব্যবহার করেছি অভেদ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকে ব্যাহত বা রুদ্ধ করতে। এবং যে-পর্যন্ত না সেই অভেদদৃষ্টি পুনরায় ফিরে পাই, আমি হয়ত প্রতীকে আর ফিরে যাব না। এই আবিষ্কারে কতখানি শান্তি পেয়েছি কি বলব! এটা কি অদ্বৈত সত্যের অপূর্ব প্রমাণ নয়—যে-সত্যকে প্রচণ্ড-ভাবে ঘোষণা করেন স্বামীজী—যেখানে প্রতিটি পথেই তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষিত?

ডঃ বসুর সঙ্গে কখনো কখনো কথা বলে এই বিষয় কিভাবে না বুঝেছি! স্বামীজী এবং তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেন না, কারণ সেটা অশালীন হবে; এবং আমাকে সর্বদা জোর দিয়ে বলতে হয়—"দেখতে পাচ্ছেন না—সেই মানুষটি এত বিরাট যে, যে-পর্যন্ত আপনি সত্যের উপর এবং নিজের উপর বিশ্বাসী, আপনি কখনই তাঁর বিরোধী হতে পারেন না।'

একই সঙ্গে ডঃ বসুর মধ্যে এই অসাধারণ ব্যাপারটি দেখা যায়—অদ্বৈতের সেই পুরাতন ধারণা পিছনে থেকে তাঁকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে, যার মধ্যে অন্য বিজ্ঞানীরা অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ-ই প্রমাণগুলিই আমি ভালবাসি—কথা বা যুক্তি নয়—বা ঐ জাতীয় অন্য মারপ্যাঁচ নয়, যা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার,—ভালবাসি এই এক বা অন্য স্তরের অভিজ্ঞতাকে—যেখানে তা সর্বোচ্চ স্তরের নয়, সেখানেও। 'আমাদের উভয়কে সেই একই ব্রহ্মবস্তু করে তোলো।'......

মিঃ হাউই চান, আমি ভারতীয় শিক্ষা-প্রশ্ন নিয়ে কোনো সেরা পত্রিকায় ঝকঝকে জোরালো একটি প্রবন্ধ লিখি। এমনকি ডঃ বসুও বলছেন, এ-ব্যাপারে এক দৃঢ় ভূমিকা নেবার জন্য আমার প্রস্তুত থাকা দরকার। কেবল তাঁর দাবি, তা করার আগে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পূর্ণ অধিগত করে নিতে হবে; ও বিষয়ে এমন অথরিটি হয়ে উঠতে হবে যে, ওরা যেন আমাকে সভয়ে সম্মান করে। তা না হতে পারলে চুপ করে থাকাই ভাল।

উত্তম উপদেশ। সুতরাং আমি এ. এম. বসুর (আনন্দমোহন বসু) কাছে সাহায্যের জন্য লিখেছি।"

১৮ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে : "অল্প এক ছত্র, দারুণ তাড়াহুড়ার মধ্যে, শুধু মজার কথাটা জানাবার জন্য, যে-বিষয়ে সেন্ট সারা দেখছি তোমাকে গোটাগুটি লিখে পাঠিয়েছে।......ডঃ বসু যে শান্তির সঙ্গে গত রাত্রের আঘাত গ্রহণ করেছেন তা আমাকে সবচেয়ে উল্লসিত করেছে। একদা তিনি স্বামীজীর চেয়েও স্পর্শকাতর ছিলেন। দেশাত্মবোধের সেহেন অনুভূতিপ্রবণ তরু থেকে কার্যকরী কিছু পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। যদিও তিনি এস—এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হয়েছিলেন, ও তাঁর কাছ থেকে অনেক বড়-কিছু আশা করেছিলেন, গত রাত্রে বাড়ি ফিরে যখন আমরা কাহিনীটি বললাম, তখন তিনি শুধু খাড়া হয়ে বললেন, 'আমি অন্য ধরনের বিবরণ আশা করেছিলাম। যাই হোক যা হয়েছে তাও উত্তম।' মিসেস বসু বললেন, উপরতলায় উঠে দেখেন, তিনি শান্তভাবে ঘুমোচ্ছেন!"

অপারেশনের দু'মাস পরে ডঃ বসু পুরোপুরি কাজ শুরু করেন এবং রয়াল ইনস্টিটিউশনে এক যুগান্তকারী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আসার আগে পাঠকদের নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে পুনশ্চ কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই। নিবেদিতা অসুস্থ বসুকে সেবা করে তাঁর হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়ার বা প্রেরণা দিয়ে আত্মিক বলাধানের চেষ্টাই মাত্র করেননি—বস্তুগত সাহায্যের চেষ্টাও যথেষ্ট করেছেন। সে প্রয়াস নানামুখী। ডঃ বসুর জন্য চাকুরী সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, বন্ধু সংগ্রহ, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে অংশ গ্রহণ, সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে প্রচার—সব কিছুই তাঁর কর্মতালিকার অংশ হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি তিনি বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে উপযুক্ত ভাষায় লিখে দিতে শুরু করেছিলেন। এই কাজ তিনি দীর্ঘদিন করবেন, এবং বসুর কর্মজীবনে এর গুরুত্বের কথা পরে আরও আলোচিত হবে।

নিবেদিতার পত্র থেকে আমরা পূর্বে দেখে এসেছি, পাশ্চাত্যে, বিশেষতঃ আমেরিকায় বসুর জন্য চাকরী সংগ্রহে নিবেদিতা কতখানি ব্যস্ত ছিলেন এবং ব্যাপারটা কিভাবে সংগঠিত করছিলেন। জগদীশচন্দ্র যখন ইংলণ্ডে চাকরি পেলেন, তখন চাকরি নেওয়া সম্বন্ধে তাঁর মানসিক দ্বিধার রূপ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে দেখেছি। নিবেদিতাও ব্যাপারটা জানতেন। বিকল্প পথ তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। একটি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, যার বিষয়ে ইঙ্গিত ডঃ বসু ও শ্রীমতী বসুকে ৫ নভেম্বর, ১৯০০-তে লেখা নিবেদিতার এক দীর্ঘ পত্র থেকে পাই। পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তবু উদ্ধৃত করিনি, এখানেও করছি না, কারণ গোটা বিষয়টি ভবিষ্যতে আমাদের বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে—জামসেদজী টাটা ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ভারত সরকারের কাছে এক বিরাট দানের প্রস্তাব করেন; ঐ টাকায় একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তৈরী হবে, যেটির পরিচালনায় ভারতীয়দের বড় অংশ থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী সরকার

স্বভাবতঃই এধরনের প্রস্তাবে গররাজি হয়। স্বামীজী টাটা পরিকল্পনার বিশেষ আগ্রহী ছিলেন; স্বামীজীর সূত্রে নিবেদিতাও। ভারত সরকারকে প্রভাবিত করবার জন্য তিনি বিখ্যাত বিশ্ববাসীদের অভিমত এর পক্ষে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এবং তিনিই ১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে মিসেস ওলি বুলকে দিয়ে ইংলণ্ডে এক ভোজসভায় বিভাগীয় বড় কর্তা স্যার জর্জ বার্ডউডকে নিমন্ত্রণ করান এবং সেখানে আলোচনার মধ্য দিয়ে সরকারের মনোগত অভিপ্রায় জানতে চেষ্টা করেন। আলোচনা অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, স্যার জর্জ বার্ডউড ঘাড় পাততে রাজি হননি। ভোজসভার পরেই নিবেদিতা আলোচনার বিবরণ ডঃ বসুকে লিখে পাঠান। এখানে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, টাটার পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে নিবেদিতার বিশেষ আগ্রহের অন্যতম কারণ—ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে তিনি সরকারী নিগড়মুক্ত এই উচ্চ গবেষণাকেন্দ্রে স্থাপন করতে চাইছিলেন।

এইকালে জগদীশচন্দ্র নানা চিন্তায় কতখানি বিপর্যস্ত ছিলেন, অপারেশনের পূর্বে লিখিত তাঁর একটি চিঠি থেকে বুঝতে পারি। চিঠিটি সম্ভবতঃ মিসেস বুলকে লেখা, নিবেদিতাকেও হতে পারে। পত্রটি মূলে উদ্ধৃত করছি—

33 Pour's Sq.
16th Nov., 1900

My dear friend,

I fully understand your former advice. I some times think I would do anything to free myself from the hateful dependence and giving my mind to practical improvements held out such a chance. At the same time I feel overburdened with many thoughts, often weary of thinking, and any new efforts, specially in the direction of business is too much for me. Even writing a simple business letter makes me useless for the day.

My paper will probably come before the R. Society next week and then too I will feel some restraint, as some of the important things which I recently did with crude homely apparatus, are capable of much improvement and far-reaching development with proper apparatus. If I give out the idea of my method, and do not continue the work myself, better results will be soon brought forward by others and my work will appear ridiculously crude. If I go to the nursing home, I shall have to stop the work for sometime.

I ought not to mind about success, but that they will ask an account of what I did, and then are some in the Government too anxious to run down anything I do.

But in all this you know what is best, and I will abide by your advice.

Yours affly.
Jagadish Ch. Bose

রয়াল ইনস্টিটিউশনে স্মরণীয় বক্তৃতার পূর্বে গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্রের উদ্দীপ্ত মূর্তির সংক্ষিপ্ত চিত্র পাই নিবেদিতার চিঠিতে। ১৫ মার্চ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

"ডঃ বসু যেন বাতাসে ভাসছেন। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার, এক যন্ত্রের পর অন্য যন্ত্র, তাঁর অপূর্ব অভিপ্রায়গুলি এখন বাস্তবায়িত সত্য। শ্বাসরোধ করে সসম্ভ্রমে শুধু চেয়ে দেখতে হয়। জগন্মাতা কিভাবে না তাঁর প্রেরণা এত অজস্রভাবে ঢেলে দিচ্ছেন।"

২২ মার্চ একই জনকে—

"ডঃ বসুর কাজের তুল্য কিছু তুমি কখনো দেখনি। এ যেন আবিষ্কারের ধারাবর্ষণ।"

অপরদিকে ঘরোয়া মানুষটিকে পাই ৪ এপ্রিলের পত্রে, একই জনকে লেখা—

"ডঃ বসু চান, তাঁর ছোট ভাগনা, মিঃ এ. এম. বসুর বাচ্চা ছেলেটিকে বছর-খানেক কি তারো বেশী সময় আমি কাছে রাখি; কিন্তু তাঁর ধারণা সারদা দেবী হয়ত আপত্তি করবেন। তা কিন্তু আমার একেবারেই সত্য মনে হয় না, শুধু জিজ্ঞাসা করে চিঠি লিখেছি। ছেলেটিকে আমি তার প্রতিদিনের বাংলা পড়ার সময় বাদ দিয়ে সারাক্ষণ নিজের কাছে রাখতে চাই। আমরা তাকে এমন দেশপ্রেমিক এবং এমন বৈজ্ঞানিক করে তুলতে চাই, যার তুল্য পৃথিবী দেখেনি।*......

---

* আনন্দমোহন বসুর এই শিশুপুত্রের নাম অরবিন্দমোহন বসু। এঁকে লেখা নিবেদিতার দুটি চিঠি পেয়েছি। নিবেদিতার পত্রের ভাষায় যে কী যজ্ঞাগ্নি জ্বলত, তা চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়। উইসবাডেন থেকে ১০ জুন, ১৯০৯ তারিখে তিনি লিখেছিলেন—

"আদরের অরবিন্দ, আর একটি জন্মদিন সমাগত; এবার তা তোমাকে গৌরবে মণ্ডিত করেছে। তোমার সম্বন্ধে আমরা সকলেই কত গর্বিত! কত গর্বিত তোমার মামা, চেয়ে দেখছি। তিনি অল্পই বলেন, কিন্তু বলার সময়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর চোখ।

তাহলে, এইবার, পুরনো জীবনের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ। আমি জানি এখন এবং পরেও তুমি জীবনের কঠিন পথই বাছবে, পদে পদে একরোখা তেজে অগ্রসর হবে, কোনো শ্রমেই কাতর হবে না, কোনো ত্যাগেই পরাঙ্মুখ নয়, তোমাকে তা নিয়ে যাবে সমুচ্চ লক্ষ্যে। বিজ্ঞানের আচার্যত্ব কী অপরূপ—কখনো ভেবে দেখেছো? যে-হৃদয় শুধু সত্য চায়—যে-কোনো মূল্যে শুধু সত্য—সে-ই এর যোগ্য। সর্বোচ্চের জন্য যারা নিজেদের উৎসর্গ করে—প্রতি পদক্ষেপে নিজের হৃদয়কে বিচলিত করে এগিয়ে যায়—তারাই সিদ্ধিলাভ করে। তোমার মামার বিরাট জীবন আমি স্বচক্ষে দেখেছি; আমি দেখেছি তাঁর আত্মসংযমের রূপ; দেখেছি কী উচ্চ, কী পবিত্র, কী কঠিন তাঁর সত্যের চরিত্র—আমি তাই বিপুল আনন্দে ভাবছি—কী অপূর্ব! তাঁর ছায়ায় পথ চলার সৌভাগ্য তুমি পাবে, তুমি তাঁর শিষ্য হবে, সন্তান হবে! জন্মদিনে আজ কি তুমি প্রার্থনা করবে, যে-নূতন মন্দিরের দিকে তোমার জীবন তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি যেন তার যোগ্য হতে পারো!

প্রিয় বৎস, গুরুর কাছে কেমন করে যেতে হয়, সে সম্বন্ধে আমার দুটি-একটি কথা যদি শোনো!

যখন আমরা গুরুর সামনে দাঁড়াব, তখন আত্মার থাকবে বিপুল স্তব্ধ শান্তি; বন্ধু-বান্ধব, অপর শিক্ষক, সকল চিন্তা-ভাবনা পিছনে পড়ে থাকবে। যেমন অর্জুন কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সমস্ত অতীত জীবন বিস্মৃত হয়ে, সর্বমনপ্রাণ উজাড় করে, করযোড়ে—শুনেছিলেন ভগবদ্গীতা। ঠিক সেই রকম। যখনই আমরা গুরুর সামনে দাঁড়াই—গীতা শুনবার জন্যই দাঁড়াই। স্মরণে রাখতে হবে সর্বদা, এক অর্থে তিনি মোটেই মানুষ নন—

এক বিরাট সত্য—সত্যের মধ্যে স্থিত,—সেই সত্যের দর্শনই হবে সাধনার বস্তু। অন্য অর্থে অবশ্য তিনি মানুষই, সর্বদা আমাদের মনের মানুষ; সেজন্য তাঁকে ভালবাসব, তাঁর চরণে উজাড় করে দেব হৃদের সম্পদ, তার দ্বারা যদি তাঁর সেবা হয়।

প্রিয় অরবিন্দ,, তোমার গীতা হবে তোমার বিজ্ঞান, ভাবী ভারতের জন্য সুবিরাট ধর্মবাণী উৎসারিত হবে তার মধ্য থেকে। তুমি এখন বুঝতে পারবে না, ঐ মহান সংগীতের শব্দরাজি তুমি যে বিশ্বস্ত হৃদয়ে শুনেছ—তোমার দেশের কাছে তার অর্থ কী দাঁড়াবে। এ ব্রত কতখানি উচ্চ ও কতখানি দুরূহ, তাও বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু একটি বিষয়ে আমার বিশ্বাস আছে, এমন কোনো ত্যাগ নেই আমাদের অরবিন্দ বসু যা করতে পিছিয়ে আসবে, এমন কোনো যন্ত্রণা নেই যা সে সানন্দে গ্রহণ করবে না, আর নিশ্চয় এমন উচ্চ কোনো ভালবাসা নেই যা প্রকাশ করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে।

প্রিয় পুত্র, স্বয়ং জগজ্জননী তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, তোমাকে তোমার শ্রেয়ঃতম, মহানতম প্রকাশে চালিত করবেন।—তোমার জন্য নিত্য ভালবাসায় ভরা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।"

মায়াবতীতে বসে ২৩ জুন, ১৯১১ তারিখে অরবিন্দমোহনকে লেখা নিবেদিতার আর একটি প্রাণাগ্নিপূর্ণ পত্র পাওয়া গিয়েছে। অরবিন্দমোহনের জন্মদিন উপলক্ষে একটি কলম উপহার দিয়ে নিবেদিতা আশা প্রকাশ করেছিলেন—"তোমার কাজের সকল যন্ত্রই, বিশেষতঃ এই কলমটি, যা সরস্বতীর প্রতীক, সর্বদা উচ্চ ও মহান আদর্শ প্রকাশে নিযুক্ত থাকবে।" তারপর লেখেন—

"যখন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম, তখন তুমি ছোট্টটি, সবে শৈশব ছাড়িয়েছ। এখন তুমি একেবারে বি-এস-সি!

অনুভব করছি, আগামীকাল তোমার জীবনের একটি পবিত্র দিন, কতখানি তা এখন তুমি বুঝতেও পারবে না; কারণ তুমি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হচ্ছ, জীবনের বৃহৎ বিদ্যালয়ের প্রায় শেষ শ্রেণীতে; এ যেন প্রাচীন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করা। বেরিয়ে আসবে কিভাবে?

কখনো কি ভেবে দেখেছ যে, নতুন সুযোগগুলিকে গ্রহণ করার সামর্থ্যের দ্বারাই আমাদের পুরনো সুযোগগুলি মহিমান্বিত বা নিন্দিত হয়? কখনো ভেবেছ যে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ তিনিই যিনি সর্বাধিক শিক্ষা গ্রহণের শিক্ষা পেয়েছেন! শিক্ষা দেওয়া নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। তা আপনা থেকেই হবে। আমাদের কর্তব্য অপরকে এইটুকু দেখানো—আমরা শিখতে জানি।

আমি তোমার জন্য সুখ-সম্পদের পুত্তলরাশি কামনা করছি না। তোমার জন্মদিনের জন্য আমার কামনা—অনন্ত ধৈর্যময় আত্মোৎসর্গ ঘটুক তোমার জীবনে। সত্যের জন্য, কর্তব্যের জন্য, ভালবাসার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো—ত্যাগ করো, ত্যাগ করো, শান্তি না রেখে, শ্রান্তি না রেখে, শর্ত না রেখে, সীমা না রেখে; অর্জন করো সেই শক্তি ও ভক্তি যা বলে—নাও! নাও! কদাপি স্বপ্নেও বলে না—দাও! দাও! দাও!

তারপর, তোমার জন্য প্রার্থনা আমার—অনন্ত জ্ঞানের শক্তি হোক তোমার, আরও জানার তৃষ্ণায় অধীর হও, অধীর হও, যেটুকু সত্য পেয়েছ, কদাপি সন্তুষ্ট হয়ো না তাতে, আদর্শের অভিমুখে চড়াই ভেঙে ওঠো নিরন্তর, অক্লান্ত আবেগে, (কখনো আদর্শের ফল-পরিণতি—যশ, সৌন্দর্য, সুখ, সম্পদের জন্য লোলুপ হয়ো না)। আ-হায় অরবিন্দ, তোমার জন্য আমি সেই আদর্শই চাই, যা ডুবিয়ে দেয়, মেরে ফেলে, যা কখনো তৃপ্তি দেয় না, শান্তি দেয় না, যা কদাপি করায়ত্ত হয় না।

আর চাই, সাক্ষাৎ কর্তব্যের মধ্যে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে; ভবিষ্যৎ কি করবে না করবে, তা নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে দরকষাকষি করো না। মনের এই প্রবৃত্তি দূর করা সত্যই বড় কঠিন। কিন্তু যাকে আদর্শলাভ করতে হবে, তাকে জানতে হবেই, কিভাবে আনুগত্যের প্রবাহে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়, কিভাবে হাতের কাজের বাইরে না-দেখতে হয়। যেমন আমার গুরু বলতেন, 'কোনো পরিকল্পনা নয়।'

এ সকলই, দেখতে পাচ্ছ, মহান কঠিন আশীর্বাদ। সহজ নয় মোটে, সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যহীন। আশা করি, তুমি কখনো, কখনই, সহজকে, স্বাচ্ছন্দ্যকে বাছবে না, নিজের উপর কঠোর হবে, এমন উচ্চমানের জন্য লড়াই করবে, যা অন্যের প্রত্যাশার অতীত। ওয়াল্ট

সকালে ও সন্ধ্যায় সকলে মিলে আমরা ছুটির ব্যায়াম হিসাবে বাইসাইকেল চড়ছি। খুবই উপভোগ্য। এমনকি সেন্ট সারা পর্যন্ত রিচকে আচার্য করে চড়তে শিখছেন।*......

আমরা সকলে রান্না ঘরেই খাওয়া দাওয়া সারছি, কারণ ডঃ বসু খাওয়ার ঘরকে ছুটির সময়ের ল্যাবরেটরীতে রূপান্তরিত করেছেন। আহা, যদি দেখতে—যন্ত্রপাতি সাজানো অবস্থায় কি দারুণ দেখতে হয়েছে।"

রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পূর্বে নিবেদিতা ৩ মে, ম্যাকলাউডকে লেখেন—

"আগামী শুক্রবার রয়াল ইনস্টিটিউশনে ডঃ বসুর বিরাট বক্তৃতার দিন। ঐ বিরাট ঘটনার জন্য আমরা আশা করি মিসেস লেগেট এবং অ্যালবার্ট এখানে উপস্থিত থাকবেন। কত কি এর উপরে নির্ভর করছে। আশা ও বিশ্বাস করি যে, সভাকক্ষ তারকাখচিত হবে।"

ম্যাকলাউড, ওলি বুল প্রভৃতি সম্ভবতঃ রয়াল ইনস্টিটিউশনের ১০ মে তারিখের সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাই তাঁদের কাছে এ বিষয়ে নিবেদিতার পত্র লেখার প্রশ্ন ওঠে না। সুখের বিষয় নিবেদিতা অবিলম্বে দূর ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে বিষয়টি লিখে পাঠিয়েছিলেন। পত্রটি খুবই দীর্ঘ ছিল, রবীন্দ্রনাথ 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' নামক প্রবন্ধে সেই পত্র থেকে স্থানে স্থানে অনুবাদ করে দিয়েছেন। প্রবন্ধের বাকি অংশও, যাতে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল বিষয়টি সহজভাবে লিখিত, সন্দেহ নেই তা নিবেদিতার পত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে লিখিত। প্রবন্ধের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক সমাজের একাংশ কেন জগদীশচন্দ্রের বিরোধিতায় অগ্রসর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কারণ দেখিয়েছিলেন; ভারতবর্ষে সহানুভূতি ও সহায়তাহীন কী শোচনীয় পরিবেশে কাজ করতে হয়, বেদনাকরুণ ভাষায় তা জানিয়েছিলেন;† আর শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন সেই 'প্রলোভনহীন

হুইটম্যান বলেছিলেন—"শোনো! আমার খাঁটি কথা বলছি, আমি পুরনো সহজ পুরস্কার দেবো না, আমি তোমাকে দেব নূতন কঠিন পুরস্কার।"

যেহেতু আমি তোমাকে এত ভালবাসি, তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি, যেহেতু আমি তোমার পিতাকে ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, এই যে-ঘরে বসে আমি লিখছি, সেই ঘরেই *তিনি ৯ বছর আগে বাস করেছিলেন, যেহেতু আর একজন,* যাঁকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, যিনি তোমাকে পিতার চেয়েও ভালবাসেন, যিনি স্বয়ং একটি বিরাট আহ্বান, বিরাট বিশ্বাস, তেমনি ভালবাসা—এই সমস্ত কারণের জন্য আমি তোমার উদ্দেশে এই দারুণ প্রার্থনা এনেছি; প্রিয়, আমার প্রিয় অরবিন্দ, এ সমস্ত করছি যাতে করে তুমি সেই পরম অভিপ্রায়ের বেদীমূলে নম্রচিত্তে, স্বার্থহীন প্রাণে আত্মনিবেদন করতে পারো।

চিরদিন তোমার প্রতি গভীরতম ভালবাসায় পূর্ণ—*রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।*

রেম' ও হারবার্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অরবিন্দমোহন এই দুটি চিঠির পটভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তিনি আমাকে কী অপূর্ব দুটি চিঠি লিখেছিলেন! একটি, যখন আমি বিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষায় পাশ করি (তিনি ভিসবাডেনে জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে তখন ছিলেন) এবং দ্বিতীয়টি, বি. এস-সি পাশের পরে। সে সময়ে আমরা সকলে মায়াবতীতে ছিলাম। রাত্রে সেটি লিখে পরদিন সকালে আমার হাতে দেন।"

* এ সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা পূর্বেই রিচমণ্ড নোবলের স্মৃতিকথায় পেয়েছি।

† "সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,—চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের অনুকূল স্থান;—এই ত স্বদেশের লোক—এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু *বলিতে চাহি না।*" ('আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' প্রবন্ধ)

পণ্ডিতকে "যিনি জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্মে এই হত-চারিত্র দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয়" হয়ে উঠেছেন।*

রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"আমাদের আচার্যের জয়বার্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।......

আমাদের দেশে দর্শন যে-পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেইপথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এপর্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হকস্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোনো কোনো জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীবশরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড় বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বতঃ লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই। জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবনী-শক্তির নাড়ী-স্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ অতঃপর "এই সভায় উপস্থিত কোনো বিদুষী ইংরাজ মহিলার (নিবেদিতার) বিবরণ স্থানে স্থানে সাক্ষাৎ অনুবাদ করে দিয়েছেন—

> "সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসুজায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহার পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্বপশ্চাতে আচার্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিতভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* জগদীশচন্দ্র কর্তৃক ইংলণ্ডে অধ্যাপক পদ প্রত্যাখ্যান এবং সম্ভবতঃ আবিষ্কার পেটেণ্ট করতে অস্বীকারের বিষয় ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য-প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম।" (একই প্রবন্ধ)

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙানো রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে ; এবং তাঁহার বলিবার ধরনও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থ-তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে-সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে;—অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধ প্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি।—

'I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things

—the mote that thrills on ripples of light, the teeming light on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.'

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ—শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল, পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।"

নিবেদিতা-প্রদত্ত বিবরণ রবীন্দ্রনাথকে ভাবাবিষ্ট করেছিল; ভারতের সত্য গৌরবের অনুধ্যান করেছিলেন কবি অতঃপর—

"লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি' —এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ। তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতি ক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,—আমরা অদ্য যাহাকে 'হিঁদুয়ানি' বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনামাত্র;—তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তর-নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে।...

আচার্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্মে কর্মে, সেই পথ ব্যতীত 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'"

রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত ফল হয়েছিল। অনেক বৈজ্ঞানিকের আক্কেলদন্ত গজদন্ত আকারে নির্গত হয়েছিল। তাঁদের চক্রান্তে জগদীশচন্দ্রের ডেপুটেশন-কাল বৃদ্ধি পেল না অথচ গবেষণার প্রয়োজনীয় অগ্রগতির জন্য আরও কিছুকাল য়ুরোপে থাকা দরকার—এসব বিষয়ে অল্পবিস্তর আগে জানানো হয়েছে। নিবেদিতা ও ওলি বুলকে বাদ দিলে এই কালে জগদীশচন্দ্রের প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্তো প্রথম বৈজ্ঞানিক সাফল্যের পরে জগদীশচন্দ্র যখন ১৮৯৭ সালে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দিত করতে গিয়েছিলেন তাঁর ভবনে, সাক্ষাৎ হয়নি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের নিদর্শনরূপে একটি ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল রেখে এসেছিলেন। সে-ই পরিচয়ের সূত্রপাত। তারপরে পরস্পরের দেখা হোক বা না হোক, তাঁরা কাছাকাছি থাকুন বা না থাকুন, মধ্যবর্তী ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলটির বর্ণ গন্ধ ম্লান হয়নি কখনো। সেইকালে, একদিকে কবিবন্ধুর প্রতিভায় মুগ্ধ জগদীশচন্দ্র চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় গোচর হোক বিশ্বজনের কাছে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন জগৎ-সমক্ষে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের মূর্তির উপরে যবনিকাপাত যেন না হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহির্ভারতে প্রচারের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র কতখানি উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে ব্যাপারে নিবেদিতা কতখানি সাহায্য করেছিলেন, সে বিবরণ আমরা নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে দেব। এখানে জগদীশচন্দ্রের বর্তমান সংকটে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের কথাই আলোচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই এক্ষেত্রে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি জগদীশচন্দ্রকে পাঠান, তাঁর অর্থের যখন বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্র-জগদীশ পত্রালাপের যে সব অংশ মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকে দেখতে পাই—রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের পূর্ব থেকেই জগদীশচন্দ্রের জন্য ত্রিপুরার মহারাজার কাছে অর্থপ্রার্থী। এই বৎসরের সম্ভবতঃ নভেম্বর মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে পাই—"ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আপনার কার্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরও অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।" ২০ নভেম্বর লিখেছেন—"মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুশি হলেন। আচ্ছা তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও, তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও, সেটা যদি আমরা পুষিয়ে দিতে না পারি, তাহলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন?"

চিঠির ভাষা থেকে মনে হয় জগদীশচন্দ্র নন, অন্য কেউ রবীন্দ্রনাথকে জগদীশচন্দ্রের অবস্থার কথা জানিয়ে যাচ্ছেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, কবি যেন সরকারী কাজের বন্ধন থেকে মুক্তি নেওয়ার ব্যাপারে ডঃ বসুকে উৎসাহিত করেন। তিনি কে—অবলা বসু কিংবা নিবেদিতা? বা উভয়েই? নিবেদিতা যে হতে পারেন তার প্রমাণ এর কিছুদিনের মধ্যে, রয়াল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার পরে, রবীন্দ্রনাথকে

পাঠানো নিবেদিতার বিবরণ। সে চিঠি মূলে আমরা পাইনি, এবং আরও অনেক চিঠিই নিশ্চয় পাইনি।

যাই হোক রবীন্দ্রনাথ তারপরে চিঠির পর চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে একই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। (১২ ডিসেম্বর ১৯০০, জানুয়ারী ১৯০১, ২১ মে ১৯০১, ৪ জুন ১৯০১, ২৫ জুলাই ১৯০১ ;—চিঠিপত্র—ষষ্ঠ খণ্ড)।

এর পরের কাহিনীর খণ্ডাংশ দেখা যাক—নিবেদিতার ১৯ জুলাই ১৯০১-এর চিঠি থেকে (ম্যাকলাউডকে লেখা)—

"ডঃ বসুর কাজকে যেরকম ব্যাপক আক্রমণ করা হচ্ছে তাতে আমরা অবশ্যই ভাবতে পারছি—ঐ লাইনে এতাবৎ করা এইটেই সেরা কাজ। শারীরতাত্ত্বিকেরা এমনই বিচলিত যে, চড়াই পাখির মত কিচির মিচির করছে। কখনো তাঁর গবেষণা ফলে তারা বিহ্বল, আবার কখনো বুক বাঁধছে, যেহেতু অক্সফোর্ডের বার্চ বলেছেন—ঐ একই পরীক্ষা তিনি পুনর্বার করে দেখেছেন যে, ঐ ফল হয়েছে অনিশ্চিত সংযোগের জন্যই! বার্চের মন্তব্য তাঁকে জানাতে সাহস করিনি, কিন্তু অপরপক্ষে তাঁদের সকলের কাছে তাঁর চিঠি থেকে সমূহ স্বস্তি পেয়েছি। ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁরা তাঁদের সকল প্রভাব প্রয়োগ করে আমাদের হতভাগা হিন্দুটিকে সরাসরি কলকাতায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। কুছ পরোয়া নেই, ঐভাবে ভারতের সর্বনাশ করা যাবে না। ওঁকে (বসুকে) কোনো কিছু না বলে আমি মিঃ টেগোরের কাছে লিখেছি—**কোনো হিন্দু রাজা কি এঁর এবং এঁর কাজের ভার নিতে পারেন না?**" (স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে এইকালে নিবেদিতার বিশেষ পরিচয় ঘটে, এবং বসুকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে উভয়ে একই অভিপ্রায়ে আবদ্ধ হন। চিঠিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে ১৬ জুলাই ১৯০১ তারিখে লেখা রমেশচন্দ্রের একটি চিঠি পাওয়া যায়, যাতে তিনি ইংলণ্ডে বসু-বিরোধী চক্রান্তের বিবরণ দিয়ে ডঃ বসুকে সাহায্য করা যে ভারতবর্ষের মানুষের বিরাট কর্তব্য, তা প্রবল আবেগের সঙ্গে লিখেছিলেন। এই পত্রেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে হলে ডঃ বসুর কি পরিমাণ টাকার দরকার তারও হিসাব দিয়ে লিখেছেন— "The suggestions I have made in this letter are all my own." রমেশচন্দ্রের সাজেশানগুলি ব্যক্তিগত হতে পারে কিন্তু নিবেদিতা বা অবলা বসু সবই জানতেন। ২৩ জুলাই মিসেস ওলি বুলকে নিবেদিতা লিখেছেন—

"মিঃ দত্ত আমাকে বলেছেন, তাঁর মতে, ডঃ বসুকে শৃঙ্খলমুক্ত করার সময় এসেছে। তিনি হিসাব করে দেখেছেন, কাজ চালিয়ে যেতে এবং শেষ করতে ডঃ বসুর প্রয়োজন—

সহকারীর মাহিনা ও অন্যান্য খরচ	...	বৎসরে ২০০ পাউণ্ড
যন্ত্রপাতি	...	বৎসরে ২০০ পাউণ্ড
ব্যক্তিগত খরচ, ভ্রমণাদির জন্য	...	বৎসরে ৬০০ পাউণ্ড

মোট—বৎসরে ১০০০ পাউণ্ড করে,
সারা জীবনের জন্য।

এই টাকা অ্যান্যুয়িটি হিসাবে ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এবং ২ লক্ষ টাকা হলেই তা করা যাবে। অর্থাৎ মাত্র ১৩,০০০ পাউন্ড ; তবু পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। অবশ্য আমার ভুল হতেও পারে। সে যাই হোক, গোপনে ভারত থেকে টাকাটা যাচ্ঞা করতে হবে, এবং আমাকে যাচ্ঞা-কাজে সাহায্য করতে হবে। তুমি জানো, পূর্বে তাঁর (স্বামীজীর ?) বিষয়ে টাকাকড়ির ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য ভাল, এক্ষেত্রেও হয়ত কিছু পেতে পারি। তোমার কি মনে হয় ? আমি বলেছি, ঐ ভিক্ষার কাজ আমার কাছে সর্বোচ্চ কল্যাণের কাজ হবে—নিশ্চয় তা হবে। মিঃ দত্ত আমাকে এমন সব লোকের শ্বারস্থ হতে বলতে পারেন, যাদের তিনি সহজে নিজে বলতে অসমর্থ। তিনি ইতিমধ্যেই মিসেস বসুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে মিঃ টেগোরের কাছে লিখেছেন। কিন্তু তাঁর ধারণা মিঃ টেগোর অসহায় বোধ করবেন।

এই কাজের আদর্শের দিকটিও মিঃ দত্ত উপলব্ধি করেছেন—এ কাজ করলে জাতি কতখানি লাভবান হবে, এ কাজ নবীন বিজ্ঞানকে পুরাতন বিজ্ঞানের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করে দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বলেন, কোনো 'নেটিভ গভর্নমেন্ট' (দেশীয় রাজ্য ?) এ'র ভার নিতে সাহস করবে না। হায় টাটা! হায় টাটা!

সুতরাং প্রিয়তমাসু, যে-ব্রত তোমাকে প্যারিস থেকে টেনে এনেছে—'এ'দের সংকটের অবস্থা আমরা পার করিয়ে দেব'—তাকে আর টেনে রাখার প্রয়োজন নেই।"*

---

* ঐ ২৩ জুলাই তারিখেই মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার আর একটি চিঠি আছে, যার মধ্যে মনে হয়, ডঃ বসুর আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়া সম্বন্ধে ইঙ্গিতে কিছু বক্তব্য আছে।—

"*Re the patent*: Molybdenum being absolutely neutral to electric conductivity, the curve being a straight line without deflection, this is a material of which standard high resistances can be made.

The Bairn has given you this information and more by now—but just in case—I am so pleased that you feel it was the nick of time. And I am *so so so* pleased Dearie that you are there!"

প্যাট্রিক গেডিস পেটেন্ট প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এসব বিষয়ে ডঃ বসুর উদাসীনতার কথা বলেছেন। ভারতীয় পুজামন্দিরে অর্পিত শুভ্র পুষ্পের বাল্যস্মৃতি বসুর মনে চিরদিন থেকে গিয়েছিল; তাঁর জ্ঞানসাধনা যেন ঐ রকম নিঃস্বার্থ সর্বশুভ্র হয়। তাই আবিষ্কারাদিকে ব্যবসায়ে খাটাতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। গেডিস লিখেছেন—

"In 1901, one of the great manufacturers of wireless apparatus proposed to Bose, just before his Royal Institution lecture of that year, to sign a remunerative agreement as to his new type of receiver; but to the business man's frank surprise, not to say disgust, he declined the offer. An American friend, indignant with what seemed such impractical quixotism, forthwith patented the invention in his name in America, but Bose would not use his rights, and allowed the patent to lapse."

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণেও ডঃ বসু জানান—এই বিজ্ঞানমন্দিরের আবিষ্কার পেটেন্ট করা যাবে না।

রমেশচন্দ্রের উদ্যোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল মনে হয় না। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ, পূর্ব থেকেই যিনি সাহায্য সংগ্রহে তৎপর ছিলেন, তিনি কিন্তু রমেশচন্দ্রের আশংকামত সত্যই 'অসহায়বোধ' করেননি, বরং উদ্দীপিত হয়েছিলেন।* রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে তাঁর ত্রিপুরা-সহায়কে স্মরণ করেছিলেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ আবার নিবেদিতার চিঠি পান—

"আজ মিস নোবলের চিঠিতে তোমার (বসুর) কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি।" (সেপ্টেম্বর ১৯০১)

পরের কাহিনী, রবীন্দ্র-পক্ষে—

"আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি।...তিনি (মহারাজা)) শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরও দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।" (ডঃ বসুকে লেখা, অক্টোবর বা নভেম্বর ১৯০১)

"জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে।" (২৪ শ্রাবণ, ১৩০৯)

নিশ্চয় ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ চিঠির পর চিঠিতে "আর্য আচার্য জগদীশকে" অর্ঘ্যদান করে চললেন†, এবং নিবেদিতা নিশ্চয় জানিয়ে চললেন বসুর কীর্তিকথা। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার অধিকাংশ চিঠিই আমরা পাইনি, এবং নিবেদিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিও। কবিকে লেখা নিবেদিতার যে দুটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তার দ্বিতীয়টির অনুবাদ এখানে উপস্থিত করব, যদিও আমাদের আলোচ্য পর্বের (১৮৯৯ জুন—১৯০২) অল্প পরে সেটি লেখা—১৮ এপ্রিল ১৯০৩, তারিখে। এই দীর্ঘ পত্রটিতে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ডঃ বসুর আবিষ্কারের এবং বিষয়ের বিবরণ দান করেছেন ; এমন চমৎকার

---

* রবীন্দ্রনাথ(...)অগস্ট ১৯০১ তারিখে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন—"আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তোমার প্রতি, সুতরাং স্বদেশের প্রতি, তাঁহার সহৃদয় অনুরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল।"

রমেশচন্দ্রের তৎপরতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন (২০ জুলাই ১৯০১)—"রমেশবাবুর সহিত সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার কথায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। একবার এইভাবে বাধা পাইলে যে আর ফিরিয়া যাইব না, তাহা বুঝিতে পারি। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। তোমার পত্র পাইলে স্থির করিব।"

† বাংলা দেশে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনাকে সুপরিচিত করতে রবীন্দ্রনাথ যৎপরোনাস্তি করেছেন। এ সম্বন্ধে চিঠিপত্রের (ষষ্ঠ খণ্ড) সম্পাদক জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে দুটি প্রবন্ধ লেখেন—"আচার্য জগদীশের জয়বার্তা" (বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮) এবং "জড় কী সজীব?" (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)। "বন্ধু ও আত্মীয়মণ্ডলীকেও" রবীন্দ্রনাথ এই কাজে প্রণোদিত করেন। তাঁর সহকর্মী জগদানন্দ রায় এই সময় ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 'প্রিয় সুহৃৎ' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও একাধিক প্রবন্ধে একই কাজ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বাংলায় বিজ্ঞানের লেখায় নিবেদিতা কিরকম উৎসাহী ছিলেন বোঝা যায় তাঁকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার সম্পাদিত নিবেদিতা শতবার্ষিকী গ্রন্থে (ইংরাজী) চিঠিটি মুদ্রিত হয়েছে।

সে লেখা যে, সেটি জগদীশচন্দ্রের জীবনের এক পর্যায়ের ভূমিকারূপে গৃহীত হতে পারে, এবং বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কেন ঐ কাহিনী বলবার যোগ্যতম মানুষরূপে নিবেদিতাকেই স্থির করেছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক, নিবেদিতার পত্রোক্ত বিবরণের বেশ কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই জগদীশচন্দ্রের পত্র মারফত (নিবেদিতার পূর্বেকার পত্র মারফতও) জেনে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার পত্রের শেষ অংশে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, কী আর্ত ক্রন্দন—মানবতার পক্ষে, লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের পক্ষে, অগ্নি ও অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন। অনুবাদে, আমি স্বীকার করছি, মূলের রস কিছুই ফোটেনি।

জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার চিঠি

১, ইলিসিয়াম রো,
কলিকাতা
১৮ এপ্রিল, ১৯০৩

প্রিয় মিঃ টেগোর,

অধ্যাপক বসু ঠিক ঠিক কি আবিষ্কার করেছেন এবং কোন্ অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে তাঁকে ঐসব আবিষ্কারের কাজ করতে হয়েছে, সে বিষয়ে বিবরণ লিখে পাঠাতে বলেছেন। মনে হয়, একটি চিঠির মধ্যে যতখানি লেখা যায়, সেই ধরনের বিবরণই আপনি চেয়েছেন। আরো ধরে নেওয়া যায়, এ চিঠি ব্যক্তিগত, তাই ভয় না রেখেই ইতস্ততঃ কোনো কোনো নামোল্লেখ করতে পারি, প্রকাশ্যে আমার লেখা উদ্ধৃত হবে না, এই বিশ্বাসে।

কলকাতায় আসার পরে আমি অধ্যাপক বসু ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে। মহা আতঙ্কিত হয়ে তখন দেখেছিলাম, ঐ রকম বিরাট বিজ্ঞানকর্মীকে কি ধরনের ধারাবাহিক অসুবিধা ও উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়, এবং সেইসব অসুবিধা ও উৎপীড়ন ঘটাচ্ছেন তাঁরাই যাঁদের একান্ত ইচ্ছা তাঁর কৃতিত্বের অবসান হোক, কারণ ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাছে গাত্রদাহকর। গবেষণার সময় যাতে তিনি না পান তার জন্য কলেজ-রুটিন যতখানি সম্ভব শ্রমসাধ্য করা হয়েছিল, এবং সামান্য যা-কিছুই ঘটুক না কেন, তার জঘন্য কদর্থ করা ও বিরক্তিকর চিঠি লেখালেখিতে তাঁকে বাধ্য করা হত।

এসব জিনিস আপনার চোখে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু যে-কাজের জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ব্যাপক ও ধারাবাহিক ভাবাবেগের প্রয়োজন হয়, সেখানে স্বাধীনতা ও শান্তির কতখানি প্রয়োজন সে বিষয়ে যদি আপনার কোনো ধারণা থাকে (তা অবশ্যই আপনার কাছে), তাহলে নিশ্চয় বুঝবেন, আমাদের-বন্ধু যে, কাজ করে যেতে পেরেছেন এবং পারিপার্শ্বিকের ঐ চেহারা সত্ত্বেও সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন—কী অপূর্ব ব্যাপার তা! আমেরিকান বা ইংরেজ, ফরাসী বা জার্মানদের মত স্বাধীন দেশের লোকেরা ডঃ বসুর তুল্য বৈজ্ঞানিককে স্বজাতির মধ্যে পাবার জন্য সানন্দে যেখানে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে, সেখানে

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ হওয়া সত্ত্বেও ওহেন বিরাট বৈজ্ঞানিককে একেবারে একাকী কাজ করতে হচ্ছে—স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম এই দৃশ্যে। আমি তখন ইউরোপ থেকে সবে এসেছি; খনিজ দ্রব্য ভেদ করে যায়, এমন ঈথার-তরঙ্গের আবিষ্কারক-রূপে সেখানে তাঁর নাম সুপরিচিত। ইউরোপে তাঁর কাজের সংবাদ বিলম্বে পৌঁছেছিল। রণ্টেজেন রশ্মির সঙ্গেই তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর আবিষ্কার আরও গভীরে প্রবেশে সমর্থ, কারণ রণ্টেজেন রশ্মি অস্থি ও ধাতুতে প্রতিহত হয় কিন্তু এ'র আবিষ্কার তাদের ভেদ করে যায়। যতদূর মনে হয়, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই তিনি কলকাতার টাউন হলে ঐ অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্ব যন্ত্রযোগে প্রমাণ করেছিলেন, এবং তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের দু' বছর পরে, ইটালীর কিছু বৈজ্ঞানিক কাগজে দেখা যায়, মার্কনি ঐ রশ্মিকে ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন।

আপনি অবশ্যই বুঝবেন যে, বিজ্ঞান জগতে মার্কনি, টেসলা, ম্যাসিন ধরনের উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকদের স্থান ডঃ বসুর মত সন্ন্যাসী-মনের সন্ধানীদের তুলনায় অনেক নিম্নে। সন্ধানীদের কাছে জ্ঞানই একমাত্র লক্ষ্য, জ্ঞানের জন্যই তাঁরা জ্ঞানের অন্বেষণ করেন। এমন কি অধ্যাপক (অমুক) পর্যন্ত পেটেণ্ট নিয়ে, বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের বিরাট সুনামের ক্ষতি করেছেন, যাতে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যাই হোক, ডঃ বসু এই বিশেষ ঈথার-তরঙ্গের অস্তিত্বই কেবল প্রদর্শন করেন নি, গবেষণার বিরাটত্বের মতই তিনি নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিরাটত্ব দেখিয়েছেন,—'কৃত্রিম চক্ষু' নামে পরিচিত তাঁর যন্ত্রটি সরল ও সংহত রূপের জন্য অত্যাশ্চর্য বস্তু বলে গৃহীত হয়েছে। প্রিন্স ক্রপটকিন বলছিলেন, অধ্যাপক টমসন এক সপ্তাহ আগে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে আলোকের পোলারাইজার-এর কাজ করছে এমন একটি কয়েক গজ দীর্ঘ যন্ত্র দেখালেন,—পরের সপ্তাহে ডঃ বসু সেই একই কাজ করলেন, অন্য কিছুর দ্বারা নয়, কেবল একখানি বই তুলে নিয়ে দেখালেন, (ঘটনাচক্রে সেটি একটি ব্রাডশ!) কিভাবে রশ্মি এক দিক দিয়ে যাবে, অন্য দিক দিয়ে নয়। প্রিন্স ক্রপটকিন বললেন—"আমি নিজের মনে বললুম, এই হল সর্বোচ্চ প্রতিভার যোগ্য সহজতা।" ডঃ বসুর পদ্ধতি যে এমন আশ্চর্যরকম সহজ হতে পেরেছে, তার মূল কারণ অবশ্য—তাঁর থিয়োরী সমক্ষেত্রের ইংরাজ ও জার্মান প্রতিযোগীদের তুলনায় বহু গুণে উন্নত।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আমার বিশ্বাস তিনি রয়াল সোসাইটি মারফত পেপার প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে সর্ববিধ অসুবিধার মধ্যে কাজ করেও প্রতি বছর দুটি কি তিনটি পেপার প্রকাশ করে গেছেন—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যাওয়া পর্যন্ত এই রকমই চলে। (সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি যদি ২ বৎসরে একটি পেপার প্রকাশ করতে পারেন, সেটা উত্তম কীর্তিরূপে গৃহীত হয়!) আবার অধ্যাপক বসুর কাজ প্রতি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণভাবে মৌলিক এবং এক বিশেষ অর্থে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসম্পন্ন। একটি আশঙ্কায় তিনি সর্বদা তাড়িত হয়েছেন—যদি কোনো একটি ক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হন, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় তাঁর দেশবাসীর কোনো অধিকার নেই—তাই যেন প্রমাণিত হয়ে যাবে। লণ্ডনে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রোগশয্যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, সেইসঙ্গে সর্বশেষ

আবিষ্কারসমূহকে প্রকাশের লড়াইও চলছে, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন—"সবাই জানে আমাদের অপূর্ব কল্পনাশক্তি রয়েছে, কিন্তু আমাকে অধিকন্তু প্রমাণ করতে হবে, নিখুঁত কাজের ক্ষমতা এবং নাছোড় লেগে থাকার ক্ষমতাও আমাদের আছে।" তা তিনি সত্যই প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড র‍্যালে এবং স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্, উভয়েই তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর পদ্ধতি যে নিখুঁত, সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না, এবং তিনি ১৮৯৫—৯৬-তে যে এক্সপেরিমেণ্ট দেখিয়েছেন, ১৯০১ সালেও তার পুনঃসম্পাদন করতে আর কেউ সমর্থ হল না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষতা বটে।

১৮৯৪ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়ের কাজ : অদৃশ্য আলোক-পোলারাইজেশনের উপর ডজনখানেক কি তারও বেশী স্বতন্ত্র অনুসন্ধান। 'Dark cross'-এর অস্তিত্ব প্রমাণ ও অন্যান্য মূল্যবান কাজ—ইউরোপের অগ্রসর কর্মীদের কাছে বহুল ইঙ্গিতসূচক,—যাঁরা এঁর থিয়োরী এবং যন্ত্রাদি থেকে সূত্র গ্রহণে বিলম্ব করেন নি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কিন্তু স্পষ্টতঃ এইসকল বিচ্ছিন্ন কাজগুলি বিরাট এক সাধারণীকৃত রূপের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে, যার সর্বাঙ্গসম্পন্ন রূপকে এখনো জগতের গোচর করা হয়নি, যখন করা হবে তখন থেকে উত্তরোত্তর তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর দর্শন-গত আগ্রহের সৃষ্টি করবে।

'Stress and Strain' -এর বিরাট থিয়োরীর ইঙ্গিতই আমি এখানে করছি। একে প্রকাশ করার মত সময় এবং সামর্থ্য যদি তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন, তাহলে তা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতই যুগান্তকারী আবিষ্কার হবে—পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতের যোগ্য উপহার হবে তা।

এই ব্যাপক সত্যের গৌণ প্রয়োগই ইতিমধ্যে প্রভূত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—এর সূত্রে প্রথম যে আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তা হল— 'Binocular Alternation of Vision'. আর একটি অধিকতর ব্যবহারগত (অর্থাৎ ব্যবসায়িক) আবিষ্কার ঘটিয়েছে—বেতার সংকেতের গ্রাহকযন্ত্রের উন্নতি ; লজ্-এর সহযোগী ডঃ মুরহেড খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন, এই পদ্ধতির ক্রমোন্নত যে ব্যবহার ইদানীং ভারতে করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ডঃ বসুর পেপারগুলি ও কথাবার্তা থেকে তাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত লাভ করেছেন। এই থিয়োরীর বৃহত্তম প্রয়োগ অবশ্য খাঁটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই। ফটোগ্রাফির মধ্যে, রসায়নের মধ্যে এবং 'Molecular Physics'-এর মধ্যে যে আপাত বৈষম্যের রূপ রয়েছে, তার রহস্যসূত্র এর মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, এর থেকে 'Vegetable Response' নামক ব্যাপারের আবিষ্কার ও সূত্র নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছে। ডঃ বসুর এই মতবাদ, এইসব ক্ষেত্রের নানা ছোটখাট হবু থিয়োরীকারদের অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করেছে, এবং সেইজন্যই যে-সব শারীর-তাত্ত্বিক প্রাণের অনন্য স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে ব্যস্ত, তাঁদের তরফ থেকে কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে। এই বিরোধিতা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। এবং সাধারণতঃ এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বৈজ্ঞানিক নিজের বিরাটত্ব প্রমাণ করেন, এবং বিরোধীদের জয় করেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানগত বিরোধিতার সঙ্গে প্রচণ্ড জাতিবিদ্বেষও যুক্ত হয়েছে ; এবং আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, এইসব লোকই ইণ্ডিয়া অফিসে তদ্বির করে ডঃ বসুর ডেপুটেশন-বৃদ্ধির প্রস্তাব রদ করেছেন, ঠিক সেই সময়টিতে, যখন

ডঃ বসুর মত প্রচারিত ও পরিজ্ঞাত হতে আরম্ভ করেছে এবং তাঁর বই প্রকাশিত হয়নি।

যে-বিশেষ লোকটিকে আমি সন্দেহ করি তিনিই নভেম্বর মাসে ডঃ বসু ভারতে আছেন জেনে (যাঁকে যথার্থতঃ জোর করে ভারতে পাঠান হয়েছিল) তাঁর কিছু আবিষ্কার চুরি করেন ও নিজের নামে প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞান-জগতে ডঃ বসুর নাম এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ঐ ব্যক্তি ছোট একটি দল গঠনে সমর্থ হয়েছেন ; তবু যদি উপযুক্তভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বিশ্বাস করি সহজেই তাদের তুচ্ছ করে দেওয়া যাবে।

Response in Living and Non-living বইটির এখন জয়জয়কার। কিন্তু আমি আরও অনেক বড় কাজ চাই—যা কেবল এই ভারতের বৈজ্ঞানিকই লিখতে সমর্থ, সে বই হবে 'Molecular Physics'-এর উপরে, তার মধ্যে ভারতের যে-বিরাট মন উপনিষদের যুগে সকল মানবজ্ঞানকে পরিক্রমণ ক'রে তাকে অদ্বৈত বলে ঘোষণা করেছিল, সেই মনই ঊনবিংশ শতাব্দী যে-বিরাট বস্তু-পুঞ্জকে সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করেছে, তাকে পুনশ্চ দর্শন করে, নিছক অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী, যন্ত্র-উপাসক, স্বর্ণ-শিকারী পাশ্চাত্যের কাছে পুনরায় ঘোষণা করবে—বহুরূপে প্রতিভাত এই বস্তুসত্য মূলে সেই এক—অদ্বৈত।

কিন্তু বুঝতে পারি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-ধরনের একটা কাজ আরম্ভ করার অনুরোধ পর্যন্ত করা যায় না। পূর্ণ সহানুভূতি এবং সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার যেখানে একান্ত প্রয়োজন, সেখানে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, যেহেতু চাকুরিয়া অতএব ব্যতিব্যস্ত-করা কাজের দায়, অন্নসংস্থানের নিত্য চিন্তা, ক্ষুদ্র ঈর্ষার উপরে ওঠার ক্ষমতা নেই এমন সামান্য আমলাদের সৃষ্টি-করা নানা অসুবিধা,—এও কি যথেষ্ট নয়? তথাপি আমরা তাঁকে বিরাট কাজে হাত দেবার অনুরোধ করি! কিন্তু তাঁর জন্য কতখানি করতে প্রস্তুত আমরা? আমরা কি তাঁকে এমন জ্ঞান-সঙ্গী দান করতে পারি, যিনি প্রেরণা দিয়ে এই কঠোর শ্রমসাধ্য কাজে উৎসাহিত করবেন? একথা কি আমরা কখনো গভীরভাবে ভেবেছি যে, বর্তমান ভারতে একমাত্র তিনিই প্রথম শ্রেণীর কাজে লিপ্ত আছেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁর পদে কাজ করতে রাজি হবে এমন যে-কোনো ইংরেজের, অতি সাধারণ ইংরেজের চেয়েও তিনি কম মাইনে পান?

লন্ডনের ডাঃ গারনেট আমাকে ভিয়েনার সুমহান বিজ্ঞান-কলেজের বিরাট জাঁক-জমকের কথা বলেছিলেন। সেই দেখে, তিনি যখন সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, কী বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার!—তখন সরকারী প্রতিনিধি সগর্বে বলেছিলেন, যদি এখান থেকে সারা শতাব্দীতে একজন যথার্থ বৈজ্ঞানিকও জন্মান, তাহলে তার তুলনায় এই সমস্ত ব্যয় সামান্যই। আমাদের মধ্যে এমন কথা বলবার মত কে আছেন?

ভারত! হে ভারত! তুমি কি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ একটি সন্তানকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে পারো না, যা তাকে বিশ্রাম দেবে না, ঠেলে দেবে যুদ্ধক্ষেত্রে তোমারই জন্য সংগ্রাম করতে— যেখানে আগুন জ্বলছে লেলিহান, পাগল হয়েছে সংঘাত, এবং ঘর্মে ও শ্বাসে চলেছে দারুণ প্রয়াস। হে ভারত, যদি তুমি তা করতে না পারো—যদি তুমি নিজ সন্তানকে পর্যন্ত আশীর্বাদ ক'রে সজ্জিত আকারে

রণক্ষেত্রে পাঠাতে অসমর্থ হও—তাহলে এই বড় অসুখী অথচ বড় ভালবাসার দেশটির আসন্ন সর্বনাশ বিলম্বিত হোক, স্তব্ধ হোক নিয়তির সমুদ্যত বজ্র—তা বলবার কি কোনো অধিকার আমাদের থাকবে?*

প্রিয় মিঃ টেগোর, খুবই অসম্পূর্ণ এই কথাগুলি। কিন্তু ইতিমধ্যেই নোট বইয়ের অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যবহার করেছি, সুতরাং এখানে চিঠি শেষ করতেই হচ্ছে।

আপনার চির বিশ্বস্ত—
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থরচনায় নিবেদিতার সাহায্য :
ডঃ বসুর সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রবন্ধ ও বক্তৃতা

জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ

রয়াল সোসাইটির বৈজ্ঞানিক মুখপত্রে জগদীশচন্দ্রের পেপার প্রকাশ যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন জগদীশচন্দ্র গ্রন্থাকারে তাঁর গবেষণা প্রকাশ করবেন স্থির করেছিলেন একথা আগেই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চয় নিবেদিতা ও মিসেস বুলের পরামর্শ পেয়েছিলেন, সাহায্য তো নিশ্চয়ই। ১৯০১ সালের অনেকখানি অংশ ধরে গ্রন্থরচনার কাজে নিবেদিতা সাহায্য করেন, এবং এই কাজে ব্যাপৃত থাকাই তাঁর ভারতযাত্রাকে বিলম্বিত করেছিল। জগদীশচন্দ্র তাঁকে ছাড়তে মোটেই রাজি ছিলেন না, এমনকি মিসেস ওলি বুলও নয়।

জগদীশচন্দ্রের *Response in the Living and Non-Living* নামক বইটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করা হয়েছিল দেশবাসীর উদ্দেশ্যে—

To my Countrymen
This Work is Dedicated.

উৎসর্গপত্রের বাঁ দিকে ছিল ঋগ্বেদের বাণী—

"The real is one: wise men call it variously"—Rig Veda.

* এই অনুচ্ছেদটির অনুবাদ নিতান্ত অসন্তোষজনক, তাই মূলও উদ্ধৃত করছি—

"Ah India! India! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,—not to sit at ease, but—to go out and fight your battles where the fire is hottest and the labour most intense, and the contest raging thickest? And if you cannot do this—if you cannot even bless your own child and send him out equipped, then,—is it worth-while that the doom should be averted, and the hand of ruin stayed, from this unhappy and so beloved land?"

বইটির ১৯১০ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল—২০+১৯১। নক্সা ও ছবি ছিল—১১৭।

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে নানা সময়ে দেশবিদেশের নানা পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, একথা বিক্ষিপ্ত সূত্রে শোনা গেছে, এবং নিবেদিতার জীবনীকারেরাও বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটি ছাড়া আমরা দ্বিতীয় কোনো রচনা আবিষ্কার করতে পারিনি। এখানে শুধু এইটুকু বিনা দ্বিধায় বলা চলে, সংবাদপত্র জগতের সঙ্গে নিবেদিতার যে-রকম ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং সংগঠনে তিনি যেরকম পারদর্শী ছিলেন, তাতে স্বনামে ছাড়াও বেনামে তিনি নিশ্চয় লিখেছেন, কিংবা অপরকে লিখতে প্রণোদিত করেছেন।

রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় নিবেদিতার রচনা

অনেক সন্ধানের পরে জগদীশচন্দ্রের বিষয়ে নিবেদিতার যে প্রবন্ধটি আবিষ্কার করেছি, সেটি ইংলন্ডের সুবিখ্যাত 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২-এর অক্টোবর সংখ্যায়। লেখাটির পিছনে অনেকখানি কাহিনী আছে—নিবেদিতার পত্র থেকে তার ক্রমিক বিবরণ পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য রিভিউ অব রিভিউজের সম্পাদক উইলিয়ম স্টেডের সঙ্গে আগে থেকেই নিবেদিতার পরিচয় ছিল। এ-বিষয়ে নিবেদিতার পত্র—

১ মার্চ ১৯০১, ম্যাকলাউডকে : "মিঃ স্টেড প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ডঃ বসুর 'চরিত-চিত্র' ছাপাবেন,* যা জীবন্ত ভারতের ছবি ফোটাবে।"

২২মার্চ একই জনকে : "চরিত-চিত্র নিয়ে এগোচ্ছি। এ ব্যাপারে তুমি উৎসাহ দিয়েছ, কল্যাণ হোক তোমার।"

১০ জুন, একই জনকে : "ডঃ বসুর চরিত-চিত্র আমি ঠিকই লিখেছি। তা এখন মিঃ স্টেডের হাতে। এটা মনোনীত হতে পারে।"

১৯ জুলাই, একই জনকে : "চরিত-চিত্র আমি লিখেছিলাম এবং কাজটা বিরাট দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এখন মিঃ স্টেড তা প্রত্যাখ্যান করছেন, এই কারণে যে, এতে ভারতবর্ষ বড় বেশী, ডঃ বসু বড় কম। যাইহোক, আমি আবার লিখছি, শেষ পর্যন্ত গৃহীত হবে এই প্রত্যাশায়।"

২০ জুলাই, মিসেস বুলকে : "বসুর চরিত-চিত্রের পুনর্লিখন সম্পন্ন হয়েছে। মিঃ স্টেডের চিঠি পুনরায় যখন পড়লাম, নিজেকে কি রকম যে বোকা স্বার্থপর মনে হল কি বলব। অবশ্যই তিনি, যদি চান, 'ভারত' অংশ বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অংশ

---

* রিভিউ অব রিভিউজে প্রায় প্রতি মাসে সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তির বহু চিত্রসংবলিত বিস্তৃত জীবনচিত্র ছাপা হত। কেউ খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিবেচিত হলে তবেই তাঁর চরিত-চিত্র ছাপা হত।

প্রকাশ করতে পারেন, তাতে আমি একটুও কিছু মনে করব না। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় করে সাক্ষাৎ করো। কেবল তিনি খোকাকে (বসুকে) কোনভাবে ভেঙে চুরে দেখাতে পারবেন না কিংবা আমাদের দুজনের কোনো একজনকে না দেখিয়ে কাজ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলো।......

চরিত-চিত্র হয়ে যাবার পরে বইয়ের ('দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ') কোন্ অধ্যায় আসবে বুঝতে পারছি না, সম্ভবতঃ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের অধ্যায়। এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমি সর্বদা মোহ বোধ করি। কিন্তু ডঃ বসুকে এবিষয়ে কিছু না বলাই ভাল—তিনি অত্যন্ত চটে যাবেন।"

২৩ জুলাই, মিসেস ওলি বুলকে : "চরিত-চিত্র নতুনভাবে করতে আমি সবিশেষ চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখলাম এখানে আসল পাণ্ডুলিপিটি নেই, কেবল কতকগুলি খসড়া কাগজপত্র রয়েছে। আসল লেখাটা নিশ্চয় উইম্বলডনে গ্লাস-কাবার্ডে রয়ে গেছে। সত্যই কাজটা আর করতে পারলাম না। মনে হয় সবচেয়ে সহজ কাজ হবে— বর্তমান আকারটিকে ভাগ করে তার মধ্যে সাক্ষাৎ চরিত্র সম্বন্ধে নতুন অংশ যুক্ত করে বলা—কিভাবে, কোন্ ভিত্তিতে ঐ চরিত্রের অভ্যুদয় হয়েছে। মূল অসুবিধা ঘটাচ্ছে আমার এই প্রবল বিশ্বাস : ঐ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অলৌকিক সৌন্দর্যে ও পবিত্রতায় সমমূল্য। প্রার্থনা করো, আমি যেন সেই উপনিষদ রচনার পরম অধিকার পাই যার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতি তাঁকে স্মরণ করবে।"

যে বিশাল কল্পনা ও আবেগ নিয়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর চরিত-চিত্র এঁকেছিলেন, উইলিয়ম স্টেডের সাংবাদিক বুদ্ধি সকল ভারতপ্রীতি সত্ত্বেও তার পূর্ণ মূল্য স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না। নিবেদিতা যেভাবে লিখেছিলেন, সেভাবে ছাপা হয়নি, এবং বড় দুঃখের কথা, মূল লেখাটির সন্ধান আমরা পাইনি। নিবেদিতার লেখাটি খণ্ডিত এবং পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল—'চরিত-চিত্র' রূপে নয়—জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থের আলোচনা রূপে। লেখার শেষে নিবেদিতার নামের আদ্য অক্ষর ছিল—M.N. সম্পাদক সূচনায় প্রশংসা করে বলেছিলেন, যোগ্য জনই এটি লিখেছেন। জগদীশচন্দ্রের পোরট্রেট এবং অনেক বৈজ্ঞানিক নক্সা লেখাটির মধ্যে ছাপা হয়।

THE BOOK OF THE MONTH

Is Matter Alive? By Professor Bose

[Messrs. Longmans, Green and Co. publish this day (October 15th) a scientific work by Professor J. C. Bose, B.Sc., London, of Calcutta University, which, under the simple title of "The Response of Matter", establishes the very startling truth that what we call dead matter can be proved to be alive!

He does not go so far as to suggest that a piece of steel has either sex or soul, or heart or mind, or consciousness. But he

does prove thatinorganicsubstances are capable of feeling to an extent which enables them to make that distinct and registrable response to external stimulus which has hitherto been regarded as the distinctive sign of life.

The following account of the discovery of Professor Bose, written by a competent hand, is illustrated, by permission of the publishers, with blocks appearing in the book.]

Ever since the birth of modern science men have been fascinated by the difference between the organic and the inorganic. The mystery of life, and pre-eminently of animal life, has attracted as many inquirers as ever did the quest of the philosopher's stone. For it seemed to imply a far greater miracle. Its myriad individuality; its eager movements; its peculiar forms; its growth of large from small, and back to embryo again; its persistence of species combined with its rapid evanescence of individuals; above all, its possession of consciousness, rising into thought and knowledge—these and other characteristics make up a phenomenon so complex and stupendous in its seeming unlikeness to all else in Nature, that, in the first enthusiasm of science, living things were inevitably assigned a place by themselves and a terminology of their own.

But alluring as was the task of dissecting out the mighty puzzle and putting it once more together, the scientific intellect had time after time to turn back from the attempt which it had already felt was foredoomed to failure. There were plants that moved visibly and animals that never moved at all; and the very existence of the science of organic chemistry is an abiding protest in chemical regions against the arbitrary distinction between living and non-living products.

IF RESPONSE IS A SIGN OF LIFE—

Yet there was one criterion of life which seemed to stand persistently alone. This was the characteristic of irritability, or power of responding to stimulus. You pinch your arm. There is an immediate response in the feeling of pain. In response to the stimulus something is sent along the nerve to the brain, which causes the sensation. In fact, we have here something like an electric circuit, the effect of a shock in any part of the body being sent along the conducting nerve to the detecting brain. If an isolated piece of muscle or nerve be connected with a detector of electric current—a galvanometer—then each time a muscle or nerve is stimulated by a pinch or shock of any kind the thrill of response is betrayed by an electric pulsation. These electric pulses give a faithful indication of the "livingness" of the tissue. When the tissue is killed the electric pulse ceases to beat. We can thus read the history of the life-process autographically recorded before our eyes; we can watch the diminishing pulsation with the waning

of life and the final arrest at the moment of death. The up-and-down curve of : throbbing life is replaced by a line of immobility at the moment when it passes into non-life.

— THEN METAL IS A LIVING THING !

Thus the pulse of electric response is regarded as the criterion between the living and non-living. When it is not found, we are in presence of death or else that which has never lived. A living thing is responsive, a dead thing is not. The living response with the attendent phenomena of sensation were supposed to be due to the working of a mysterious "vital force" which found its dwelling-place in the living.

Alas, however, for human boastfulness! Since as the result of the latest discovery it appears that this harmless little arrogance of man eager to believe that his corporeal brain and frame obey laws different from, and greatly superior to, those which govern the mineral world—this seemingly innocent morsel of ignorant vanity is about to be refused to us. For as regards response, the gulf that yawned between vital and non-vital has been bridged, and the bounds of sympathy are pushed into a new domain by proofs that the responsive processes seen in life have been foreshadowed in non-life, and that even metals respond precisely in the same way as human beings!

It is too early as yet to estimate the full significance of such a discovery. The unity proclaimed is far-reaching and marks an epoch in scientific thought.

THE DISCOVERER OF THE LIFE OF METALS

Dr. Jagadis Chunder Bose, to whom we owe this discovery, is the professor of science at the University of Calcutta.

After taking his degree in Calcutta, he own entrance as a scholar at Christ's College, Cambridge, in the year 1881. His course there ended in 1884 with his taking simultaneously the Natural Science Tripos and the London B.Sc. Degree, and he returned to India to receive—thanks to the interest of Lord Ripon, then retiring—the Chair of Physics in the Presidency College, Calcutta.

Ten years later his work won the recognition of the Royal Society, which published his paper on the "Determination of the Indices of Refraction of various substances for the Electric Ray." In the year 1896-97 Professor Bose spent nine months in this country on his first scientific deputation from the Government of India. During this period he received the degree of D.Sc. of the University of London in recognition of the value of his research. The scientific world, both in England and on the Continent, was greatly interested in his apparatus for the detection and measurement of the properties of invisible light.

Since his return to India in 1897 Professor Bose's investigating energy must have been redoubled, to judge from its results. It was therefore inevitable that he should be sent once more to Europe by the Government of India as a delegate to the international Scientific Congress held in Paris two years ago. This was specially due to the great interest taken in the cause of scientific progress by Sir John Woodburn, the Lieutenant-Governor of Bengal. The first account of Professor Bose's discovery—the Responsive Power of Inorganic Substances—was thus announced before the Paris Congress, a full account of which appeared in the Transactions of the Congress. Since reaching England he has pursued the many-sided outcome of his enquiry, and his communications have been published in the Proceedings of the Royal Society. In May last year he delivered a Friday evening discourse at the Royal Institution dealing with the responsive phenomena in the living and non-living. He subsequently undertook an extensive inquiry on the response in the transitional world of plants, and an account of this work has been published in the Journal of the Linnaean Society.

CHARACTERISTICALLY HINDU

Finally, it is not the least remarkable fact about his great theory of stress and strain that this comprehensive conception should have revealed itself to a Hindu mind. For the doctrine means simply that molecular action is one in all matter, living and non-living. And here Dr. Bose appears to have come, without intention, and working by the most modern methods, on the time-honoured goal of his people's effort. Dr. Bose's discovery is in some special sense the contribution of his whole race. We are told of a certain Madonna of Cimabue's that it was carried in triumph about the streets, and old men in Florence wept for joy that they had lived to see such an advance in the painting of human emotion. Some such relation exists in this case between the regional thought and interest of the Hindu people and this scientific achievement of their fellow-countrymen. For if the simple ryot in his fields and the grain-seller in the Bazaar could but master that technical jargon in which the man of science feels that his ideas must be buried—could but understand the concrete picture of the creation which *Stress and Strain*—suggests they would say quietly, "yes, that *must* be true!" Surely there are few instances of the dramatic fitness in the history of science to parallel this.

HIS WORK ON ELECTRIC WAVES

It will be interesting to say a few words of Professor Bose's previous work on electric waves, from which he was unexpectedly led to his present line of investigation. It was the English

physicist Maxwell who from theoretical considerations first came to the conclusions that light was a kind of electric vibration, to all but a single octave of which the human eye was blind. (Similarly with the ear, there are whole ranges of sound inaudible to us; it is probable indeed that certain notes reach the insects which we shall never hear!) Hertz, in Germany, was able to produce electric waves by rapid electric vibration and narrowly anticipated in this Sir Oliver Lodge, the eminent English physicist. It is by means of this invisible light, sweeping through space with incredible swiftness in its mighty billows, that wireless messages are sent. Thus, with the discovery of electric vibration new realms of radiance possessing wonderful and unknown properties were opened out.

Naturally the great difficulty in investigating these rays arose from their invisibility. Some apparatus was required which would serve to detect them. Branly, in france, observed that the shock of electric waves produced changes in metallic particles by which their power of conducting the electric current became increased. What these changes might be remained a mystery, but it was evident that by this means detectors of electric waves could be made. At first, however, these detectors or receivers proved very capricious in their action, but Professor Bose succeeded in producing a type of receiver which was quite consistent in its working. He was also able to construct a very perfect electric wave apparatus with which the various properties of invisible light could be studied and measured. It was the wonderful performance of this instrument that surprised and delighted the leading *savants* who were amongst his audience at the Royal Institution five years ago. He took various so-called opaque objects—a book, human hair, blocks of wood, and so on—and producing electric waves with the help of his apparatus was able not only to show that rays passed through these masses, but also to measure the angle at which the unseen light become bent in its transmission. With unfailing certainty also the existence of hidden strains within opaque masses was detected by the same means.

"THAT TIRED FEELING" IN METALS.

It was said that the precise nature of the changes made by invisible light on the mass of metallic particles which constitute the receiver remained a mystery. In practical application this fact had a grave drawback. After receiving a signal, the detector would become fatigued from the strain, and a tap had to be given to revive it. The whole thing went by rule of thumb. If the receiver was to be made more sensitive so that messages could be recorded from a greater distance and with greater speed, it must be self-recovering, so as to do away with

the contrivance of tapping. To bring out any improvement, therefore, it was clearly necessary that the theory of the receiver should be properly understood.

In the course of a lengthy research, in which a very patient and wearisome investigation had to be made of all the elementary substances, Professor Bose lighted on several which exhibit self-recovery, and of which therefore receivers could be made which would require no further tapping. He came to the conclusion, indeed, that the whole question was one of overstrain. This is seen on some materials like lead wire, which become easily overstrained, while others, such as a steel spring, exhibit greater elasticity, and therefore more easily recover from the effect of strain.

SENSITIVE ARTIFICIAL ORGANS.

It was while working on his theory of the effect of external stimulus on matter that he was led on to a new line of investigation, the outcome of which was the construction of artificial organs which stimulated the action of our sense organs. These artificial instruments transmitted the impressions received from without to be recorded by suitable electric recorders, just in the same way as our sense organs, the eye, for example send in messages received from the outside to be recorded by the brain. It is hardly to his mind a question of similarity, but rather of identity.

For what is the distinctive characteristic of life? Is it not the power to respond to external stimulus? We pinch or pass an electric shock through the arm, and a visible twitch shows that the muscle is still living. A dead body does not respond when pinched or shocked; the sudden twitch is thus an indication of life. Physiologists make the twitching muscle record its autograph on a travelling strip of paper, and the autographic record tells the history of the muscle, the story of its stress and strain. When it is fresh the writing is bold and strong, as fatigue proceeds it becomes indistinct, and when the muscle dies the record comes to a stop.

These are, however, but gross indications of the vital condition. There are other and subtler processes which can not be so easily detected. Nervous impulses, for instance, are transmitted without any visible changes in the nerve. Yet when a flash of light falls on the eye, something is sent along the optic nerve to the brain, there to be interpreted (or recorded) as visual sensation. This visual impulse, produced by the stimulus of light, is an electric impulse. Whenever a shock or disturbance impinges upon a bundle of receivers in the human body, an electric thrill is produced and courses along the nerves which are but telegraphic wires, to the central station, the brain.

THE NERVOUS SYSTEM OF METALS.

These electric pulsations are regarded as the signs of life. External stress, like light and sound, gives rise to them, and the electric currents thus set up excite the brain and cause sensation. But when any organism dies, accidentally or otherwise, the living mobility of its partitles ceases, the stress-pulses can no longer be sent along the nerves, and there is an end of response.

The electric twitch in answer to external stress is thus the perfect and universal sign of life, and the autographic records of these electric twitches show us the waxing and waning of life. Their gradual decline shows the effect of fatigue, their exaltation the climax of artificial stimulation, rapid decline the anaesthetic action of choloroform, total abolition the end of life.

But is this electric response, the sign of life, entirely confined to what we call living things? Is it quite wanting in what we know as the inorganic?

By means of Dr. Bose's instrument this question can be answered definitely, for when the metals were stimulated by a pinch, they also made their autographic records by electric twitches, and thus, being responsive, showed that they could in no sense be called "dead"! Nay, more, it was found that given the records for living muscle, nerves and metals, it was impossible to distinguish one record from the other for the metals also, when continuously excited, showed gradual fatigue; as with ourselves, so with them, a period of repose revived their power of response, even a tepid bath was found helpful in renewing vigour; freezing brought on cold torpidity, and too great a rise of temperature brought heat rigor.

METALS CAPABLE OF DEATH

It is said, however, that the ultimate sign of life is inevitable death. An animal is living as long as it is capable of dying. It is true that death can be hastened by poison. Then can the metals be poisoned? In answer to this was shown the most astonishing part of Professor Bose's experiments. A piece of metal which was exhibiting electric twitches was poisoned; it seemed to pass through an electric spasm, and at once the signs of its activity grew feebler, till it became rigid. A dose of some antidote was next applied; the substance began slowly to revive, and after a while gave its normal response once more!

But if the inorganic be indeed touched with this glimmer of living response, then it ought to be possible to construct artificial organs of perception. Of all the organs we possess none is so wonderful as the eye. Professor Bose therefore turned his

attention to the construction of an artificial retina which would respond to light. But this particular organ has one advantage over the human eye, inasmuch as its sweep of vision is practically unlimited, detecting waves of invisible as well as visible light, whereas we are confined to a single narrow octave.

HIS ARTIFICIAL EYE

It was while he was striving to interpret the hieroglyphic records of his artificial eye that Professor Bose came upon certain hitherto unnoticed and extraordinary phenomena of human vision Forif the action of the artificial corresponded with that of the real eye, then the peculiarities of both must be present in each. It may be said that according to the stress and strain theory, the sensitive elements in the retina respond to light simply because they are strained or disturbed by it, as a wire is strained by twist. Just as on the removal of twist the wire continues to vibrate, so do the strained particles in the sensitive retina go on oscillating, and thus send pulsating currents to the brain. These pulsating currents, again, cause a pulsating visual sensation. For if one look at a bright object, then shut the eye, the bright object looked at will appear and disappear several times in succession. These "sight echoes" are very persistent, and form the incipient stage of the process we call memory.

WHY WE HAVE TWO EYES

Another fact discovered from the clues given by the artificial retina is that when we look at any object the two eyes do not, at any given instant, see equally well but each takes up the work of seeing and resting alternately. One falls asleep, as it were, while the other is waking to its maximum consciousness, and then *vice versa.*

Thus Professor Bose was led to the paradoxical statement that under certain circumstances we can see much better with the eyes closed than with them open. To prove this it is only necessary to look at the light through a modified stereoscopic apparatus in which, instead of photographs, we have placedtwo different inscriptions.

On looking through this one finds the two images superposed, making a blurr. But on shutting the eyes the tangled writing is unravelled and the constituent parts of a sentence are read clearly by the brain.

Thus sight lends itself to interpretation by the process of strain and self-recovery amongst sensitive atoms and what is true of the complex organism of the eye is found common to all nerve, all muscle, and to that matter which we have long thought of as lifeless and insensate.

A VAST NEW FIELD OF INQUIRY

It will be seen by the least scientific reader that these experiments teem with significance. Not only do they completely destroy all barriers of a hard and fast kind between responsiveness of the organic and inorganic, showing that the one is merely some greater complexity of the other; not only do they impress us profoundly with the mystery of the sensitiveness of all things, but they are full of practical suggestions alike for the worker in wireless telegraphy and for medical science. In the last field they are of vast importance. For the effects of drugs have been hitherto capable of only vague experiment, while here we have an opportunity suddenly opened to us of arriving at the clearest data with regard to fundamental processes, quantities and the rest.

THE ALL-PERVADING UNITY OF THE UNIVERSE

Yet every step in this vast simplication—making them all appear as various rhythms and harmonies of a single fundamental sequence—only drives the question deeper—"Who is He that sits within, striking the molecules this way and that? Or what is He, 'Pure, free, ever the witness,' Who interprets the records of strain, using the brain as His galvanometer, and discarding alike the laboratory and its instrumetns when these no longer please Him?" Dr. Bose does well to end his lecture, given at the Royal Institution, May 10th, with the striking passage:—

"It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things: the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our earth, and the radiant suns that shine above us—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago:—

"They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth, unto none else, unto none else!"

Thus we see that the so-called vital response of living matter has met with the same fate as other differentiae of the organic and the inorganic—that once more there is no hard-and-fast line between the living which respond and the non-living which do not, but that in both alike we see the spectacle of matter as a whole possessing irritability and passing out of the state of responsiveness into that of irresponsiveness; having its response in both alike affected by external circumstances and agencies, often identical; responding in different ways in both alike, according as the stimulus is great or little, the criti-

cal degree being often the same. In metals and plants, as in animal tissues, we have been shown the phenomena of weariness and depression, together with the possibilities of recovery, of exaltation, of irresponsiveness which is death.

Who can regret this? Is it not the inevitable destiny of all conceptions which imply that a given phenomenon unique, mysterious and beyond analysis to check inquiry and thwart the advance of scientific thought? Science can grow only where the mind of the student is prepared to recognise an underlying unity amongst apparently diverse phenomena.

"They who behold but one in all the changing manifoldness of this universe, unto *them* belongs Eternal Truth ; unto none else—unto none else."—M.N.

আলোচ্য পর্বে ডঃ বসুর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রদত্ত নিবেদিতার তিনটি বক্তৃতার সংবাদ আমরা পেয়েছি। নিবেদিতা ৯ জানুয়ারী ১৯০২ তারিখে 'প্যারিস হইয়া' যখন ভারতগামী জাহাজে উঠলেন তখন তাঁর মন জগদীশচন্দ্রের কীর্তি ও মহিমার বোধে আচ্ছন্ন এবং ডঃ বসুর মত প্রতিভাকে যে-সাম্রাজ্যবাদী শাসন নিষ্পিষ্ট করতে চায় তার বিরুদ্ধে ঘৃণায় পূর্ণ। জাহাজ ৩রা ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে পৌঁছেছিল। একই জাহাজে রমেশচন্দ্র দত্তও প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। উভয়কে মাদ্রাজের মহাজন সভা হলে ৪ ফেব্রুয়ারী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ভাষণে নিবেদিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতায় ইচ্ছা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্রের প্রশংসা করতে পারেননি, কারণ সাক্ষাতে প্রশংসা করা বিধেয় নয়, এবং বিখ্যাত ভারতীয়দের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ও কিছু বলতে পারেননি, যেহেতু কন্যা কি করে পিতার বিষয়ে বলবে, কন্যার জীবন যেখানে পিতাই গঠন করেছেন—বলেছিলেন দূরস্থিত জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে—যেহেতু দেশবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রয়োজন আছে সেই নিঃসঙ্গ বিরাট সংগ্রামীর পক্ষে।* বক্তৃতাটি অবশ্য

* জগদীশচন্দ্রের স্পর্শকাতর অন্তর দেশবাসীর সাহায্য ও সমর্থনে উদ্দীপিত হবে, তা বুঝে সে বিষয়ে নানা আয়োজন করা হয়েছিল, ভারতে এবং ইংলণ্ডে। বলাবাহুল্য এসব ব্যাপারে নিবেদিতার সক্রিয় যোগ থাকতই। এই সময়ে লণ্ডনে একটি ভারতীয় সংস্থার পক্ষ থেকে ডঃ বসুকে অভিনন্দন জানানো হয়। বেঙ্গলী কাগজে ৩১ জুলাই, ১৯০১ তারিখে তার বিবরণ বেরিয়েছিল।

LONDON LETTER

(From Our Own Correspondent)

London, July 12

Dr. J. C. Bose

No one deserves greater honour than Dr. J. C. Bose, the eminent scientist. He has own renown all over the world and has endeared himself to the land of his birth by his services to science. India is proud to possess such a son ; for, he

শুধু জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধেই নয়—ভারতবর্ষের অতীত মহিমা ও বর্তমান জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে নানা কথা তার মধ্যে ছিল। ভারতবাসীকে দীনতাবুদ্ধি ঝেড়ে ফেলার জন্য উদ্দীপ্ত আহ্বান নিবেদিতা জানিয়েছিলেন। স্বামীজী এই বক্তৃতায় খুবই খুশী হন।

বক্তৃতাটির বসু-অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি। অমৃতবাজার পত্রিকার ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯০২ সংখ্যা থেকে এটি সংগ্রহ করেছি :

মাদ্রাজ মহাজন সভায় নিবেদিতার বক্তৃতায় জগদীশ বসুর কথা

"আমার জীবনের অবর্ণনীয় সৌভাগ্য, আমি আধুনিক ভারতের কয়েকজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। তাঁদের একজন (স্বামী বিবেকানন্দ) আপনাদের সুপরিচিত। তাঁর বিষয়ে বলা এখানে আমার কাজ নয়, কারণ কন্যা তার পিতার প্রশংসা বিশ্বজগতের সামনে করতে পারে না। এক্ষেত্রে সে মাত্র নিজ জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে—তাই হবে তার পক্ষে সর্বোচ্চ কাজ। ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি (রমেশচন্দ্র দত্ত) সামনেই রয়েছেন, সাক্ষাতে তাঁর প্রশংসা করা অসৌজন্যকর। তাঁর কাজ এবং চরিত্র অনিবার্যভাবে যে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগরিত করে—তাকে হৃদয়ের নীরব গহনে স্থাপিত রাখতেই হবে এক্ষেত্রে। আসুন, মাতৃভূমির অপর এক বিশ্বস্ত সন্তানের কথা বলি, যিনি বহুদূরে একাকী কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে স্মরণ করা প্রয়োজন প্রতিদিনের প্রেমে ও প্রার্থনায়। আমি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলছি।

---

lifts her in rank in the comity of nations. The other day, the "Sukha Samity" of London had a luncheon in honour of the distinguished scientist. Among those present were Messrs Dadabhai Naoroji, Romesh Ch. Dutt, Nishi Sen and J. D. Dutt. Many letters of regret were read. Dr. Mullick wrote that he was sorry he could not be present as he was in Edinburgh on professional and political work. Nothing else would have prevented him from being present, as there was no one whom he should like to honour more than Dr. J. C. Bose. Mr. Sen presided, and proposed the guest's health in most eloquent terms. He eulogised Dr. Bose's services to science and hailed his as one of the greatest scientists of the day. Mr. Naoroji and Mr. Dutt also made complimentary speeches and said that any country would be proud of Dr. Bose. Dr. Bose, rising amidst cheers, said with his usual modesty that he was not worthy of the honour, conferred on him. He had in his own humble way tried to follow his instincts; and anything he had done, was but a poor subject for eulogy that had been showered on him. Such gatherings as these were compliments, indeed, and encouraged him in his duties. For nothing was more encouraging than the appreciation of one's neighbours.

অপর যাঁদের উল্লেখ এইমাত্র করলাম, তাঁদের মত ইনিও ভারতের পুরাতন জীবনের হৃদয়কেন্দ্র হতে উত্থিত। বাংলা দেশের সবচেয়ে রক্ষণশীল এক অংশের ইনি গ্রাম-বালক। এঁর মা—সরলপ্রাণা সেইসব হিন্দুরমণীদের একজন, যাঁরা পরম মাধুর্যে, স্নিগ্ধতায় ও ত্যাগে পূর্ণ—যাঁদের নিয়েই হিন্দুজাতির গৌরব। এঁর পিতা—বাংলার এক লেফটন্যান্ট গভর্নর নিজের ডায়েরীতে একবার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"আজ এমন একজন ভারতীয়ের সাক্ষাৎ পেলাম, যাঁর সমতুল আমি কখনো দেখিনি।" ডাঃ বসু তরুণ বয়সে এক বিশিষ্ট ইংরাজ বিজ্ঞান-শিক্ষকের কাছে পড়েছিলেন। তাঁর পত্নী আমাকে বলেছেন—বালকটি যখন ইংলণ্ডে যাবে, তাঁর পিতা তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"বৎস, আমার যতখানি সামর্থ্য আমি তোমাকে ততদূর নিয়ে গেছি; যদি তুমি আরও এগিয়ে যেতে চাও, যাও, সেখানেও আমার আশীর্বাদ পাবে।"

পিতা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতীতের সঙ্গে, রীতি-নীতি ও পরিবারের সঙ্গে, যে স্নেহবন্ধন হিন্দুকে জড়িয়ে রাখে, পারিপার্শ্বিক ও সমাজের যে বাঁধনে সে বাঁধা থাকে, তার গুরুভারের কথা যখন চিন্তা করি, এবং অপরদিকে দেখি, এই পূর্ণ অব্যাহতির ছবি—তখন মনে হয় যেন 'মুক্তি'-চেতনার সম্মুখীন হয়েছি আমরা, যে-জ্বলন্ত মুক্তি-বোধের কাছে পৃথিবীর অপর সকল জাতির স্বাধীনতা-বোধ নিতান্ত ম্লান। এই মুক্তির আদর্শই হিন্দুর সকল চিন্তায় প্রতিফলিত; যা-কিছু স্থানীয়, সীমাবদ্ধ এবং স্থূল, তাকেই এই আদর্শ বহুদূরে বিতাড়িত করে। ডাঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। বস্তুজগতের অভেদ প্রতিপাদক তাঁর অধুনাতন বিরাট আবিষ্কারগুলির কথা আপনারা অনেকেই জানেন। তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহ উপস্থিত করেছেন। তাঁর কিছু গৌণ আবিষ্কারের কথাও আপনারা শুনেছেন। মার্কনির নাম শোনা যাবার আগেই তিনি কলকাতার এক বারান্দার মধ্য দিয়ে, এমনকি একবার জনৈক লেফটন্যান্ট-গভর্ণরের দেহের মধ্য দিয়ে বেতারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন। আপনারা এও জানেন, যখন রন্টেজেন রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই ইউরোপের বুদ্ধিজীবী মহল শিহরিত হয়ে উঠেছিল যখন জনৈক ভারতীয় আগন্তুক একই ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক এবং গভীর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। আর, সম্প্রতি আপনারা নিশ্চয়ই দৃষ্টি-রীতি, ফটোগ্রাফি-তত্ত্ব এবং এজাতীয় অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধে অসাধারণ আবিষ্কারের কথা শুনেছেন। এই মানুষটি যেখানেই গিয়েছেন, ভারতের পতাকা বয়ে নিয়ে গিয়েছেন, আর সেই পতাকা প্রোথিত করেছেন বিজ্ঞান-অভিযানের একেবারে মুখাগ্রে।

এসব জিনিস সহজে করা যায় না, অনন্ত সংগ্রাম ছাড়া করা সম্ভব নয়। ফলাফলকে এক্ষেত্রে সংবর্ধিত করাই যথেষ্ট নয়। এইসব শক্তিধর সেবকের সাহস ও ভরসাকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণকে গ্রহণ করতে হবে; জনগণের নিরন্তর প্রেম ও সমাদর ওঁদের পাখায় বলাধান করবে।

এই বিশেষ জীবনটির দিকে তাকিয়ে যখন আমরা নিজেদেরই প্রশ্ন করি—এজীবন এত বিরাট হল কিভাবে, কিভাবে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের জগতে অবতীর্ণ প্রথম

ভারতীয় পুরুষটি এক ঝটকায় উঠে গেলেন একেবারে শিখরের উপরে—তখন আমার মনে তিনটি কারণের উদয় হয়।

প্রথমতঃ, ডাঃ বসু এদেশ থেকে ছাত্ররূপে গিয়েছিলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে। তাঁর পিতার আশীর্বাদ এমন একটি জিনিসের প্রতীক ছিল, যা প্রবেশ করেছিল অতি গভীরে। তিনি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সম্মুখীন হবার সময়ে পাশ্চাত্ত্য স্বতঃসিদ্ধগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন, যে-কোনো মূল্যে সত্যলাভ করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে আন্তরিকতার সঙ্গে সকল পূর্ব ধারণা ও সংস্কারের উচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, তিনি মতের ব্যাপারে একেবারে ধোয়া-মোছা শ্লেট নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। শুধু মননের দিক দিয়ে যদি হয়, যে-কোনো হিন্দু এই স্বাধীনতাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বরণ করতে পারেন, এবং এখানকার অনেকে তা করেছেনও। কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ভারতীয় পুরুষটির ভাগ্য তাঁকে এমন এক পরিস্থিতিতে স্থাপন করেছিল, যেখানে মনোজীবনকে তার সাধুতা বজায় রেখে বহির্জীবনের আচার আচরণের সঙ্গে সুসংগত হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে উপাদান ডাঃ বসুর জীবনের রূপ নির্ধারণ করেছিল, তা হল, ছাত্ররূপে তাঁর কঠোর ও সর্বাত্মক পরিশ্রম। বিজ্ঞানকে নির্বাচন করার পরে যেকটি যত প্রকারের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা সম্ভব, তাই করতে সচেষ্ট হয়েছিল, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, তড়িৎ-বিদ্যা, শরীরবিজ্ঞান সবকিছু। শ্রান্তি ঘটল না কোথাও, প্রতিহত করতে পারল না কিছু। রণজিৎ সিং ক্রিকেট-জগতে যা করেছেন, বিজ্ঞানের জগতে তিনি তাই ঘটালেন—অভ্রান্ত পরিণতিতে পৌঁছাবার জন্য উভয়ক্ষেত্রে একই দুর্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশনের এই যুগে যে-ব্যাপক সংস্কৃতি তিনি অর্জন করেছিলেন, তার তুলনা বিরল। এখানে বলা উচিত, ঘটনাচক্রেই মাত্র তিনি পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ভারতে ফেরার পরেও তাঁর মনের রূপ বদলায়নি। একবার ফটোগ্রাফি ধরলেন, অন্য সময়ে ফনোগ্রাফ-রেকর্ড নিয়ে পড়লেন, ফল—অতীব চমৎকার এক 'সংগ্রহ।' যে-জিনিসই এই মানুষটি ধরুন—তাকে সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত ইনি সন্তুষ্ট নন। শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফ, শ্রেষ্ঠ ফনোগ্রাফ, শ্রেষ্ঠ রেকর্ড। পূর্ণতার জন্য এই উৎকণ্ঠা কি আদর্শ তপস্যা নয়? তারপর—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতির অসামর্থ্য সম্বন্ধে নাক-সিঁটকানো অবজ্ঞার উত্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঝলক—বিরাট ভারতীয়টি মিথ্যা প্রমাণ করলেন সকল অবিশ্বাসকে—বিখ্যাত হলেন নিজের সামর্থ্যে, কর্মে।

অধ্যাপক বসুর ভাগ্যক্ষেত্রের পরম সুবিধা অবশ্য তাঁর ভারতীয় জন্ম। এপর্যন্ত আমরা অন্যান্যের সঙ্গে তাঁর কম বেশী সম-অবস্থার কথাই আলোচনা করছিলাম। যদি তিনি দেশকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষাটুকু ছাড়া আর সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দায়মুক্ত স্বাধীন চিত্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তা অন্য কারণে নয়, পূর্ব-সিদ্ধান্তের বোঝা বইছে না, এমন সব পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে মানসিক সমভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁর প্রতিভা আছে—পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকরাও কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁদেরও প্রতিভা আছে। লর্ড কেলভিনের কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ১৪ বছর বয়সে ডিগ্রি এবং ঐ ধরনের ব্যাপার। সুতরাং এবার অধ্যাপক বসুর

সঙ্গে অন্যান্যদের পার্থক্যের প্রসঙ্গে আসা দরকার—বলা দরকার, স্বদেশ ও স্বদেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি, যাঁরা ভারতের ঐতিহ্যকে নির্মাণ করেছেন সেই সরল সত্যসন্ধ মানুষগুলির প্রতি, ভারতীয়রূপে তাঁর বিপুল ঋণের কথা।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ছাত্রগণ সৃষ্টির বিচিত্র ও বিভক্ত প্রকৃতিকে দেখাতে বদ্ধপরিকর, যার জন্য পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান নিরন্তর বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য দেখানোই ঐ বিজ্ঞানের ব্রত যেন। জড় ও চেতনকে পৃথক করছে কোন্ কোন্ জিনিস—সে সম্বন্ধে তার পুনঃ পুনঃ উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্ন।......এক্ষেত্রে ভারতীয় পুরুষটির প্রতিক্রিয়া কি ধরনের ছিল? কেন তাঁর প্রতি রক্তবিন্দু ঐক্যবোধে স্পন্দিত হয়েছিল? বলা যায়, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, তড়িত-তত্ত্বকে আলাদা আলাদা খাঁচায় অতি সাবধানে বন্ধ করে রাখায় তাঁর কোনোই আগ্রহ ছিল না। সে কথা উক্ত বিখ্যাত ভারতীয় শুক্রবার সন্ধ্যায় সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মেলনভূমি গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল ইনস্টিটিউটে কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন। তিনি বলেছেন—'ভারতে একটি বিজ্ঞানই আছে—সৃষ্টি-বিজ্ঞান— The Science of Nature ।' তাই তিনি যখন দুই আপাত-পৃথক বিরাট সৃষ্টি-ধারার মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেন, তখন তাতে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের তুল্য বিভ্রান্ত বা তিক্ত-চিত্ত হন না—কেননা একে অভ্যর্থনা জানাবার যথেষ্ট অধিকার তাঁর আছে। রেখার মধ্যে রেখাকে, আয়তনের মধ্যে আয়তনকে, সমগ্রের মধ্যে সমগ্রকে তিনি সানন্দে নিমজ্জিত হতে দেখেন। সর্ব বস্তুর যে অদ্বৈত দর্শনে তাঁর চিত্ত পূর্ব থেকেই নিবিষ্ট, এসকলই তার পক্ষে নূতন প্রমাণ। এই ভাবের দ্বারা তিনি পরিবৃত হয়ে আছেন সমস্ত জীবন ধরে। অশিক্ষিত ভৃত্যেরা এবং সুশিক্ষিত বন্ধুরা, দোলনার জীবন থেকে বর্তমান জীবন পর্যন্ত সময়ে সবাই যেন এই কথাই যোগ-সাজস করে তাঁকে শুনিয়েছে। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে একে তিনি পান করেছেন। মৃত্যুকেও যে তিনি দেখেন প্রত্যাবর্তনরূপে! এরই দ্বারা তিনি জাতীয় ভাবের সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র জগৎ যদি পার্থক্য কল্পনা করেও, ভারতীয় হয়ে কিভাবে তিনি অদ্বৈতকে অনুভব করে পীড়িত হতে পারেন?

ভারতীয় ঐতিহ্যের আর একটি জিনিস বিজ্ঞানচর্চায় সমূহ সুবিধা সৃষ্টি করে, উৎকৃষ্ট ভাষায় যাকে বলা হয়েছে—"সন্ন্যাসী মন।" জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগের এই পদ্ধতি দৈহিক শ্রান্তির ক্ষেত্রে মনঃসংযোগকে ব্যাহত হতে দেয় না। ভারতের ধর্মে কখনই ঈশ্বরকে 'শিক্ষা' করার কথা বলা হয়নি—ঈশ্বরকে জানতে বলা হয়েছে। মনকে সৎ-বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের চরিত্র,—অনুমান, তথ্য-পরীক্ষা এবং যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে নিতান্ত পৃথক। পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অনুমান ও তথ্য-যুক্তির পথ গ্রহণ করেন। গাণিতিক উন্নতি এই পথেই হয়েছে। কেবল ভারতীয় জনগণই কোনো ঘটনার পূর্ণ স্বরূপ অনুধাবন করার পরেই তাকে বিশ্লেষণ করে। এই মানস-সংস্থান লাভের উপযুক্ত শিক্ষাও সে পেয়েছে; এবং এমন একটি সমাজ ও সভ্যতা ভারতের আছে, যা অন্তর্জগতের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের আদর্শে চালিত। এই সকল ব্যবস্থা থাকার জন্য এই পথে জ্ঞানলাভের শক্তি পৃথিবীর অন্য যে-কোনো স্থানের

তুলনায় ভারতে সহজতর, এবং এর দ্বারা ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পথে অপরিসীম মূল্যবান জাতিগত প্রস্তুতির সুযোগ লাভ করে।

এই হেতু যখন আমি এই ভারতীয় পুরুষটিকে তাঁর সর্বশেষ সুমহান ঘোষণা—জড় ও চেতনের মধ্যে অব্যাহত প্রবাহের তত্ত্ব-ঘোষণার পক্ষে উদাত্ত দোঁখ—তখন জানি, তাঁর সাফল্য তাঁর দেশেরই সাফল্য, তাঁর সংগ্রাম ভারতেরই সংগ্রাম, এবং তিনি—শতাব্দীর মধ্যে এক নিঃসঙ্গ আকার—যেন ভারতের নারী ও পুরুষের প্রতি মহা আহ্বান—যা বলছে, তারা যেন (অধ্যাপক গেডিসের ভাষায়) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাঁট-কাট না হয়ে আধুনিক চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে আচার্যরূপে প্রবেশ করতে পারে—মননের ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে ভারতের সমশক্তি—নহে, কোন মতে নয়।—যেন ভারতের আধিপত্য তারা প্রমাণ করতে পারে সম্মানের সংঘাতে। এমনই একটি বিষয়ে আমি আপনাদের সকলের সমক্ষে অধ্যাপক বসুর বার্তাবাহী, যে-বার্তা ভবিষ্যতে উপযুক্ত অবসরে ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করব।

ভারতের বিরাট পুরুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিরাট পুরুষদের তুলনায় কোনো অংশেই ন্যূন নন। গৌরব বোধ করুন তাঁদের নিয়ে, ভালবাসুন তাঁদের, সর্ব প্রাণ দিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করুন। তাঁদের জন্য কদাপি আপনাদের লজ্জিত হতে হবে না।

আর, ভারতীয় জন্মের গৌরব যিনি বৃদ্ধি করবেন, তাঁর জন্য আদর্শের মান উচ্চে রাখুন। প্রশ্ন করুন—তিনি কি সত্যের জন্যই সত্যকে চান—নাকি নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য? তাঁর হৃদয় কি উদার—একনিষ্ঠ? তিনি কি চলার পথে অদম্য, অক্লান্ত? জ্ঞানের জন্য এবং ন্যায়ের জন্য কি তাঁর তৃষ্ণা চির অতৃপ্ত, কামনা চির জাগ্রত?

যদি উত্তর হয় 'হাঁ', তাহলে, যাঁরা জাতি-আচারের একটিও কোনদিন ভাঙেন নি তাঁদের তুলনায় ইনি অন্ততঃ কুড়ি গুণ বেশী ভারতীয়—যদি অবশ্য স্বদেশীয়ত্ব মাপার কোনো উপায় থাকে।

মহাশক্তিধর এই জাতি। শুধু সেই শক্তির স্বরূপ জানতে হবে এবং প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিজীবনে তাকে ব্যক্ত করতে হবে,—তা যদি হয়, কেউ ভারতের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। তাহলে মাকড়সার জালের মত সকল সমস্যার জাল ছিন্ন হয়ে যাবে।

এবং—পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে যে চরম সত্য ঘোষণা করা ভারতবর্ষের নিয়তি, যদি কোনো পন্থা তার উপলব্ধি থেকে ভারতবর্ষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেই পথ সাময়িকভাবে যত লাভজনকই মনে হোক, তার দ্বারা ভারতের কোনই অগ্রগতি হবে না।

এই অসত্যের মধ্যে যে সত্যকে দর্শন করতে পারে, মৃত্যুর মধ্যে দেখতে পায় জীবনকে, নিত্য পরিবর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে দেখে পরম ঐক্যকে, চির শান্তি তারই মধ্যে—শুধু তারই মধ্যে—অন্য কোথাও নয়।

'বিজ্ঞানে হিন্দু মন' বক্তৃতা

মহাজন সভায় বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেছিলেন—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি ডঃ বসুর বার্তাবাহী, যাকে ভবিষ্যতে উপযুক্ত অবসরে ভারতীয় শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করবেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিবেদিতা ২১ মার্চ ১৯০২ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে 'বিজ্ঞানে হিন্দু মন' বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। জানি না কলকাতার ঐ বক্তৃতায় নিবেদিতা তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন কি না। ইণ্ডিয়ান মিরারে ২৮ মার্চ ১৯০২ তারিখে ঐ বক্তৃতার যে রিপোর্ট বেরোয় তাই উদ্ধৃত করছি।*

SISTER NIVEDITA'S LECTURE IN CALCUTTA

Sister Nivedita's lecture commenced by the reading of the invocation to creation from the Rig Veda, the most wonderful pronouncement of the religious scientific consciousness of any age or people.

In referring to the recent work of Dr. Bose in Europe, the lecturer pointed out the relation which his present theory of stress and strain holds to his previous accomplishment on the subject of electric waves. The wonderfully practical nature of his scientific work was shown in the fact that he had constructed by far the most perfect detector of wireless signals yet produced. The manipulative dexterity here displayed must have served him well in such later experiments as that in which he proved the continuity of mechanical and light stimulus by balancing the effect of a sunray on one wire by a twist of the hand on another.

The continuity of living and non-living was only one point in the great line of argument verified in experiment by which Dr. Bose aimed at establishing in scientific form the doctrine of the fundamental unity of phenomena. For all the phenomena of heat, light, electric radiance, and chemical union and disruption, might be regarded at bottom as but different aspects

---

* এই বক্তৃতার বিজ্ঞপ্তি নিবেদিতার বিশেষ প্রশংসাসহ অমৃতবাজার পত্রিকায় ৫ মার্চ ১৯০২ তারিখে বেরোয়—

SISTER NIVEDITA—Our readers will be glad to learn that the same Sister Nivedita, Miss Margaret E. Noble, who once drew much of public sympathy towards her for her indefatigable work during the plague, is again amongst us here in Calcutta during this dreadful season. Nor can any of us forget her enthusiasm for Hindu religion. She will deliver an address on "The Hindu mind in modern science" at the Classic Theatre Hall, on Friday, the 21st instant, at 6 p.m. The Hon'ble Justice Sarada Charan Mitter will preside. The lecture is a public one.

বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি বেঙ্গলী কাগজেও বেরিয়েছিল ২১ মার্চ তারিখে।

of the single basic occurrence of the swing of molecules under stress, this way and that. A great stress produced overstrain and overstrain was apt to result in reversal or rebound past the point of equilibrium. So every given force had the power of producing not only its proper but also its opposite effect. This fact was not without interest for students of the doctrine of the Maya. Matter, and the laws of matter, were one, whether manifested in physiological or in what are called "purely physical" sequences. Simple mineral matter such as metal, was just as subject to stress of any given kind as the animal body, a steel ware could be killed by poison, or brought to life by the right antidote, like a muscle or a human being.

The lecturer dealt much with the work of careful preceding observers like Lodge and Waller. It was clear however, that even in the field of the former worker, a research so comprehensive and unexpected must be revolutionary. But it was the great glory of science to welcome truth from any quarter, and whatever *its effect upon ourselves*.

Improving the continuity of living and non-living, Dr. Bose had conceived the audacious idea of testing whether plant tissues would respond to a pinch or a tap by an electric disturbance, like as had long been known, the animal and like, as he was now prepared to prove the metals.

By this attempt, Dr. Bose had opened out to Western men of science an area of investigation hitherto unthought of where most accurate and simple methods would replace the system of indirect inference.

In dealing with more technical matters, the lecturer showed that our great countryman had further added to western power of research by suggesting methods of experiment on electric response which would not require the preliminary abnormalising *of the specimen. Hitherto it* had been thought necessary to "injure" one end of the muscle or nerve for expetiments, in order to produce the necessary inequality of current on stimulation. Dr. Bose had adopted the "Block method" and the "method of exaltation" by which no less than two additional sets of an experiment *might be made, without abnormal conditions* of any kind, incorroboration or disprove of any given observation.

The practical issues of these investigations were likely to prove of extraordinary utility in wireless telegraphy and also in medicine. In wireless telegraphy, Dr. Bose's discovery of molecular self-recovery and other phenomena of metals, would be sufficient to sweep away many crudities, notably that of the tapping apparatus to restore sensitiveness. In medieine, we had heard for the first time a possibility of precise testing and demonstration of the influence of drugs or metals,—which always remain, however continuous with the animal, less pressures from the human point of view.

Theoretically, it remained with Dr. Bose to prove his theories in face of the determined and natural reluctance of scientific men in the West—tried and faithful workers in their own paths, many of them—to accept them. But if once accepted and incorporated, there could be no doubt that this, the first voice through which the Hindu genius was speaking in science, would be heard through all time side by side, not with the patient observers of details, but with such masters as Newton and Darwin and La'Place.

In the lecturer's opinion, the Hindu race had an aptitude of the strongest kind for scientific work. The brilliant imagination, the dogged persistence, and the manipulative dexterity which distinguished this worker, might be proved to be a race-characteristic, not an individual inheritance.

Above all, as Dr. Bose himself had been heard to say on one occasion, Hindus had the incomparable advantage in science of freedom of thought. "They did not take God into their keeping!" One of these worst defects in their equipments was a habit of "wicked, self depreciation." The strong man must believe in himself and so must the strong people, and they must expect no help. To the soul that strives for *Gnan*, what help can be given? What conditions were necessary? A raging fever of realisation, a thirst for renunciation for *Tapasya* who could differ that soul from its path?

All direct knowledge was *Gnan*. All efforts, all concentration was *Tapasya*. Let the young men of Bengal turn to knowledge in this spirit. Let them cease from spurious limitation of foreigners out of marcenary motives and live for Truth as their fathers lived. Let them regard self as nothing, and the work in hand as all, and proving thus the actual nature of Hinduism, it was likely that they might find themselves in Science leading the world.

Babu Norendro Nath Sen said that it was a pleasure and a privilege that he should have been invited to propose a vote of thanks to the noble and gifted English Lady, who had both interested and delighted them that evening by her thoughtful, animated and eloquent discourse. The large gathering that he saw before him testified to the popularity of Sister Nivedita, and the esteem in which she was held by Hindus, and, she might fitly add, by all classes of the community. Miss Margarette (Sic) Noble was an honour to English womanhood, and to the great English race itself. There was scarcely a Hindu heart in which she did not maintain a cherished place, because of the repeated, striking and convincing proofs she had given them of her deep, sincere and practical sympathy with the Indian people, with their religion, and with their history and traditions. They had been admiring as well astonished witnesses, of her philanthrophic—and to her personally dangerous—work in the backslums of Calcutta. English womanhood, as exemplified

in Annie Besant and Margarette Noble, went far to benefit India in various ways. It was they who were the peace-makers for all kind between divergent races and religions. It was such as they who would make enthusiastic realize the dream of a final blessed Union between the East and the West under God's dispensation.

The speaker has much pleasure also to propose a vote of thanks to the chair. No better gentleman would have been called on to preside on that occasion. They had known him as a good Hindu, who was fired with the spirit of propagating the truths of a religion in which he had utter faith. They had seen him set his whole heart on the education of their children on purely Aryan lines. A distingushed *alumnus* of the Calcutta University, a Premchand Roychand Scholar, despite his weight of Western materialistic education, his faith in the creed of his fathers, had grown with the years till that faith was steadfast as the rock of ages and could not be uprooted or shaken.

The Chairman, in replying to the vote of thanks, reminded the audience that it was due to Sir John Woodburn's personal love and fidelity to Science that their distinguished countryman had been sent to the West on Government Service.

নিবেদিতার বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় ডঃ বসুর কথা

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা প্রধানতঃ স্বামীজীর জীবন ও বাণী প্রচারের জন্য ভারতভ্রমণ করেন। 'দি ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' কাগজের ২৬ অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যায় দেখতে পাই নিবেদিতা বোম্বাইয়ের ছাত্রদের কাছে ডঃ বসুর আবিষ্কারের কথা বলেছিলেন। সোস্যাল রিফর্মার ঐ সূত্রে ডঃ বসুর কাজ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে।—

SISTER NIVEDITA gave the students of Bombay the other day a view of the discoveries of Prof. Bose. The following excerpt from the address of the President of the Botanical Section of the British Association whose sessions were held this year at Belfast, explains them from the point of view of a scientist and assigns to them their proper place in relation to previous discoveries:—

"Some very striking results were only a few months ago published by Bose on the electric response in ordinary plants to mechanical stimulation. He arranged a piece of vegetable substance, such as the petiole of the horse-chestnut, or the root of a carrot or radish, so that it was connected with a galvanometer by two nonpolarizable electrodes. The uninjured tissue gave little or no evidence of the existence of electrical currents; but if a small area of its surface was killed by a burn

or the application of a few drops of strong potash, a current was observed to flow in the stalk from the injured to the uninjured area just as was the case in animal tissue. The potential difference in a typical experiment amounted to 12 volt. The tissue was then stimulated either by tapping or by a torsion through a certain angle, and at once a negative variation or current of action was indicated, the potential difference being decreased by 0·26 volt. Very soon after the cessation of the stimulus the tissue recovered and the current of rest followed as before. Bose's investigations extended considerably beyond this point, and established a very close similarity in behaviour between the vegetable substance and the nerves of animals. Summation effects were observed, and fatigue effects demonstrated, while it was definitely shown that the responses were physiological. They ceased entirely as soon as the piece of tissue was killed by heating. This remarkable demonstration of similar electrical properties to those possessed by nerve strengthened very greatly the view of the conduction of stimuli in the plant by means of the protoplasmic threads which have been demonstrated by Gardiner and others to exist throughout the plant, uniting cell to cell into one coherent whole."

তৃতীয় পর্ব : ১৯০২—১৯১১

স্বামীজীর দেহত্যাগ ১৯০২-এর জুলাই মাসে—তখন থেকে ১৯১১-এর অক্টোবর মাসে নিবেদিতার দেহত্যাগ পর্যন্ত তৃতীয় পর্বের ব্যাপ্তিকাল। স্বামীজীর সমাধি নিবেদিতাকে সর্বপ্রকার পার্থিব বন্ধন থেকে কার্যতঃ মুক্তি দিয়েছিল। এর পরে সিদ্ধান্তের, কাজের, সাফল্যের ও ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই। স্বামীজী যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা, স্বামীজীর ইচ্ছায় কাজ করেছেন, স্বামীজীর ইচ্ছার সঙ্গে সংঘর্ষও হয়েছে কখনো কখনো, কিন্তু কোনো কিছুই বিবেকানন্দকে অতিক্রম করে নয়। অতঃপর নিবেদিতার নূতন ভূমিকা।

সে ভূমিকা—ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিবেকানন্দের দায় বহনের। যতদিন বিবেকানন্দ জীবিত, ততদিন নিবেদিতা ভারতের 'সেবিকা বান্ধবী'; তারপরে—'ভারতের সন্তানের' মাতা। নিবেদিতা স্বয়ং তা সচেতনভাবে অনুভব করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নূতন ভাবনার প্রভাব দেখা যাবে।

রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মুক্তি নেওয়ার পরে বাইরের দিক থেকে দেখা যাবে, নিবেদিতা বসুপরিবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেছেন। ডঃ বসুর বিজ্ঞানের কাজে তিনি বিপুল সময় দিচ্ছেন, বসুপরিবারের সঙ্গে অবকাশের ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন, সবই ঠিক, তবু এখন সমগ্র ভারতবর্ষ নিবেদিতার ধ্যান ও কর্মের আশ্রয়, তার বিজ্ঞান

নয় শুধু—ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তাঁর কল্যাণ-কর্মের বিস্তার।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুলাই ১৯০২ পর্যন্ত

স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্বে নিবেদিতার লেখা চিঠিতে ডঃ বসু সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অনুভূতি ফুটেছে, তারই অংশ :

২ জুন ১৯০২, ম্যাকলাউডকে—(মায়াবতী থেকে) "জানাবার বিশেষ কিছু নেই, শুধু মনে হচ্ছে, এই বৎসর ডঃ বসুর প্রত্যাবর্তন চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে।... ভাবছি তুমি হয়ত নরওয়েতে হাজির হবে। কে জানে! অবশ্যই আশা করি যে ডঃ বসুও যাবেন।"

৭ জুন, একই জনকে—"এর মধ্যে তুমি আমার শিশুর (বসু) সাক্ষাৎ পেয়েছ। যদি তুমি ধেয়ে গিয়ে তাকে—তার হৃদয়, মন এবং কল্পনাকে—বন্দী করে ফেলতে পার, তা করো। জীবনের স্পর্শ সে চায়, মজা চায়, নতুন আকর্ষণ চায়। ভ্রূক্ষেপ করি না কোথা থেকে তা সে পায়—যদি সে সত্যই পেতে চায়। পূর্ণ কর তাকে 'আনন্দে'। সে অনুভব করুক—আবার সে বাঁচতে শুরু করেছে। তার কাছে ধর্মের কথা বলো, কিংবা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কথা, কিংবা আবোলতাবোল যা ইচ্ছা—কি বলছ তাতে কিছু এসে যায় না।

কেবল যদি তাকে না ভালবাসো, ভালবাসার ভাণ করো না। আমি কিছুই মনে করব না যদি তুমি স্বতঃই মনে কর যে, সে তোমার মনে সাড়া জাগায় না। সে ক্ষেত্রে কোনো পথ নেই। যাতে চূড়ান্তভাবে সে তোমাকে ভালবাসে তা করো, যদি না মনে করো পরে তাকে পরিহার করবার প্রয়োজন হবে।

শুধু এইটুকু চাই, এর বেশী নয়—এটা বেশী কি?"

২ জুলাই, একই জনকে—"আমার শিশুটির বিষয়ে তোমার মিষ্টি চিঠি সম্বন্ধে কি আর বলতে পারি বলো! ঐভাবে তোমার লেখাটি—এ যেন তারই খানিক স্পর্শ। এত খুশী আমি—তুমি অমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলে। তোমার মুখে তার মাধুর্য এবং শিষ্ট নম্রতার কথা শুনে নিতান্ত ভাল লাগল। বেচারা খোকাটি আমার! ভয় হয় সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এইটুকুই আশা করতে পারি, সেন্ট সারা তাকে তার শক্তির বাইরে যাবার তাগিদ দেবে না। ভরসা করি—পরের শীত সে বস্টনে কাটাতে পারবে। সারার পরিবেশ অপূর্ব। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতে চায় সে। বাইরে থাকার ব্যাপারে কতই ধৈর্য দেখিয়েছে। তার ১০ জুনের বক্তৃতা কী প্রচণ্ড জয়-সূচক। আমাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই।...

প্রিয় য়ুম, আমার অভিপ্রায়, তুমি ভাল থাক; কিন্তু অসুস্থতা হয়ত সম্পূর্ণ ভয়ংকর হবে না যদি তা কাউকে তোমার নৈকট্যে এনে দেয়। মায়েদের অহঙ্কার এমনই হয়—দেখতে পাচ্ছ। তোমার জীবনে সে (বসু) সম্ভবতঃ সুদূর ক্ষুদ্র একটি ঘটনা। আমি চাই, সে তোমার মধ্যে সুখের বিরাট উৎস দেখুক। সে বলে, তুমি

প্রেমের মতই প্রেমময়। তাই হোক। পৃথিবীতে অবতীর্ণ এক বিরাট স্বর্গ-স্বপ্ন তুমি—যাকে আমাদের সবারই প্রয়োজন।"

নিবেদিতার উপরের চিঠির দুদিন পরে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ১০ জুলাই ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লেখেন—"গ্রিন্ডলের সাহায্যে ডঃ বসুর মারফত তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি।" ১৬ জুলাই একই জনকে—"ডঃ বসুর মারফত আমার পাঠানো বার্তা কি পেয়েছিলে?"

স্বামীজীর দেহত্যাগ নিবেদিতার মনে যে বিপ্লব ঘটায়, তার ফলে পুরাতন সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণার অনেক বদল হয়ে যায়। ভারতের জাতীয়তার জাগরণই তাঁর কাছে প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়—সেইটাই স্বামীজীর কাজ—তার কাছে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব, যা অল্প কিছু আগেও সমস্ত মনোযোগ অধিকার করে ছিল, হ্রাস পেয়ে যায়। নিবেদিতার মনের দিক-পরিবর্তনের ফলে নানা স্থানে বিক্ষোভ-তরঙ্গ উঠলেও তিনি আদর্শে অবিচলিত ছিলেন। এই সংঘাত, আমরা লক্ষ্য করব, তাঁর অপরূপ চরিত্রকে উন্মোচিত করেছে। মানুষকে উত্থিত, উন্নীত করবার মত হিরণ্ময় স্পর্শ সে চরিত্রে ছিল।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ডিসেম্বর ১৯০২ পর্যন্ত

২৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"আমার জীবন সম্বন্ধে সেন্ট সারার ধারণা আমাকে কুঁকড়ে দেয়। তিনি চলে যাবার পর থেকে কারো জন্য ব্যক্তিগত ভালবাসা বোধ করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হোক, কাজ হোক—একথা নিজেকে বলেছি বার বার, কিন্তু ওভাবে আর নয়—যদি তা না হয়, তাহলে আমি তাঁর (মিসেস বুলের) উপস্থিতি এখানে চাইব, কিন্তু কাজ আমি একলাই করব।

ওঃ য়ুম, তুমি দৈবী, কারণ তুমি আমার প্রতিটি কথা বোঝো। যে-সাহায্য দিয়েছি, তার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, তীব্র জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছি। ভাবছি, তাকি ভাল হয়েছে! আমি তাঁর (মিসেস বুলের) বিবেচনাকে বিশ্বাস করি না, তুমিও করো না। তিনি নিজের ইচ্ছার গোটা ভার চাপিয়ে দেবার ক্ষেত্রে একেবারে বিবেচনাহীন।"

২৮ জুলাই, একই জনকে—"আশা করি তুমি আমার ছোট খোকাটিকে একেবারে যা-তা মনে করনি। বেচারা শিশুটি! তাকে এখানে নিরাপদে ফিরে পেতে খুবই ইচ্ছা হয়। প্রিয়, মধুর, নীড়সুখী প্রাণ! সদাই তার আশ্রয় ও আনন্দ চাই।"

২১ অগাস্ট, একই জনকে—"খুবই অসুস্থ ছিলাম। গত সপ্তাহে মাত্র তোমাকে ও খোকাকে ছোট চিঠি পাঠাতে সমর্থ হয়েছি।...

খোকার হতাশ ভাবের কথা যে লিখেছ, তাতে আমি খুব উৎকণ্ঠিত হব না তুমি জানোই। আবিষ্কারের জ্বরের আগুন যে একটু কমেছে, তাতে আমি খুব খুশী; কোনো মানব-মস্তিষ্ক ও-জিনিস আর সইতে পারত না। তার সঙ্গে থাকতে পারলে ভাল হত, কেন না তাহলে বিরতিগুলো বিশুদ্ধ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠত।

বিচিত্র! ঐ ক্ষুদ্র প্রাণটি এত অসহায়! তুমি জানো না, তার কতখানি মঙ্গল তুমি করেছ। সে বিষয়ে আমি খুবই নিশ্চিত। বেচারা শিশুটি! বড় কিছুর সঙ্গে সর্বদা সংস্পর্শ থাকা তার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।"

৪ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"বুঝতে পারছি, পরবর্তী কয়েক মাস আমার খোকাই আমার মূল দায়িত্ব হবে।"

১০ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, সেখানে স্বামীজীর কথা বলবার জন্য। তারপর আরম্ভ হবে বক্তৃতা সফর। সুতরাং খোকা যখন ঘরে ফিরবে, তখন জগন্মাতা আমাকে অন্যত্র রাখছেন। তাতে দুঃখিত নই। কেবল বোম্বাই বন্দরে (?) দাঁড়িয়ে তার জাহাজের আগমন দেখতে চাই।"

১৪ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"বসুদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে বোম্বাই জাহাজ-ঘাটায় মিলিত হব।"

১ অক্টোবর, একই জনকে—"দেখতে পাচ্ছ, আমার ছোট্ট খোকাটি স্বর্গীয়। কিন্তু যেখানে দেশের ব্যাপার, সেখানে আমিই গুরু। সেণ্ট সারার প্রবল প্রভাবে ও-ব্যাপারটা সাময়িক ভাবে যেন ভুলে যাওয়া হয়। তুমি জানোই, আমার মিণ্টি শিশুটি ইদানীং কিসব বাজে কথা বকছে, যার প্রতিটি শব্দকে সেণ্ট সারা সশ্রদ্ধভাবে পুনরুচ্চারণ করছে, যেন সেগুলি আমার ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মাবলী। এখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি, সেটাই অদ্ভুত। আর, যদি না (বসু) নাগপুর হয়ে কলকাতা যেতে মনস্থ করে—যা করলে ১৬ মিনিটের জন্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে—আমরা ১৯শে বা ২০শের আগে তার দেখাই পাব না। তার জন্য দুঃখিত নই। তখনো আমি আলাসিঙ্গা ও মাদ্রাজের দিকে ডানা মেলে আছি। আর যদি তোমার শিশু (ওকাকুরা) সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে (গুপ্ত আন্দোলনের ব্যাপারে)...তাহলে হয়ত এই দাঁড়াবে—খোকা ও আমি আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে নিতান্ত ঘটনাচক্রে মাত্র কখনো-সখনো মুখোমুখি হয়েছি। বিচিত্র! বিচিত্র! তবে কদাপি ভেবো না, আজ যেহেতু জীবন সম্বন্ধে বৃহত্তর, সত্যতর দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে, সে কারণে তার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। না, তা সত্য নয়, আসল বস্তু পূর্বের মতই একইভাবে বর্তমান। তবে তা নৈর্ব্যক্তিক বস্তু, নামের দ্বারা সীমায়িত নয়। মনে রেখো, যা ঘটেছে, তার প্রয়োজন ছিল প্রাণ ও মস্তিষ্ককে রক্ষা করার জন্য, এবং সম্ভবতঃ আমার কর্ম-ক্ষয়ের জন্যও। এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের খৃষ্ট, মহম্মদ বা নারীপুজার মত ব্যাপার; একবার তা সম্পন্ন করবার পরে তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

১১ অক্টোবর, একই জনকে—"আগামীকাল খোকার অবতরণ করার কথা। আমি যে-রকম অনুরোধ করেছি সেইভাবে তারা যদি নাগপুর হয়ে কলকাতা যায় তাহলে এখানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রবিবার সকালে এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা একত্র বেড়াবো। অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছি না, কারণ খোকার মধ্যে কতক-গুলো অদ্ভুত জিনিস আছে যা আশাভঙ্গ করে। আর যদি তারা ঐ কথার রাখি না হয়, তাহলে ২০শে নভেম্বর নাগাদ কলকাতায় দু' তিন দিন তাদের পাব, তার পরে পুনশ্চ বিচ্ছেদ। তারপরে বড়দিনের সময়ে যদি সে নতুন কোন আহ্বান

পায় এবং গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের পুনশ্চ সাক্ষাতের সম্ভাবনা নিতান্ত ক্ষীণ। সবই স্বামীজীর হাতে। এখন সবই তাঁর জানা। সুতরাং সবই ঠিক।...

বোম্বাইয়ে একজন ফটোগ্রাফার আমার ফটো তুলতে চেয়েছিল। এসে সে খোকাকে দেখল। দেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল—'এ যে মস্ত সাধু!' আমার সুখের পরিমাণ বুঝতেই পারছ। নিগু (ওকাকুরা) বড় চমৎকার, আমার সঙ্গে কথা ব'লে, আমার ভাবগুলি বুঝে নিয়ে সেগুলি আমার কাছে পুনশ্চ পোঁছে দিয়ে সে আমাকে বিরাট সাহস দিয়েছে, যাতে করে ভাবগুলিকে খোকার সঙ্গে বিনিময় করতে পারি। ব্যক্তিগত ভাবটুকু চলে গেছে মনে হচ্ছে, কিংবা হয়ত সবই আমার কল্পনা।"

২৩ অক্টোবর, একই জনকে—"আমার খোকা এসেছিল। আমার আশঙ্কা সত্য হয়েছে, তারা অন্য পথে কলকাতায় গেছে। ১৯শে নভেম্বর তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার জন্য সাক্ষাৎ হবে বলে মনে হয়। কিন্তু শুনছি, জানুয়ারীতে সে পাশ্চাত্যে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ ক্ষণিক সাক্ষাৎই সর্বোচ্চে পাচ্ছি।"

৯ নভেম্বর, একই জনকে—"খুব সম্প্রতি আমার এক শিষ্য হয়েছে।...সে কিছুটা লজ্জিত ভাবে পাশ্চাত্য চরিত্রের শক্তি সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করে কিছু বললে। তাতে আমি শুধু এই বললাম, যেখানে এক বছর কি দু' বছর আগে আমি শিশু ছিলাম, সেখানে এখন আমি মা।...আজ তিন ঘণ্টা আমার খোকাকে পেয়েছিলাম—ফলে আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। গতকাল সে এসেছিল, তারই ভাষায়—কঠিন, শীতল ও হিংস্র হয়ে—তারপরে চলে গিয়েছিল আলোকে ও মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে। আজ কিন্তু সারাক্ষণই সব কিছু পবিত্র ও সুন্দর। অন্যের সঙ্গে যেমন বলি তেমনি তাকে সহজভাবে খোলাখুলি সব বলেছি। দায়িত্ব হবে তারই। আমি যে-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাকে সে বোঝে, এবং তার কথায় যে তন্ময় পূজার সুর যা অর্ধ-সচেতন এবং অজ্ঞানিতে উন্মোচিত—আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে আদর্শকে আমি তার কাছে নামাইনি এতটুকু। আর তুমি জানো আমার মধ্যে কোথাও কোনো কপটতা নেই। সুতরাং সব কিছু ঠিকঠাক। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি কি কোনো প্রলোভনের কারণ হয়েছি, সে বলল—'তুমি আমাকে স্বাভাবিক করেছ, তুমি আমাকে ঈশ্বরের সন্তান করে তুলেছ।'...

ইতিমধ্যে বলি, আমার খোকার কলেজীয় পার্থিব জীবন পুনরায় স্বচ্ছন্দ হয়েছে। মিঃ র‍্যাটক্লিফের মারফত তার স্বতন্ত্র প্রমাণ আমি পেয়েছি—সত্যই তা হয়েছে, হবেও।"

১৯ নভেম্বর, একই জনকে—"আমার ছোট্ট খোকাটিকে ভালভাবে দেখতে পেয়েছি।"

২১ ডিসেম্বর, একই জনকে—"আমার ছোট্ট খোকা এখন বিশেষ শক্ত সমর্থ ও সুন্দর। একে ভালবাসার আগে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমি এত ভালবাসতে পারি। আমরা আমাদের সকল সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা বলেছি। সে মুক্ত আত্মা, কোনো কিছুর উপরই নির্ভরশীল নয়, আমার প্রাণ শান্তি পেয়েছে তা

শুনে। সেন্ট সারার কাছে অনন্ত ঋণ—আমাদের এই কথাবার্তা সম্ভব হয়েছে বলে। তবু ব্যাপারটা যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়াত। কেবল জানতাম, আমি তাকে (বসুকে) অকারণ বেদনা দিতাম। আহা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ তিনি যেভাবেই হোক আমাকে সেবা ও ত্রাণ করবার শক্তি দিয়েছেন।"

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দটি ডঃ বসুর জীবনে খুব শুভ বৎসর নয়। কর্মজীবনে বাধা যথারীতি বজায় ছিল। নিবেদিতার সাহায্যও ছিল। কিন্তু এই বৎসরই জীবনের গভীরতম প্রত্যাশার মৃত্যু হয়েছিল—তিনি ও তাঁর স্ত্রী তীব্র শোক পেয়েছিলেন, যে শোক, আমরা অনুমান করি, ডঃ বসুর উৎসর্গকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই বৎসর তাঁদের একমাত্র সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।

খোকা ও 'বো'র (বউ) সন্তান হবে—সেই সম্ভাবনায় নিবেদিতার উচ্চকিত প্রাণ, তারপরে মৃত্যুর আঘাতে ছিন্ন আশার যাতনা, এবং তারপরে শ্রীমতী বসুর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে অপরূপ সান্ত্বনা বাণী। যে-প্রাণ অপরের বেদনা টেনে নেয়, সেই প্রাণই যে যথার্থ সান্ত্বনা দিতে পারে—নিবেদিতার লেখা পড়ে তা বোঝা যায়।

জগদীশচন্দ্রের শোক : নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, ডিসেম্বর ১৯০৩ পর্যন্ত

২৮ জানুয়ারী ১৯০৩, ম্যাকলাউডকে—"সেন্ট সারা এখানে এসে খোকার রক্ষাকর্ত্রী ও আশ্রয়দাত্রী হলে খুব খুশী হব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকা হয়ত এখানে থাকবে না। সেক্ষেত্রে সেন্ট সারা খোকার কাছাকাছি থাকুন তাই চাই।... আমি জানি, সারার পারিপার্শ্বিক সুন্দর, যদিও সর্বাংশে তা খোকার প্রয়োজন পূরণ করবে না, তবু নিঃসঙ্গতার তুলনায় কতগুণে ভাল।"

২৬ মার্চ, একই জনকে—"আমার বেচারা খোকা, তার কি-যে যা-তা সময় যাচ্ছে!"

২ এপ্রিল, একই জনকে—"আমার খোকার কাছে জীবন বোঝা হয়ে উঠেছে। ভগবান জানেন তার ফল কি হবে। সেদিন সন্ধ্যায় তার সঙ্গে একলা ছিলাম, মনে হল যেন জমাট বিষণ্ণতার সামনে বসে আছি—তাকে যেন নড়ানো যাবে না। ঈশ্বর করুন, লক্ষ লক্ষ লোকের এই অবরুদ্ধ যাতনা যেন শীঘ্র দূরীভূত হয়ে যায়! ছোট্ট বউটি মাতৃত্বক্ষণটির দিকে ধীরভাবে অগ্রসর হচ্ছে। তাকে কত সুখী দেখাচ্ছে!"

৯ এপ্রিল, একই জনকে—"খোকা ডেমনস্ট্রেশনসহ দুটি অপূর্ব বক্তৃতা করেছে।... মিসেস বসু দিন পনেরর মধ্যে সন্তান আশা করছে। অপরূপ নয় কি? এর দ্বারা নূতন জীবন ও নূতন আশার সূচনা হবে, তাই আশা করি। তুমি ভাবতেই পারবে না কী যে মধুর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে!"

২৩ এপ্রিল, একই জনকে—"তোমাকে বলেছি কি, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মিসেস বসুর সন্তান হতে যাচ্ছে! অপূর্ব নয় কি ব্যাপারটি! অনুভব করছি, আমি

৪:

যাদের ভালবাসি তাদের মধ্যে একটি শিশুর উপস্থিতি বিরাট মিস্টিক তাৎপর্য যুক্ত করে দেবে। নিঃসন্দেহে কিন্তু শিশুটি হবে উৎসর্গীকৃত। যখন তার আবির্ভাব হবে, আমার বিশ্বাস তুমি তাকে (বসুকে) মধুর করে কিছু লিখবে।"

৭ মে, একই জনকে—"তোমার ভালবাসা খোকাকে দিয়েছি, তোমাকে সে তার ভালবাসা জানাচ্ছে। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে। ছোট্ট বউটি, বলব কি, মাতৃত্বে একেবারে জ্যোতির্ময়ী। যে-কোনোদিনই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা। তার দর্শন পেতে আমার ব্যাকুলতার কথা কি করে বোঝাই বল!"

১৮ মে, অবলা বসুকে—

"আমার ছোট্ট মা, আজ সারাদিন ধরে তোমারই জন্য যে কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ঘুরেছে ফিরেছে, সেগুলি বলতে চাইছি বলে আমাকে যেন অশালীন ভেব না। আমি এই কথাটাই বলতে চাইছি—জানি না বলার অধিকার আছে বলে তুমি মানবে কি না—আমার কাছে তুমি এখনো সেই মা হয়েই আছো—শিশুটি যেন আমাদের সকলের মধ্যে প্রাণময় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।

এই সকালে এক বিচিত্র শোক নিয়ে ফিরেছি।—শিশুকন্যাটিকে দু' এক মুহূর্তের জন্যও আমরা হাতে তুলে নিতে পারলাম না, আমাদের এই মানুষের পৃথিবীতে তার আত্মাকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্যাপ্‌টিজমের মত কোনো অনুষ্ঠান করা গেল না, তার আগেই সে চলে গেল অনুদ্বিগ্ন অকলঙ্করূপে। স্বামী সদানন্দ এলেন, তাঁর সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বললাম। সদানন্দ বললেন—যে-মাসগুলি ধরে জননী সন্তানের প্রতীক্ষা করে—যে-মাসগুলিতে তুমি পরম ধৈর্যে, পরম মাধুর্যে প্রতীক্ষা করেছিলে—হিন্দুদের কাছে সেইকালে শিশুর সত্তা জীবন্ত, ব্যক্তিত্ব আকারিত, এবং সান্নিধ্য বাস্তব সত্য—তখনকার অনুষ্ঠানগুলি শিশুকে ভালবাসা ও অভ্যর্থনা জানানোর অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। এই ভাবনাটি বড় সুন্দর তাকি তুমি মনে করো না, যার ফলে অনুভব করতে পারবে সেই ছোট্টটি এখনো তোমার সঙ্গেই আছে, সর্বদা তোমার সঙ্গে মা ও শিশুর যোগসূত্র রেখে যাচ্ছে, যদিও সেইসঙ্গে এও সত্য, তোমাকে অনেক মধুর সুখ ও সেবার তৃপ্তি ত্যাগ করতেই হবে। হয়ত তুমি বৃহত্তর মাতৃত্ব অর্জন করেছ, যেহেতু তোমার ক্ষেত্রে প্রাণের না হয়ে শোকের grand sacrament হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ভাবেই হোক, আমি অনুভব করি, যেন তোমার কন্যার সান্নিধি বেশী করে থাকবে তোমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদের সময়ে, তোমার প্রার্থনা ও আশীর্বাদ আগে তার কল্যাণ করবে, তারপর তোমার। মনে রেখো, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, তা সর্বদাই পূর্ণ, জ্যোতির্ময়, বলীয়ান। যারা ভালবাসে তাদের কাছে অসহায় দেহখানি কি মধুর! মনে হয় তোমাদের তিনজনের মধ্যে এই সুন্দর সম্পর্ক সর্বদা বজায় থাকবে, যদিও এখানে জন্মমুহূর্তই হয়েছে মৃত্যু-মুখের উন্মোচনের ক্ষণ। বোধহয় মুক্ত আত্মারাই প্রবেশপথে পৃথিবীকে ত্যাগ করে যায়। তেমনই এক অতিথির সেবা-পূজো হয়ত তুমি করতে পেরেছ।

সে যাই হোক, প্রিয় আমার—আমার কাছে তুমি চিরদিনের মা। যদি তুমি কোনো চলতি আনন্দকে হারিয়ে থাকো, আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি একই

সঙ্গে সেই মহান জীবন্ত শক্তিলাভ করেছ যার ফলে আরও বেশী করে সার্বভৌমিক মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ—যেহেতু পৃথিবীর লোক যাকে বিচ্ছেদ বলে তারই অনুভূতি লাভ করেছ। সারদাদেবী নিজের একটি সন্তান চেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ওগো, একদিন তুমি এত ছেলে পাবে যে তাদের নিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারবে না।"

চিরদিন তোমারই, আমার অতি প্রিয় তুমি,
—ইতি মার্গট

রোমান ক্যাথলিকেরা কোনো লোকান্তরিত ব্যক্তিকে 'সেণ্ট' পর্যায়ে উন্নীত করার অনুষ্ঠানে তিনি যে সেণ্ট তার পক্ষে প্রমাণ দেবার জন্য জানায়, কিভাবে তাঁর মধ্যবর্তিতায় মিরাকল্ সংঘটিত হয়েছে। এটা দেখিয়ে দেয়, তাঁরা মৃতের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁরা মনে করেন জীবিত ও মৃতেরা এক বিরাট প্রার্থনায় সমবেত হয়েছেন, যে-প্রার্থনা পরস্পরের হৃদয়নিহিত এবং পরস্পরের জন্য কৃত—এবং জগতের জন্যও। যখন তুমি দেহত্যাগ করবে, তুমিও তাতে যোগদান করবে এবং কে জানে হয়ত মধুর আত্মাটিকে তুমি চিনে নেবে, যে তোমার দিকে দৃষ্টি মেলে ছিল, প্রার্থনা করেছিল তোমারই সঙ্গে। নয় কেন?

অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস। মৃত্যুর অন্তরে জীবন—নিশ্চয় তা একটি মহান মিস্টিক পবিত্র সত্য।"

২০ মে, ম্যাকলাউডকে—"প্রিয় শিশুটি—কন্যা—গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে হয়েছিল—মৃত অবস্থায়—জন্মাবার আধ ঘণ্টা আগেই বোধহয় গতপ্রাণ। মায়ের জীবনই শুধু বাঁচানো গিয়েছিল, তাও কষ্টে। বেচারা—বেচারা—ছোট্ট জননী। হারিয়ে গেল কতখানি।"

১৯ জুন, একই জনকে—"এক সপ্তাহ আগে সেণ্ট সারা এসে পৌঁছেছেন, আমাশয়ে অত্যন্ত অসুস্থ, তাই অবিলম্বে দার্জিলিঙ যাওয়ার পরিবর্তে বসুর সঙ্গে তাঁকে থাকতে হল। তিনি এখন অনেক ভাল, সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় নিশ্চিত যাত্রা করছি।"

২৩ সেপ্টেম্বর, একই জনকে—"এই শীতে বোধ হয় পাশ্চাত্যে যাচ্ছি না।...... এখানে এত জিনিস খুলে যাচ্ছে—বেট-এর স্কুল, মুসলিম-সংযোগাদি, আমাদের সঙ্গে মিস লকউডের যোগদানের সম্ভাবনা এবং বিজ্ঞানের কাজ,—এবং আমাদের পল্লী সম্বন্ধে অজস্র পরিকল্পনা—এ সবের জন্য মনে হয় 'স্বামীজী চান আমি এখানে থেকে যাই।"

১৭ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"নতুন পুস্তক সম্বন্ধে খোকার আইডিয়াটি অপূর্ব। কিন্তু আমরা একটা নতুন পেপার শেষ করছি।"

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ *Plant Response* ("Plant Response as a means of Physiological Investigation") ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গপত্রে নাগরী অক্ষরে সংস্কৃতে লেখা ছিল—'মাত্রে'। বইটি বিরাট, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৮+৭৮১। এতে ২৭৮টি চিত্র ও নক্সা। এর ভূমিকায় লেখক অন্যান্য কথার সঙ্গে জানিয়েছেন—

"The investigations described in the present volume have been an outcome of my work on the similarity of Responsive Phenomena in Inorganic and living Matter, first communicated as a Memoir to the Science Congress at Paris, in August 1900, and subsequently expanded into greater detail in my book on *Response in the Living and Non-Living......*"

জগদীশচন্দ্রের এই দ্বিতীয় কীর্তির প্রতি পৃষ্ঠায় যাঁর হস্তাক্ষর, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি মুদ্রিত অক্ষরে, কারণ তা করলে মিথ্যাচার করা হত। এই গ্রন্থ যতখানি জগদীশচন্দ্রের ততখানিই নিবেদিতার—অন্ততঃ অনুভূতির দিক থেকে। নিবেদিতা গ্রন্থটিকে (এবং গ্রন্থগুলিকে) 'আমাদের বই' বলেছেন। আবিষ্কার অংশ জগদীশচন্দ্রের, প্রেরণার প্রধান অংশ নিবেদিতার, রচনাংশ তাঁরই, নক্সা প্রভৃতিও বহুলাংশে তিনিই করেছেন, প্রকাশের এবং প্রচারের ব্যবস্থাতে তাঁরই মুখ্য ভূমিকা। এই বইয়ের কাজ যখন তিনি করেছেন, এখানে জানানো উচিত, তখন সেটাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল না। ভারতের জাতীয়তা আন্দোলন-সংগঠনে ইতিমধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন। তার জন্য ব্যাপক বক্তৃতা-সফর এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত সংগঠনে অংশগ্রহণ। তাছাড়া সাংবাদিকতা আছে, নিজের গ্রন্থরচনা আছে (শ্রেষ্ঠ দুই গ্রন্থ, 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' এবং 'দি ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্' এই সময়েই রচিত হয়), লোকসেবার কাজ আছে, বিদ্যালয় চালনা রয়েছে এবং জ্ঞাত অজ্ঞাত অগণ্য কাজ রয়েছে যার অংশমাত্র সম্পন্ন করতে পারলে যে-কেউ মহাকর্মী আখ্যা পেতে পারেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি দুবার গুরুতর পীড়িত হয়ে প্রায় মৃত্যুদর্শন করেছেন, যা তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল। নিবেদিতার জীবনে অন্য অলৌকিকতা ছিল কি না তা প্রশ্নের বিষয় হতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষমতা এবং মননশক্তি যে অলৌকিক পর্যায়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

অন্য হিসাবের প্রয়োজন নেই, যদি কেউ নিবেদিতার ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার বিষয়ে সামান্য ধারণা রাখেন, তিনিই বুঝবেন, সেই সমস্ত কাজ করেও যদি তাঁকে জগদীশচন্দ্রের প্রথম চারটি বইয়ের এবং মধ্যবর্তী কালের প্রচুর পেপারের লেখার ও নক্সা তৈরীর মূল দায়িত্ব নিতে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কী অসাধারণ কাজ করেছেন মাত্র ১০ বৎসরে। ঐ চারটি বইয়ের মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এবং নক্সার সংখ্যা প্রায় হাজার।* এবং এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়

---

* *Plant Response* এবং *Comparative Electro-Physiology* —এই দুইটি বইয়ে নিবেদিতার সাহায্য সবচেয়ে বেশী। বিরোধী পক্ষের চক্রান্তের উপযুক্ত জবাব

নিবেদিতার মত উৎসর্গীকৃত চরিত্রও দাবি না করে পারেন নি—ভারতীয় বিজ্ঞানকে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে অন্ততঃ লজ্জিত হতে হবে না।

বিজ্ঞানের কাজ ১৯০৩ সালে চললেও পুরোদমে চলে ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে। এই সময়ে নিবেদিতার যে-সব চিঠি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্য থেকে ডঃ বসুর কর্মজীবনের খণ্ডিত দিনপঞ্জী যেন আমরা পেয়ে যাই। গবেষণা সাফল্যে উদ্দীপনা, বিরোধী আক্রমণে যাতনা এবং তাকে জয় করার প্রবল প্রয়াস। রয়াল সোসাইটির দ্বার একবার মনে হয়েছিল বুঝি খুলেছে—উল্লাসের সীমা ছিল না তাতে, তারপরে যখন চক্রান্তের ফলে ঈষৎ উন্মোচিত দরজা বন্ধ হয়ে গেল তখন মানুষের নীচতায় অসীম ক্ষোভ—সবই পাওয়া যাবে চিঠিগুলি থেকে।* এই পর্যায়ে জগদীশচন্দ্রের ব্যাপারে মিসেস বুলকে লেখা চিঠির সংখ্যাধিক্য পাঠক লক্ষ্য করবেন। ডঃ বসুর গবেষণায় মিসেস বুলের সক্রিয় সাহায্যের কথা পাঠক পূর্বেই জেনে এসেছেন। সেই সক্রিয়তা কতখানি ছিল এখানেই পাঠক দেখবেন। চিঠিগুলি থেকে দেখা যাবে, ডঃ বসুর সঙ্গে কাজ করার জন্য নিবেদিতার জীবন-যাত্রার মূল ভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন। এই সূত্রে আমরা মিসেস বুলকে লেখা ডঃ বসুর কয়েকটি চিঠিও প্রকাশ করব, এবং ডঃ বসু ও নিবেদিতাকে লেখা মিসেস বুলের কিছু চিঠিও। ডঃ বসুর জীবনী রচনার ক্ষেত্রে এই পত্রগুলির অসীম গুরুত্ব ভবিষ্যতে স্বীকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জগদীশচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ

১৯০৭ সালে ডঃ বসুর তৃতীয় বই প্রকাশিত হয়। নাম—

Comperative Electro-Physiology: A Physico-Physiological Study.

বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪+৭৬০। ছবি ও নক্সার সংখ্যা ৪০৬। ভূমিকায় বলা হয়েছে—

দেবার জন্যই গ্রন্থগুলির রচনা। যে বিরোধিতা এত বড় সৃষ্টি সম্ভব করতে পারে তা অভিনন্দনযোগ্য মনে হয়েছে অধ্যাপক গেডিসের কাছে। বই দুটির পিছনে যে বিপুল প্রতিভা ও পরিশ্রম রয়েছে তার গৌরব ডঃ বসুকে দান করে অধ্যাপক গেডিস লিখেছেন—

"But happily Bose's response to this combination of environmental stimuli, by turns so depressing and so exasperating, was of the intensity and duration required for the large and sustained experimental productivity summarised in the two books which Bose wrote for publication. *They include an amount of work and fresh result during the three years of their production to which there can be few parallels in science;* so that, despite the painfulness of these experiences, we can now hardly regret them. We must, in fact, rather congratulate their sufferer upon stimuli which have proved to be of such effective increase in his own movements and growth." (Italics mine)

"This volume concludes the line of investigation on responsive phenomena in general, which I commenced with the publication of a Memoir at the International Congress of Science, Paris, 1900......"

এই গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের এক পর্যায়ের, বলা যায় মুখ্য পর্যায়ের গবেষণার সমাপ্তি। জগদীশচন্দ্রের জীবনের এই পর্ব ১২ বৎসরের এবং হিন্দু জীবনে ১২ বছরের অর্থাৎ এক যুগের তাৎপর্যের কথা নিবেদিতার মনে বারবার এসেছে, যেমন ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র যে দশ বৎসর সাধনার ব্রত নিয়েছিলেন, তার সমাপ্তির কথাও।

আলোচ্য পর্বের মধ্যে ডঃ বসু ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে নিবেদিতার বুদ্ধ-গয়া ভ্রমণ এবং বজ্রচিহ্ন আবিষ্কার। এই ভ্রমণের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য 'নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হবে। 'বজ্রকে' নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র উভয়েই প্রতীক করেছিলেন, এবং নিবেদিতা চেয়েছিলেন, ভারতের জাতীয় পতাকায় 'বজ্র'-প্রতীক গৃহীত হোক।

ডঃ বসুর জীবনী লিখবেন, নিবেদিতার এই অভিপ্রায়ের কথাও জানতে পারি, যার উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত লিখে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এইসব এবং আরও বহু তথ্য ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়ে নিবেদিতার চিঠি থেকে মিলবে। সেইসঙ্গে ব্যক্তিজীবনের নানা কথা, যার অন্তরঙ্গ স্পর্শ আমাদের কাছে সুপবিত্র সুগভীর অভিজ্ঞতার মত।

১৯০৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত নিবেদিতা, মিসেস বুল, ডঃ বসু প্রভৃতির পত্র

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ ১৯০৭ পর্যন্ত

৭ জানুয়ারী ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে—" 'ওয়েব' তাঁর (স্বামীজীর) বই—তাই নয় কি? আর কোনো উৎসর্গ পত্র নয়, শুধু লেখা 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে!' গুরুজীর জয়। প্রিয় যুম, তোমার সমস্ত জীবন মুখর হয়েছে এই কথায়—'ওয়াহ্ গুরু!' এই উৎসর্গটি খোকা নিজের হাতে লিখেছে, আমার পক্ষে।"*

১৭ মার্চ, ওলি বুলকে—"এ চিঠি দীর্ঘ হবে না কারণ আমার নিতান্ত সময়াভাব। এ সপ্তাহে খোকাকে অপার যাতনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তার বালক ভাগিনেয়, যে তার নিজের শিষ্যও বটে—মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। কিন্তু আমি জানি স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ফিরিয়ে আনবেন। গতকাল সকালে মনে হয়েছে তার বিপদ কেটেছে। স্বামীজী কখনই প্রিয় কোনো জীবনকে ত্যাগ করেন

* নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে জগদীশচন্দ্রের হস্তাক্ষরে উৎসর্গ-পত্রটি লেখা, আমি দেখেছি।

না। এই হল সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা। মধ্যবর্তীকালে, এই সংকটের জন্য খোকা ও ছেলেটির মধ্যে সম্পর্ক অপূর্বভাবে গভীর হয়েছে। সে এখন আমাদের ছোট্ট 'খোকা'র (অরবিন্দমোহন) মতই ঘনিষ্ঠ। কোনো কিছু তাতে চিড় খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু খোকার (বসুর) যাতনা হয়েছিল নিদারুণ।

(অমুকের) চিঠিতে জানছি যে, ওয়েলার রয়াল সোসাইটিতে দাঁড়িয়ে উঠে (ডঃ বসুর) পেপার প্রকাশে বাধা দেবার মত স্পর্ধা দেখিয়েছে! কল্পনা করতে পারো! তুমি হয়ত ভেবেছ, খোকার নাম শুনলে সে মুখ লুকোবে। তার চিহ্নও নেই।

কিন্তু শক্তিসামর্থ্যে আমরা কত না বেড়ে উঠেছি! ও-সবের ভাবনায় এক মুহূর্তও ব্যয়িত হয়নি, শুধু শান্ত প্রশ্ন—এর পরে করণীয় কি? এবং—তা করবার জন্য লেগে যাওয়া।

এখন থেকে জুলাই পর্যন্ত আমার প্রতিটি উদ্বৃত্ত মুহূর্ত তার কাজে দিতে চাই।"

১৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"কয়েক সপ্তাহ যে তোমাকে লিখতে পারিনি তার জন্য মিষ্টি করে কিছু বলেছ। আমি লখনৌ ও বারাণসীতে সফরে গিয়েছিলাম, তারই মধ্যে প্রকাশকদের কাছে চিঠিপত্র ও আমার বৈজ্ঞানিক-সহায়িকার কাজ—এসবের জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।"

২৪ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"আগামীকাল আমার জন্মদিন ('নিবেদিতা'-জন্মের)—মনে আছে তো? আজ লেখার সময় খুবই অল্প, কারণ এই সপ্তাহে বিজ্ঞানের দাবি ছিল প্রচণ্ড, এবং সে চাপ বজায় থাকার সম্ভাবনা আছে।"

১৪ এপ্রিল, ওলি বুলকে—"আমাদের প্রিয় খোকা এত কঠোর পরিশ্রম করছে!"

[১৯০৪-এর মে মাসে মিসেস সেভিয়ারের আমন্ত্রণে বসু-পরিবারকে নিয়ে নিবেদিতা মায়াবতী যান। প্রায় দেড় মাস সেখানে তাঁরা থাকেন এবং 'প্ল্যান্ট রেসপনস্' গ্রন্থের কাজ পুরোদমে চলে। ডঃ বসু পরেও নিবেদিতার সঙ্গে ১৯০৭-এর গ্রীষ্মে এবং ১৯১১-এর গ্রীষ্মে মায়াবতী যাবেন, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁর স্থায়ী প্রীতি-সম্পর্কের সূত্রপাত হবে। নিবেদিতার দেহান্তের পরেও ডঃ বসু মায়াবতী গিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় ডঃ বসুর সম্বন্ধে যত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সংঘ-সম্পর্কহীন কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে সেরূপ হয়েছে কি না সন্দেহ। অদ্বৈত আশ্রমের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারতের যে-বিশেষ সংখ্যা বেরোয় তার অনেক-গুলি লেখায় ডঃ বসুর উল্লেখ থাকে এবং তাঁর দেহান্তের পরে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শোকসংবাদ লেখা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে গভীর প্রীতিসম্পর্কসূচক এই সংবাদগুলির কয়েকটি আমরা চয়ন করে দিচ্ছি:

"Mr. Herbert Spencer, shortly before his death, wrote to Dr. J. C. Bose in highly appreciative terms regarding his scien-

tific work, the results of which that great philosopher was desirous of incorporating in his own writings." [P.B. Oct., 1906]

NERVOUS IMPULSES

(Report of a lecture by Dr. J. C. Bose, C.I.E. at Advaita Ashrama, Mayavati).

On the afternoon of June 23rd, the Mother brought her guests up to the Ashrama, and there monks and visitors sat in a circle, to listen to a talk by Dr. J. C. Bose. It has become a custom with Dr. Bose, when visiting Mayavati, to give at least one lecture to the assembled monks, and on this, his third visit, the tradition was notably maintained.

Dr. Bose is the ideal teacher. Not only does he start always from the familiar, and make each point simple to demonstration, as he proceeds, but he appears unable to pass from one step of an argument to another, until definitely satisfied that all, even the lowliest of his hearers, understands.

[P.B. Aug. 1911]

PROFESSOR BOSE'S LECTURE AT MAYAVATI.

Professor J. C. Bose, M.A., D.Sc., C.I.E., C.S.I. of the Presidency College, Calcutta who is widely celebrated in scientific circles in Europe and America, as well as in his own land, was again a most welcome visitor at our Ashrama. He is always delighted to spend the summer holidays at our Ashrama because of the opportunity for solitude and complete retirement as well as for the calm and deep thinking it affords, and also because of the great beauty of the surrounding scene. And again, as the chief event of his stay, so far as the Mother and inmates of the Ashrama were concerned, was the lecture, which he has given each time of his visits, concerning the lines of his research.

This year, however, the lecture which has always been held in the Ashrama Library, proved an even more interesting event than the previous lectures, considered both from the text of his subject and the number of hearers. As to the latter, the Mother had invited the European residents of the near-by station of Lohaghat, headed by Mr. R. Nestor, the sub-divisional officer, to attend the address; also the Tassildar Sahib of Champawat had been invited. Thus, in all, there was a gathering of quite thirty persons, a considerable audience for a lecture in a monastery situated in the heart of the Himalayas and far distant from towns and railways.

The subject of Professor Bose's lecture was "The Irritability of Plants." For the occasion his assistant, Bosiswar Sen, B.Sc., had made, at his instructions, a sample of a recording instrument frequently used in the experiments at the Presidency

College Laboratory. With this instrument, to which a plant had been attached, Professor Bose illustrated his ideas on plant response and the methods employed for making automatic records. It was the automatism of the plant in writing out its own history under the influence of various shocks and narcotics which proved of the greatest interest to the distinguished lecturer's audience. He pointed out, by drawing and lucid explanation, the astonishing fact that plants respond to external stimuli in much the same way that animals respond; in fact in some instances the response is even more complex and quicker in plants. Previously it had been supposed, so said Professor Bose, that the response of a plant was purely physical of hydro-mechanical. Through his successful investigations, however, he had been able to prove that the changes induced in a plant, through electric or other stimuli, were physiological, proving the existence of a nervous, living, sensitive apparatus in the structure of a plant. In making his experiments Professor Bose said, it was necessary to invent an instrument that would record time to as infinitesimal a degree as a thousandth part of a second. He exhibited also the practical results of his new, demonstrated theories, how they would in time revolutionise practical botany. He also suggested how scientific discoveries proved, more and more as they were extended, the underlying unity of life, despite the multiplicity of living forms and showed, how science was in real consonance with the teachings of the Hindu philosophers that, "From a multi-verse we proceed to a universe."

The lecture proved most interesting, as may readily be imagined. The guests were entertained with light refreshments and in spite of a most rainy day and a journey of seven miles both in coming to and returning from Mayavati, the guests expressed their great interest and delight. Professor and Mrs. Bose remained in all about seven weeks at Mayavati, leaving this place on the twenty-third of June to resume his interesting work in Calcutta. [P.B. July 1913].

THE ADVAITA ASHRAMA, MAYAVATI, HIMALAYAS

(A Report of work from 1911 to 1913).

The Ashrama counts among its honorary guests and visitors, numbering 63 within the last 3 years, many distinguished persons, Indian and Western. The great scientist, Dr. J. C. Bose, C.S.I. passed his summer holidays every year in the precincts of the Ashrama and greatly enjoyed the calm, and the salubrious climate, returning to the field of his work fully refreshed in health and vigour. His sojourn, besides being pleasant, was highly instructive to the residents of the Ashrama. He kindly gave a lecture each year on his new discoveries, and thus the members had the opportunity of hearing with absorbing in-

terest his discourses on (1) The Similarity of Stimulus and Response between Human organisms and plants, (2) Do plants feel? and (3) Irritability of Plants. In these lectures, he spoke of his latest discoveries before even they were given out to the public. Sister Nivedita during her last visit to the Ashrama in the summer of 1911, also gave a valuable talk to the members setting forth in her unique way the aims and ideals in Education and study that should guide the Vivekananda Brotherhood in making them eminently useful in their service to the Motherland. [P.B. Dec. 1913].

অদ্বৈত আশ্রমের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রবুদ্ধ ভারতের বিশেষ সংখ্যায় (জানুয়ারী, ১৯৫০) *Reminiscences of Mayavati Ashrama* প্রবন্ধে বলা হয়েছিল :

"Sir Jagadish Chandra Bose, the famous scientist, who had been to Mayavati four or five times, used to say, 'when I am at Mayavati, ideas rush into my mind, but when I am in Calcutta, everything seems to dry up.'"

ঐ সংখ্যাতেই *Advaita Ashrama, Mayavati: Early Years* প্রবন্ধে দেখতে পাই, মায়াবতীতে একটি পায়ে হাঁটার পথের নাম 'Bose's Walk.' ঐ পথ ধরে ডঃ বসু পাদচারণা করতেন। এই প্রবন্ধের মধ্যেই একটি ছবি দেওয়া হয়েছে, যাতে দেখা যায়, আশ্রমের 'মাদারস্ বাংলো'র বারান্দায় বসে আছেন স্বামী অতুলানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী বিরজানন্দ, সিস্টার ক্রিস্টিন, মিসেস সেভিয়ার এবং লেডী অবলা বসু।

পুনশ্চ, *Fifty years of Advaita Ashrama, Mayavati* প্রবন্ধে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে ডঃ বসু এবং আনন্দমোহন বসুর নাম আছে।

ডঃ বসুর দেহত্যাগের পরে জানুয়ারী ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারতে বিস্তৃতভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। তার প্রথম অনুচ্ছেদ :

"The death of Sir Jagadish Chandra Bose on the 23rd of November last has been deeply mourned by the nation as well as by the whole of the scientific world. It has also been felt as a personal loss by us. He was long closely associated with the Advaita Ashrama, Mayavati, Himalayas. For a number of years both he and Lady Bose used to visit the Ashrama almost annually and to stay here during the summer months. The members of the Ashrama were drawn to them by their easy and natural manners, and they often used to watch with great interest Dr. Bose's demonstration of the fascinating story of plant's life."

১৪ জুলাই, ওলি বসুকে—"আগামীকাল তুমি আমাদের টেলিগ্রাম পাবে—'Victory, Royal accepts' (অর্থাৎ জয় হয়েছে, রয়াল সোসাইটি বসুর পেপার

প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছে)। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ও (বসু) নিজে তোমাকে লিখবে। ট্রানজাকশনস্‌-এর জন্য গৃহীত হওয়ার অর্থ—ইংলণ্ডের বিজ্ঞানের রেকর্ডের্ম অন্তর্ভুক্ত হওয়া, পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হওয়া। এপর্যন্ত যা হয়েছে এটি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা।"

২১ জুলাই, ওলি বুলকে—"আমরা 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশন' নিয়ে কী গর্বিত! এখন যদি বোটানি বইটি লিখে ফেলতে পারা যায়! তারপর আমরা আবার ফিজিকস্‌-এ ফিরে যেতে পারব।" (এরপর পত্র খণ্ডিত)

২৮ জুলাই, ওলি বুলকে— "*Philosophical Transaction* -এ খোকার পেপার প্রকাশের তাৎপর্য বুঝতে পারো কি? এর অর্থ—১৯০১-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চে সে বোটানিতে ডুব দেয় এবং ১৯০৪-এ এমন কিছু লিখল যাকে ইংরেজরা ঐ বিষয়ে তাদের বেদগ্রন্থে প্রকাশ করতে পেরে গর্ব অনুভব করতে পারল। ১৯০৪ শেষ হবার আগে একটি বই প্রস্তুত করার যথেষ্ট আশা রাখি, যা উদ্ভিদ জগৎ পরিক্রমণ করে ব্যাপারটার ইতি করে দেবে। সাড়ে তিন বছরের কাজ একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানকে তার মূলীভূত ঐক্যের সমন্বিত রূপে অঙ্গীভূত করে ফেলল! ভাবো একবার! সব রেকর্ড গুঁড়ো! পরের মেলে রয়াল সোসাইটিতে খবর পাঠাবার আশা রাখি। বর্তমানে দমবন্ধ করে আমাদের কাজ চলেছে, গ্রহণ, বর্জন, সংযোজন প্রভৃতি। আমার ক্ষুদি-ক্ষুদি লেখার চেহারা দেখলে তুমি হাসবে।

ভারতের 'ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি' বা উচ্চতর বিজ্ঞানের জন্য একটি ভারতীয় বৃত্তির প্রবর্তন করে তোমার পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কি? খুব খরচ হবে কি? আমেরিকা হয়ত একদিন খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করবার কারণ খুঁজে পাবে।"

১১ অগস্ট, মে উইলসনকে—"ডঃ বসু তোমার চিঠি শোনেন গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে। বইটির (সম্ভবতঃ 'দি ওয়েব') বিষয়ে তিনি প্রতিটি শব্দ শুনতে চান এবং মার্গট ও সিসিলির (মে'র দুই মেয়ে) বিষয়ে প্রতিটি শব্দ। তিনি প্রায়ই বলেন, যখন সুযোগ ছিল তখন ছোট্ট মার্গটের উপরে তাঁর সমস্ত স্নেহ ঢেলে না দেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই ভুল হয়েছে।"

২১ সেপ্টেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"আমার অযোগ্য মস্তকটির যে রেখাচিত্র মিস স্টাম করেছেন, তার ফটোগ্রাফ ও মুদ্রণ কী মনোরম হয়েছে! বিজ্ঞানের মানুষটি (বসু) শাসিয়ে রেখেছেন, এইটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আমার পোরট্রেট বললে শেষ করে ফেলবেন। আর—এটিকে সত্যই ভালবাসি, কারণ এর রচনায় স্বামীজীর সাহায্য ছিল। কী মধুর দিনই না ছিল তখন!*

---

* মড স্টামের আঁকা এই স্কেচ-এর বিষয়ে নিবেদিতা ৮. ২. ১৯০৫ তারিখে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"সেন্ট সারাকে লিখেছি, তিনি যদি পারেন মিস স্টামের আঁকা আমার স্কেচ-এর ফটো যেন পাঠিয়ে দেন। এটিকে এমনই সুন্দর বিবেচনা করা হয়েছে যে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এটি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহৃত হতে দেবো না।"

বিজ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ। গত একবছর ধরে আমরা যা লিখেছি তা একেবারে বোমা! প্রায় মাসে-মাসে একটি করে পেপার। শেষের দিকে গতি একটু কমাতে হয়, কারণ আমাদের শারীরিক সামর্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হবার মুখে। যাইহোক, ভরসা করি, এ অবস্থা স্থায়ী হবে না, অবকাশযাপনের পরে আমরা আবার নবোদ্যমে কাজ আরম্ভ করতে পারব, একটা বিরাট বইয়ের কাজ, যা দু'বছরের মত সময় নিতে পারে। কাজটি চলতি ধারণার থেকে এত অগ্রগামী এবং এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে যে, অবিলম্বে এর প্রকাশন সম্ভব হবে না। গত অক্টোবরের কাজ ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক সমাজে কয়েক মাস আগে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা আরও ডজনখানেক কাজ করে ফেলেছি যা বিবেচিত হবার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি।

ভেবে আনন্দ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান তার মূল রূপে যেমন, তেমনি লেখায় প্রকাশের ক্ষেত্রেও সামান্যতম ত্রুটিযুক্ত থাকবে না। এইদিক থেকে আমরা আশা করতে পারি, সর্বকালে এটি ক্লাসিক হয়ে থাকবে।"

(স্থূলাক্ষর লেখককৃত)

১৩ নভেম্বর, ওলি বুলকে—"খোকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ। আমার নিজের অভিমত, সে আগামী অক্টোবরে, ১৯০৫-এর অক্টোবরে, ছুটিতে থাকার অনুমতি চাইবে......" (পত্র খণ্ডিত)

১ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"গতকাল ছিল খোকার জন্মদিন। এই দিনটিকে বলি 'বজ্র-দিন', কারণ তার দশ বছরের ব্রতের সমাপ্তি ঐ দিনে। এখন সে মুক্ত। মনে হয় স্বাধীনতা সর্বদাই ঐ রকম—সকল বহিরঙ্গ বাধ্যবাধকতার সমাপ্তি——তখন—"আমার আর কিছু করার নেই, ঈশ্বর তাই সহায় হোন!" আরও বলি, আমরা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে নিয়েছি। ফরাসীরা যেমন নেপোলিয়ানকে বলে L'homme, তাকে ইঙ্গিত করবার জন্য আর কোনো কথার দরকার হয় না, তেমনি প্রাচীনকালে বুদ্ধের নাম লেখার পরিবর্তে বজ্র বললেই চলে যেত।

এবিষয়ে আরও অনেক গভীর কথা আছে, যা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নানা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারবে যখন স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে বজ্র কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।"

১ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"খোকার জন্মদিন তাকে স্পষ্টই সুখী করেছে। এবং সে একটি অসাধারণ এক্সপেরিমেন্ট করেছে, যাতে একটি আকর্ষ তার ইচ্ছামত পাক খুলে বিপরীত দিকে পাক দিতে সচেষ্ট।

ঐ সন্ধ্যায় সামান্য কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। গিয়ে দেখলাম, পড়ার ঘরের সাজ বদল। তার (বসুর) ডেস্কের পিছনে পুরনো পিয়ানোর কাঠ দিয়ে লম্বা তাক তৈরী হয়েছে। কোণের বিছানাটাকে নীচু করে ডিভানে পরিণত করা হয়েছে, দেওয়ালে ডিসটেম্পার করে সবুজ রঙ; কাঠের রঙ সাদা।

তদুপরি, বুদ্ধগয়ার মোহন্ত আমাদের প্রায় নিখুঁত একটি স্তূপ দিয়েছেন, যাতে সুন্দর বুদ্ধ বসে আছেন বহু শত ক্ষুদ্র বুদ্ধের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। এই

স্তম্ভটিকে তার (বসুর) ডেস্কের কাছে একটি স্তম্ভের—পদ্ম-স্তম্ভের—উপরে বসান হয়েছে। সব বুককেস বিতাড়িত—তাদের জায়গায় তিনটি নীচু বুককেস। ফলে এখন ঘরের মধ্যে হাঁপ ছাড়া ও বিশ্রাম করার জায়গা হয়েছে।...

তোমার পক্ষ থেকে আমরা ভারতীয় রীতিতে তৈরী চারটি পশমী জিনিস দিয়েছিলাম—তার দুটি খাঁটি সাদা সিল্ক ও পশম মিশিয়ে তৈরী, আর দুটি বিস্কুট-রঙের ফ্লানেলের। খুব একটা কায়দার ব্যাপার; বিশেষ আনন্দ দিয়েছে।......

তোমাকে জানাই, গতকালকার দিনটিকে আমরা ভবিষ্যতে সর্বদা 'বজ্র-দিন' বলব, কারণ ঐদিন তার দশ বছরের ব্রতের সমাপ্তি। আমরা ও-বাড়িতে পতাকা নিয়ে গিয়েছিলাম যাতে বজ্র আঁকা।"

৫ মার্চ ১৯০৫, ওলি বুলকে—"গত রাত্রি ছিল শিবরাত্রি। খোকা (ডঃ বসু) 'খোকা'কে (অরবিন্দমোহন বসু) নিয়ে এসেছিল। ...একটি সংবাদপত্রে কিছু অসুবিধাজনক সংবাদই এই আগমনের মূলে।

বুধবার। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা। সকালে মঠে গিয়েছিলাম গোলাপ নিয়ে। দুপুর থেকে কাজ চলেছে, আমি এত ক্লান্ত তার ফলে। বহু দরকারের কথা বলবার আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ভালবাসার, প্রার্থনার কিছু করবার জন্য প্রাণ তৃষিত। মন্দ খবরটি কি, তুমি তা নিজেই দেখবে। বলবার মত যা-কিছু খবর সবই মন্দ খবর। প্রতিদিন সংগ্রাম তীব্রতর, অসাধুতা জঘন্য—জঘন্যতর ক্রমে—তিক্ততার বৃদ্ধি। জগজ্জননী, মা মাগো! মানুষ কি করতে পারে বল?

হাত দিয়ে যেন সমুদ্র রুখবার চেষ্টা—তাই মনে হচ্ছে—ঠিক তাই।......

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রিয় সারা, দেখতে পাচ্ছ, উৎসাহজনক কিছু নেই কোথাও। মায়ের কাছে প্রার্থনা করো—ওরা যেন এখনো পেপারটিকে চেপে দিতে না পারে—তা যেন 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশানস্'-এ প্রকাশিত হতে পারে। অবশ্যই প্রার্থনা করো।...

গভীরতর শান্তি এনে দিতে কিভাবে না চাই! সেই ক্ষমতা যাতে পেতে পারি, তার জন্য প্রার্থনা কখনো থামিও না। আর তার (বসুর) জন্য সেই স্থির আলোকের প্রার্থনাও কদাপি থামিও না—যেখানে সব শক্তি, সব কিছু মাধুর্যে ভরা। একবার তুমি বলেছিলে, এমন একদিন আসবে যখন সে (বসু) আমার ধর্মবিশ্বাসের পর্যন্ত অংশীদার হবে। নিশ্চয় করে বলতে পারি না কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে সে সময় এসেছে। এমন ভবিষ্যৎবাণী আরও করো তুমি—ঐসব কথা কিভাবে না শুনতে চাইছি!...

পেপারটির বিষয়ে গন্ডগোল হয়ত খোকাকে আর এক বছরের পরে য়ুরোপে যেতে বাধ্য করবে—কে জানে!"

[এর পরেই নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুখের সময়ে তাঁকে বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে বসুদের বাড়ির কাছাকাছি বিরাট খালি বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়, তাতেই তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। নিবেদিতা ৫ এপ্রিলের চিঠিতে তা জানিয়েছেন।]

১২ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"ডঃ বসুর বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ। হাঁ—পরবর্তী শরৎকালের মধ্যে আমরা বোটানির একটা বই বার করে ফেলতে পারব, যা বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে অতীব বিস্ময়কর বোধ হবে, এ আশা আমরা রাখি। সে (বসু) যেভাবে দেখছে তাতে কাজটা সম্পূর্ণ শেষ করতে কয়েক বৎসর লাগবে, কিন্তু কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে যাচ্ছে।"

৪ মে, গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে—"আমার সম্বন্ধে আপনি যে-সব সহৃদয় উক্তি করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমি তার যোগ্য নই। আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে আমরা—ডঃ বসু এবং আমাদের (নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন) উভয়ের পক্ষে বলছি—আপনাকে একেবারে অন্তরঙ্গমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত মনে করি।"

২৩ মে, ম্যাকলাউডকে—"বুঝে দেখ, ১২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মেলা থেকে ৮ মে, আমাদের এখানে আসার তারিখ পর্যন্ত, আমি প্রায় কোনো কাজ করিনি। আবার এখন আমরা বিজ্ঞানের নতুন কাজে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। সুতরাং—একেবারে অকেজো নই!"

২৪ মে, ওলি বুলকে—"শুভ জন্মদিন বার বার আসুক। খোকা তোমাকে তার করতে চাইছিল। কিন্তু এখানে এত সুন্দর সব তিব্বতী জিনিস রয়েছে এবং সেগুলি এতই দামী যে, খোকার মনে হল তারই কিছু ঐ টাকায় কিনে তোমাকে পাঠান ভাল, যাতে স্থায়ী আনন্দ পেতে পারো।...

খোকা আমাকে একটি শিয়ালছানা দিয়েছে; যদিও তার দাম চার আনা কিন্তু যেহেতু কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার সুন্দর কালো চোখের দিকে না তাকিয়ে পারি না, খোকা বলে, অমন ব্যয়বহুল জিনিস সে দেখেনি। কয়েক দিনের মধ্যে ওটিকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছা।...

ঠিক হয়েছে আজ শেয়ালছানাটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তোমার জন্মদিনের সম্মানে। বল, তুমি খুশী হওনি!"

১৩ জুন, ওলি বুলকে—"খোকা বলছে, তুমি পাশ্চাত্ত্যযাত্রার পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে উদ্‌গ্রীব। তার ইচ্ছা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলি যে, এখানে নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং সেই একমাত্র লোক যে আত্মসমর্পণ করেনি, সুতরাং আরও এক বছর কি দেড় বছরের জন্য এদেশে তার একাদিক্রমে অবস্থান প্রয়োজন। এখনি সে লেফটন্যাণ্ট গভর্নরের কাছে পুনরাবেদন করতে চাইছে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য; যদি তা সফল হয় খুবই ভাল; না হলে ব্যাপারটা সহ্য করতে হবে। কিন্তু আরও ১২ কি ১৮ মাসের আগে সে পদত্যাগের কথা ভাবতে পারছে না।...

বইয়ের বিষয়ে। এই বইটি অপর বইয়ের চেয়ে আকারে ২গুণ বড় হবার সম্ভাবনা। তবু খরচের হিসাব মাত্র ১৬০ পাউণ্ড; তার উপর নক্সার জন্য ২০০ পাউণ্ড। আমাদের ধারণায় এ খরচ খুবই কম। অবশ্য তুমি যা বলেছ, আমার নিশ্চিত ধারণা তা সত্য। কিন্তু খোকার সমস্ত মনপ্রাণ বইটির যোগ্য মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য এমনই পড়ে আছে যে,—এটিকে 'একটি বজ্র' করে তুলতে চায়। তাই আমি এর

সম্বন্ধে কোনো কিছুতে প্রতিবাদ করিনি। সব জড়িয়ে মনে হয় ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড খরচ হবে। সে এখন এটিকে একখণ্ডে বের করবে বলে ঠিক করেছে। যদি তাই হয় তাহলে খরচ কম হওয়ার কথা।"

২১ জুন, ম্যাকলাউডকে—"অবিরত কাজ করে যাচ্ছি, এবং বোটানির উপর নতুন একটি বই প্রায় শেষ। বিজ্ঞানের ভারতীয় মান্দুষটির মধ্যে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি, যিনি তাঁর কাছে যে-সাহায্যই আসে সবই ব্যবহার করতে পারেন, এক্ষেত্রে গেডিসের মত নন তিনি। এখানে বৃথা ব্যয়িত চেষ্টা বলে কিছু নেই।"

২১ জুন, ওলি বুলকে—"জন্মদিনের মুখে লেখা তোমার চিঠি এখানে এসে পৌঁছেছে। গতরাত্রে কি আগের রাত্রে খোকা আমাকে বলছিল—তুমি এবং আমি বর্তমান আছি, এইটে জানলেই চলে যায়। সে বলেছিল, তার কাজের বিরুদ্ধে সকল বিক্ষোভ, মাপামাপির চেষ্টা এবং প্রতিঘাতের চেষ্টার উল্টোদিকে সে রেখেছে তোমার অভ্যর্থনা, হৃদয়ের উত্তাপ এবং তারিফ : 'যদি সে (বসু) আর কিছু কখনো না করে তাহলেও ইতিমধ্যে যা করেছে তাই যথেষ্ট।' পরের শীতের কথায়, সে তোমাকে জানাতে বলেছে, তার সর্বদা ভয়—(ভারতে) আসার পথে তোমার ভালমন্দ কিছু হতে পারে, সুতরাং সে কোনো দারুণ সংকটের জন্য তোমার আগমন জমিয়ে রাখতে চায়। আমার অসুখের সম্বন্ধে যদি সে পূর্বাহ্নে কোনো সংকেত পেত তাহলে তোমাকে নিশ্চয় ডেকে পাঠাত।

কিন্তু আমরা সর্বদাই তোমাকে চাই—এটা অবশ্যই তোমাকে বুঝতে হবে।... বোটানির উপর বইটির শেষের অধ্যায়গুলি এখন লেখা হয়ে গেছে।"

২০ জুলাই (চিঠির খণ্ডিত পৃষ্ঠা)—"খোকা আজ এল—এত ক্লান্ত। আহা বেচারা! আমি এখন আরও শক্তি পেয়েছি। ফলে দেখতে পাচ্ছি, আমার কাজ শুধু দিয়ে যাওয়া—কেন, কোথায়, তার ফল কী হবে—এসব যাচাই করা নয়।"

১৭ অগস্ট, ওলি বুলকে—"সূচীকর্মকে তুমি আশাপ্রদ মনে করেছ বলে আমি আনন্দিত। আমার মতে উন্নতি হচ্ছে ক্রমেই। মহিলাদের মধ্যে একজন সদ্য খোকার জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করেছে, যা সে বরোদার মহারাজাকে দেবে।

এখন বল দিকি শুনে কি বলবে—১লা জুলাই আমরা নতুন বইয়ের ১ থেকে ২০ অধ্যায় পর্যন্ত ডাকে পাঠিয়েছি ; গতকাল পাঠিয়েছি ২১ থেকে ৩১ অধ্যায়—আরও ১১টি অধ্যায়। বাকিটা লিখতে হবে, যা অবশ্য মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়।

এ পর্যন্ত ১৬৮টি নক্সা এবং ২৭৯ পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। কিন্তু বাকি আছে দ্বিগুণ পৃষ্ঠা, যার অর্থ ৫০০ থেকে ৫৫০ পৃষ্ঠা।

গত সপ্তাহে এক ইংরাজ অধ্যাপকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছ থেকে খোকা সম্বন্ধে যথেষ্ট নাক-সিঁটকানো কথা শুনলাম। আমি চুপ করে ছিলাম, তাকে কিছু বলিনি, কিন্তু মনোভাব? এখন শুধু চাইছি তাদের এমন কিছু দিতে থাকে পৃথিবী স্বীকার করবে। তুমি এখানে না থাকার ভ্রান্তির লজ্জা কিভাবে না অনুভব করছি। তুমি থাকলে একটা দল তৈরী করা যেত, যার ফলে ওরা এত বেশী এগোতে

সাহস করত না। এই বিশেষ লোকটি আবার খোকার বন্ধুরূপে বিবেচিত হতে ব্যস্ত—ভেবে দেখ একবার! যাই হোক, এসব খোকার কাছে ধরা পড়েনি।"

২৪ অগস্ট, ওলি বুলকে—"প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চিঠি লিখব না যেহেতু আমরা এই সপ্তাহে বইটির উপর কঠোর পরিশ্রম করছি।"

৩১ অক্টোবর, ওলি বুলকে—"খোকাকে লেখা তোমার চিঠিগুলি দীর্ঘ পথে ঘুরেছে এবং সে এখনো তোমার শেষ চিঠি পায়নি। সুতরাং আজ যতখানি পারি ততখানি সংবাদ তাকে দিয়েছি। আমরা বইখানি এখন প্রায় শেষ করেছি। সে বলেছে, আগামী বছর এই সময়ে দু' বছরের জন্য ইংলণ্ড যেতে চাইবে। এবার আমেরিকা যেতে চায়। ফিরবে জাপান হয়ে, যাতে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থা বুঝে নিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমরা জাপানের জন্য যে পরিচয়পত্র দিতে পারি, তা সে চায় না। তার ধারণা আগামী মে ও অক্টোবরের মধ্যে আর একটা বই লিখবে 'ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজি অ্যাণ্ড প্ল্যাণ্টে'র উপর। আকার হবে অনেকটা প্রথম বইয়ের মতই। এ বইটা হয়ে যাবার পরেই সে যেতে পারবে। এসব তোমাকে জানাচ্ছি, যাতে করে তুমি তার পরিকল্পনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পার। বেশ বুঝতে পারছি যে, তাকে পাশ্চাত্যে যেতেই হবে যখন তার বইটি পঠিত হতে আরম্ভ হবে।"

২২ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"আমরা ক্রমে খোকার বোটানি বইটির আকাশ-প্রমাণ কাজ শেষ করে আনছি। এখন উপসংহার অংশটি লেখা হচ্ছে। আশা করি তার জন্মদিন ৩০ তারিখে এর আনুষঙ্গিক বাড়তি আবিষ্কারগুলিও বইয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে, এমন কি ভূমিকা পর্যন্ত। এর মানে কাজের একেবারে সমাপ্তি নয়; তবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো রচনা নয়—এই পর্যন্ত। আশা করছি, শেষ হলে মাসখানেক কি মাস দুই বিশ্রাম ও ভ্রমণ করব। এখন আমরা সপ্তাহে তিন কি চারদিন কাজ করি, সকাল আটটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত, মধ্যে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুই আহারের জন্য বাদ। ছুটির দিনে প্রায়ই এর থেকে বেশী করি। বুঝতেই পারছ, এর ফলে আমরা দুজনেই কি রকম শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কারণ প্রায় প্রতিদিন একাদিক্রমে এমনই চলেছে ১৯০৪ অক্টোবরের সূচনা থেকে।...

গত রবিবার আমরা একটি মাল বওয়ার নৌকা নিয়েছিলাম, তাতে করে নদীতে বহু ঘণ্টা কাটিয়েছি। এ ধরনের নৌকায় লেখা-পড়া এবং শোয়া-বসা করা যায়, অনেকটা ছোট ড্রইংরুমের মত। আমরা বালি পর্যন্ত গিয়েছিলাম, যাওয়ার পথে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চা মঠে খেয়েছিলাম, তারপরে ফেরার সময়ে দক্ষিণেশ্বরে নেমেছিলাম। এর প্রতিটি স্থান, যার সঙ্গে স্মৃতি-সম্পর্ক আছে, সেগুলি এখন কত না সুমধুর ভাবনায় আমার মন ভরিয়ে তুলেছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।"

৬ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"তুমি জানো আমার বিজ্ঞান-পূজা সত্ত্বেও আমি ক্যাথলিক মতকে ভালবাসি। যখন আমার খুবই অল্প বয়স, সবে বাল্য অতিক্রম করেছি, তখন ভাবতাম, এখনো তাই ভাবি—আমার একমাত্র বাসনা হবে সত্যেরই বাসনা। সেই সত্যের সন্ধানের সঙ্গে মধ্যযুগপ্রীতির সংঘাতেই আমার জীবনযন্ত্রণার সূত্রপাত। স্বামীজী সে যন্ত্রণা মোচন করে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন নতুন জগৎকে।

সকল পুরাতন পৃথিবী এই নতুন জগতের অন্তর্গত। কি বিচিত্র! জানো কি, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য, যখন তাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলাম, শুনেছিলাম যে, সর্বপ্রকার জ্ঞান তারই অন্তর্লীন, তখন নিজের মনে বলেছিলাম, "বেশ কথা, তবে এই তত্ত্বের প্রমাণ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে দিতে হবে; তত্ত্বটিকে এখনকার মত কাজ চালাবার জন্য মেনে নিলাম।" আর এখন পাঁচ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক প্রমাণসহায়ে ঐ তত্ত্বের পরীক্ষা করে, তার সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। কারণ, একথা অবশ্যই সত্য, অন্যের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মী যে সাফল্যলাভ করে, তার মূলে ভারতীয়ের 'ভিশনের' প্রকৃতি। নতুন বইটির উপসংহারের কথাগুলি গতকাল আমরা লিখেছি। এসব কথা অপরকে জানিও না, কিন্তু আমাদের আনন্দ কল্পনা করতে পারো তুমি। অন্য জিনিসও কয়বার আছে। সে সব সেরে সদানন্দকে নিয়ে দার্জিলিঙ যাবার ইচ্ছা আছে বিশ্রামের জন্য। কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরে প্রুফগুলি শেষ করার আশা রাখি। তারপরে ভরসা করি মাসখানেক ভ্রমণ।

আগামী মে মাসে একটি নতুন বিজ্ঞানের বই আরম্ভ করার ইচ্ছা। তার আগে শুরু করতে গররাজি হয়েছি।

১২ জানুয়ারী ১৯০৬, ওলি বুলকে—"আমি যেন আমার ভবিষ্যৎ-জীবন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। যে-ইঙ্গিত চাই, যে-জিনিসটি সন্ধান করছি, বারাণসীর এক গণকের কাছ থেকে তা পেয়ে গেছি। এখন আমার একটিমাত্র উৎকণ্ঠা এই লেখায় (স্বামীজীর জীবনী লেখা) দ্বারা স্বামীজীর কাজকে নিশ্চিত ভিত্তিতে স্থাপন করা, তারপর অবশিষ্ট বৎসরগুলিতে অপর কর্তব্যে নিজেকে নিয়োগ করা। ভাবতে বড় ভাল লাগে, ব্যাপারটা তুমি অবিলম্বে বুঝেছ, গভীরভাবে নিয়েছ, এবং পরম বিশ্বাসে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ। তোমার নিশ্চয় স্মরণ আছে, স্বামীজী আমাকে পরিস্থিতিকে একটু এগিয়ে দেখার জন্য স্বাধীনতা দিয়েছিলেন,...ব্রিটানীর সেই সুমধুর সন্ধ্যায়, বলেছিলেন,—'ও জিনিসও মায়েরই।' যদি আমি মারা যাই, আমার অত্যন্ত ইচ্ছা তুমি খোকাকে ব্রিটানীতে নিয়ে যাবে, যে-বাগানে স্বামীজী আমাকে তাঁর শেষ শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, যেখানে প্রফেটের উত্তরাধিকার আমার উপর অর্পিত হয়েছিল—সেই স্থানটি দেখাবে।

[এই চিঠিতে এবং আগেও দেখা যায়, নিবেদিতা স্থির করেছেন স্বামীজীর জীবনী লিখবেন। তার জন্য য়ুরোপে যেতে ইচ্ছুক। তার ফলে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। একক্ষেত্রে নিবেদিতার মনোভাব—"আমি কিছু বেছে নিতে পারি এমন অবস্থায় আছি মনে করি না। আমার নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" ডঃ বসু যাতে কিছু মনে না করেন সেজন্য ওলি বুলকে লিখেছেন—"খোকাকে বলো, তুমি আমাকে চাও। এতে বিচ্ছেদ সহজতর হবে।"]

৪ এপ্রিল, (খণ্ডিত চিঠি)—"ইলেক্ট্রো-ফিজিওলজি' হবে মননগতভাবে 'সর্বোচ্চ উড্ডয়ন'..."

২ মে, ম্যাকলাউডকে—"বসুরা মনে হয় না মিঃ গেডিসকে চিন্তাবিহ্বলে

জানেন।...ডঃ বসুর এক ভাগিনেয়র প্রতি মিসেস গেডিস একেবারে মাতৃসুলভ আতিথ্য জানিয়েছেন।...ডঃ বসু মিঃ গেডিসকে তাঁর এক কপি বই পাঠাচ্ছেন।"*

৭ জুন, ম্যাকলাউডকে—"এই গ্রীষ্মে খোকার শরীর বিশেষ দৃঢ় নয়। সেই বিরাট গ্রন্থটি তৈরী করা তামাশার কাজ ছিল না। কিন্তু এই বছরটি যদি কোনো-ভাবে নিরাপদে কাটে, আমার আশা বিশ্বাস, জগন্মাতা তাহলে তাকে বসন্তকালে দু' বছরের অবকাশ যাপনের সুযোগ দেবেন। অতীব অতীব প্রয়োজন ওর। বেচারা খোকা। আমার মনে হয়, ঐ হল তার বাইরে যাবার সেরা সময়, কারণ আমি যখন ওখানে নেই সে অত প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারবে না। তাকে অবশ্যই কিছু পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে। এই বিরাট সাফল্যের আনন্দ তার সান্ত্বনারূপে তো রইল!

৮ জুন, (খণ্ডিত পত্র)—"তোমার সঙ্গে অনেক কথাই আছে। কখনো কখনো আমি ভাবাভিভূত হয়ে পড়ি যখন ভাবি খোকার জীবনীর কয়েক অধ্যায় অন্ততঃ তোমার সঙ্গে বসে কিভাবে আমার প্রস্তুত করে ফেলা উচিত।"

১৬ জুলাই, ওলি বুলকে—[মিসেস বুলকে লেখা এই পত্রটি বড়ই দুঃখের বিষয় খণ্ডিত। যতটুকু পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, এটি যেন নিবেদিতার জীবনের স্ব-পরিকল্পিত মানচিত্র। ভবিষ্যৎ-জীবনের নানা পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনাও দিয়েছেন। প্রধান গ্রন্থ হবে স্বামীজীর জীবনী। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে, নিবেদিতা লিখেছেন, "তুমি জানো আমি খোকার জীবনীর জন্য কাগজ-পত্র প্রস্তুত রাখতে চাই।" এই চিঠিতেই নিবেদিতা টাকার একটা অংশ বিজ্ঞানের জন্য রেখে যাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন—

"তোমার প্রতিশ্রুত অর্থের বাকি তিন হাজার পাউণ্ড—খোকার হাতে থাকবে; সে টাকা সে দেবেন (দেবেন্দ্রমোহন বসু) বা খোকা (অরবিন্দমোহন বসু) বা দুজনের জন্যই খরচ করবে। অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানের সেবায় তাদের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য নিযুক্ত হবে কি না, তা বিবেচনা করে।"

এই পত্রেই নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য অর্থ রেখে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং লেখেন যে, যদি জনগণ তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারে কোনো

---

* অধ্যাপক গেডিস তাঁর বসু-জীবনীর ভূমিকায় কেন এই জীবনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন তা জানিয়েছেন। বায়োলজিতে অধ্যাপকের আদি আকর্ষণ, সেই সঙ্গে ফিজিওলজিতেও, সুতরাং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বসুর আবিষ্কার তাঁকে আকৃষ্ট করে। ক্রমে সে পরিচয়ের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে আসে। পরে অধ্যাপক যখন ভারতে চাকরি নিয়ে আসেন, তখন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। অধ্যাপক গেডিস বিজ্ঞানের নানা শাখায় পারদর্শী হলেও সমাজ-বিজ্ঞানের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসকে সামাজিক পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এবিষয়ে অধ্যাপক লিখেছেন—

"All the sciences and all their scientific men are social products, and must be studied as such in the sociological way. This book, though originally planned in its simplest and most direct aspect and purpose—as an exposition of a life-work—is thus something of a sociological study also."

অর্থদান করে তাহলে সে টাকা যাতে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়, সে বিষয়ে ডঃ বসু মনে রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।]

৮, অগস্ট ওলি বুলকে—"আজ বো-র (বউ-এর অর্থাৎ অবলা বসুর) জন্মদিন। আমি তোমার জন্য একটু উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু খোকা আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, তুমি বাড়ি ফেরার পরে তোমার পাঠানো বার্তা সে পেয়েছে।"

অগস্ট ২৯, ম্যাকলাউডকে—"যে-পর্যন্ত আমরা 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' লিখেছি, সে অবধি তার বাইরে কোনো কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার কাজের অংশ দম বন্ধ করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের বর্তমান বইটি সম্বন্ধে একই পরিমাণ কাজ করি, কিন্তু মনের দিক দিয়ে অনুভব করি যে, আমি মুক্ত! মনের আধখানা অংশ আমি দিনান্তরে, কোনো দায়ভার বোধ না করে, নিজের চিন্তায় দিতে পারি, এটা কি বিচিত্র প্রাপ্তি নয়।"

৫ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"রবিবার আমরা খোকার...জন্মদিন পালন করছি। কী মনোরম! প্রাচ্য বীররূপে একমাত্র যে সম্মান তার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা হল—একটি সুসজ্জিত চেয়ারের প্রস্তাব—যা সে অস্বীকার করল।...আর বউ—তার জন্য যে সামান্য উপহারের ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম, তাতে সে এতই বিস্মিত ও বিব্রত হল যে, টেবিলের অপরপ্রান্তে নিছক লজ্জায় সরে গেল।

যখনই আমরা সবাই মাসখানেকের মত সময় একত্র থাকি, তখন এই ধরনের দু'চারটি সহজ ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন করি। ওগুলি কতখানি সুখ এনে দেয় যদি দেখতে।...

তোমাকে কি বলেছি, বিজ্ঞানের মানুষটি আমাকে রবিবার মহাভারতের সমগ্র ইংরাজী অনুবাদ দিয়েছে! দশ ভল্যুমে বাঁধিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপরে এর মধ্যে প্রবেশ করে ক্রমে সংশোধন করা যাবে। বিজ্ঞানের মানুষটি মনে করছে যে, দু-বছরের মধ্যে শেষ করা উচিত, কিন্তু যদি চার বছরের মধ্যে হয়ে ওঠে সুখী হব, কারণ এই কাজকে জীবনের পরম কাজ করতে চাই না এবং মানুষ যে-সব উপকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে তার সীমা আছে। বিজ্ঞানের মানুষটি নিজের আপ্নের উদ্দীপনা দিয়ে বিচার করে, যদিও তার নিজের কাজ একটিই এবং তাতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখন আমরা এমন ভাল একটা রাঁধুনী পেয়েছি যে 'বউ' আমাদের ঈর্ষা করছে।"

১২ ডিসেম্বর, ওলি বুলকে—"গত রবিবার খোকার সুন্দর প্রাপ্তি ঘটেছে। পৈতৃক গ্রাম দর্শন ও সেখানে অভিনন্দন। নিকট দূর সর্বস্থান থেকে লোক জড়ো হয়েছিল, আশীর্বাদ, অভ্যর্থনা ও নমস্কার জানাতে। স্কুলের ছেলেরা তার পালকী ঘা মোট বেয়ারাদের বইতে দেয়নি। সমস্ত জায়গাটা তার জন্য উৎসবে মেতে উঠেছিল—কুড়ি বছর আগে যে-বালকটি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি এক আত্মীয়ের কাছে বেচে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সামনে—সৎসাহসের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উগ্র বাসনায়। ঐ উৎসব অবশ্য আসলে জ্ঞানীর প্রতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অর্ঘ্য। জয় হোক তার! অপূর্ব মনে হচ্ছে নাকি?"

[ব্রহ্মচারিণী কল্পলতা প্রবন্ধে ভারত পত্রিকার মার্চ, ১৯৫৯ সংখ্যায় জগদীশ বসু ও নিবেদিতার উপরে এক প্রবন্ধে ১৯০৬ সালে মিসেস বুলকে লেখা নিবেদিতার পত্রের অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে 'প্ল্যাণ্ট রেসপন্স' গ্রন্থের উপর সম্ভাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে তথ্য আছে।—

"(অধ্যাপক) ভাইনস্ দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন, তাতে বইটিকে কী কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে তা বলা আছে। বেচারা খোকা—চিঠিটি তাকে ক্রমান্বয়ে মুহ্যমান ও ক্রুদ্ধ করেছে। আজ সকালে আমরা তার উত্তর লিখছি। ভরসা করি তারপর ওটা আর খোঁচা দেবে না।

অপরের নামোচ্চারণ সে খুব কম করেছে বা উদ্ধৃতি কম দিয়েছে বলে একটা প্রচণ্ড চেঁচামেচি হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি জানো, সে একাজ ভেবেচিন্তেই করেছে কারণ নামোল্লেখ না করাই ভাল। উল্লেখ করলে সেটা তাদের কাছে শাস্তিস্বরূপ হবে কারণ নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রান্তি দেখাবার জন্যই তা করতে হবে। সোজা এই দাঁড়ায়, আমি খোকাকে বলেছি—তাকে অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে। যে-প্রবীণদের সে অতিক্রম করেছে তারা শুধুই ঘৃণা করে যাবে, কিন্তু নতুনেরা তার কথা শুনবে—অনুসরণ করবে তাকে। নেতা যাঁরা, প্রত্যাদিষ্ট যাঁরা—নিঃসঙ্গ তাঁদের হতেই হয়। তাই যদি সমস্বরে জয়গান না হয়, খোকা আশা করে, তুমি তাঁর নৈরাশ্য বোধ করবে না।"]

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭, ওলি বুলকে—"'নেচার' পত্রিকার বহু-আশঙ্কিত সমালোচনা এসে পৌঁছেছে,—পাঁচ কলমব্যাপী! সমালোচক কাগজটির মতই 'ভাইটালিস্ট'। সুতরাং সে 'প্ল্যাণ্ট রেসপনস্‌কে' 'বেদ' বলে ছাড়পত্র দেবেই না। কিন্তু ইঙ্গিত করেছে। যে-জিনিসটি স্পষ্টই তাকে অভিভূত করেছে, তার বিষয়ে সে বলেছে—'বইটির চরম স্বাতন্ত্র্য লেখকের বিজ্ঞানগত অতীতের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে, যিনি পদার্থবিজ্ঞান থেকে এসেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুতঃ আলোচক যদিও বইটিকে তৃপ্তচিত্তে নিতে নিতান্ত গররাজি, তবু আমার মতে এটি একটি প্রচণ্ড আলোচনা। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বোস্টন ট্রানস্ক্রিপ্ট-এ যা অল্প কিছু বেরিয়েছে, সারা ভারতে তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।...

খোকার স্বাধীনতা সংগ্রহের পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা কর।"

২৭ ফেব্রুয়ারী, ম্যাকলাউডকে—"ভারতীয় সংস্কার হল—১২ বছরে কোনো চিন্তা পূর্ণ বিকশিত হয়। তাই ডঃ বসু তাঁর বর্তমান বইটি (Comparative Electro-Physiology) মে মাসের আগে শেষ করতে চান—তাঁর প্রথম রচনা-প্রকাশের পরে ১২ বছরের মাথায়।...

গ্রীষ্ম এখন দুয়ারে। কাজকর্মকে তা এত বেঁধে দেয়। ইতিমধ্যে বসুরা মে ও জুনের জন্য কাশ্মীরের কথা বলে রেখেছে। যদি যাওয়া হয়, মিসেস সেভিয়ার যোগদান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি এবং বউ ডাণ্ডি নেবেন, এবং আমরা তিনজন হাঁটব। ভয় হয়, এটা বসুদের পক্ষে বিরাট খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা প্রায় সকল ছুটির বেড়ানোর খরচ বহন করে। এধারে দার্জিলিঙয়ে যে বসন্ত দেখা দিয়েছে!"

[নিবেদিতার মারাঠি জীবনীকার সুপণ্ডিত ডঃ ভি ভি পেণ্ডসে 'নিবেদিতা স্মারক গ্রন্থের' (শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সুনীলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত) জন্য গোখলেকে লেখা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের অনেকগুলি চিঠির নকল পাঠিয়েছিলেন। ডঃ বসুকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিবেদিতা নানা মহলে কি রকম তোলপাড় করতেন, তার সামান্য একটা আভাস ঐসব চিঠি থেকে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে— বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে লেখা নিবেদিতার অতি সামান্য চিঠিই আমরা পেয়েছি।

২৭ মার্চ তারিখে ক্রিস্টিন গোখলেকে লেখেন—

"পত্র সংলগ্ন ডঃ বসুর কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবেদিতা আপনার কাছে পাঠাতে বলেছেন, যার ব্যবহার ইচ্ছামত আপনি করতে পারেন বা নাও পারেন। তার ধারণা, আপনি হয়ত এটিকে প্রয়োজনীয় বোধ করবেন। ডঃ বসু গতকাল এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি এই ধরনের একটা কিছু চাইছেন। কিন্তু সেটা লেখার সময় যখন এল তখন তিনি "বেয়াড়াপনা" করলেন, এবং সবকিছু বাতিল করে দিলেন। এ জিনিসটি তিনি চলে যাওয়ার পরেই লেখা হয়েছে, এর কথা তিনি জানেন না, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকেই এটি পাঠানো হয়েছে। অয়্যারলেস্ টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে তাঁর কাজের কোনো উল্লেখের ব্যাপারে তিনি সর্বদাই সংকোচ বোধ করেন, এবং সম্ভবতঃ তার উল্লেখ করা তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করবেন না। করণীয় কি তা আপনিই ভাল বুঝবেন।"

গোখলেকে এইসব কথা বলার বা বিবরণ লিখে পাঠানোর কারণ যে, কাউন্সিল-সদস্য গোখলের মারফত সরকারী মহলে নাড়া দেওয়া, তা সহজেই বোঝা যায়।

ক্রিস্টিন-প্রেরিত গোখলেকে লেখা নিবেদিতার পত্রটি—]

"প্রিয় মিঃ গোখলে, একটা খসড়া করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। এর থেকে আপনি যা উত্তম বিবেচনা করবেন, তাই নেবেন।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত কিছু পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা পেয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অধিকার তার জন্মেছে। ভারত যে যোগ্যভাবে তা করতে সমর্থ তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। এখন একমাত্র প্রশ্ন, এর জন্য অধিকতর সুযোগ সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার কি পন্থা গ্রহণ করবে? এখানে জানানো যায়, সমুচ্চ বৈজ্ঞানিক সদিচ্ছা, অর্থাৎ কোনো বিশেষ ধারায় কাজ করার জন্য বিজ্ঞানকর্মীর ব্যক্তিগত অনুরাগ এবং তাকে ধরে থাকবার জন্য তীব্র মননগত ব্যাকুলতা—এ জিনিস বিদেশ থেকে আমদানী করা যায় না, বা কেবল সংগঠনের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে তা উৎপাদন করা যাবে, এমন আশাও করা যায় না। হায়, ঐসব উচ্চ গুণাবলী নশ্বর মানবের ইচ্ছামত ওঠ-বোস করে না। একমাত্র যা করা যায়, ব্যক্তিবিশেষ বা সরকার যা করতে পারে, তা হল যেখানে স্বতঃই তা স্ফুরিত হয়েছে সেখানে সুযোগ নিয়ে সে তার লালনের ব্যবস্থা করতে পারে।

আমার স্বদেশীয় ডঃ জে সি বসু যে-কাজ ইতিমধ্যেই করেছেন, তা জগতের সামনে উপস্থিত আছে। তথাপি এই ত গবেষণার সবে সূত্রপাত—যাকে প্রাণপাত পরিশ্রম করেই মাত্র তিনি সমাপ্ত করতে পারেন। সরকার অতীতে এই ক্ষেত্রে তাঁর দানের সমাদর করেছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষে এই সমাদরকে পূর্ণভাবে কার্যকর

করাই কি সর্বোত্তম নীতি হবে না—সরকারের গৌরব ঘোষণার পক্ষে উপযুক্ততর জিনিস আর কি থাকতে পারে? তাঁর হাতে উচ্চতর গবেষণার কোনো বিরাট কেন্দ্রের সংগঠন-দায়িত্ব অর্পণ করার উপযুক্ত সময় কি এখনই নয়, যার জন্য ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক সমাজ ইতিমধ্যেই প্রস্তাব করেছেন? আর, তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেসব আবিষ্কার তিনি ইতিমধ্যেই করেছেন এবং ভবিষ্যতে করতে পারেন—সেই পথে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য যাতে তিনি নিজের সমস্ত সময় নিয়োগ করতে পারেন, সেই বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করে তাঁর প্রতিভা ও উৎসাহের যথাসম্ভব সদ্-ব্যবহার করাই কি সরকারের ন্যূনতম কর্তব্য হবে না?

এখানে জানানো যায়, এদেশে বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধার জন্য যে দাবি উঠেছে, টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন তার মোটেই উপযুক্ত উত্তর হবে না; কারণ হাত-ফিরি হওয়া জ্ঞান দু'দিনেই অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং তা কদাপি প্রাণসঞ্চারক নয়। যতক্ষণ না জনগণ নিজেদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা সঞ্চারিত করতে পারছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মৌলিক চিন্তার অভ্যাস ও মানুষের মৌল জ্ঞানরাশিকে অগ্রসর করিয়ে দেবার সামর্থ্য অর্জন করছে, ততক্ষণ অপর দেশের মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির প্রয়োগের চেষ্টা উত্তরোত্তর অযোগ্য মনে হবে।"

২৮ মার্চ, গোখলেকে—"আগামীকাল গুডফ্রাইডে, আমরা সবাই একত্র হব আশা করছি। এমনকি মিসেস বসু পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগদান করছেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য ফাঁক কেটে আপনি কি আসতে পারেন না? আপনাকে কত না পেতে চাই।......ডঃ বসু বিশেষভাবে এটা চান, এবং আজ রাত্রে দেখা পেতে ইচ্ছুক। এবিষয়ে তাগিদ দিচ্ছেন।......

আমাদের সঙ্গে কাশ্মীরে আসছেন না কেন? আপনার প্রতিশ্রুতি পেলে এবিষয়ে আমরা মনস্থির করতে পারি। বিরাট অরণ্যের মধ্যে পাইন, দেওদারের নীচে—সেখানে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকব, কিংবা সন্ধ্যার ছায়া যখন নদীর উপরে ঘনতর হয়ে উঠবে—তখন সেখানে বসে আমরা সুমহান বিষয়ে কথা বলে যাব। এমন সুযোগ যাঁরা পান, তাঁরা পরবর্তী জীবনের জন্য পেয়ে যান আলোক ও শক্তির ঐশ্বর্য।"

৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—আমরা যদি কাশ্মীর যাই, মিসেস সেভিয়ার বেরিলিতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। সে যাই হোক, এতদিনের মধ্যে এই প্রথম বিজ্ঞানের মানুষটির ও আমার কাছে ছুটি সত্যই ছুটি হওয়ার সম্ভাবনা।" (দার্জিলিঙরে তাঁরা ছুটির সময়ে বিজ্ঞানের কাজ করতেই যেতেন।)

৮ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"আবার যখন আমরা বোসপাড়া লেনে গেড়ে বসেছি তখন আশা করি হলিস্টার আমাদের এখানে এসে পৌঁছবে, জুলাই মাসে। ভারতীয় জীবনের সমস্ত মজা দেখাবার ব্যবস্থা অবশ্যই আমরা করব। বসুরা, রায়েরা এবং অন্যান্যরা তার সঙ্গে সুসজ্জিতা সুন্দরী রমণীদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে এবং আমরা তাকে মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে দেব।......

আমরা হয়ত কাশ্মীরে যেতেই পারব না কারণ বসুপরিবারের একটি মেয়ে ক্ষয়রোগে দ্রুত মৃত্যুর পথে। আহা রে!"

১১ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"কাশ্মীর যাত্রার পরিকল্পনা, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, মনে হয় পরিত্যক্ত হয়েছে। তার পরিবর্তে আমরা সম্ভবতঃ অমরনাথ-জাতীয় তীর্থযাত্রায় যাব। চমৎকার হবে না? কিন্তু হায়, তা ঘটবার আগে বসুরা হয়ত মস্ত শোক পাবেন, কারণ তাঁদের প্রিয় এক ভাইঝি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে।"

[১২ *এপ্রিল তারিখে গোখলেকে লেখা এক চিঠিতে ক্রিস্টিন জানিয়েছেন, 'নিবেদিতার সর্বশেষ মতলব বদরীনারায়ণে তীর্থ করতে যাওয়া।' ক্রিস্টিন সঙ্গী হবার জন্য গোখলেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বদরীনারায়ণ পরিকল্পনা বদলে মায়াবতী হয়েছিল।*]

২৪ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"মায়াবতীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খুব খানিকটা হাঁটা-চলা করার আশা রাখি। এবং প্লেগ যেহেতু খোকার পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেহেতু আমাদের যাত্রাকে পূর্বপরিকল্পনার চেয়ে আগে অবশ্যই ঘটাতে হবে।

তাহলেও তার (বসুর বইয়ের) শেষ অধ্যায়গুলি এবং আমার শেষ গল্প দুটি সমাপ্ত করবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তার (বসুর প্রথম পেপার) প্রকাশনের পরে পয়লা মে তারিখে ঠিক ১২ বছরে পুরোবে এবং এবিষয়ে তার কুসংস্কার রয়েছে। ভারতে ধরা হয় যে, ১২ বছরে কোনো চিন্তা পূর্ণতা পায়। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, সকল সাধু বলেন তাঁদের সিদ্ধি পেয়েছেন ১২ বছরে।"

২৪ *এপ্রিল, ওলি বুলকে*—"খোকার বাড়ির এক ভৃত্যের প্লেগ হয়েছে। সুতরাং তারা সবাই ছড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের নিজ নিজ কাজটুকু শেষ করা পর্যন্তই মাত্র অপেক্ষা করব, তারপরেই পাহাড়ে যাত্রা করব। মায়াবতী যাবার পথে এবং মায়াবতীতে থাকা কালে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পায়ে হাঁটার ও তাঁবু-জীবনের আশা রাখি। একমাত্র অসুবিধা, ঐ অঞ্চলে একটি নরখাদক বাঘ ঘুরছে।

ভাবো একবার, আমি কৃষ্ণবিষয়ে লেখা শেষ করেছি। দশটি কাহিনী। কিভাবে না উপভোগ করেছি! খোকা অবশ্য বলেছে, অপরেও উপভোগ করবে।.....

নিতান্ত বাসনা ছিল, 'যার সমস্ত জীবন মহাভারতের প্রতি ভালবাসায় মুখর,*

---

* *জগদীশচন্দ্রের অপরিসীম মহাভারত-প্রীতির কথা নানাসূত্রে পাই।* রামায়ণও তিনি ভালবাসতেন কিন্তু দোষেগুণে মিশ্রিত পৌরুষ-ভীষণ মহাভারতীয় চরিত্রগুলিই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। অধ্যাপক গেডিস অনেকখানি অংশ নিয়ে এঁর মহাভারত-প্রীতি এবং পরবর্তীজীবনে তার প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সকল মহাভারতীয় চরিত্রের মধ্যে কর্ণ চরিত্র আবার তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। জগদীশচন্দ্র কিভাবে আত্মহারা হয়ে কর্ণ-জীবনের ঘটনাগুলি বলে যেতেন, গেডিস তা বর্ণনা করেছেন। দৈবাহত কর্ণের নিষ্ফল সংগ্রামের মহিমার কিছু রূপ তিনি নিজের পিতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র বলতেন—"কর্ণের জীবনই আমাকে *সাধারণ পার্থিব সাফল্যকে* ক্রমেই তুচ্ছ করতে শিখিয়েছে। তথাকথিত বিজয় কী সামান্য! আমি সংঘাত ও পরাজয়ের উচ্চতর অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছি; বুঝেছি যে, পরাজয়ের মধ্যেই আসল সাফল্য নিহিত। এই উপায়ে আমি আমার জাতির একটি সর্বোচ্চ ভাবাদর্শ উপলব্ধি করতে পেরেছি—আমার প্রতিটি তন্ত্রী কম্পিত

বইটি তাকেই উৎসর্গ করব। কিন্তু সে বলল, পরিবর্তে একটি শূন্য পৃষ্ঠাই সে চায়।

এখন আমরা নির্ধারিত দ্বাদশ বৎসরের শেষ সপ্তাহে। অতীব তাৎপর্যপূর্ণ চারটি অধ্যায়ের উপর কাজ করছি। 'সজীব পদার্থের সাড়া'র উপরে সমস্ত কাজের পদার্থগত ফলের উপসংহার করা হয়েছে দুটি অধ্যায়ে—গভীরতম অপরূপ রীতিতে। নিজের দানের বিষয়ে তার খোলাখুলি বক্তব্য, তা'Molecular Theory'. সমস্ত জিনিসটি আমাদের সম্ভ্রমে স্তম্ভিত করেছে—কোনো ঐশ্বরিক শক্তি যেন এক বিরাট পদার্থ-বিজ্ঞানীতে অবতীর্ণ হয়ে বিজয়োল্লাসে পরিতৃপ্ত। এবং এর পরেই অবিলম্বে সে 'psychological inferences'এর দুটি অধ্যায় যুক্ত করেছে। দারুণ—অপূর্ব! এবার বলো তাহলে, ঐ দ্বাদশ বৎসর যোগ্যভাবে পরিসমাপ্ত। সবিস্ময়ে ভাবি, এর পরে কি আছে! নতুন আবিষ্কার কি। হয়ত বাস্তব প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত জয়। কে বলতে পারে!

নতুন বইটি শেষ বইটির মত বোধহয় ৭০০ পৃষ্ঠার হবে। অধ্যায়সংখ্যা মনে হয় ৪৫।

আমার ধারণা খোকা আজ সন্ধ্যায় ফিরবে, আর বউ আগামীকাল কিংবা শনিবার। মুমূর্ষু ভাইঝির স্বামী এসেছে। যদি মেয়েটির মৃত্যু হয়, তার স্বামী কাছে থাকাকালেই সে চলে যাবে, এই আমার বিশেষ বিশ্বাস।"

১৭ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"ডঃ বসুর বিদেশযাত্রা হঠাৎ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে—স্বাস্থ্যের কারণে। কিন্তু যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক আমি ১৫ অক্টোবরের আগে ভারত ছাড়তে পারব না।......যাই হোক খুব সুন্দর হবে৷ যদি মাদাম

হয়েছে অতীতের স্পন্দনে। ন্যায়সংগ্রাম করা, কুটিলতার আশ্রয় না নেওয়া, বাধা অগ্রাহ্য করে সোজা পথে চলা—এই হল সত্যকার জয়ের ভিত্তি এবং এই হল মহত্তম আধ্যাত্মিক শিক্ষা।"

জগদীশচন্দ্রের মহাভারত-প্রীতি ও কর্ণ-প্রীতি সম্বন্ধে আরও কিছু উক্তি 'চিঠিপত্র' ষষ্ঠ খণ্ডে (পৃ—১৫৭-৫৮) সংকলিত আছে। সেখানে প্রদত্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কর্ণ-কুন্তী সংবাদ এঁর প্রেরণাতেই লিখেছিলেন। 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, ডঃ বসু তাঁর জীবনের পরম ভাষণে—বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণে—শিষ্যের কাছে গুরুর সুমহিম পরাজয়ের কথা বলতে গিয়ে অর্জুনের বাণে মৃত্যুবরণ করে ভীষ্মের আনন্দের কথা বলেছিলেন।

মহাভারত থেকে জীবনে এতকিছু পেয়েছেন বলে জাতীয় সংস্কৃতি থেকে এই ধারার বিলোপের ভাবনায় আশঙ্কিত হয়েছিলেন। গেডিস ডঃ বসুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"I feel how necessary it is to keep alive the great traditions of the heroic age of India through travelling *Jatra* players and the reciters of the epics. It is through them that the highest national culture has been kept alive among the people. They are fast disappearing, and we must either revive the institution or have its modern equivalent......... It should be! It must be! Then and then only shall we fully realise the true India."

এই পটভূমিকায় নিবেদিতার উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে।

ওয়েলারস্টিন ডঃ বসুর জন্য বোডেনেস্কে একটি আমন্ত্রণ জোগাড় করেন, এবং আমরা যদি সকলে একত্রে কিছু সময়ের জন্য প্যারিসে যেতে পারি। কিন্তু এবছর তা হওয়া সম্ভব হবে না বোধ হয় কারণ ডঃ বসুর যাওয়া এবং ভিসবাডেনে 'বাথ' নেওয়া দরকার। সে ওখানে অক্টোবরের শুরুতে যেতে পারে।"

১৯ জুলাই, গোখলেকে—"আজ খবর পেয়েছি, চিকিৎসকদের চাপে ডঃ বসু দুবছরের ফার্লো পেয়েছেন। অবর্ণনীয় স্বস্তি এতে, কারণ এর ফলে তিনি পালাতে পারবেন। তাঁর মন মরে যেত যদি আরও বেশীদিন রাশীকৃত লোক-সঙ্গে তাঁকে কাটাতে হত। নির্বোধ লোকে প্রতিভাকে যে-রকম শক্ত-গুঁড়ির গাছ মনে করে, সেরকম নয় তা। তা অতি স্পর্শকাতর নমনীয় এক সৃষ্টি।

কিন্তু ডেপুটেশনের বদলে যে ফার্লো হল, এতে আমি একেবারে সন্তুষ্ট নই। যখন আমি এই দেশ—ভারতের—কথা ভাবি, তখন দেখি, কিভাবে বিদেশীরা এই দেশের উদারতাকে শোষণ করে মেদস্ফীত হচ্ছে, আর অন্যদিকে এর মাটির সন্তানেরা দেশসেবায় ব্রতী হয়ে নিতান্ত ক্লেশস্বীকার করছে—যা শাস্তিরই তুল্য। আমি ক্ষুব্ধ—ক্রুদ্ধ। এল এল আর-এর (লালা লাজপত রায়?) প্রশ্নটি কী যথার্থ—ইংরেজরা কি এদেশকে আকাশ থেকে পেড়ে এনেছে?"

২০ জুলাই, ওলি বুলকে—"আমার পক্ষে শীতকালের জন্য কোনো পরিকল্পনা করা নিরর্থক, কারণ খোকার সমস্ত স্কীম এখন তচনচ। বর্তমান পরিস্থিতি কি—তুমি বুঝতে পারবে না। চাপানো কাজ দ্বিগুণ, ডিরেক্টর দুর্লভ, ফলে তার হতবুদ্ধিকর অবস্থা। সরকার নিতান্ত ভারত-বিরোধী। ওগো প্রিয় সারা, অবস্থা যৎপরোনাস্তি মন্দ।

আজ একজন ইংরেজ ডাক্তার তাকে দেখতে গেছেন, কারণ তার বাতের মত হয়েছে যাতে এক ধরনের জার্মান 'বাথ' দরকার। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের সুপারিশ হয়ত ছুটি পাওয়ার কারণ হতে পারে। বলা শক্ত। একবার কলেজের বাইরে যেতে পারলে তার কদাপি—কদাপি ফেরা উচিত নয়। এটা খুবই স্পষ্ট। মা যেন পথ দেখান।"

২১ জুলাই, ওলি বুলকে (পত্র খণ্ডিত)—"আমাদের ছোট্ট খোকাটির জন্য প্রার্থনা করো, মা যাতে সর্বদা তার সঙ্গে থাকেন, সবকিছু যাতে তার অভিপ্রায়ের অনুকূল হয় এবং শেষপর্যন্ত ভারত যেন তার বিজ্ঞানের অভিযানে বিজয়ী হয়—সামরিক অভিযানে কদাপি নয়।"

২৫ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"২ বছরের ফার্লো মঞ্জুর হয়েছে! হতে হবেই। মা যদি কলকাটি নাড়েন সে ডেপুটেশন পাবে. যার অর্থ বিজ্ঞানের সংস্থান, কিন্তু মধ্যবর্তীকালে তার অর্থ স্বাধীনতা! আর পৃথিবীতে স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় জিনিস। সম্ভবতঃ ৩০ অগস্ট তারা (বসুরা) বোম্বাই ছাড়ছে, নামবে মার্সাই বা ব্রিন্দিসিতে, বোডেনেস্কে একটি আমন্ত্রণ এবং......প্যারিস সত্যই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এসকলই সেণ্ট সারার তার-বার্তা অনুযায়ী—ইতালী বা লণ্ডন, তিনি যেখানে অবতরণ করতে বলেন—তদনুযায়ী ঠিক হবে।"

৩১ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"বসুরা 'পি এণ্ড ও' জাহাজে বোম্বাই ছাড়ছে ৩১ অগস্ট, এবং প্যারিস হয়ে ভিসবাডেন যাচ্ছে তার বাত সারাবার জন্য। মনে হয়—প্যারিসে যে কয়েক ঘণ্টা কাটাবে, তখন তোমার সাক্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা তাদের নেই—কি বলো? সময় দাঁড়াবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। সেণ্ট সারাকেও তার করেছি, যাতে অগস্টের শেষে যাত্রা করতে পারে। তাহলেই সারার পরিকল্পনা সর্বাধিক কার্যকরী হবে।"

[ক্রিস্টিন গোখলেকে ৩১ জুলাই লেখেন—

"কয়েক দিনের জন্য আমরা দমদমে ('ফেয়ারী হলে') আছি। দুই লেখক (জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতা) তাঁদের বই শেষ করছেন।......বসুরা সম্ভবতঃ ৩১ অগস্ট বোম্বাই থেকে যাত্রা করবেন। নিবেদিতা নিজের যাত্রার বিষয়ে এখনো নিশ্চিন্ত নয়, কিন্তু ১৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ যেতে পারবে মনে করে।......

নিবেদিতা এখনি আমার কাছে হাজির, যাত্রার বিষয়ে আলোচনা করতে। ফলকথা, সে পূর্বনির্ধারিত ১৫ কি ১৭ অগস্ট বোম্বাই থেকে যে-জাহাজ ছাড়বে তাতেই যাবে। আপনাকে সে দু'একদিনের মধ্যে লিখবে মনে হয়।"

ক্রিস্টিনের এই চিঠি থেকে এবং নিবেদিতার অন্যান্য চিঠি থেকেও দেখা যায়, নিবেদিতা নিজের যাত্রার দিন সহসা এগিয়ে নেন। মনে হয় এর মূলে ছিল রাজনৈতিক কোনো কারণ।]

৩১ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে—"খোকা ৩১ অগস্ট প্যারিস হয়ে ভিসবাডেনের জন্য যাত্রা করছে। হয়ত তুমি এবং আমি প্যারিসে কয়েকদিন কাটিয়েও তাদের প্যারিসে ধরতে পারব, এবং তাদের বিদায় জানাতে পারব। যদি তাই হয়—তাদের কদাপি বলো না—চমক দিতে হবে। ১২, ১৩ বা ১৪ অক্টোবরের মধ্যে তাদের পৌঁছানো উচিত।"

১ অগস্ট, গোখলেকে—"ইতিমধ্যেই আপনি জেনেছেন, ডঃ বসুর ডেপুটেশন-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মহাভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত তিনি ফার্লো-টুকু পেয়েছেন। শিক্ষাবিভাগে যে অসহ্য দল তৈরী হয়েছে এবং যেভাবে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার মুখে, তাতে যদি তাঁকে নির্ধারিত সময়ের কাজ করে যেতে হত—সপ্তাহের কুড়ি ঘণ্টার কাজ এবং অশেষ রকম সরকারী চিঠিপত্রের হয়রানি—তাহলে পরিণতি কি দাঁড়াত বলতে পারি না। যা হোক এখন যা দাঁড়িয়েছে—তিনি 'কমপ্যারেটিভ ইলেক্ট্রো-ফিজিয়লজি' বইয়ের শেষ বাক্যগুলি লিখছেন এবং অন্যদিকে উন্নতির লক্ষণও দেখা গেছে।

ভূপেনবাবুর (ভূপেন্দ্রনাথ বসু) কাছ থেকে অবশ্য শুনলাম, স্বয়ং Mr. Earle মতপ্রকাশ করেছেন—ডঃ বসু ফেরার পরে তাঁর চাকরির যে-কয় বছর বাকি থাকবে, সেই সময়ে তিনি পেনসনসহ অগ্রিম অবসর নিতে পারবেন; তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের গবেষণাগারে কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার বাড়তি আরও থাকবে—তাঁকে মুক্তি দেবার এই একটা পথ। তাঁরা নিতান্ত শীতল মস্তিষ্কে এর একটা হিসাব পর্যন্ত কষে ফেলেছেন—মাসে ৭০০৲ টাকা

কি ৮০০, টাকা। অর্থাৎ গবেষণার সর্বোচ্চ সম্মান—আর হ্রাসের শাস্তি। শিক্ষা-বিভাগের দিকে তাকিয়ে দেখুন—তা পাঁচশো থেকে হাজার পাউণ্ড এবং বারশো পাউণ্ড পর্যন্ত মাহিনার লোকদের দিয়ে ভর্তি হয়ে আছে, যারা ইংলণ্ডে থাকলে বহু কষ্টে বছরে সত্তর থেকে একশো টাকার বেশী রোজগার করতে পারত না। আর এই লোকটি, যেহেতু ভারতীয়, সেই কারণেই তাঁকে তাদের সকলের তলায় স্থাপন করতে হবে! অ্যাকাউন্টস্ অফিসে সন্ধানের দ্বারা অধিকন্তু বার করা গেছে, ঐ যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যকরী হতে হলে তাকে অনন্ত লালফিতার ফাঁস খুলে বেরুতে হবে, যেখানে নিতান্ত সহজ ব্যাপার হত এই অর্ডারটি দেওয়া —"এই ব্যক্তি বিশেষ-কর্তব্যে অবশিষ্ট কার্যকাল পর্যন্ত নিযুক্ত হলেন এবং এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হবে।" অবিরত এরকম অর্ডার বেরুচ্ছে। এক্ষেত্রে ঐটেই একমাত্র উচিত কাজ হত। যদি এ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, তাহলে আকাশপাতাল তোলপাড় করে আপনার মুসাবিদা করা তাঁর মূল আবেদনপত্রটি উদ্ধার করাই আমার কাজ হবে, যার দ্বারা যখন তিনি পাশ্চাত্যে আছেন, তখনকার জন্য প্রয়োজনীয় সহকারীর ব্যবস্থা, ভ্রমণ-ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে। এপর্যন্ত আমি জানি না ভূপেনবাবু কি রকম সফল হয়েছেন। লর্ড অ্যাভেবরী লিখেছেন, তিনি এ ব্যাপারটা মর্লির দৃষ্টিতে আনবেন এবং ইংলণ্ডে লর্ড মিন্টোর জনৈক বন্ধু ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পত্রে তাঁকে লিখেছেন। কিন্তু ফ্রেজারের হাত ছাড়িয়ে ব্যাপারটা বার করা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভূপেনবাবু নভেম্বর মাসে প্রীতি ও আস্থার পরিবেশের মধ্যে বিদায় নিচ্ছেন; তিনি বলেছেন, এ জিনিসটি তিনি ব্যক্তিগত পুরস্কাররূপে দাবি করবেন।"

মিসেস বুল ও জগদীশচন্দ্রের পত্র

[এই পত্রগুচ্ছে ১০টি চিঠি আছে, চারটি মিসেস বুলের, ৬টি জগদীশচন্দ্রের। পত্রগুলির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে মূলেই সেগুলি প্রকাশ করলাম। মিসেস বুলের চিঠিগুলি নকল করা, যতদূর মনে হয়, নিজেই সেগুলি নকল করে রেখেছিলেন। ডঃ বসুর মূল চিঠিগুলিই পাওয়া গিয়েছে। ১০টি চিঠির ২টি ১৯০৪ সালের, ৮টি ১৯০৫ সালের। ১৯০৫-এর চিঠিগুলি অতি মূল্যবান। এগুলি থেকে বোঝা যায়, ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক জীবনে মিসেস বুল কী স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

৩০ মার্চ, ১৯০৪ তারিখে সম্ভবত নিবেদিতাকে লেখা চিঠিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিষয়ে জনৈক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য উধৃত করেছেন, যাতে দেখা যায়, বিজ্ঞান-সোসাইটিগুলিতে পেপার প্রকাশের ব্যাপারে কী ধরনের অনাচার চলে।

১৩ এপ্রিল, ১৯০৪ তারিখে মিসেস বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠিতে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ওয়েলারের নষ্টামির কিছু পরিচয় আছে।

মিসেস বুলকে লেখা তারিখহীন একটি চিঠিতে, যেটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণে ১৯০৫ সালে লেখা মনে হয়, জগদীশচন্দ্র মিসেস বুলের কাছে বিনীত মার্জনা চেয়েছেন নিবেদিতার অসুখের সময়ে তাঁকে আসতে বলেননি বলে।

৩ জুন, ১৯০৫ সালে নিবেদিতাকে মিসেস বুল যে চিঠি লিখেছেন, তাতে দেখা যায়, পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নিবেদিতার জীবিকার আর্থিক দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে চান। তিনি ব্যাঙ্ককে সেই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন। নিবেদিতার অসুখের সময়ে যে-সব খরচ হয়েছিল, তার পরিমাণও জানতে চেয়েছেন। খরচের কথা বলতে নিবেদিতা যেন সংকোচবোধ না করেন, কারণ—'ও তো মা ও মেয়ের মধ্যে স্বাভাবিক জিনিস।' এই চিঠিতেই মিসেস বুল জানিয়েছেন, নিবেদিতা যেন তাঁর অভিপ্রায়সূচক এই চিঠি সংরক্ষণ করেন, যা ভবিষ্যতে দেখিয়ে দেবে, এইসব ব্যবস্থাদি হয়েছে তাঁরই অনুরোধে ও তাগিদে। গভীর আবেগের সঙ্গে মিসেস বুল লিখেছিলেন—"তোমার বাড়িতে সেবায় যত্নে তুমি আমাকে সুখী করেছিলে। তোমার কাছ থেকে যা নিয়েছি, এ-জীবনে আর কারো কাছ থেকে তা নিইনি। যদি তুমি ভবিষ্যতে আর একটি শব্দ বা চিন্তা আমার জন্য ব্যয় না করো, তবু আমাকে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিয়েছ তুমি।"

৩ জুন, ১৯০৫ তারিখের চিঠিতে মিসেস বুল নিবেদিতাকে বলেছেন, স্বামীজী লেখার জন্য শান্তি ও অবসর চাইতেন, তোমারও তা প্রাপ্য। স্বামীজীর জীবনী রচনা করার পরিকল্পনা নিবেদিতা করেছেন, তার উল্লেখ করে তিনি বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্যের ব্যাপারে নিবেদিতার 'অনুশীলিত দক্ষতার' বিষয়ে বলেছেন।

১২ জুন, ১৯০৫ তারিখে জগদীশচন্দ্রকে মিসেস বুল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক চিঠি লেখেন। তাতে প্রথমে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রশংসা ছিল। তারপরে নিবেদিতার দক্ষতার প্রশংসা করে বলা হয়েছে, তিনি ল্যাবরেটরী বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ব্যাপারটুকু অনুধাবন করতে ও তাতে সাহায্য করতে সমর্থ। তারপরে মিসেস বুল একটি নির্মম সম্ভাবনার কথা বলেছেন—মৃত্যুর উপর কারো হাত নেই—জগদীশচন্দ্রেরও তো আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে! সেক্ষেত্রে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রচনাদি যাতে সংরক্ষিত ও প্রকাশিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এঁর প্রস্তাব, নিবেদিতা যেহেতু যোগ্যতার সঙ্গে সবকিছুর মধ্য দিয়ে যেতে পেরেছেন সেক্ষেত্রে ডঃ বসু তাঁকে 'লিটারারি এক্জিকিউটার' করুন—এবং গোটা ব্যাপারটাকে মৌখিক না রেখে লেখাপড়ার মধ্যে আনুন। এসব বিষয়ে উইল করার অভিপ্রায়ও মিসেস বুলের আছে। নিবেদিতার অসুখের সময়ে জগদীশচন্দ্র যেভাবে সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইনি বলেছেন—নিবেদিতা ধর্মীয় প্রেরণায় ত্যাগ ও সেবা করতে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু বাস্তব পরিশ্রমের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থা থাকা উচিত। স্বামীজী বিশ্রাম চাইতেন, লিখবেন বলে—তাঁর সন্তান যেন তা পায়—যাকে স্বামীজীর জীবনী লিখতে হবে। মিসেস বুলের এই চিঠিতেই দেখা যায়, তিনি জগদীশচন্দ্রের বই লেখার, যন্ত্রপাতি কেনার, সহকারী রাখার খরচাদি বহন করছেন। একটি বিরাট কাজে অংশগ্রহণের গৌরব অনুভব করেই তিনি এ জিনিস করেছেন।

২৮ জুন, ১৯০৫-এর চিঠিতে ডঃ বসু মিসেস বুলকে কলকাতার শিক্ষা-বিভাগের 'দারুণ চক্রের' কথা বলেছেন। তিনি এতই উত্যক্ত যে, লেফটন্যান্ট গভর্নরকে জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে মুক্তি নেবেন।

৩১ অগস্ট, ১৯০৫-এর চিঠিতে ডঃ বসু মিসেস বুলকে তাঁর কঠোর পরিশ্রম, আবিষ্কার এবং নরওয়েতে অবকাশযাপনের সুমধুর স্মৃতির কথা বলেছেন।

১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ তারিখে মিসেস বুলকে বঙ্গভঙ্গের সময়ে রাখী-বন্ধনের রাখী পাঠিয়ে জগদীশচন্দ্র আবেগময় ভাষায় লিখেছেন—আইন আমাদের পৃথক করেছে, কিন্তু মনে আমরা এক। এই ঐক্যচেতনা ভারতের নূতন জাতীয় জীবন সৃষ্টি করেছে।—'জানি তোমার হৃদয় আমাদেরই সঙ্গে আছে—তোমার প্রার্থনাও যুক্ত হোক আমাদের প্রার্থনায়।'

এই চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিটিউশনে তাঁর বক্তৃতা-বিষয়ে একটি সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ জুড়ে দিয়েছেন।]

DR. BOSE TO SISTER NIVEDITA, MARCH 30, 1904

There is a very outspoken letter from a distinguished F.R.S. who has been himself in the council of referees. The letter appears in this week's Nature.

"My attention has been recently directed to the letters of Messrs Buchanon and Heaviside. What I wish to point out is that every author who feels aggrieved has a remedy in his own hands, which consists in abstaining for the future from sending papers for publication to the society. A sufficient supply of papers for publications in their Transactions or Proceedings constitute the life-blood of the societies to which I refer (R.S.) and if the supply were cut off these societies will die of inanition. (The authors) will then not be subjected to the disadvantage of having their papers referred to a *Secret inquisition* composed of persons whom I can testify, from personal experience as a former Councillor of a learned society (R.S.), frequently know far less about the subject matter of the paper than the author does, and whose reports, to my personal knowledge have frequently contained errors from not understanding the papers.

The practical and common sense cause would be to boycott the society."

A. B. Basset, F.R.S.

In this week's Sanjibani there is a letter from Japan, with special reference to Conference, signed by A. K. Majumdar.

"It is very sad that there is no chance of the Congress. The gentleman who was asked by O.K. to preside has declined. The East Honganji who were said to have favoured the idea —the chief priest of this section has given out that he will have nothing to do with the Congress..."

Did you see in today's Statesman Sarala Devi's appeal for Volunteers for Red Cross—on behalf of Japan? All communications to be addressed to S. Devi, Ballygunge.

I am glad to think that since such a noble example has been set, others will initiate in this laudable object and express their sympathy for Japan.

I hope the cold is better and in spite of yesterday's cold(ness).

Sincerely yours
J. B.

DR. BOSE TO MRS. BULL, APRIL 13, 1904

Calcutta

My Dear Mother,

Your letter came rather early—earlier than the English mail I think through Genoa.

I have not heard anything from Vines—my letter about Waller will reach him by this time. In any case I dislike the whole thing—specially scientific matter degenerating into personalities. I think it is meant that I shall have to write the book and henceforth that [would] be my mode of expression.

What I am doing now is to print each paper as is completed. In this way the material of the whole book will be collected; and then I could rearrange with necessary alterations in the form of a book. This however makes the thing costly, virtually printing twice over. But otherwise I shall not get time to write the book afresh. I won't feel writing things chapter by chapter.

My nephew had another relapse and that upset the whole household. He is much better now and I am thinking of arranging a sea-voyage for him.

I am sorry the last Paper, copy of which I promised you is but partially typed and illustrated—there being so many interruptions in the meanwhile. I hope to complete them and you shall not only have these, but my new papers which I shall have printed. The great difficulty is in having illustrations as I can't get anyone who can do the illustrations. I have to get these done slowly by some of my artist friends.

Could you now spare the typed copy of the Papers which is now hanging fire before the Royal Society? I shall use them for certain chapters of the book. If all goes well, I hope to have the material for book collected by next January; and all the printed slips, suitably posted will be sent to publishers in England for speedy publication. I hope this to have the Plant book published by May, 1905.

As for the particular quotation you wanted about fatigue, I do not quite understand the particular passage you want.

There is a mention of it in my 'Similarity of Response in the Living and Non-Living' printed by Electrician. Unfortunately I have no copy of it except one in bound volume, Waller's copy being sent to Vines. I sent you a copy of the passage from it.

By the way I cannot tell you how very helpful your prevision has been. When Vines wanted the history of the case, I had no evidence. But on opening the desk I found Waller's letter and his copy of my paper with annotations neatly tied up and marked very *precious*, and these made it possible to show up Wallers through his own admission.

With much love,

Yours affectionate son.

DR. BOSE TO MRS. BULL, 1905

My dearest Mother,

How good of you to say that you wish to see your bairns. I always wished to think that you would come whenever we wished for you. But the last time you came, you were so ill, that I am afraid of asking you, till some supreme occasion should rise. I am always keeping the call sacred for that occasion. When the Child (Nivedita) was ill, I would have sent for you but that there was no time. But you must at least in your mind hold yourself ready to come all at once. If I can only feel that, I shall feel so much rested.

We have done $\frac{3}{4}$th of the work. Then remains the last $\frac{1}{4}$th. There is abnormal heat-wave in Calcutta—there is a talk of the college being closed for another fortnight. In that case I may be able to finish it, at least the rough sketch of it.

With much love,

Yours affectionate,
Son.

MRS. BULL TO NIVEDITA, JUNE 3, 1905

Dearest Margot,

I am immensely relieved by your return of the paper, and turning down, so to speak, of the whole matter. It is proof that no real necessity exists for a change of conditions for either health, life or work. A change might well cause more loss than the meeting of known difficulties. Had my anxiety been justified by reality you would have been the first to feel it and to grasp the opportunity, even though as in the past we assumed a burden heavy and seemingly not just, except that it is imposed by Providence,—and so to be shared or carried by us as well. The five years could have been taken only provided I met the obligation the completed service, thereby securing a pension after death for one, will secure. This extreme venture on my part and its acceptance—poor as it would be as

an alternative—I felt, if my proposal were accepted, some such letter were needed to preserve, to show my people in the future possibly that it was wholly my request and urgence. Your impression of it shows me how free you are from any anxiety concerning the immediate future as regards health and the necessities of the work. You would be the first to grasp at a straw—as such an alternative would be—if necessary, and only with and by your co-operation could it have been blessed.

Please understand that I am wholly at rest about it, and shall instantly free my estate from any contingency which only an impersonal end excused me for wishing to secure at so relatively a disproportionate cost.

I enclose a note to Grindlay in London, and shall be glad if you find it convenient to allow me to take up the note. As they hold the paper for you, it will be necessary, I find, to collect it in this manner. I do not feel quite warranted in sending my letter on direct to them, lest you find it inconvenient to place it and thus lose interest. I am on half interest—better than none, of course, holding it for you. *I shall be glad to have your cable "pay" if you will permit* me to do so. I also enclose order for you on Grindlay of Calcutta, to pay you the balance due me with them.

In March 30th 1904, it stood 1159. 1. 9.

I have been hoping to learn the amount for house-rent, nurses, physician—&c. that was advanced necessarily for you. That seems the natural thing between mother and child. Will *you please let me have it?*

You who have made me happy in your home and care, from whom I have accepted as from no other person in my life, have made me rich also if you never give me another thought or word. Your task is so great, and conditions so difficult you will remember that while I love your letters, they are never to be a matter of duty on any day whatsoever.

Lovingly, dearest—Margot,
Mother.

[*In a separate sheet of paper—*]

Will Messrs. Grindlay & Co., Calcutta, have the goodness to pay to Margaret E. Noble, the balance with them to my credit, and oblige.

Cambridge, Mass., U.S.A. — *Sara C. Bull*
168, Brattle St. June 3rd, 1905 — (Mrs. Ole Bull)

MRS. BULL TO MESSRS. GRINDLAY & CO., JUNE 3, 1905

To Messrs. Grindlay & Co.,
51, Parliament Street, London.

Gentlemen,

Mrs. Ole Bull desires to make payment of the note held

by Miss Margaret E. Noble, and with you for safe keeping. The Cambridge Trust Co. will meet the obligation if you will forward the note to your Boston correspondents with your directions to collect the amount. I am sending a copy of this to Miss Noble in Calcutta, asking her to cable me "pay" if it is convenient for her to receive it now, when I will forward this duplicate to you direct, and, meantime, she will write you her own wishes regarding the same then paid to you for her.

168, Brattle St., Cambridge,
Massachusetts.

Very truly,
Sara C. Bull
(Mrs. Ole Bull)

এই চিঠির উল্টোদিকে নিবেদিতা লিখেছিলেন—

I don't understand the how when or wherefore of *this*. Is it not strange? I have just read, after writing this unhappy letter this wonderful quotation you send from my Guru.

I feel strangely able to believe how that the whole difference between soul and soul lies in their different capacity for various degrees of joy. I could never have foreseen myself praying—as I do now—"O God give me joy!"!!!

MRS. BULL TO NIVEDITA, JUNE 12, 1905

My dearest Nivedita,

Please find enclosed a draft for £ 100 for your personal use.

It used to be my dream that some day Swamiji would have quiet, books and the favourable conditions for writing. May I not ask you to let me try to secure these to you? And to feel that you earn these by the trained efficiency you bring to your work?

If this is the kind of work you feel it best to give yourself to in your present state of health, I shall be grateful that you are able to do so.

But after so serious an illness and the labour of the secretary you may need a complete respite.

The life of Swamiji and the same line of publication you have already initiated, no one but yourself can contribute so—either to make conditions favourable to writing—or to use for your health until it is safely established—you will count this contribution especially sent. And the same amount I mean to respect next year and the succeeding years.

To the present moment I know of no duty that you have not fulfilled amply, generously and nobly.

During your illness your writings have been a solace and strength.

The book on Marriage. Mrs. W. feels to herself personally a great need met.

You will have received by last mail my order for the amount of my balance, with Grindlay Calcutta, for your general purposes and uses, and I will hope for your cable "pay" that I may ask Grindlay of London to collect your note from me. The money stands ready to meet it.

I do hope that you may secure a larger interest there for it.

Hoping, dear, that there is some joy in the convalescence for you and if less robust yet that you may be well.

Lovingly,
Sri Sara.

MRS. BULL TO DR. BOSE, JUNE 12, 1905

My dear Son. I have read four chapters of the book—many many points I understand is related to previous work. How clearly you set aside previous conclusions of others, reg. Prof Waller's wrong current smoothly and go into these wonderful demonstration by thermal and optic and mechanical nerves! The new instrument even more complex and marvellous than I saw and the *applications* of current etc. *all automatic*!!! Is it strange that each sentence means so much, and yet I do not understand anything!

The secretary [Sister Nivedita] is fortunate to follow all without the laboratory work.

I have mentioned in my correspondence my desire that your records and scientific *mss.* should be safe-guarded. The uncertainty of life and, as well, the uncertainty of the right disposal of your Papers in case of your death, made this wise. All this your secretary has gone over with you she could edit properly.

If you could persuade her possibly, to put it on an understood basis of a professional kind—this would if you wish by will to empower her to act as your literary executor with full control of your notes and scientific Papers, be generally respected and understood.

Your prompt action at the time of her illness was a worthy recognition of your right to make conditions for her recovery and comfort as your co-worker. And if you wish to make this privilege in your part in an emergency, cover the possible emergencies that one may reasonably prepare for, I shall be glad.

She has always from her nature itself in the freedom—her religious calling gives her, opportunities ample to give her service:—but in the matters when she earns by actual manual work, it is a satisfaction to have that part on an acknowledged basis?

It was my desire always that Swamiji should come to have the leisure for writing which he always craved. If his child can achieve this, it seems to me a continuity, to us all, of the which,

one thought of for him. His life remains to be written and much else in the same line already published by her.

I hope that she may persist me to so arrange for the conditions essential to her quiet and health that she may accomplish this and at the sametime, feel that she is *earning* her right to do this by bringing her trained efficiency to the task.

I shall be thankful if my feeling can meet the occasion and, together, we provide for her the necessary conditions;—for I presume she will not venture as in the past so much general expenditure of physical strength. The illnesses point to a chance of one cause or another— not the combining, as hitherto, such exacting labours with pen voice and teaching together.

Thank you for letting me know the publishing estimate.

And if for assistants and other possible expenses (instruments) etc. you require more than I have sent this year for the Plant-research—please tell me.

I enclose a draft for that publishing amount—and thank you so much for letting me have a very tiny share in the Great Work. If you can arrange £50 for secretary allow me please to send that for this year.

And above all stands radiant the love with which my life is blessed!

God grant, protect and give you strength and peace always,

Always Mother

Did I leave with you a business note of mine given you until I should make my wish secure in my will? If so, please return it to me.

DR. BOSE TO MRS. BULL, JUNE 6, 1905

Dearest Mother,

I had to postpone work for a couple of days—and am renewing it today. Just finished about 500 pages of the book, another 200 to be written yet.

I do not know what the future might bring, but I have sent a message to the Lt. Governor that I mean to have freedom for my work, whether with or without their help. Of course you know that they have now the strongest combination. It is just as well that things should come to a crisis one way or another.

With much and much love,

from your affectionate
Son

DR. BOSE TO MRS. BULL, AUGUST 31, 1905

My darling Mother,

Your short note telling me that you are having such beautiful rest, gave me much joy. How I look forward for your

letters! Tell me that you wish to look after me just as in Norway. How I dream of those days when used to sleep hours under the pines, on ground carpeted with moss, and the fierd so near. I wish I could make another such rest.

But next two months is to be strenuous work. I have got wonderful results shewing what is the true meaning of 'Constitution', why a drug affects on in one way, and another in a different way. It is wonderful that I should have been able to solve this great mystery.

With much love,
from your son.

DR. BOSE TO MRS. BULL, OCTOBER 16, 1905

CAN METALS FEEL?

Can metals feel? Last night at the Royal Institution Professor Jagadis Chunder Bose proved that they can, in much the same way as animate beings.

He struck a piece of copper, pinched a piece of zinc, gave it poison and administered an antidote, and threw light upon an artificial retina. In each case the electrical emotion, as registered by the galvanometer, was painful to witness. There is an opening for a society for the prevention of cruelty to metals.

(Cutting from a paper)

Darling Mother,

There is just time to send you this thread, which I tie round your wrist. They have divided us by laws, but *we* all over India bind ourselves by this symbolic tie to stand by each other all time, and stand and face everything. This is our true union and from today there shall be the beginning of new national life. We have turned back on relying on strangers, we for India and for ourselves. Dearest one, your heart is with us and let your prayers be also with us.

Trying to send off remaining chapters.

Yours affectionate
Son

N. (Nivedita) is just packing off the mss. for book. Her love heartfull. Please direct the enclosed.

য়ুরোপে দু বৎসর

১৯০৭ সালের শেষ দিনে নিবেদিতা নিজের ডায়েরীতে লিখেছিলেন—

"অপূর্ব বৎসর। দমদমে শুরু—লণ্ডনে শেষ। দুটি বই বেরিয়েছে—'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিয়লজি' ও 'ক্র্যাডল্ টেলস অব হিন্দুইজম্'। কাজ চলছে অপরগুলির। ধন্য বৎসরটি। মা মা মা।"*

ইতিমধ্যে নিবেদিতা পূর্ব পরিকল্পনার চেয়ে আগেই য়ুরোপে চলে এসেছেন। ১৯০৭ সালের ১৫ অগস্ট তিনি যাত্রা করেন এবং ১৯০৮ সালের ১৬ জুলাই প্রত্যাবর্তন করেন, অর্থাৎ মোটামুটি ২ বৎসর য়ুরোপ-আমেরিকায় কাটান। এই-সময়ে অন্যান্য বহু কাজের সঙ্গে তিনি ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক মিশনের ব্যাপারে যথারীতি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ডঃ বসুর য়ুরোপযাত্রার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট সংবাদ ইতিমধ্যে আমরা নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখে এসেছি। জগদীশচন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—

"Detailed descriptions of his experimental methods and the results of his researches in the new realm were for the first time embodied in his *Plant Response* (1906) and *Comparative Electro-Physiology* (1907). The desire was now widely expressed that Prof. Bose should prove his results with practical demonstrations, and the Government of India, in response, sent him on his third scientific deputation to England and America in 1907-8. After a short sojourn in England he went to the United States—for the first time—visited laboratories and lectured before select but appreciative audiences in different American Universities. It is interesting to recall that the suggestion for his visiting U.S.A. first came from the eminent Indian politician—Gopal Krishna Gokhale, a life-long friend and admirer of Jagadish Chadra Bose."(p. 23)

যাঁরা আমাদের বর্ণনাধারা অনুসরণ করে এসেছেন, তাঁরাই বুঝবেন, স্মারক পুস্তিকার বিবরণে আংশিক সত্য মাত্র প্রকাশিত। বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ভারত সরকার অতীব সুশীল—ডেপুটেশন দেবার জন্য সদাই ব্যগ্র। তা যে সত্য নয়, একথা আর বলে বোঝাবার দরকার নেই। ভারত সরকারের ঘোলাটে চোখের জন্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকা সংগ্রহে নিবেদিতা প্রভৃতিকে কি ধরনের পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার আভাস আগে পেয়েছি। স্মারক পুস্তিকায় দেখছি, ডঃ বসু ডেপুটেশন পেয়েছিলেন, ফার্লো নয়—নিবেদিতার পত্রে এই নিয়ে টানা হেঁচড়ার সংবাদ ছিল। হয়ত শেষ পর্যন্ত সরকার ডেপুটেশনে রাজি হয়েছিলেন। স্মারক-পুস্তিকার একটি তথ্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু সংশয় থেকেই গেল—ডঃ বসুকে আমেরিকা যাবার প্রথম তাগিদ দিয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে?—নিবেদিতা বা ওলি বুল নন? অথচ নিবেদিতা বা ওলি বুল এর বহু আগে থেকেই ডঃ বসুর জন্য আমেরিকায়

* নিবেদিতা-জীবনী, আত্মপ্রাণা

অধ্যাপনা পত্র সংগ্রহে ব্যস্ত। তাছাড়া গোখলেকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, ডঃ বসুর ব্যাপারে নিবেদিতাই গোখলেকে চালিত করেছেন।

নিবেদিতার জীবনী গ্রন্থগুলি থেকে পাই—আলোচ্য দুই বৎসরে নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গে বহুবার মিলিত হয়ে য়ুরোপ-আমেরিকায় অনেক সময় কাটিয়েছেন। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭-এ নিবেদিতা বসুদের নিয়ে ইংলণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডে যান; তাঁরা ২৬ সেপ্টেম্বর জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করে ৫ অক্টোবর সেখানে পৌঁছান এবং মিসেস বুলের অতিথিরূপে সেখানে থাকেন। প্যাট্রিক গেডিস তাঁর বইয়ে লিখেছেন, আমেরিকায় বক্তৃতাকালে ডঃ বসু মিসেস বুলের ভবনকে নিজের হেডকোয়ার্টার রূপে ব্যবহার করেছিলেন। স্বামীজীর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহের জন্য কারাবাস করার পরে আমেরিকায় গেলে সেখানে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন নিবেদিতা ; ডঃ বসু সেকাজে পরামর্শ দেন। ১৯০৯-এর জানুয়ারীতে নিবেদিতা নিজের মায়ের শেষ অসুখের সময়ে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন তার বর্ণনা বিস্তৃতভাবে আগে করেছি। ডঃ বসু পরবর্তী মার্চ (১৯০৮) মাসে ইংলণ্ডে ফেরেন। মে মাসের শেষে মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও সস্ত্রীক ডঃ বসু য়ুরোপে যান ; একমাস থাকেন ভিসবাডেনে। ৩০শে জুন তাঁরা জেনিভায় যান মণ্ট ব্ল্যাংক দেখার জন্য। তারপরে মার্সেলিজ থেকে ২ জুলাই, ১৯০৯, ভারত যাত্রা করেন।

আলোচ্য দুই বৎসরে নিবেদিতা রাজনৈতিক কাজে কি প্রচণ্ডভাবে সক্রিয় ছিলেন, তার যথাসম্ভব বিবরণ আমরা নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন আলোচনা-কালে দেব। এইকালে নিবেদিতার যে-সব চিঠি পেয়েছি তার মধ্যে বসু-সংবাদ বিস্তারিত নয়, তার কারণ খুবই স্পষ্ট। ডঃ বসুর বেশী সংবাদ নিবেদিতা মিসেস বুলকে দিতেন—এই সময়ে মিসেস বুলের কাছেই ডঃ বসু ছিলেন। ম্যাকলাউডও অনেক সময়ই কাছাকাছি ছিলেন; সুতরাং স্বভাবতঃই ঐ দুজনকে লেখা নিবেদিতার চিঠি সংখ্যায় অল্প হয়েছে, ফলে বসু-সংবাদও অল্প পেয়েছি।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, জুন ১৯০৯ পর্যন্ত

১০ সেপ্টেম্বর ১৯০৭, ওলি বুলকে—"আমার খুবই বিশ্বাস, খোকা এখন পোর্টসইদে।"

১১ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"তুমি লিপজিগে যাচ্ছ। খোকা বলছে সেও যেত যদি সে জানত তোমার সঙ্গে যেতে পারবে। বউ বলছে, তোমার কোনো 'বন্ধন নেই।' বউ বড় মিষ্টি।"

২৯ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"এখানে শুধু রাত্রিটুকুর জন্য এসেছি, ...আগামীকাল খোকার জন্মদিন।......আমি চলে গেলেও খোকা ল্যাবরেটরীতে যেতে পারবে।"

২৪ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"আমরা গতকাল লর্ড কেলভিনের সমাধিকৃত্যে গিয়েছিলাম। খোকা বলছে—তাঁর বিয়োগে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড়

ব্যক্তিত্ব অপসৃত হল। তাঁর মত শিশুর আনন্দ নিয়ে নতুনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আর কেউ রইল না—আর কেউ তাঁর মত কর্তৃত্ব-প্রবণতা বা ঈর্ষা থেকে মুক্ত নয়।"

৯ মার্চ ১৯০৮, ওলি বুল ও ম্যাকলাউডকে—"তোমাকে গোড়ায় কোনটির বিষয়ে বলব? 'নেচার' পত্রিকায় ৫ মার্চ, ক্রোড়পত্রে আলোচনাটি বেরিয়েছে। সেটি পড়ে মনে হবে—"শয়তানও বিশ্বাসী হয়"—অতখানি অমিয় যখন প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। অধিকন্তু ঐ আলোচনায় ফার্ন এবং ফুলকাপির মধ্যে উদ্ভিদ-স্নায়ুর আবিষ্কারের কথা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং ইতিমধ্যেই ওয়েলারের পালের বাতাস কেড়ে নেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং স্পষ্টতঃ সে কাজ করছেন তাঁরই দলের একজন—যিনি আবার ভিভিসেক্‌শনিস্ট। এই ধরনের আলোচনা দেখিয়ে দেয় যে, পৃথিবী ওহেন আবিষ্কারফলকে স্বীকার করার পক্ষে এখনো প্রস্তুত নয় —এবং সেটাই সবচেয়ে মূল্যবান স্বীকৃতি—আজ আমি তা বুঝতে শিখেছি।......

ইতিমধ্যের ঘটনা—তিনি (বসু) গতকাল ১১-৩০-এর সময়ে পরীক্ষাকাজে গিয়েছিলেন, ১-১৫ মিনিটের সময়ে ফিরলেন নাচতে নাচতে। অভিপ্রেত ফল সব ঘটছে! অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম ক'রে মনে হয় চূড়ান্ত পন্থাটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তা হল—সমগ্র উদ্ভিদ-স্নায়ুকে বিচ্ছিন্ন না করে, তার এক প্রান্ত সাধারণ পেশী-তন্ত্রীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখার পরে উন্মুক্ত তন্তুর সঙ্গে একটি সংযোগ এবং পাতায় সাধারণ পেশী-তন্ত্রীর সঙ্গে অপর একটি সংযোগ করা। তিনি সমস্ত স্নায়ুকে উন্মুক্ত করে এক প্রান্ত সংযোগের জন্য দিতেন; কিন্তু এই জিনিসটি [এখানে পত্রের মধ্যে একটি নক্সা আঁকা ছিল]—যা কলকাতায় প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল, এই আবহাওয়ায় তার ফল শুভ হয়নি।

তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, গতকাল দিনটি উত্তম। বড় ধন্য দিন শনিবার।......

অ্যালবার্টকে (মিসেস লেগেটের কন্যা) বলো, তার স্বামীর (জর্জ মণ্টেগু, পরে লর্ড স্যান্ডউইচ) তুল্য প্রিয় জিনিস আর কিছু হয় না। যখন অক্সফোর্ড থেকে ওয়ারেনের উত্তর সম্বন্ধে তাঁর চিঠি পড়ে শোনাচ্ছিলাম, তখন বিজ্ঞানের মানুষটির মুখের চেহারা যদি দেখতে! বিশ্বাস করি, জগন্মাতা এখন আমাদের কৃপা করতে আরম্ভ করেছেন। মায়ের করুণাহস্ত উত্তোলিত হচ্ছে—পদ্মের কাছে উড়ে আসছে মধুকর। কত আশা! কত আশা আমার!"

১০ জুলাই, মিসেস লেগেটকে—"মিসেস বুল এখনকার পরিকল্পনামত বোস্টনের উদ্দেশ্যে ভাসছেন।......বসুরা এবং আমি ২৬ সেপ্টেম্বর যাত্রা করার আশা রাখি।"

১৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"পরের মঙ্গলবারে খোকার বক্তৃতা গুরুত্বপূর্ণ ও ঘোরালো ব্যাপার হবে। তোমার উপস্থিতির কত না প্রত্যাশা করি।"

১৬ সেপ্টেম্বর, মিসেস উইলসনকে—"৮ সেপ্টেম্বর থেকে আমি বসুদের সঙ্গে আছি।"

৮ অক্টোবর, ম্যাকলাউডকে—"ঠিক এইক্ষণে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্যই অবশ্য প্রধানতঃ মন অধিকার করে আছে। এখন ঐ ব্যাপারটিই ভারতের বিরাট

দায়িতায়। ওটা মন থেকে কিছুটা নেমে যাওয়ার পরে প্রকাশকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনাদি করব।"

২২ অক্টোবর, ম্যাকলাউডকে—"১-৩০ মিনিটে এখানে পৌঁছে প্রিয় মানুষগুলিকে দেখলাম। মনে হচ্ছে, টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের বায়োলজিক্যাল ক্লাব ওঁর কাজকে তার প্রাপ্য যথার্থ মূল্যদান করতে পারবে—ও'র এবং ও'র কাজ সম্বন্ধে তারা একেবারে খুশীতে মত্ত !!!! নতজানু হয়ে আমেরিকাকে নমস্কার। বিকাল চারটের সময় অধ্যাপক সেজরিক, ও তাঁর অধস্তন-অধ্যাপক, এবং ২০—৩০ জন অগ্রসর ছাত্রের কাছে উনি বলবেন ; তারপরে ক্লাস ভেঙে সমবেত সকলে এখানে দেখতে আসবেন ; ফলে মিসেস বসু চা-বিতরণ করবেন।...

অধস্তন-অধ্যাপক জানালেন, বসুই তাঁর আগামী কালের বক্তৃতার সম্পূর্ণ বিষয় হবেন। এমনই প্রগাঢ় সমাদর।......ডঃ বসুকে প্রদীপ্ত দেখাচ্ছে। সেণ্ট সারাকে পর্যন্ত তাঁর ভাইয়ের (মিঃ থর্প) মারফত আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সুতরাং মিঃ থর্প পর্যন্ত এই তারকার বিশালত্ব বুঝেছেন, অথচ ইংলণ্ডে গেডিসই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই সমস্ত কিছুকে যথার্থ অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন !!! জানতেই পারবে না, মা কি খেলা খেলছেন।"

৩ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"খোকা ৮ বা ৯ ডিসেম্বরে হয়ত নিউইয়র্কে যেতে পারে। তাঁদের এবং সেইসঙ্গে তাঁদের একজন সহকারীর থাকবার জন্য কি কোনো বোর্ডিং হাউসের নাম করতে পারো, কিংবা কোনো মাঝারি হোটেল? কিন্তু মনে হয় বোর্ডিং হাউসই উপযোগী হবে।"

১০ নভেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"হোটেলের ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ। খোকা আজ এখানে বক্তৃতা করবে।"

১ ডিসেম্বর, মিসেস লেগেটকে—"হঠাৎ হয়ত পরের শনিবার বসুদের নিয়ে আমি তোমার ওখানে গিয়ে মিঃ লেগেটের সঙ্গে রিজলিতে দেখা করতে পারি, নিউইয়র্কের বদলে। এ যদি হয় তাহলে আমি অতীব আনন্দিত হব। এতে শুধু আবার তোমার সাক্ষাৎ পাবার সুন্দর সুযোগ মিলছে তাই নয়, অধিকন্তু আরও বহু দিক থেকে সুবিধা হয়ে যাবে। রাত্রে ৭-৩৫ মিনিটে আমাদের কিংসটনে পৌঁছতে হচ্ছে; তবে যেহেতু আমি সঙ্গে আছি, সেক্ষেত্রে ছোট ট্রেন যদি পাই (ট্রেন মিলবে বলেই ধারণা) তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।......তারপরে, খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, রিজলি ছাড়তে হবে সোমবার সকালে, কারণ মিঃ বসু বিশেষভাবে চান, নিউইয়র্কের [......] 'ফরেস্ট প্লেস' আমি তাঁকে সঙ্গে করে দেখাই। তারপরে আমাকে মঙ্গলবার সকালে পিটারবার্গে উপস্থিত হতে হবে। তবে আশা করি, এই ব্যবস্থায় তুমি কিছু মনে করবে না। এই ভ্রমণে বসুদের সঙ্গে থেকে যে সাহায্য করতে পারছি এতে আমার আনন্দের সীমা নেই, আর সঙ্গে থাকলে সাহায্য করাটা খুবই সোজা আমার পক্ষে।"

২৩ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"দোষ তোমারও নয়, লেডী বেটীরও নয়, তোমাদের লোকটির—সে তোমাদের নির্দেশের উপর বুদ্ধি ফলাতে গিয়েছিল। ডঃ

বসু আগামী সোমবার জোনস্ হপ্‌কিনস্-সভায় আমেরিকান বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। এটি বিশেষজ্ঞ-সমাবেশ, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের মত। [কয়েক মাস আগে এক ছোকরা, যার নিজস্ব কোনো অধিকার নেই, বা ডঃ বসুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের স্বার্থের কথা ভেবে ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপালের কাছে হাজির হয় (ডঃ বসুর বক্তৃতার জন্য)। ব্যাপারটা শোনা মাত্র আমরা তাকে থামিয়ে দিয়েছি, কারণ, ডঃ বসুর গবেষণার মর্যাদায় পক্ষে তা হানিকর হবে। ডঃ বসু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বক্তৃতার জন্য সরাসরি আহূত হবেন—তাই তো প্রত্যাশিত।] আমি যখন ছিলাম না তখন বসুরা আবিষ্কার করেন যে, বাল্টিমোরে বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ডেলিগেট-হোটেল রয়েছে; সেখানে তিনি ঘর নিয়ে নেন। তোমার পরামর্শমত আমি গতকাল বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে একটি গোপনীয় চিঠি লিখেছি, তিনি যাতে হোটেল-কর্তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু অতিথির বিষয়ে কথা বলেন। আমি যে লিখেছি তা বসুদের বলিনি।"

৩০ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে—"বসুরা বাল্টিমোরে। আর আধ ঘণ্টা বাদে ডঃ বসু তাঁর পেপার পড়বেন। জগন্মাতা তাঁকে আশীর্বাদ করুন—সফল হোন তিনি।

আমি লক্ষপতি হবার বিশেষ চেষ্টায় আছি, যাতে আগামী বৎসরগুলিতে ভারতে নারীশিক্ষা ও বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আর—ওটা কি শুধুই গালভরা আশা মাত্র? ভাবতেই আমার হৃদয় উত্তাল—শুধু লিখতেই তাই! আর হে মাতঃ, আমি তো লিখে ফেলেছি, এখন সেটা সমাধা করে ফেলাই তোমার কাজ হবে।"

৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, ওলি বুলকে—"বউয়ের বক্তৃতায় খুব খুশী।"

৩ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"ডঃ বসু সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনার কথা যে-চিঠিতে লিখেছ, তা আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি, কেবল তার বিষয়ে উল্লেখ আছে এমন দুটি চিঠি পেয়েছি। তোমার আইডিয়া কি তা অনুমান করতে পারছি না, কিন্তু যদি কোনোভাবে তার কোনো সাহায্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়—সেক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতাই হবে আমার একমাত্র অনুভূতি।"

৯ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"তুমি কি এপ্রিলে লণ্ডনে যাবে? ঐসময়ে আমি ওখানে থাকার আশা রাখি।"

৩ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"এখন যেন হাসপাতালে আছি। বউ লিভারপুলে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে নেমেছে।......গত শনিবারে, এক সপ্তাহ আগে এখানে এসেছি, কিন্তু তার খারাপ সময় এখনো কাটছে না, এবং ডাক্তার তাকে আরও তিন দিন শয্যাগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।......

ডঃ বসুর ল্যাবরেটরী?—এবিষয়ে কদাপি কোনো কথা নয়। ঐ নামে অভিহিত করার সাহস নেই। শোনামাত্র সরকার তেলেবেগুনে হবে—ঐধরনের বোকাপড়ার কোনো ফিসফিসানি শুনলেও।"

২৯ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"মনে হয় আমরা হয়ত ভিসবাডেনে যাব বিজ্ঞানের মানুষটির জন্য, কেননা তার পা আবার কষ্ট দিচ্ছে।"

২ মে, ম্যাকলাউডকে—"আশঙ্কা হয়, বিজ্ঞানের মানুষটি ভাল নেই। হয়ত বাত নয়......আমি খুবই উৎকণ্ঠিত।"

১১ মে, ম্যাকলাউডকে—"যদি আমরা ভিসবাডেনে যাই, সম্ভবতঃ তুমি এবং আমি ভিলা হার্থাতে একই ঘরে কাটাতে পারি। বসুরাও থাকবেন। এটা যদি তোমার পছন্দ হয়, অবিলম্বে জানাবে যাতে বউ ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে।"

২ জুন, ম্যাকলাউডকে—"খোকা সবসময় তোমার কথা ভাবছে, বলছে।"

নিবেদিতা ভারতে ফেরেন ১৯০৯-এর ১৬ জুলাই, তারপরে মিসেস ওলি বুলের গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে দার্জিলিঙ থেকে সোজা আমেরিকা যাত্রা করেন এবং মিসেস বুলের কাছে পৌঁছান ১৫ নভেম্বর, ১৯১০। মধ্যবর্তী এক বছরের কিছু বেশী সময়ে নিবেদিতা ডঃ বসুর সঙ্গে পুরোদমে বিজ্ঞানের কাজ করেছেন (সিস্টার দেবমাতার সাক্ষ্য আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করে এসেছি), একত্র ১৯০৯-এর বড়দিনে অজন্তা, ১৯১০-এর গ্রীষ্মের ছুটিতে কেদার-বদরী, ও পুজোর ছুটিতে দার্জিলিঙ গেছেন। শেষ পর্যায়ের এই সব ভ্রমণের কথা বলার আগে নিবেদিতার চিঠি থেকে বাকি অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহ করে দেব। এখানে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে গিয়েছে—বাংলা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক পরিণতিতে। নিবেদিতা সরকারের সন্দেহভাজন। সর্বপ্রকার জাতীয়তাবোধ সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র রাজনৈতিক প্রশ্ন থেকে দূরে থেকে বিজ্ঞানসাধনা করতে চান, এবং সরকারের আনুকূল্য সর্বদা প্রার্থনা করেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সরকারকে নিশ্চয় সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল এবং শিক্ষাবিভাগে তাঁর শত্রুদের দাঁত ও নখকে আরও বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, নিবেদিতা তাঁর ব্যক্তিগত পত্রে পর্যন্ত বসু-প্রসঙ্গ যথাসম্ভব পরিহার করেছেন (নিবেদিতার চিঠি তখন সেন্সার হচ্ছিল)। আমরা আগেই দেখেছি (৩ এপ্রিল, ১৯০৯) নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে ডঃ বসুর ল্যাবরেটরীর কথা তুলতে নিষেধ করেছেন। তবু ল্যাবরেটরী গঠনের কাজ চলছিলই, এবং সেকাজে মিস ম্যাকলাউডের অল্পাধিক সাহায্য ছিল। নিবেদিতা এই সময়ে খানাতল্লাসের বা গ্রেপ্তারের ব্যাপারে এতই ভাবিত হয়েছিলেন যে, ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক কাজ সংক্রান্ত ডায়েরীগুলি বোনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন। পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, বসুর বিষয়ে নিবেদিতা অনেক সময়েই প্রায় সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেছেন।

পুলিশী উৎপাত নিবেদিতাকে বিরক্ত এবং ডঃ বসুকে আতঙ্কিত করে তোলে। রাজনৈতিক কার্যাবলী থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি নিবেদিতাকে বিশেষ চাপ দেন। এই সময়ে একটি ঘটনায় আপাত স্বস্তির কারণ ঘটে—ভাইসরয়-পত্নী লেডী মিন্টো নিবেদিতার বিষয়ে শুনে গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এই সাক্ষাতের

ফলে পুলিশী যন্ত্রণা কমে যায়। তবে তা চিরতরে দূর হল, এমন নিবেদিতা মনে করেননি। শুধু তাঁর মনে হয়েছিল, মিণ্টোর আমল পর্যন্ত তিনি কিছু অধিক সুবিধাভোগ করবেন।

নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখতে পাই, শ্রীমতী অবলা বসু সারদাদেবীকে দর্শন ও প্রণাম করে এসেছেন। এই সময়ে দেশনায়কেরা অনেকেই তাই করছেন, কারণ তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, জাগরণের মূল প্রেরণা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেরই।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, সেপ্টেম্বর ১৯১১ পর্যন্ত

৫ অগস্ট ১৯০৯, ম্যাকলাউডকে—"মাতা ঠাকুরাণী অপরূপ। গতরাত্রে বো (অবলা বসু) গিয়েছিল তাঁর পাদস্পর্শ করতে। চমৎকার নয় কি? সকল মহান জাতীয়তাবাদীই এখন তা করেন। সকলেই স্বীকার করছেন—আহ্বান এসেছিল স্বামীজীর মধ্য দিয়েই। সেদিন যখন মাতাঠাকুরাণীকে বললাম, 'মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আপনার অসংখ্য সন্তান এসে জুটবে—সেদিন তো এসে গেছে। সারা দেশই তো এখন আপনার।' শ্রীমা বললেন, 'তাই তো দেখছি।'"

অক্টোবর ২৭, ১৯০০, ম্যাকলাউডকে—"আমরা বসুদের অতিথি (দার্জিলিঙয়ে)। তবে আমরা ভিন্ন বাড়িতে আছি, খাবার সময়ে নেমে আসি। এবারকার (বৈজ্ঞানিক কাজের) পর্ব এত নিদারুণ ঠাসা ছিল যে, আমি পরের বই আরম্ভই করতে পারিনি, কিন্তু আরম্ভ করতে কত না চেয়েছি।"

২ ডিসেম্বর ১৯০৯, ম্যাকলাউডকে—"অন্য কথা বলার আগে বলে নিই, খোকার মনে হয়েছে যে সে ২০০ পাউণ্ডের দুটি এবং ২০ পাউণ্ডের একটি টাকার অঙ্ক তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়েছে। নিঃসন্দেহে তা তোমার দানের ফল। সে অবশ্যই তোমাকে নিজে লিখে ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তার আগেভাগে বলে নিই, এটা বড় স্বস্তির কারণ হয়েছে। তুমি তার ল্যাবরেটরীকে শৈশবে পালন করছ, কী অপূর্ব। ভারতে তোমার মহা ভূমিকা।

প্রিয় মিঃ দত্ত (রমেশ দত্ত) মারা গেছেন! খোকার জন্মদিন, ৩০শে নভেম্বরের সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শিব! শিব! এবছরটি কী ভয়ঙ্কর!"

৩ মার্চ ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"লেডী মিণ্টো তাঁর জন্য কিছু স্বদেশী বিস্কুট আনতে বলেছেন। তাঁকে অজন্তার একটি স্কেচও আমাদের দিতে হচ্ছে।

---

* নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রকাশিত 'ভারত-তীর্থে নিবেদিতা' নামক গ্রন্থে ৩ মার্চ ১৯১০-এ লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির অংশানুবাদ দেওয়া আছে—

"গতকাল লেডী মিণ্টো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।...বসু খুবই স্বস্তি-বোধ করছেন। কারণ ইদানীং পুলিশের উপদ্রব বড়ই বেড়ে চলছিল। তাই তিনি চাইছিলেন, আমরা কয়েকজন রাজকর্মচারীকে বন্ধু হিসাবে লাভ করি। গ্যাভিন্ন বন্ধু স্যার গাই ফ্লীটউড উইলসন ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটি স্থগিত রাখায় বসু উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়ে এই ব্যাপার ঘটল, যার ফল অনেক বেশী কার্যকরী ও কল্পনার অতীত।"

সেটি তরুণ বুদ্ধিমান এক শিল্পীর করা। নেহাৎ খোকার অনুরোধেই এটা করতে হল, নচেৎ ঐ ত্যাগস্বীকার আর কিছুতে করতে পারতাম কি না সন্দেহ।"

১৪ এপ্রিল ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"জানো কি, খোকা আমাদের গণেন-বালকটির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে—এই বইয়ের ('দি মাস্টার') টাকায় আমাকে ভূস্বামিনী করে তুলবে। হলে নিতান্ত খুশী হব—তা যে স্বামীজীর উপহার হবে।"

৫ মে ১৯১০, মিসেস উইলসনকে—"ডঃ বসু সর্বদা মার্গটের (নিবেদিতার বোনঝি ও ধর্মকন্যা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তুমি যা-কিছু বলেছ, তা তাঁকে গতরাত্রে বলেছি। তিনি অবশ্যই চান, ছোট তাবিজটি ব্যবহার করা হোক। তাকে যাবার সময়ে যদি পথিমধ্যে ভেঙে যায়, তুমি নিশ্চয় তা জানাবে, কারণ সহজেই আমরা নতুন পাঠাতে পারি। এই ছোট্ট মুসলমানী জিনিসটি সম্বন্ধে খোকার অসাধারণ বিশ্বাস। ব্যাপারটি বিচিত্র।"

২৫ অগস্ট ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—

[মধ্যবর্তীকালে নিবেদিতা বসুদের নিয়ে কেদারবদরী ভ্রমণ করে এসেছেন। সামান্য পরেই সে প্রসঙ্গ আসবে।

বর্তমান চিঠির অংশ এবং ২২ সেপ্টেম্বরের চিঠির অংশ আমরা মূলে উদ্ধৃত করছি, কারণ এইকালে ডঃ বসুর বিষয়ে নিবেদিতা কি রকম আধা সাংকেতিক বা আবৃত ভাষায় কথা বলতেন, তার রূপ চিঠির ভাষা থেকে বোঝা যাবে। ২৫ অগস্টের চিঠি থেকে ডঃ বসুর ল্যাবরেটরীর প্রাথমিক পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যাবে।]

"I have been almost wiring to you this week: *Explain Laboratory Prince*. I have asked my journalistic friend to come and talk to you about it. It flashed across me one night at the Holy Mother's evening service that the recent visitor at Hinchingbroke ought to be interested in the scheme by you or George. *We* have not been able to write to him about it, though we have tried, because of the insecurity even of the registered post. I am more and more anxious that it should be in a separate building of its own and not merely in a broken and modified version of the family home! That was to have been a source of income, but now owing to difficulty of buying land closely, it will be sacrificed in October, if Mother gives no definite leading in time to stop this.

We want 3 things in the building:

(1) Good working-resources,

(2) And equally important, a good lecture-hall,

(3) A library and museum, for all sorts of collections, instruments etc., and study. About *this* we need not talk. It is provided, I think, if the rest is. Also garden for specimens.

All this in private Indian context."

September 22, 1910, To May Wilson: "I am thinking of sending you a few old diaries to place with my others. I think

I shall feel better if such papers are with you before the Mintos go—and if anything should happen, you would always know that I would rather *you* searched them than anyone else, unless it were Himself (Dr. Bose) or Xtine (Christine).

Again—it might someday happen that material was wanted for a biography of Himself (Dr. Bose). I have asked that £ 100 should be left by anyone [S C B (Sara C Bull) or J C B (Jagadish C Bose)] to Mr. Ratcliffe, for this purpose. If so, my diaries would be found full of material. Probably Xtine would be the only person who could pick out the references with absolute certainty."

নিবেদিতার সঙ্গে বসুদের ভ্রমণ

ইতিমধ্যে আমরা অনেকবার বলে এসেছি, নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গে অবকাশভ্রমণে যেতেন। এইসব ভ্রমণকালে তাঁরা অনেক সময় অনুকূল আবহাওয়ায় (প্রায়ই পাহাড়ে যেতেন) বিজ্ঞানের কাজ করতেন। কিন্তু ডঃ বসু বা নিবেদিতা ভ্রমণকালে ভ্রমণের অন্যতর উদ্দেশ্যকে কখনই বিস্মৃত হতেন না। ভ্রমণ তাঁদের কাছে মহৎ শিক্ষা—যেহেতু তাঁরা কেবল কল্পনায় দেশ বা জাতিকে দেখতে চাননি, সাক্ষাতে দেখতে চেয়েছেন। ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ নিবেদিতার মনোজীবনে এই ভ্রমণগুলির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্র এ নয়, কিন্তু ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু, সেই তন্ময় বিজ্ঞানী, যিনি গবেষণাগারে জীবন যাপন করবেন, তিনিও ভারতভ্রমণকে দেশাত্মবোধের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর জীবনীকার, সুবিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডিসের রচনাংশ উদ্ধৃতিযোগ্য। বিয়ের পর থেকেই জগদীশচন্দ্র তাঁর পত্নীর সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করেন (ইনি দশ বার পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ করেছিলেন!) এবং সে ধারা জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অধ্যাপক গেডিস তাঁর ব্যাপক ভ্রমণের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"এই ভ্রমণ-ব্যাপারটি আপাতভাবে মনে হয় বসুর বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু তা বস্তুতঃপক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কার্যের প্রাণশক্তি দিয়েছিল, সর্বোপরি তাঁকে ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও কর্মসাফল্যের ঊর্ধ্বে ভারত-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত রেখেছিল।...এর ফলেই এই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত আধুনিক পদার্থবিদ্ অদ্ভুত ব্যাপকভাবে তাঁর স্বদেশকে জেনেছেন—নিতান্ত খাঁটি এক ভারতবাসীর মত করেই ভারতকে বুঝেছিলেন।"

ইংরেজ সাংবাদিক এবং সরকারী কর্মচারীরা অগভীর ধারণা থেকে বলে থাকেন, ভারতের ঐক্য আধুনিক কালের সৃষ্টি—তা উকিল-ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিকদের মাৎসিনী-আদর্শের উদ্গিরণ এবং ছোকরাদের মানসিক উত্তেজনার আশ্রয়। অধ্যাপক গেডিস সেই সিদ্ধান্তের অসারতা দেখিয়ে বলেছেন, 'ভারতের মূলীভূত ঐক্য তার ধর্মচেতনায়, তার নারীদের আত্মায়', তার রাজধর্মে ও কর্মে। সে ঐক্যবোধ মুসলমান শাসন, এমন কি ইংরাজ শাসনও নষ্ট করতে পারেনি। জগদীশচন্দ্র সেই ঐক্যচেতনার স্পর্শলাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি যখন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শ্রীরঙ্গম মন্দির

দর্শনে যান, তখন অতি পবিত্র সংরক্ষিত স্থান, একেবারে গর্ভমন্দিরের ভিতরে তাঁকে যেতে বলা হয়। জগদীশচন্দ্র জানান, তিনি মোটেই রক্ষণশীল হিন্দু নন, জাতিভেদে বিশ্বাস করেন না, সামাজিক অনুশাসন লংঘন করে কালাপানির পারে গেছেন, সুতরাং ঐ জায়গায় প্রবেশের কোনো অধিকার তাঁর নেই। পুরোহিত বলেছিলেন, 'আপনি সাধু। চলে আসুন।'

এমনই সব অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছিল ডঃ বসুর মনে। তিনি বলেছেন—

"এইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ভারত আমাকে তার সন্তানরূপে নির্মাণ করেছে, রক্ষা করেছে। ভারতের বাইরের জীবনের গভীরে তার অবিচ্ছিন্ন প্রাণের স্পন্দনকে আমি অনুভব করি।"

গেডিসের বসু-জীবনীতে নিবেদিতার সঙ্গে বসুরা যে-সব ভ্রমণ করেছেন, তার অনেকগুলির উল্লেখ আছে। যেমন তাঁদের মায়াবতী-ভ্রমণ, বা বুদ্ধগয়া-ভ্রমণ। অজন্তা-ভ্রমণের কথাও পাই। এই ভ্রমণে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, সস্ত্রীক জগদীশ বসু ও গণেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। লেডী হ্যারিংহামের তত্ত্বাবধানে এবং নিবেদিতার প্রেরণায় নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার অজন্তার গুহাচিত্র নকল করতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার চিঠিতে ঐ ভ্রমণের দু' এক টুকরো সংবাদ—

* "পরের সপ্তাহে মিসেস হ্যারিংহ্যামের সঙ্গে অজন্তায় মিলিত হওয়ার কথা। ফেরার আগে ইলোরাও সেরে নেওয়ার কথা। ইতিহাসের মহাভোজ এক মাস ধরে, যা এক বছরের লেখার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান।"

"তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, বড়দিনের আগের দিন আমরা সারা রাত্রি ধরে অজন্তা-মুখো চওড়া রাস্তায় হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়িয়েছি। অপূর্ব চন্দ্র যখন নেমে গেল, এক ঘণ্টা পরে আমরাও নেমে এলাম মিসেস হ্যারিংহামের তুষারশুভ্র তাঁবুতে—তাঁকে বললাম—'শুভ বড়দিন!' তারপর তিনটি পরমানন্দের দিন কাটালাম,—শিল্পের—ইতিহাসের—গ্রন্থের—ভ্রমণের—গুহার—তিনটি দিন।"

ডঃ বসু তাঁর অজস্র ভারত ভ্রমণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনে রেখেছিলেন ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালের কেদারবদরী ভ্রমণটিকে—একথা তাঁর অনুমোদিত জীবনীতে পাই। আমরা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের চিঠি থেকে দেখেছি, বহুদিন ধরেই এই ভ্রমণের জন্য নিবেদিতার আগ্রহ ছিল, এবং তাঁরা ১৯০৭ সালেই এই ভ্রমণ-পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। কেদারবদরী ভ্রমণ ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থযাত্রা, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভূখণ্ডের মানুষ একত্রে যাত্রা করে এই তীর্থে। গেডিস লিখেছেন—"এর পূর্বে আর কখনো ওঁরা এমন ব্যাপক ধর্মপ্রভাবের রূপ দেখেন নি, যা ঐতিহ্যগত ও স্বাভাবিক। এক সুরে সকলের প্রাণ বাঁধা। জাতি নির্বিশেষে সকলে সকলকে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র বন্ধুভাবে সম্বোধন করে। কেদারের বিরাট তুষারশিখর দর্শনমাত্রে প্রতিটি মুখ ভাবোদ্দীপ্ত—কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে ওঠে—জয় কেদারনাথ কি জয়! নরনারী সকলেই যেন প্রার্থনায়, পূজায়, ভাববিহ্বলতায় সমাচ্ছন্ন। অন্ধ একটি মানুষ সংকীর্ণ মারাত্মক একটি পথে, চূড়োর উপরে, হাতড়ে

* নিবেদিতা এই ভ্রমণের উপর দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন— *The Ancient Abbey of Ajanta* এবং *Elephanta—the Synthesis of Hinduism.*

হাতড়ে উঠছিলেন, তাঁকে যখন বলা হল, ভাই, সামলে চলুন, তিনি বললেন, প্রভু পথ দেখাচ্ছেন, আমার ভয় কি?"

এই ভ্রমণের উপরে নিবেদিতার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। নিবেদিতার মন কতখানি সমৃদ্ধ ঐ বইটিই তার প্রমাণ। প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, ইতিহাস, ধর্ম-দর্শন ও পৌরাণিক সাহিত্যে অধিকার এবং মানুষের প্রাণসত্যকে অনুভব করার আশ্চর্য ক্ষমতার আভাস এই ক্ষুদ্র বইটির মধ্যে মিলবে। অন্ধ বৃদ্ধের যে ঘটনাটির কথা গেডিস লিখেছেন, সেটি এখানেও পাওয়া যাবে, এবং আরও কিছু ঘটনা, যাদের কথা সরলাবালা সরকার তাঁর অনবদ্য নিবেদিতা-স্মৃতিতে বলেছেন।

নিবেদিতার চিঠিতে এই ভ্রমণের কিছু সংবাদ মেলে।

নিবেদিতার পত্রে কেদারবদরী যাত্রা-সংবাদ

২৫ মে ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"(রুদ্রপ্রয়াগ থেকে) এই যাত্রাটি যথার্থই তীর্থযাত্রা। সব ধরনের জায়গাতেই আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তিন রাত্রি মাত্র ডাকবাংলোতে। সুতরাং কল্পনা করে নাও। বসুরা একেবারে অপূর্ব। এত সহজে সন্তুষ্ট তারা, যে-কোনো জিনিসের সেরা রূপ দেখতে প্রস্তুত, এবং ধর্মজীবনের অভিব্যক্তিতে আগ্রহী। এই উত্তপ্ত নদী-উপত্যকায় বিপদও যথেষ্ট।"

জুন ১২, মিসেস উইলসনকে—"এই যাত্রাটি কি রকম হয়েছে তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমাদের সমস্ত শক্তি তা হরণ করে নিয়েছে। গত ৭।৮ দিন ধরে বেচারা মিসেস বসু অসুস্থ।...

হরিদ্বার নামক মনোরম এক ক্ষুদ্র শহর থেকে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম এবং তীর্থযাত্রার পথ অনুসরণ করে পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করতে হয়—যাত্রার সে অংশ সমাপ্ত হয়েছে—এটাই কঠিনতম যাত্রা। এখন আবার বদরীনারায়ণের তুষারের অভিমুখে।

প্রথমে আমরা এমন একটা রাস্তা ধরে গিয়েছি, যেখানে ইউরোপীয় বা তাঁদের ভাবানুরূপ মানুষের জন্য কোনো ব্যবস্থাদি নেই। রাতের পর রাত আমরা মুসাফিরদের সরাইখানায় কাটিয়েছি—ঠিক বেথলিহেমের মত—এবং এ ধরনের অবস্থানের চরম অভিজ্ঞতা ঘটেছিল যখন পার্শ্ববর্তী এক বিরাট মঠে আতিথ্য নিয়েছিলাম। আমাদের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দানের লক্ষণরূপে একটি ঘোড়াকে তার আস্তাবল থেকে বিতাড়ন করে সেখানে মিসেস বসু ও আমার স্নানাগার করে দেওয়া হল! কিন্তু ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দুই পরে যখন আমি বাড়ীতে হাত ধোয়ার জন্য সেখানে গেলাম তখন চমৎকৃত হয়ে দেখি—অশ্ববর তাঁর স্বস্থানে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পুনরধিষ্ঠিত হয়েছেন। তখন ডাক ছেড়ে কাঁদার অবস্থা। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, সরাইয়ে জায়গা না হওয়ায় জোসেফ এবং মেরীকে কিভাবে সহজেই আস্তাবলে ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছিল! আমাদের যাত্রার এই অংশটি কি অচিন্তনীয়ভাবে পুরাকালীন! এখন আমরা তিব্বতের অভিমুখীন সামরিক পথে, এবং প্রতি ক্ষেপে থাকবার স্বাচ্ছন্দ্যকর জায়গা পাচ্ছি।...

সারা পথে অতি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য, এবং অসাধারণ ঐতিহাসিক স্থান-

সমূহে। কষ্ট স্বীকারের উপযুক্ত পথ। এখন দিনের পর দিন চলেছি রাঙা গিরিখাতের মধ্য দিয়ে, মাঝে মাঝে পাতলা পাইন বন, তাছাড়া আর কোনো গাছ নেই। ধূমলবর্ণ গিরিসংকট। উত্তর আয়রল্যাণ্ডের বা কাম্বারল্যাণ্ডের তটভূমির মত। আহা, অপূর্ব, যেন দেবতাদের বিহারস্থান। মিঃ র‍্যাটেলের নাছোড় তাগিদে আমি তাঁদের ও তোমার জন্য ছোট্ট ডায়েরী রাখছি, কিন্তু তার থেকে তোমরা বিশেষ কিছু পাবে মনে হয় না, কারণ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করার এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছি, যার অর্থ কেবল আমার কাছেই স্পষ্ট—নিজস্ব ভাবে সেগুলি কিছুই নয়।"

১২ জুন, ম্যাকলাউডকে—"আমরা বদরীনাথের পথে। দৃশ্যাবলী অপরূপ। কিন্তু পথযাত্রার অসুবিধা সবিশেষ। মিসেস বসু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু আমরা থামিনি,—মনে ধরে রেখেছি অমরনাথের মহাস্মৃতি।"

২৯ জুন, ম্যাকলাউডকে—"আমাদের অপূর্ব তীর্থযাত্রা সমাপ্ত। স্বামীজী নিশ্চয় চাইতেন, আমরা এই তীর্থ করি। আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে কে জানে, কিন্তু এ এক অমর সম্পদ—এমনভাবে রক্ষিত ও পুণ্যাশিসপূত যে এমন কি খোকা পর্যন্ত তার মহিমা মেনে নিয়েছে। ভালভাবে নামছি আমরা—কী স্বস্তি।"

৬ জুলাই, মিসেস উইলসনকে—"বিজ্ঞানের মানুষটিকে সুস্থ, সবল, জ্যান্ত অবস্থায় কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে পেরে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। বেচারা বউই কেবল বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—সে এখন আবার ভাল হয়ে গেছে। সব জড়িয়ে আমরা ৪২ দিন হেঁটেছি, ৬ দিন হাঁটা বন্ধ ছিল। মোট ৪৮ দিন।"

নিবেদিতার রচনায় কেদার-বদরী ভ্রমণ

জগদীশচন্দ্রের সেরা স্মৃতি যে ভ্রমণটিকে ঘিরে, যে-ভ্রমণকালে তিনি ভারতের সুগভীর আধ্যাত্মিক স্বভাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন—সে অভিজ্ঞতার কিছুটা স্বাদ পেতে হলে নিবেদিতার পূর্বোক্ত তীর্থকাহিনীটুকু না পড়লে নয়। আমি খুব সামান্য কিছু উদ্ধৃত করছি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের অনুভূতির ঐক্য কতখানি।

"কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের মধ্যবর্তী পথের কোনো এক জায়গায় খেতে বসেছি, এমন সময়ে আমাদের দলেরই কে একজন বলে উঠল—'ভেবে দেখো, এখান থেকে মানসসরোবর মাত্র দশ-বার দিনের পথ। এর সব জায়গাটাই কৈলাস। আমরা কৈ-লা-সে!' সত্যই তাই। সেই পরম কাম্যলোকে প্রবেশ করেছি প্রাচীন ঐতিহাসিক পথ বেয়ে। ক্ষুদ্র অথচ অবর্ণনীয়-সুন্দর, বারাণসীতুল্য হরিদ্বার থেকে যাত্রা করে, হৃষীকেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, আমরা পায়ে পায়ে, স্তরে স্তরে ভারতের সর্বস্থানের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছি এক পুণ্যভূমি থেকে অন্য পুণ্যভূমিতে, অবশেষে পৌঁছেছি সর্বতীর্থসার কেদারনাথে; সেখান থেকে এখন চলেছি বদরীনারায়ণের পথে—সেখান থেকে ফিরে নামব আমাদের সাধারণ জীবনে, আমাদের সমতলের গৃহে, আমাদের প্রতিদিনের কাজে। অপূর্ব কথা কটি—আমরা কৈলাসে

আছি। স্তব্ধ হয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত, তাদের অর্থ ঘনালো মনের গহনে। পাইন ও দেওদারের মধ্যে বসে আছি, পায়ের তলায় পার্বত্য কুসুমরাজি, পিছনে কাল-প্রাচীন তীর্থভূমি, সামনেও তাই—মনে হল, কৈলাস?—হতে পারে, অসম্ভব কি?...

এই তীর্থযাত্রা থেকে প্রথম যে-ভাবটি মনে জাগে, তা হল ভারতের সুগভীর ঐক্যবোধ। পথযাত্রীদের মধ্যে পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মালাবার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং বাংলার মানুষেরা আছেন, প্রতি ক্ষণে তাঁদের দেখি, অতিক্রম করে চলে যাচ্ছি। শুধু এইজন্যই ঐক্যবোধ করছি না, অধিকন্তু এই ব্যাপারটি আমাদের সামনে রয়েছে—এই উত্তরতীর্থের মহান পূজারী-ব্রাহ্মণ, মোহন্তরা সবাই দাক্ষিণী। বদরীনারায়ণের পথে পান্ডারা পর্যন্ত দক্ষিণদেশের লোক। কেদারের ক্ষেত্রে অবশ্য পান্ডাদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি যেভাবেই হোক, বর্তমানে তাঁরা একেবারে স্থানীয় অধিবাসী।... কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ বা অন্যান্য পুণ্যস্থানের মোহন্ত বা রাহুলেরা তাঁদের উত্তরাধিকারী দাক্ষিণদেশ থেকে মনোনীত করতে বাধ্য। এইভাবেই আধ্যাত্মিক ভাব-ধারাকে জীবন্ত রাখা হয়েছে, গত হাজার বছর ধরে, যা সর্বদাই ভারতের অতিপ্রান্ত দেশসমূহ থেকে উত্থিত ও প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমে মগধ, তারপরে দ্রাবিড়দেশ থেকে তরঙ্গ উঠে ভাসিয়ে দিয়েছে হিমালয়কে। সেইসঙ্গে এও প্রমাণিত হয়েছে, মাতৃভূমি সত্যই এক, উত্তর ও দক্ষিণ অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, জাতিগত, ভাষাগত বা রাজনৈতিক খন্ডরূপের কোনো কাহিনী কখনই সম্পূর্ণ ভারতকাহিনী হবে না।...

কোনো ভারতীয়ের কাছেও, যদি তিনি তীর্থযাত্রা না করে থাকেন, এই পথের জীবন উদ্‌ঘাটিত করে দেবে নতুন আলোক। ভারতে নারীর স্থান ও নারী-জীবনের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কে? এই তীর্থযাত্রা করেছেন নিশ্চয় এমন কেউ নয়। পথে চলতে চলতে দেখি কখনো একাকী, কখনো জোড়ায়, কখনো দশ-বিশ বা তারো বেশী সার-দেওয়া নারীর দলকে, তার মধ্যে তরুণী থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই আছেন। তাঁদের আচরণে ত্রাস বা অহেতুক লজ্জা-সংকোচ নেই। কখনো দেখা যায়, কেউ হয়ত কিছুটা দলছাড়া হয়ে পড়েছেন, হাতে জপমালা নিয়ে মগ্ন হয়ে পথ হাঁটছেন। কখনো আবার এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, তিনি যেন কোনো দলেরই নন—একাকী। কিন্তু প্রায় সবাই আনন্দময়, দেশজ রীতি অনুযায়ী সবাই প্রায় যেহেতু সর্বক্ষণ অলঙ্কার পরে আছেন, মনে হচ্ছে উৎসবের, আনন্দের ছড়ানো পরিবেশ। যাত্রীরা সবাই সবাইকে চেনে। পরিচিত পৃথিবীর আড়ষ্ট ক্ষুদ্রতা এখানে নেই। দেখা হলেই সবাই কথা বলে; নারী হোক, পুরুষ হোক, বলে ওঠে, 'জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়!' কিংবা 'জয়, বদরীবিশাল কি জয়!' প্রতি সম্বোধনের জয়ধ্বনিতে যে মাধুর্য ও আলোকের ঝলক ওঠে তা বর্ণনাতীত।...প্রাচ্য অভিবাদনের সৌকুমার্য লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে। হয়ত কেউ চলেছেন জপমালা ফেরাতে ফেরাতে, হয়ত চান না নিজের মৌনভঙ্গ করতে, এসব ক্ষেত্রে কী না মর্যাদা ও মিষ্টতার সঙ্গে তিনি ঈষৎ নত হয়ে সেই অভিবাদনকে গ্রহণ করেন।...

এক নদীর শুষ্ক খাতের উপরকার সুবৃহৎ প্রস্তরগুলির উপর দিয়ে কঠিন পথ ভেঙে উঠবার সময়ে দুই বৃদ্ধাকে দেখলাম, তাঁরা প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে-পড়া অথর্ব শরীর—বদরীনারায়ণ দর্শন করে তাঁরা নামছেন। ভয়ঙ্কর পথ—

একজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন—আমরা এগিয়ে গেলাম সাহায্যের জন্য। আমাদের শিউরে-ওঠা চীৎকারের উত্তরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন—বিজয়ের আনন্দ তাঁদের ভঙ্গিতে—'সাহায্যের দরকার কি? নারায়ণ কি পথ দেখাচ্ছেন না? তিনি যখন দর্শন দিয়েছেন, এসবে কী এসে যায়?'...

হরিদ্বারে যাদের যাত্রারম্ভ তারা কী সুখী!...চন্দ্রালোকিত রাত্রে যাত্রীরা বেরিয়ে পড়ে পাণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে, গান গাইতে গাইতে পথে চলে। আর, আহা, গঙ্গায় সেই সন্ধ্যারতি! ব্রহ্মকুণ্ডের অর্ধচন্দ্রাকার সিঁড়ির শেষ ধাপে ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পুরোহিত দীপাধার দোলাতে থাকেন, শতদীপ একসঙ্গে জ্বলে, সেটিকে দেখায় ছোট আলোকতরুর মত। তাঁর পিছনে পূজার্থীর দল, প্রধানতঃ নারী তাঁরা; তাঁর সামনে সেতু ও অর্ধচন্দ্রাকার দ্বীপের উপরে যাঁরা বসে-দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের নানা বেশবাস ও আকারে নানা প্রদেশের চিহ্ন ফুটে আছে—সবাই গভীর স্তব্ধ যতক্ষণ পুরোহিতের পূজারতি চলছিল—শেষ হওয়া মাত্র সবাই উত্তাল হয়ে উঠল মন্ত্রগানে। সমবেত সঙ্গীতের তরঙ্গদল আছড়ে পড়তে লাগল ক্রমান্বয়ে, একের উত্তরে যেন আর একটি—গঙ্গার মহিমায় অপূর্ব সঙ্গীত। আর দূরে বিস্তৃত হয়ে আছে সবুজ ভূখণ্ড, বনরাজিনীল বন্ধুরতা, তার উপরে সদ্য নেমেছে সন্ধ্যার আবছা কুয়াশার অঞ্চল। সমস্ত পরিবেশটিই যেন অপূর্ব এক পূজা।...

কেদারনাথ এখন আট মাইল দূরে। শেষ দিনের পথ ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ শেষ চার মাইল খাড়া চড়াইয়ের অংশটুকু।...জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, কিন্তু ওঠার কষ্টও নিদারুণ। যন্ত্রণাকঠিন সিঁড়ির মত পথ, জীবনযন্ত্রণার মতই—পাণ্ডা কষ্টহাসির সঙ্গে বললেন—'স্বর্গের সিঁড়ি!' সবই কিন্তু মন থেকে মুছে গেল যখন অবশেষে উচ্চ অধিত্যকায় পৌঁছলাম এবং কেদারনাথের এলাকার কাছাকাছি এসেছি অনুভব করলাম। তৃণাচ্ছাদিত বিশাল অধিত্যকা, কুসুমাস্তীর্ণ, মুঘল শিল্পীর আঁকা বেহস্তের ছবির মত। প্রতি পদক্ষেপে যাত্রীদের অতিক্রম করে যাচ্ছি বা আমাদের তাঁরা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। সমবেত ব্যাকুলতার রূপকে ভাষায় ফোটানো সম্ভব নয়। অবশেষে—সেই মুহূর্তটি—দেখা গেছে মন্দির—বুক চিরে যেন আবেগ-ধ্বনি বেরিয়ে এল আমাদের বাহকদলের, অন্যান্য সকলের।...সোমবার পৌঁছবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম কারণ শিবের দিনে মন্দিরদর্শন মহাপুণ্যের কাজ। কিন্তু যখন হাজির হলাম দুপুরে হয়ে গেছে, সন্ধ্যারতির সময়ের আগে মন্দির খুলবে না। বিকাল গড়িয়ে গেল, পাহাড় থেকে নামল নীলাভ কুয়াশা, ঢেকে দিল সবকিছু; তারই মধ্য দিয়ে, পথের ধারে বসে দেখছি, ধূসর কম্বলে ঢাকা সাধুদের অস্পষ্ট আকারগুলি এপাশ-ওপাশ করছে বন্ধ দ্বারের সামনে। সহসা ডাক দেওয়া হল—আরতি হবে—দেখতে এসো তোমরা! অন্ধকার নেমেছে, কিন্তু কুয়াশা সরে গেছে, তুষার ও তারকা ঝকঝকে উজ্জ্বল। ঝলমলে আলোয় ও ঘণ্টারবে পূর্ণ মন্দির—বাইরে থেকে উৎসুক যাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছি। আরতি-দীপের শেষ দোলাটুকু যেমনি থামল—উন্মুখ যাত্রীদের আকুতির ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরে সে কী দৃশ্য! পথ করে দাও! পথ করে দাও! সবাই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে, রুদ্ধশ্বাসে,—ঝুঁকে পড়ছে—স্পর্শ করছে—জড়িয়ে ধরতে চাইছে প্রতীক

পর্বতখণ্ডটিকে। আসছে—আসছে—মানুষ আসছে!...জীবনের পরমতম দৃশ্য দেখলাম—সেখানে সিঁড়ির উপরে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাত্রীতরঙ্গের ধেয়ে যাওয়ার সেই ছবিটুকু! মনে হল সমস্ত ভারতবর্ষ যেন পরম একের সামনে নত-শায়িত—কেদারনাথ যে অদ্বৈতের শিখর। সমস্ত ভারতের সকল স্থান থেকে সকল পথ বেয়ে মানুষ যেন আসছে, কাড়াকাড়ি করে এগিয়ে উঠছে, কেন, কিসের জন্য?—আর কোনো কারণে নয়—ঈশ্বরকে স্পর্শ করবে তারা।...

কেদারে থাকার দ্বিতীয় দিনে এক বৃদ্ধ এলেন দেখলাম, দীর্ঘদিনের অসুস্থ। তিনি দর্শন করলেন। ব্যস্ত হয়ে পূজো শেষ করছেন, পাছে পূজো শেষের আগেই তাঁর জীবন শেষ হয়ে যায়। সবে পূজো শেষ, এখনো প্রার্থনার শেষ শব্দটি ঠোঁটে কাঁপছে, সাফল্যের সুখাবেশ এখনো জড়িয়ে আছে—তাঁরও বৃদ্ধ শেষ! প্রভাতের সোনার আলোয়, বাতাসে, সুদীর্ঘ কয়েকটি নিশ্বাস-ব্যাকুলতায় মুক্ত হয়ে গেল আত্মা। মহাদেবের আশীর্বাদ ভক্তের প্রতি—এমনই করুণার স্পর্শ তাঁর আত্মজনের উপরে!"

মিসেস ওলি বুলের দেহান্ত থেকে নিবেদিতার দেহান্ত

মিসেস বুলের শেষ দিনগুলি

মিসেস বুলের জীবনচিত্র দেবার সময়ে বলে এসেছি—এঁর কাছ থেকে নিবেদিতা পার্থিব জীবনে সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছেন, জীবনের মর্মান্তিক আঘাতও এঁর সূত্রেই পাওয়া। পাঠকদের মনে থাকতে পারে—নিবেদিতার বোন মিসেস উইলসন তিক্ত বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন—ওলিয়ার (মিসেস বুলের কন্যা) ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই নিবেদিতার জীবনাবসান। এ কাহিনী বেদনাময়, তবু উন্মোচন করছি জীবননাট্যের প্রয়োজনে। "যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়, হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান"—স্বামীজীর এই কথাগুলির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্বয়ং স্বামীজী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী নিবেদিতা।

ওলি বুলের গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে নিবেদিতা সোজা দার্জিলিঙ থেকে বস্টনে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছান ১৫ নভেম্বর। অসুখের সংবাদ তিনি আগে থেকেই পাচ্ছিলেন। ২৫ নভেম্বর, ১৯০৯-এর এক চিঠিতে ম্যাকলাউডকে লেখেন—"সেন্ট সারা আমাকে এক শান্ত মধুর চিঠিতে লিখেছেন—তিনি সম্ভবতঃ আগামী শরৎকালের আগে এখানে (ভারতে) আসছেন না। তা ভালই। শুধু আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি পীড়িত এবং গুরুতর কিছু ঘটার বিপদ রয়েছে। ওঃ য়ুম, তা কী ভয়াবহ হবে! এত জনকে সাহায্য করে এগিয়ে দেবার পরে তাঁকে একই দারুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে! কী ভয়াবহ!!!...ভাবতেও শিউরে উঠি! কিন্তু যদি তিনি চান তাহলে খুশী হয়ে তাঁর কাছে হাজির হব। ও-ধরনের কিছু শুনলে তুমি নিশ্চয় আমাকে জানাবে, কি বলো?"

১১ জানুয়ারী, ১৯১০-এর এক চিঠিতে ডঃ চেনীকে জানিয়েছিলেন—"মিসেস ওলি বুল তাঁর কেমব্রিজ (ম্যাসাচুসেটস্) ভবনে আছেন। তিনি আমায় লিখেছেন,

নিজের বাড়িতে আগুনের পাশে বসে বড় আরামের শীত কাটাচ্ছেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা, তাঁর শরীর নিতান্ত কৃশ-দুর্বল। তাছাড়া তিনি তো আরাম, শান্তি ও নীরবতার তৃপ্ত থাকতে পারবেন না!" ১৭ মার্চ ম্যাকলাউডকে লেখেন—"সেন্ট সারার চিঠি কিছুদিন ধরে অশুভসূচক হয়ে উঠছে। অবশেষে খোকা তার করল। উত্তর এল—"সন্তোষজনকভাবে আরোগ্য ঘটছে।" এখনো কিন্তু জানি না ওঁর কোনো ভয়ঙ্কর অপারেশন হয়েছিল কি না। তবে তাই মনে হচ্ছে। যদি হয়, তিনি তাঁর আরামের আশ্রয়ে থেকে আরোগ্যলাভ করছেন, এটা খুবই স্বস্তির বিষয়। যদি এখানে থাকতেন, দায়িত্ব হত নিদারুণ।" ২৫ মে, ম্যাকলাউডকে—"বড় আশা করি সেন্ট সারা গুরুতর অসুস্থ নন। দুশ্চিন্তার কারণ ঘটা মাত্র তাঁকে হারালাম, এর থেকে ভয়ংকর কী হতে পারে!" বড় উদ্বেগে ৭ জুলাই ম্যাকলাউডকে প্রশ্ন করে পাঠালেন—" 'সারার জীবনের শেষ' লিখেছ কেন? নিশ্চয় তুমি বলতে চাইছ না তাঁর জীবনান্ত হতে যাচ্ছে!"

৪ অগস্ট ১৯১০ একই জনকে—"কিভাবে না বিশ্বাস করতে চাই যে, সারার আরও বহু বহু বছর জীবন অবশিষ্ট আছে! বেচারা, বেচারা সারা! তাঁকে কিছুতে মরতে দিতে পারি না। উপরের ঢেউয়ের নীচে গভীর তলদেশে মানুষের জন্য মানুষের কতখানি না ভালবাসা থেকে যায়!" ১১ অগস্ট, একই জনকে—"সারার জন্য আমাদের উদ্বেগের সীমা নেই। আশঙ্কার যথার্থ হেতু নেই, মনে করতে চাইছি বিশেষভাবে।" এরপরে এক চিঠিতে নিবেদিতা জানিয়েছেন তাঁরা পরবর্তী মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর দার্জিলিঙ চলেছেন, এবং "সেন্ট সারার বিষয়ে একটু আশান্বিত বোধ করছি; মনে হচ্ছে, তাঁর অবস্থা কিছু ভাল।"

নিবেদিতার বৃথা আশা। সারার উদ্বেগজনক অবস্থার কথা টেলিগ্রাম করে ক্রিস্টিন জানালেন, এবং অবিলম্বে তিনি ছুটলেন। ১৪ অক্টোবর ১৯১০, যাত্রাপথে কলম্বো থেকে ম্যাকলাউডকে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে সারার জন্য মনোবেদনার সঙ্গে আর একটি আশঙ্কার ছায়াপাত হয়েছে—ভারতে আর কি তিনি ফিরতে পারবেন? নিবেদিতার ভয় ছিল, হয়ত ভারত সরকার তাঁর ভারতে ফেরা নিষিদ্ধ করে দেবেন।—

"মারাত্মক বিপদের সময়ে কিভাবে না তোমার স্মরণস্থ হতে হয় সকলকে! তোমার পছন্দমত কোনো 'সাইকিক'কে জিজ্ঞাসা করবে—অবশ্যই কাউকে না কাউকে জিজ্ঞাসা করবে যে,—এই কি আমার শেষবারের মত ভারতত্যাগ, কিংবা আবার কখনো খোকাকে দেখতে পাব এবং তার সঙ্গে থেকে কাজ করতে পারব? ক্রিস্টিন টেলিগ্রাম করেছিল: 'Await you here Sara accepts'; তার অর্থ আমরা বুঝলাম, সারার পাশে আমি যাই, সারা তাই চাইছেন। সুতরাং আমি কার্যতঃ দু'-একদিনের মধ্যেই যাত্রা করলাম। কিন্তু—বলো—আমি ফিরব তো? ভবিষ্যতে আছে কি? ১৬ তারিখে নেপলস্ অভিমুখে নর্থ জার্মান মেল ডিফ্লিন্‌জারে যাত্রা করব; ১৬ নভেম্বরে কুনারডার ক্রাসপ্রাথিয়া করে নিউইয়র্কে পৌঁছবার কথা। সুতরাং ১৭ই সারার কাছে পৌঁছচ্ছি।

ওঃ যুদ্ধ, দুঃখসাগর। (পত্র এখানে খণ্ডিত)...

সারা নিঃসঙ্গ—নচেৎ হয়ত আসল বিপদ কিছু নেই। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হচ্ছি না। প্রিয় যুম্, তাঁকে যে নিরাময় হতেই হবে! আমরা তাঁর সম্বন্ধে বিরক্ত হতে পারি, বিদ্রোহ করতে পারি, কিন্তু জীবনের কী অর্থ, যদি এইসব কঠিন শক্তির সঙ্গে সংঘাত না থাকবে! ভারত থেকে ঔষধ এবং ব্যবস্থাপত্র পাঠানো হয়েছে; যদিও সারার খুবই নিঃঝুম অবস্থা, তবু মনে হয়, ঐসবের ফল ভাল হবে।

প্রিয় সদানন্দ (যিনি রোগশয্যায়) এখনো জানেন না কি হয়েছে, কারণ আমি সোজা দার্জিলিঙ থেকে চলে এসেছি। আমি চাই যে, এসব জিনিস যতদিন সম্ভব তাঁর কাছ থেকে ঢেকে রাখা হোক।"

সারার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে নিবেদিতা কি দেখেছিলেন, কতকগুলি চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যায়। অনেকগুলি চিঠিই খণ্ডিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, বেশী বেদনাদায়ক বর্ণনার অংশ ম্যাকলাউড ছিঁড়ে ফেলে তবে চিঠি হস্তান্তর করেছিলেন। আমরা তেমন কয়েকটি চিঠি থেকে অংশ তুলে দিচ্ছি :

৪ ডিসেম্বর ১৯১০ ম্যাকলাউডকে—"এই চিঠি পাবার অনেক আগেই ক্রিস্টিন তোমার কাছে চলে যাচ্ছে। গত বুধবারে আমি তাকে ম্যারিটানিয়া জাহাজে বিদায় জানিয়েছি। মনে হচ্ছে সারা এখন ভালর দিকে। এই বিংশ শতাব্দীতেও আমেরিকায় গুপ্ত রহস্যবাদীদের মধ্যে যত সব শয়তানী ধারণা। তাদের পাল্লায় পড়লে মাথা ঠিক রাখা অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। মনে হয়, যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিতে পারলে সারা ক্রমে আরোগ্যলাভ করবেন। তবে কতকগুলি বিষয়ে তিনি নিতান্ত বেয়াড়া। তাঁর থেকে জোরের সঙ্গে অসঙ্গত দাবি করতে আর কোথাও দেখিনি। তবু সীমাবদ্ধ সেগুলি, এবং ঊর্ধ্বতর আকর্ষণে সাড়া দিতে পারেন অপূর্বভাবে। সম্ভবতঃ তাঁর সবচেয়ে মন্দ দোষ—নিজ ইচ্ছাকেই চরম ভাবা—তার জন্য অবিরত তিনি নিজ শক্তি ব্যয় করেন, সংরক্ষণ করেন না—আরোগ্যের জন্য যা করার প্রয়োজন ছিল। খুব আদর্শ অবস্থা নিশ্চয় নয়, কিন্তু ধৈর্য ছাড়া পথ খোলা নেই। আর আমাকে যে বাস্তব সেবা করতে হয় না তার জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞ। তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণাই আছে, আমার সময় উৎসর্গীকৃত। সেজন্য সবচেয়ে সতেজ মধুর মন নিয়ে আমি তাঁর কাছে যেতে পারি।"

৭ ডিসেম্বর ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"এখনো সূর্যোদয় হয়নি। চারদিক বরফে ঢাকা। চা আসার পূর্ব পর্যন্ত বহুক্ষণ শুয়ে থেকেছি, প্রার্থনা করেছি—আমরা সবাই যেন আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে ক্ষুদ্র গোপন স্থান রক্ষা করি, যে-স্থানটিতে আমরা তাঁর সঙ্গে মিলতে পারি, বেড়ে উঠতে পারি অব্যাহতভাবে, কোনো হিপ্‌নোটিজমের বা প্রভাবের বশবর্তী না হয়ে। এ আমার ন্যায়সঙ্গত বাসনা আমি জানি, কারণ স্বামীজী এই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিলেন, এবং একে তাঁর ব্যক্তিত্বের সর্বস্ব করে তুলেছিলেন। সেই ঠাঁইটুকুর বাইরে অনেকের সঙ্গেই তিনি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতেন, নিজের সীমান্তের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি দৃক্‌পাত করতেন, কিন্তু যদি প্রত্যেকের ঐ নিজস্ব ভূখণ্ডে অনধিকার প্রবেশের কোনো চেষ্টা কোনো পক্ষে কখনো দেখেছেন, সহ্য করেননি কোনোমতে। এই অন্তরখণ্ডটির অস্পৃষ্ট থাকাকেই তিনি বলতেন স্বাধীনতা।

আমাদের এই স্বাধীনতার—যত ক্ষুদ্রই হোক না তার আকার—আমরা যেন তার মধ্যে অখণ্ড স্বরূপে থাকতে পারি! ক্রমেই যেন সৎ ও অসতের পার্থক্য করতে পারি অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে!...

যারা প্রার্থনায় বিশ্বাস করে না তাদের ব্যস্ত করার দরকার নেই। কিন্তু যারা করে—জর্জ, অ্যালবার্টা, স্পেনস্, যে-কেউ—তারা যেন সেণ্ট সারার জন্য প্রার্থনা করে, যাতে তিনি এই মহাবিপদের ক্ষণে তাঁর আত্মবোধ ফিরে পান, সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।

এসব কথা তাদের অবশ্য বলো না।এ সব কিছুই তুমি, আমি, খোকা ও ক্রিস্টিনের মধ্যে থাকবে।...

আর করুণা করে আমার জন্য প্রার্থনা করো তোমরা সকলে, যাতে আমি প্রেমময়, ধৈর্যময়, গভীর আত্মসমাহিত মৌনের মধ্যে অবস্থান করতে পারি। ওঃ য়ুম, আমি এত আতঙ্কিত!...প্রেম, ধৈর্য, আত্মসংযম—ভুলো না আমার এইসব প্রয়োজনের কথা।"

৯ ডিসেম্বর, ম্যাকলাউডকে পুনশ্চ লিখলেন—

"মনে হয় সেণ্ট সারার বিচিত্র সব ধারণা এবং মিসেস ব্রিগসের প্রভাব সম্বন্ধে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছি।...মিসেস এইচ-এর ধারণাই বোধ হয় ঠিক, মৃত্যুর বা উম্মত্ততার আশঙ্কা হয়ত সত্যই নেই। আমি মাথা ঠিক রাখতে চাইছি। একই সঙ্গে অভিজ্ঞতা কিন্তু অতি বাস্তব এবং সমাচ্ছন্ন বিভীষিকা। মোট ফল, সেই স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি—'এই মায়াজাল ছিঁড়ে ফেল—মুক্তি খোঁজো।' তারা যেভাবে পারুক নিজেদের ব্যবস্থা করুক, তাদের 'সাইকিক' প্রভাবগুলি নিজেরা লড়াই করে সিদ্ধান্ত করুক, কিন্তু ত্রাণ আছে একটি ক্ষেত্রেই—মুক্তিতে। একটি উপায়েই সাহায্য করা সম্ভব—এই মুক্তিলাভ করে।"

২৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ পত্র ম্যাকলাউডকে একই বিষয়ে—

"(সারার কথা লিখে) তোমাকে ভয়ানক যাতনা দিয়েছি—তার জন্য দুঃখিত। সহজ স্নিগ্ধ প্রভাবের মধ্যে সারার অবশ্যই উন্নতি হচ্ছে, যত ধীরেই হোক, এবং বোধহয় পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে দেখা এখন সম্ভব। অধিকন্তু, লোকজন সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলেছেন।...যে ভাব নিয়ে তোমাকে গোড়ায় লিখেছিলাম তা জঘন্য মনে হচ্ছে—সম্ভবতঃ তা মিথ্যাই। ভালবাসা ও সরলতায় তিনি যে সাড়া দিচ্ছেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, আমি যে রোগনির্ণয় করেছিলাম, তা সম্পূর্ণ ভুল নয়। অন্ততঃ মিসেস ওয়ালডেনের সতর্কবাণীকে সত্য-প্রমাণ করবার মত যথার্থ।

প্রিয় মিসেস হেলিজ বললেন—'তাঁকে অর্থ দান করতে প্রণোদিত কর—এই বন্ধন মোচন কর।' ঠিক এই পথেই আমি দু' একটি নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছি। এর ফল ভালই হবে মনে হয়।...

মনে পড়ল সেই অসাধারণ অহমিকা, ডাইনিতন্ত্রে বিশ্বাস, সমালোচনার ও নিন্দার প্রবৃত্তি, গ্রীষ্মকালে ক্রিস্টিনকে সরিয়ে দেওয়া, যা ক্রিস্টিনের পক্ষে উত্তম, তবু নিজে কি ঝুঁকিই নিয়েছিলেন।...

যাই হোক দুম, মিসেস হেলিজের সিদ্ধান্ত হল—এক মুহূর্তের নোটিসে চলে যাবার জন্য তৈরী থেকো। আমি প্রস্তুত। থাকার সময় আমি কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িয়ে যাচ্ছি মাত্র। তবু, এই সংগ্রামক্ষেত্রের তলদেশে দুঃখী, আশঙ্কাতুর, মহান ও উদার হৃদয় রয়েছে, যা মানুষের জন্য এত কিছু বিরাট জিনিস করেছে, শতগুণে যা ফিরে আসা উচিত তাঁর কাছে। আর আমার পরম সৌভাগ্য, এই কাজে, বিশুদ্ধ প্রেম ও কৃতজ্ঞতার প্রয়াসে, আমি স্বামীজীর হাতের যন্ত্র হতে পেরেছি। অগস্ট মাসে সিরি যখন সারার কাছে এসেছিলেন, তখন সারা বলেন, তিনি সদ্য ভাবতে শুরু করেছেন যে 'তিনি ভালবাসতে পারেন এমন আর কিছু অবশিষ্ট নেই।'... বেচারা, বেচারা!...কিন্তু ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি, খোকা না থাকলে ক্রিস্টিনের মতই আমার অবস্থা হত—কোনো প্রভাবই থাকত না। কখনো কখনো নার্ভাস হয়ে পড়েছি, যেমন হতাম ১৯০৮ সালে।

...যথার্থই দেখতে পাচ্ছি বন্ধুত্ব একটা বন্ধন। মুক্তির সন্ধানই অন্যের কাছে প্রাণরস এনে দেয়। যখন আমরা নিছক ভাল করতে চাই তখন ক্ষতি করি, বোধহয়, কে জানে!

হ্যাঁ, সেণ্ট সারার জন্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয় করো, তাকে সত্যই ভালবাসো, তার উপর যথার্থ বিশ্বাস রাখো, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে তাকে দেখো, কিংবা সেইসঙ্গে শ্রীমার অনুধ্যান জুড়ে দিও।* এই নিঃসঙ্গ আত্মার উগ্র সরব আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র এইগুলি প্রয়োগেই সাহস করতে পারি। কিন্তু সে সত্যই ভালবাসে, ভালবাসা চায়! কী বেদনা! সে যা চায়, ভাল বা মন্দ, সব কিছু করতে তাকে সাহায্য করব, যদি সত্যই নিশ্চিত বুঝতে পারি তা যথার্থই তার ইচ্ছা। শিব! শিব!

ভালবাসার সমুদ্র তোমার জন্য। অবশ্যই ভালো হয়ে ওঠো তুমি এবং ৯০ বছর পর্যন্ত বাঁচো, নচেৎ দুঃখে আমার মৃত্যু হবে।"

যেসব পত্রের অংশ উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে বোঝা যায় জীবনের শেষ পর্বে সেণ্ট সারার বিচিত্র পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত বিচারবুদ্ধি, বিরাট অহমিকা ও নিন্দাপ্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং মিস্টিক জীবনের প্রতি আসক্তি গিয়ে পৌঁছায় 'ডাইনিতন্ত্রে' বিশ্বাসে। এই পরিবর্তনের সূচনা নিবেদিতা ১৯০৮ সাল থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। তারপরে, কোনো এক বন্ধুর প্রভাবে, যাঁর নাম কি আমরা বলতে পারব না, মিসেস বুল অশরীরী প্রেতচ্ছায়া দেখতে আরম্ভ করেন এবং অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন থাকেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। বদান্যতাই যাঁর স্বভাবধর্ম, তিনি কৃপণের লোলুপ আতঙ্কে টাকাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছিলেন। ক্রিস্টিনকে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, নিবেদিতার চিঠি থেকে পাই, এবং লিজেল রেম'র জীবনীতে আছে, নিজ কন্যা ওলিয়াকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন ও পুত্ররূপে যাঁকে গ্রহণ করেছিলেন সেই জগদীশচন্দ্রকেও পরিহারে

---

* স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, শ্রীমাকে লেখা নিবেদিতার অপরূপ চিঠিখানি, যার মধ্যে আছে, সারার জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে শ্রীমাকে মেরীর মতই মনে হয়েছিল তাঁর, সেই চিঠিখানি কয়েকদিন আগে, ১১ ডিসেম্বর নিবেদিতা লিখেছিলেন।

করেছিলেন। নিবেদিতার কাছে এই অবস্থা অসহনীয়। কেবল 'মিসেস বুলের' *পরিবর্তনের ব্যাপার যদি হোত,* নিবেদিতা ব্যস্ত হতেন না, কিন্তু এ যে স্বামীজীর 'ধীরা মাতার', 'সেণ্ট সারার' অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের লৌকিক মনস্তত্ত্ব আমরা অনুমান করতে পারি—কিন্তু আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বের মীমাংসা আমাদের সাধ্যাতীত। এবং অধ্যাত্মরহস্যসন্ধানীদের কাছে পরম 'আধ্যাত্মিক' সেণ্ট সারার এই পরিবর্তনের হেতু অবশ্যই মনোযোগের বিষয় হবে। নিবেদিতা যৎপরোনাস্তি মর্ম-পীড়িত হয়েছিলেন। সারার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনাই তাঁর প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য তিনি দুইভাবে চেষ্টা করলেন, সারাকে আবার তাঁর মাতৃত্বের হারানো অনুভূতি ফিরিয়ে দিতে চাইলেন, অপরদিকে চাইলেন, মুক্তির আধ্যাত্মিক চেতনা, যা বিবেকানন্দের মহাদান, তারই স্মৃতি যেন সারার অন্তর্লোকে প্রত্যাবর্তন করে।

নিবেদিতা যাওয়া মাত্র তাঁকে অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত সারা আঁকড়ে ধরেছিলেন। সেবার শুশ্রূষায় তিনি অনেকটা সুস্থ হলেন *কিছুদিনের মধ্যে। মনের সহজ অবস্থা* খানিক ফিরলে ওলিয়া ও জগদীশচন্দ্রকে—সারা সচেতনভাবে যাদের বিতাড়িত করেছেন, কিন্তু আজন্ম চৈতন্যে যাঁদের তীব্রভাবে কামনা করছেন—এই দুটি মানুষের কথা সারার মনে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন তিনি। সারাকে দান করবার জন্য প্রণোদিত করলেন—যেহেতু তাই ছিল সারার সহজ স্বভাব। আর ভরিয়ে দিলেন, ধুইয়ে দিলেন তাঁর মনপ্রাণ সত্তা আধ্যাত্মিকতার নির্মল আলোকে। সারার জীবনাবসান হল—শেষ ক্ষণে পুরাতন—চিরন্তন—স্বরূপের স্পর্শ পেয়ে। নিবেদিতার সেই অসাধারণ প্রয়াস—যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবাণবিদ্ধ সহযোদ্ধাকে শত্রুর আক্রমণ এড়িয়ে মহাবীর বহন করে আনছেন স্বভূমিতে!—হাঁ, অসাধারণ সন্দেহ নেই।

২৮ ডিসেম্বর ১৯১০, ম্যাকলাউডকে—"সেণ্ট সারা সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যাণ্ডে কাটাবার পরিকল্পনা করছেন। তারপরে যদি যথেষ্ট শক্তি পান, ফরাসী জাহাজে ভারতে যাবেন এবং চন্দননগরে বাড়ি ও নৌকা নেবেন।...

সারার বিষয়ে আমি কেবল প্রার্থনা করছি, কোনো 'চিকিৎসা' নয়।...আমি শুধু প্রার্থনা করছি ভালবাসার জন্য—অন্তরে বাহিরে শুধু ভালবাসা—ভালবাসা দাও, নাও, অনুভব করো। অনন্ত ভালবাসার তরঙ্গ—ভেসে যাক বন্দরের বন্ধন, ছিঁড়ে যাক জাহাজের নোঙর, তাই তাই তাই চাই।...তাঁর প্রয়োজন তাঁর বিরাট প্রকৃতির পুনর্বাসন—ভালবাসা—শুধু ভালবাসা—স্বার্থবোধ না রেখে ভালবাসা। শেষের *দিকে কয়েক বছর যেন তিনি চাবিটি হারিয়ে ফেলেছিলেন ।"**

১ জানুয়ারী ১৯১১, ম্যাকলাউডকে—"প্রিয় যুম, কাশ্মীরে আমাদের সেই বিরাট বৎসরটি—তা কী গভীর ও নিত্য বর্তমান! মুখে মুখে বলে চিঠি লেখানোর

---

* সারার পুরোনো প্রকৃতি, পরিবর্তনের মধ্যেও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। ৯ ডিসেম্বর, ১৯০৯ তারিখে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন—"সেণ্ট স্যারার শেষ চিঠিতে পেয়েছি —তিনি রিভালিতে কয়েকদিন কাটাবেন বলে ভাবছেন। আহা, আমার বড় আশা, তাই যেন হয়! তাহলে মনে হবে—সকলের মাঝখানে স্বামীজী বুঝি এখনি পা ফেলে চলে আসবেন।"

ক্লান্তিকর চেষ্টার জন্য অপেক্ষা না করে সেন্ট সারা এখনি তাঁর হয়ে আমাকে তোমার কাছে লিখতে বললেন। আজ সকালে বড় মুহ্যমান ও দুর্বল তিনি। ডাক্তারের চিকিৎসাগত একটা ব্যাপারের জন্য রাত্রি অস্থিরতায় কেটেছে। কিন্তু গত রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ভাবতরঙ্গ অনুভব করে তবে বিদায় নিয়েছিলাম। আজ সকালে তিনি আমাকে কুণ্ঠিতভাবে সেই অপূর্ব রাত্রিটির কথা বললেন, যখন এডউইনা মারা যাবার ফলে তিনি স্বামীজীর সান্নিধ্যে ছিলেন ; তাঁর জন্য কি করেছেন, কি বলেছেন, সব কিছুর কথাই আমাকে জানালেন ; অপূর্ব তা, সে-ই তাঁর জীবনের মূল সুর। নিজে থেকে বললেন—অতঃপর নতুন জীবন তাঁর। তাঁর বিচারবুদ্ধি অন্য কাউকে নিন্দিত করতে নয়, কেবল নিজেকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে প্রযুক্ত হবে। প্রিয় য়ুম, দেখ কেমন ধীরে ধীরে মেঘ সরে যাচ্ছে। সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে হৃদয়! জানলা খুলে দিয়েছি, তারপর চলে এসেছি—ও যেন তাঁর জীবনের সংকট-সন্ধির ক্ষণ। শান্তি নেমেছে আমার মনে। আমি বুঝেছি, এই শারীরিক দুর্বলতার মধ্যে হয় তাঁর আত্মা মুক্তি পাবে, নচেৎ প্রাণশক্তিপূর্ণ নতুন জীবন সত্যই আরম্ভ হবে, যা তাঁকে সর্বদা যে রকম ছিলেন আবার তেমনই দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলবে। আমি কোনো একটি সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত বলে ধরছি না, কারণ দুটোই নিম্নমুখী, শুধু অনুভব করব যে, স্বামীজীর চরিত্র ও অভিপ্রায়ের গঙ্গাপ্রবাহ আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাসাগরের দিকে। অনন্তের সেই মহাতরঙ্গের তুলনায় আমাদের জীবন বা আমাদের মৃত্যু—কী মূল্য তাদের! তুমি এখানেই আছ, সুতরাং আমরা কথা বলতে—বলতে—বলতে পারি! কত কি দেখছি, বুঝছি আমি!

সেন্ট সারা তোমাদের সকলের বিষয়ে বড় মধুর ভালবাসাভরা কথা বলেছেন।...

ওঃ য়ুম, যে আত্মা সত্যই মহান ও আলোকিত তার পক্ষেই এইভাবে সাড়া দেওয়া সম্ভব। ভয়ংকর মুহূর্তগুলি আবার আসবে, অবশ্যই, কিন্তু মনে হয় তাদের সংখ্যা কমে যাবে, এবং স্বাস্থ্য ফিরলে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। প্রথমে খুব ধীরে সন্তর্পণে, তারপরে আরও স্পষ্টভাবে কাশ্মীরের বৎসরটির পুরানো অপূর্ব সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। মাতৃত্বের জন্য তীব্র বাসনা, ওলিয়ার মধ্যে যা মূর্তিমতী, সারার মধ্যেও তাই রয়েছে ; কেবল সেইসঙ্গে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো চাই, স্বামীজীকে আবার শিশু ভগবানরূপে ('হোলি চাইলড্') দেখার ক্ষমতা ফিরে পেতে হবে। এখন তিনি তা 'দেখতে' পাচ্ছেন মনে হয় না, কিন্তু বুঝতে পারছি, তাঁর হৃদয়ে রয়েছে সেই অনুভব।...

(রাত্রে)। তিনি এখন অনেক অনেক ভালো। একসঙ্গে সারাদিন, সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কাটাবার পরে বিদায় নিয়েছি। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন তোমায় তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাই।"

১৬ জানুয়ারী, ডঃ চেনীকে—[ডঃ চেনী 'দি মাস্টার' বইটির উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে] "মিসেস বুল খুবই অসুস্থ। তাহলেও আপনাকে গভীর শুভেচ্ছা ও অনন্ত ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেননি। যদি কোনো কিছু আমার সাফল্য বলে তিনি মনে করেন, তাহলে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং অপরিসীম গর্বিত হন। (হিবার্ট জার্নালে) আপনার আলোচনাটির সূত্রে তিনি প্রায় একটি উৎসব

খাড়া করে ফেলেছিলেন—তাঁর ঘরের ফুলগুলির মধ্যে একটি উৎসর্গিত হয়েছিল 'প্রিয় ডাঃ চেনীর পক্ষে।'"

১৮ জানুয়ারী, ম্যাকলাউডকে—"শোকসংবাদ ইতিমধ্যেই তোমাকে তার করে দেওয়া হয়েছে। গতকাল কী উজ্জ্বল দিন কাটিয়েছিলেন! প্রদীপ নেভার আগে শেষ উজ্জ্বলতা। আজ সকাল ৫টায় অল্প তিনটি গোঙানি—সে-ই হল সংকেত। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে ছিলাম, ৮টায় তাঁর দেহান্ত পর্যন্ত। মিঃ থর্প, ওলিয়া, ডাক্তার—সকলেই এখানে ছিলেন। তাঁদের আসার আগে, যখন হয়ত সজ্ঞান তিনি, আমি মন্ত্রোচ্চারণ করলাম—'হরি ওঁ! রামকৃষ্ণ! ওঁ শান্তি!' শেষ যখন, আমরা খৃষ্টীয় আশীর্বচন পাঠ করলাম—আত্মা নির্গত হয়ে গেল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবই মঙ্গল। আমি জানতাম তিনি চলে গেলেন স্বামীজীর সান্নিধ্যে—একেবারে সরাসরি। গতকাল তিনি চাপাস্বরে বলেছিলেন, আমি এখনো আমার ডেস্কের উপরে স্বামীজীকে এনে রাখিনি। তিনি বলেছিলেন—'যিনি বীর।' বুঝেছিলাম তিনি বুদ্ধের কথা বলতে চাইছেন। তিনি বলেছিলেন—'এ পর্যন্ত সে মূর্তি দেখিনি।' আমি উত্তর দিলাম, 'প্রিয় আমার, তুমি কাল সকালেই তা দেখবে!' অন্যভাবে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ যে ভাবেই হোক আমি একটা কিছু তাঁর জন্য করছিলাম, যা সন্তুষ্ট করেছিল তাঁকে। কত ক্লান্ত ছিলেন। এখন তিনি দেখছেন—স্বামীজীকে বুদ্ধরূপে।"

মিসেস বুলের উইলের মামলা

নিবেদিতার জীবনে চরম দুঃখদিন এল এর পরেই। মিসেস ওলি বুলের উইলে দেখা গেল—জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এবং ভারতে নারীশিক্ষার জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উইলের অধিকার নেবার জন্য শোকগ্রস্ত নিবেদিতাকে অপেক্ষা করতে হল, কারণ ওলি বুলই পূর্বাবধি তাঁর কাজের প্রধান সাহায্যদাত্রী, এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখবার জন্য বায়বহনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতীয় কাজের জন্য মিসেস বুলের টাকা নেওয়ার ব্যাপারে নিবেদিতা নৈতিক সংকোচ বোধ করতেন না, যেহেতু তিনি মনে করতেন স্বামীজী তাঁর কর্মের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন দু-জনের উপরে; ওলি বুলের উপরে সংস্থানের দায় এবং নিবেদিতার উপরে আন্দোলন চালানোর দায়।

এইবার, উইলের বিধান জানবার পরে, মিসেস বুলের মানসিকভাবে অসুস্থ কন্যা ওলিয়া হিংস্র হয়ে উঠল। মাকে সারা জীবন তিলে তিলে দগ্ধ করেছে যে-মেয়ে, মায়ের অবর্তমানে তাঁর পরম বান্ধবীর উপরে সে গরল ঢেলে দিল। ওলি বুলের এত টাকা কেন ভারতবর্ষে যাবে? নিবেদিতা কোন্ উদ্দেশ্যে দূরে ভারতবর্ষ থেকে ছুটে এসেছে? নিবেদিতা কী খাইয়েছে মাকে—তাকি বিষ নয়? নিবেদিতা ওলি বুলের যন্ত্রণা-নিবারণের জন্য কিছু কবিরাজী ওষুধ খাইয়েছিলেন। সে জিনিস ওলিয়ার ও তার প্ররোচক বন্ধুদের প্রচারে বিষ হয়ে দাঁড়াল। উইলের মামলা আরম্ভ হয়ে গেল।

এতখানি লাঞ্ছনার জন্য নিবেদিতা প্রস্তুত ছিলেন না। প্রেম, পবিত্রতা, শক্তি ও ত্যাগ যাঁর প্রতি নিঃশ্বাসে, তাঁর বিরুদ্ধে ঐ অপবাদ তাঁকে একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছিল। অন্তর্যাতনা এমনই নিদারুণ হয়েছিল যে, এই ঘটনার পরে যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরাই শিউরে উঠেছিলেন। একেবারে ধ্বড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি—দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছিল যেন—তাঁর বোন সেকথা বলেছেন। নিবেদিতার মত আধ্যাত্মিক স্বভাবের মহিলা স্বতঃই নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন—কোন্ পাপের দংশনে এতখানি জ্বালা তাঁর। লিজেল রেমঁর নিবেদিতা-জীবনীতে সে উত্তর আছে।—

"হঠাৎ নিবেদিতা সব বুঝতে পারেন। শিব! শিব! কোন্ কালীদহ থেকে বিষয়-বাসনার কাল-নাগ ফুঁসে উঠেছে ঈশ্বর-ভক্তদের গ্রস্ত করতে, তা জানলেন। মুমূর্ষু নারীর স্মৃতিতে বিস্মৃত-সন্তান জগদীশকে ফিরিয়ে এনে, তাঁর শয্যাপার্শ্বে কন্যাকে পৌঁছে দিয়ে তিনি নিজে কি পথ খুলে দেননি? ওলিয়ার সঙ্গে তার মায়ের একটা বোঝাপড়া হোক, এ বাসনা তো তাঁর হয়েছিল। আর তাঁর জীবনের সবচেয়ে গর্বভরা উচ্চাশার পরিতৃপ্তি—ধীরামাতার ধর্মপুত্র জগদীশ বসুর কর্মজীবনের সাফল্য ঘটাতে তো তিনি আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়েছিলেন। তাই তো আঘাত নামল।"

নিবেদিতার সমস্ত মন এর পরে ভরে থাকবে প্রস্থানগানে। এই সময় থেকে নিবেদিতার মৃত্যুকালের কিছু পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পত্রধারার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করব। দেখা যাবে, এই কালে তিনি কাজ করেছেন, জগদীশ বসুর বিজ্ঞানের এবং নিজের লেখার কাজ, কিন্তু কোনো কাজেই তাঁর টান নেই, বারবার ফিরে গেছেন নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক ক্ষণটিতে—কাশ্মীরে কাটানো অপূর্ব বৎসরটির ধ্যানে।

নিবেদিতার পত্রে বসু-সংবাদ, সেপ্টেম্বর, ১৯১১ পর্যন্ত

মিসেস ওলি বুলকে লেখা নিবেদিতার কয়েকটি চিঠিতে ডঃ বসুর জন্য ওলি বুলের সাহায্যের একটা রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের এক চিঠিতে নিবেদিতা ওলি বুলকে লিখেছেন—

"তুমি তো জানো, স্কুল যথার্থতঃ তোমারই; আমার লেখাগুলিও তাই; বিজ্ঞানের বইগুলিও তোমারই, এবং ল্যাবরেটরী তোমারই হবে।"

(আত্মপ্রাণাকৃত জীবনী)

এখানে জানানো উচিত, নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রথমাবধি মাসিক দুশো টাকা করে মিসেস বুলের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে, যা নিবেদিতার দেহত্যাগের পরেও অব্যাহত ছিল। মুক্তিপ্রাণা জানিয়েছেন, মিসেস বুলের ভাই মিঃ থর্প পরেও বহু-দিন অবধি বাৎসরিক দুশো পাউণ্ড বিদ্যালয়ে সাহায্য পাঠাতেন, যার দ্বারা, বিদ্যালয়ের ১৯১৯-২২ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিদ্যালয়ের 'অধিকাংশ ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।' নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রকাশিত নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে বিদ্যালয়ের ১৯১৯-২২-এর রিপোর্টের যে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে আছে—"এই ঘটনার (মিসেস বুলের মৃত্যুর) কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সম্পত্তি

হইতে আমরা এককালে যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহাই বিদ্যালয়ের চিরস্থায়ী তহবিলের মূল ভিত্তিস্বরূপ।"

নিবেদিতার লেখাগুলি কেন ওলি বুলের, তার স্পষ্ট কারণ বুঝতে পারছি না। ওলি বুলের টাকায় নিবেদিতার বই ছাপা হয়েছিল (যা ঠিক নয় বলেই মনে হয়) বলেই কি নিবেদিতা একথা বলেছেন, কিংবা ওলি বুল নিবেদিতার জীবনযাত্রার ব্যয়ভার অধিকাংশে বহন করতেন বলেই (যে-কারণটা অধিক গ্রাহ্য) ঐ স্বীকারোক্তি? সম্পূর্ণ উত্তর আমরা দিতে পারব না।

বিজ্ঞানের বইগুলি কেন ওলি বুলের, নিবেদিতা ও ওলি বুলের চিঠি থেকে তার কারণ আগেই জেনেছি। বইগুলি ছাপার টাকা মিসেস বুল দিয়েছিলেন, এবং বইগুলি এভাবে লেখা সম্ভব হয়েছিল ডঃ বসুর সঙ্গে কার্যকালে নিবেদিতার জীবনধারণের ভার ওলি বুল গ্রহণ করেছিলেন বলে। এ-ছাড়া ডঃ বসু ওলি বুলের কাছ থেকে আরও কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য এইকালে পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারব না, পেয়েছিলেন অবশ্যই, এবং সেই সঙ্গে জানি, মিসেস বুলের আতিথ্য উন্মুক্ত ছিল সর্বদা এবং তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয় ছিল সামাজিক প্রতিপত্তি।

নিবেদিতা বলেছেন ডঃ বসুর বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী মিসেস বুলেরই হবে। ১৯০৬ খৃীস্টাব্দে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে দেখেছি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি ডঃ বসুকে ৩,০০০ পাউন্ড দিয়ে যেতে চান। বলা বাহুল্য এই অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে ছিল ওলি বুলের প্রতিশ্রুতি। মনে হয়, তারপরে নিবেদিতা আরও কিছু প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন ডঃ বসুর বিজ্ঞানাগারের জন্য, এখানে সে বিষয়েই বলেছেন। সেই টাকার পরিমাণ কত, ডঃ বসু সে টাকা পেয়েছিলেন কি না আমরা জানি না। ওলি বুলের উইলে সে টাকার বরাদ্দ ছিল। উইলের মামলায় নিবেদিতা জিতেছিলেন বলে নিবেদিতা স্কুল টাকা পেয়েছিল পরে, ডঃ বসু কি পাননি? ঠিক উত্তর জানা নেই; ডঃ বসুর চিঠি থেকে এইটুকু শুধু জেনেছি, তিনি প্রথমে স্থির করেছিলেন, তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন ওলি বুলের মৃত্যুদিনে।

নিবেদিতা তাঁর একটি অসমাপ্ত কাজের বিষয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০, ওলি বুলকে লিখেছেন—বসুর জীবনী তিনি লিখে যেতে পারলেন না। নিবেদিতা লিখেছিলেন—

"আমার জীবনের অপূর্ব ১২ বছর* সমাপ্তির মুখে।......আমার খুবই আশঙ্কা হয় তাঁর (বসুর) জীবনী লেখার জন্য বেঁচে থাকব না। কিন্তু আমি জানি, এই কাজের জন্য তুমি উইলে এস কে আর (এস কে র‍্যাটক্লিফ) বা 'এন'-এর (নেভিনসন) উদ্দেশে ১০০ পাউন্ডের বিশেষ ব্যবস্থা করে যাবে। ও টাকা অবশ্যই লেখকের উপযুক্ত দক্ষিণা হবে না, শুধু সময়ব্যয়ের মূল্যটুকু। জীবনী সহজেই ভারত থেকে ভারতের খরচে প্রকাশ করা যাবে। আমার কাগজপত্র তাদের জন্য থাকবে। তবু আমি যেভাবে তাঁকে দেখেছি, সেভাবে বোধ হয় আর কেউ কোনদিন দেখবে না।

* স্বামীজীর কাছে দীক্ষার পরবর্তী ১২ বৎসর।

বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রতি মুহূর্তের বিরামহীন সংগ্রাম এবং কী সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি ঐ সংগ্রাম করে গেছেন, 'এন' (নেভিনসন) বোধ হয় সবচেয়ে ভাল করে তার বর্ণনা দিতে পারবে।" (এই চিঠি আত্মপ্রাণা ও মুক্তিপ্রাণার উদ্ধৃতি মিলিয়ে উপস্থিত করেছি।)

প্যাট্রিক গেডিস যখন পরবর্তীকালে বসু-জীবনী লেখেন, তখন ধরে নিতে পারি, তিনি নিবেদিতা-সংগৃহীত তথ্যগুলি ব্যবহার করেছিলেন।

নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁর মত করে বসুকে আর কেউ দেখেন নি। সে দেখার রূপ নিবেদিতা শেষ বারের মত ১৯১০, নভেম্বরে জেনোয়া থেকে ডঃ বসুর জন্মদিনে যা লিখে পাঠিয়েছিলেন (পরবর্তী জন্মদিনের আগেই নিবেদিতার দেহান্ত হয়) তাতেই স্পষ্ট। নিবেদিতা যে মহান উদ্দীপ্ত ভাষায় লিখেছিলেন, অনুবাদে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আমরা জানি।—

> "আমাদের পরম প্রিয় তিরিশ তারিখটি—শ্রেষ্ঠ জন্মদিনটি—ঐ দিনেই এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছবে। অনন্ত পুণ্যে পূর্ণ হোক এই দিন; নিত্য প্রসারিত মাধুর্যে ও আশীর্বাদে সম্পূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হোক বারবার এই মহাদিন। বাইরে দেখতে পাচ্ছি ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সুমহান মূর্তি, তার তলায় শুধু লেখা, 'লা পাত্রি', আর ভাবছি, একদিন আসবে যখন এই কথাগুলি তোমার নামের নীচে মৌন-মুখর শব্দরূপে উৎকীর্ণ থাকবে। ঐ বিরাট দুঃসাহসী মানুষটি—এবং তাঁরই মত আরও দুঃসাহসীর দল যাঁরা নিজ দেশবাসীর কল্যাণের জন্য অজানা সমুদ্রে পথ খুঁজেছেন—ওঁদের সকলের সঙ্গে তুমি ইতিমধ্যেই কিভাবে না আত্মিক সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে গেছ!
>
> জয়ী হও—চিরজয়ী! মানুষের সামনে হও আলোক, পদতলে হও প্রদীপ। আর শান্তি, গভীর শান্তি পাও তুমি—তুমি নূতন ভুবনের আবিষ্কর্তা—চেতনাসমুদ্রের হে মহান নাবিক!"

পরবর্তীকালে নিবেদিতার চিঠি থেকে আরও দুটি বসু-সংবাদ উদ্ধৃত করছি। ১৯১১ সালের গ্রীষ্মে নিবেদিতা বসু পরিবারের সঙ্গে আবার মায়াবতী যান। সেখানে তাঁরা একমাস ছিলেন এবং উভয়ে বিজ্ঞানের বই লেখার কাজ করেন। ডঃ বসু আশ্রমবাসীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। "নিবেদিতা আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের কাছে 'মনন সংস্কৃতি'র বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি জোর দিয়ে বলেন, জ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মমূলক ও ধর্মসম্পর্কহীন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সঙ্গত হবে না।" ধর্মজীবনের ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাঁর এই কথা শুনে কোনো কোনো তরুণ বয়স্ক ধর্মব্রতী আপত্তি করে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তো নিরক্ষর ছিলেন! নিবেদিতা এতে বিশেষ বিরক্ত হন। মায়াবতী থেকে ১৯ মে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—

> "গতকাল আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ভাষণ দিতে হয়েছিল। ধর্ম-পথবর্তীদের পক্ষে সর্বোচ্চ জ্ঞানসাধনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছিলাম:

তাতে তরুণদের কেউ কেউ ভড়ং করে বলল—শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত ছিলেন না। পরে খোকা বলল, ওকথা শুনে সে এতই রেগে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে আত্ম-সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওরা কি উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, গঙ্গার ধারে দিনের পর দিন বসে এক হাতে মাটি, অন্য হাতে টাকা নিয়ে এ-হাত ও-হাত বদল করা এবং পরিশেষে দুটোকেই সমমূল্য জ্ঞান করে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার অর্থ কি? ওই নির্বোধেরা কি অনুভব করতে পারে না, এর জন্য কতখানি মনঃশক্তির প্রয়োজন? ওরা কি মনে করে যে, ' তা গণিত,, গ্রীক, পদার্থতত্ত্ব বা ধর্ম—যাতেই প্রকাশিত হোক কোনো পার্থক্য হয়? ওরা কি দেখতে পায় না জ্ঞানের অভেদবোধই শিক্ষার মূল কথা?"

৪ জুলাই, ম্যাকলাউডকে—"জেনে খুশী হবে যে, মায়াবতীতে বসে বিজ্ঞানের মানুষটির নতুন বইয়ের ১২টি অধ্যায় শেষ করা গেছে—তার সমস্ত লেখার মধ্যে এ পর্যন্ত যা কঠিনতম। সুতরাং আমি অলস হয়ে নেই, যদিও বুঝতে পারছি না, আমার লেখা পূর্বের মত বীরোচিত হচ্ছে কি না! হোক, তাই চাই।"

২৪ অগস্ট, ডঃ চেনীকে—"গত রবিবার অধ্যাপক বসু ও শ্রীমতী বসুর সঙ্গে ছোট নৌকাটি করে গঙ্গার উপরে সারাদিন কাটিয়েছি। নৌকা ভেসে চলল—মন্দির পেরিয়ে, কত ঘাট পেরিয়ে—কতদূর!-আপনার চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম—সবাই পড়লাম আর আপনার বিষয়ে কথা বললাম। রবিবারের অপরাহ্ণগুলিতে, অপরূপ গঙ্গার উপরে আমাদের যাত্রার কথা যদি কখনো স্মরণ করেন, জানবেন, তখন আপনি আমাদের মনে জাগরূক ছিলেন।"

১৩ সেপ্টেম্বর, মৃত্যুর প্রায় এক মাস আগে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে যা লেখেন, তার মধ্যে ডঃ বসুর বিষয়ে তাঁর শেষ বক্তব্য পাই—

"শেষ চিঠিতে খোকার সম্বন্ধে যা বলেছ, কী প্রাণোত্তপ্ত সত্য কথাগুলি! তুমি বলেছ তুমি বসুর জন্য গর্বিত, কারণ বিজ্ঞানে অপারদর্শী ভারত তাতে পারদর্শী হয়েছে। আমার ধারণা, স্বামীজী ঠিক এই কথাই ভাবতেন; মনে হয়, তিনি তাকে এত ভালবাসতেন যা আমরা ভাবতেও পারি না। আমি নিজে সর্বদা অনুভব করেছি, ভারতের মহিমার বিষয়ে কখনো সন্দেহ করা যাবে না যদি আধুনিককালে ভারতের বিপাকের অবস্থার কথা ভাবার পরে চিন্তা করে দেখি—তা সত্ত্বেও ধর্মে ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর জন্য ভারতবর্ষ কতখানি দিয়েছে। ডঃ বসুর কাজের মূল্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ভারতে আরও যেসব মহান ব্যক্তি আছেন ভারতের সেবার দ্বারাই তাঁরা মহান; সীমাবদ্ধ এক গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁরা কাজ করেন। কিন্তু ধর্মে বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞানে বসু পৃথিবীর জন্য দান রেখেছেন।"

উইলের মামলায় আরও কথা

মিসেস বুলের উইলের মামলায় নিজ স্বত্বরক্ষার জন্য নিবেদিতা আইনগত চেষ্টা ত্যাগ করেননি কারণ ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রামের ক্ষমতা তাঁর ভগ্ন শ্রান্ত

মনে তখনো অবশিষ্ট ছিল। এই মামলা তাঁর নৈতিক মহত্ত্বের উপর প্রচণ্ড আঘাত, আবার তাঁর চরিত্রের বিজয়ক্ষেত্রও বটে। ২৯ মার্চ তারিখে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে অপরাজেয় মনঃশক্তির প্রকাশ—

"সে যাই হোক, আমি ঠিক করেছি, যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আমাকে যেতে হবে, তার মুখোমুখি হব সাহসের সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে।......মিঃ থর্পকে লিখেছি, যেখানে দরকার সেখানে আশার্কার আমার পক্ষে তোমাকে কাজ করতে দেবে। মনে হয়, আমার মনোভাব মামলায় অসুবিধা ঘটাবে। আমি মিঃ পার্কারকে লিখেছি, তিনি যেন বিশেষ বিশেষ সময়ে সেণ্ট সারার সঙ্গে আমার কতকগুলি গোপনীয় বৈষয়িক আলোচনা হয়েছিল, সেগুলির স্বত্বরক্ষা করেন। তার বাইরে আমার কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা অবশ্যই নিরানন্দকর হবে, কিন্তু সহ্য করতেই হবে— সহ্য করা যাবে। এ পথ স্বামীজীই দেখিয়েছেন। বিচিত্র বিষয় লক্ষ্য করছি আমি; খৃষ্টের বিচারের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে যে, যখন সমস্ত পৃথিবী তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় তুলেছে, তখন যথার্থতঃ তিনিই পৃথিবীর বিচার করেছিলেন! সুতরাং দৃঢ় হও। এখানেই অবতারের দেওয়া শক্তি। তাঁর (খৃষ্টের এবং স্বামীজীর) কোনো একটি সহজ আচরণ বুঝবার জন্য সমস্ত জীবনের—জীবনের সুগভীর যন্ত্রণার—প্রয়োজন হয়। এসব কথার উল্লেখ আর করার দরকার হবে না ভবিষ্যতে, এবং আমি আর কিছু জানতেও চাই না, যদিও আমি সম্মুখীন হতে পারব, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। শিব! শিব!"

ওলিয়ার বীভৎস নৃশংস আচরণ তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজনকে কম পীড়িত করেনি। তাঁর নিজের মামা মিঃ থর্প নিবেদিতার পক্ষে মামলার তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মিঃ থর্পের সঙ্গে পরে যিনি বিবাহিত হন, কবি লংফেলোর কন্যা মিস লংফেলো, স্নিগ্ধ সান্ত্বনাভরা চিঠি লিখেছেন নিবেদিতাকে। অপরপক্ষে, নিবেদিতার অসীম মানসিক শক্তি—তিনি ওলি বুলের উপর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়, (তার অনুবাদ আগেই দিয়েছি), যার মধ্যে ওলি বুলের পরবর্তী বিকারের কথা নেই, আছে শ্রেষ্ঠ শক্তি ও ঔদার্যমহিমার কথা। সে লেখা ওলি বুলের পরিবারের মানুষদের খুশী করেছিল। নিবেদিতা বৃহত্তর আকারে মিসেস বুলের জীবনচিত্র রচনার কথাও ভেবেছেন।*

নিবেদিতা বলেছিলেন, তিনি সহ্য করতে পারবেন। বাইরে হয়ত পেরেছিলেন, কিন্তু ভিতরে একেবারে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। মিস ম্যাকলাউড তাঁকে সংবাদপত্রে

---

* ১৬ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মিস লংফেলোর রচনাটুকুর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।...মিঃ থর্প মডার্ন রিভিউতে সারার উপর আমার প্রবন্ধ পড়ে প্রশংসা করে চিঠি পাঠিয়েছেন, গত কাল সেটি পেয়ে খুবই খুশী। তাঁরা যে সন্তুষ্ট, এতে আমার আনন্দের অবধি নেই। এখন কেবল আশা করি, তাঁরা পৃথিবী-বিখ্যাত কোনো পত্রিকার বড়ো আকারে এবিষয়ে রচনার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনায় সহযোগিতা করবেন। সেটি লিখবার আগে তাঁদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে আছি, কারণ প্রথমতঃ কাজটা কঠিন, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যদি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তাহলে বৃথা প্রভূত সময়ব্যয়। তবে যদি মিস লংফেলো সহযোগিতা করেন, কাজটা করে ফেলা যায়।"

৭ সেপ্টেম্বর মিসেস উইলসনকে লেখেন—"আমি সব দিকে চিঠিপত্র লিখছি, যাতে মিঃ থর্প সারার জীবনী বার করার প্রয়োজনীয়তা দেখতে পান। শিব! শিব!"

প্রকাশিত মামলার বিবরণ পাঠাতেন। সে কাগজগুলি অঙ্গারের মত তাঁকে দগ্ধ করত। শেষে সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে ম্যাকলাউডকে নিষেধ করেন। নিবেদিতার বোন অভিযোগ করে বলেছেন, ট্যাণ্টিনের এই অবিবেচনার কাজই নিবেদিতাকে মেরে ফেলেছিল, যার জন্য ম্যাকলাউড পরে অনুতপ্ত হন।

৪ জুলাই নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লেখেন—

"সব সময়ে শরীর বিশেষ ভাল থাকে না। কাগজের টুকরোগুলো (মামলার বিবরণ যাতে আছে) ভয়াবহ মুহূর্ত এনে দেয়।......অন্য কারো চিঠি আমাকে পাঠিও না। প্রতিটি উল্লেখ যন্ত্রণা বাড়ায়।"*

---

* কেবল তাঁর নিজের নাম লাঞ্ছিত হয়েছিল বলেই নয়, নিবেদিতার গুরুর নাম ও শিক্ষাকেও টেনে আনা হয়েছিল মামলায়। নিবেদিতার পক্ষে অসম্ভব সে যন্ত্রণা। ওলি বুলের প্রাচ্য ধর্মানুরক্তির মূলে বিবেকানন্দের প্রভাব, সুতরাং মিসেস বুল শেষ বয়সে যে বিচিত্র ভৌতিক চেতনায় আচ্ছন্ন থাকতেন, তার মূলেও তাহলে এই বিবেকানন্দের শিক্ষা রয়েছে। নিয়তির লীলা একেই বলে, গুপ্ত রহস্যবাদের জাতশত্রু বিবেকানন্দ মৃত্যুর পরে অভিযুক্ত হলেন বিকৃত রহস্যবাদের প্রচারক বলে। এই জঘন্য মিথ্যার প্রতিবাদে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তৎকালীন আমেরিকার সুবিখ্যাত কবি ও লেখিকা এলা হুইলার উইলকক্স আছেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে রক্ষিত নিউইয়র্ক ইভনিং জার্নালের মে ২৭, ১৯১১-র কর্তিত অংশে এবিষয়ে সংবাদ দেখেছি।

সংবাদটি এইরূপ—

VEDANTA PHILOSOPHY DEFENDED BY
ELLA WHEELER WILCOX

"The sensational statements made in the will contest case of Mrs. Ole Bull regarding the teachings of *Vedanta* are most misleading and unjust to that great philosophy. It was my privilege to be a pupil of Swami Vivekananda during his two Winters in New York.

This I regard as the greatest intellectual and spiritual opportunity of my life. Neither in the lectures of Vivekananda, his books or the Vedanta philosophy are to be found any of the "wierd", "uncanny" or unwholesome teachings related by the witnesses as a part of Mrs. Bull's "lessons." The breathing exercises, inhaling, retention of the breath and exhaling, using a word which means Gall, *are* a part of Vedanta teaching.

The very first physical act of a new born child is to breathe a long breath. After a few years children, especially in our Western world, cease to breathe deep breaths, because they wear restricting garments, and live indoors, and sit and stand with indrawn chest. In the Orient the morning devotions are begun with breathing exercises. Therefore, tuberculosis and catarrhal troubles are the least prevalent of all maladies in India. Vivekananda repeatedly warned his pupils against excesses in these exercises. Properly practised, they produce physical, mental and spiritual strength. Overdone, they produce disaster. Precisely as the right use of the X and violet rays cure disease, and the wrong use kill, or as a tonic may stimulate digestion and too much tonic may induce indigestion.

নিবেদিতার পত্রে তাঁর শেষ দিনগুলির কথা :

স্বামীজীর অনুধ্যান এবং বসু-সংবাদ

নিবেদিতার শেষ কয়েক মাসের চিঠিগুলি পড়লেই বোঝা যায়, জীবনের প্রতি আসক্তি তাঁর চলে গেছে। সমস্ত মনপ্রাণ গুরুর ভাবে ভরপুর। তাঁর বন্ধন ছেদনের উপযুক্ত পরিবেশও তৈরী হয়েছিল। অনেকগুলি প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেছিল ক্রমান্বয়ে। ১৯০৯ জানুয়ারীতে নিজের মা, ১৯১০ জানুয়ারীতে মিসেস বুল, ফেব্রুয়ারীতে স্বামী সদানন্দ, জুলাইয়ে স্বামীজী-জননী ভুবনেশ্বরী দেবী, অগাস্টে

In all religions, sciences, arts and professions there are too many teachers illy prepared for their work.

Vivekananda was a master. He urged the most careful preparation and years of study and self-development before his pupils attempted to be teachers. Despite his warnings, many of them rushed into the field to impart informations which they had not yet received.

The Vedanta philosophy teaches the full development of body, mind and soul, and methods of concentration, and the realisation that *all life is one.* Christ studied this philosophy in the Orient, and it was a part of "Vedanta" when He said, "I and my Father are one."

There are many foolish women who study Vedanta and think they must cease to be human—who strive to be disembodied spirits—while still in the earthy form.

But, properly understood, this religion teaches each human being to make the *best of life* in the position to which he or she is called. The best wife, husband, parent, friend and citizen, and to perform every duty cheerfully and perfectly, and to be happy in this life while conscious that it is only one plane of many—one room in the Father's mansion.

If Mrs. Bull feared demons and rubbed her furniture with oil to drive away uncanny influences, she did not learn these things from Vedanta philosophy. For that teaches, above all things, that each soul makes its own destiny and contains all divine powers within itself, and that through realisation of the *one life* we may all become Christ, "One with the Father."

Absolute fearlessness, absolute unselfishness, absolute kindness to all living things must result from a proper understanding of the real Vedanta philosophy. It is profound as the ocean depths; all other religions, all other philosophies, all the sciences are contained in it; and, while it has its codes and rules for those who wish to become adepts and masters, it has also its simple wholesome and helpful line of training for the man and woman who want to make happy homes and successful toilers. It teaches self-reliance, self-conquest and self-development, and these must be the [......] of immortality."

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—মৃত্যুপ্রবাহ! নিবেদিতা অনুভব করতে থাকেন, স্বামীজী তাঁর স্বজনদের ক্রমে সরিয়ে নিচ্ছেন। নিবেদিতাও স্বয়ং চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। এইকালে নিবেদিতার নানা চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। শুরু হবে মিসেস বুলের মৃত্যুর পরে নিবেদিতার ভারতযাত্রা থেকে—

২৪ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"তোমার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত কতই প্রাণোত্তপ্ত আর সুন্দর। তোমার সঙ্গছাড়া হবার পরেই 'বেলুড় ও কাশ্মীরের' চকিত আলোক-ঝলক পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম— যা ছিল আমাদের।......

শিব! শিব! প্রাচ্যের সুমহান পথে আরও এক পা এগোলাম, অনন্ত আনন্দ আমার। কিন্তু তোমার জন্য বুকে মোচড় লাগবে—হয়ত তুমি নিজের দিকে নজর দেবে না মোটে—ফলে হারিয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে! না না না—বাঁচো বাঁচো বাঁচো—তোমার জীবন মানে আমাদের সুখ—যতই বাঁচো তার পরিমাণ কম হবে না এতটুকু।......

(তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে) আমি একাকী, তার জন্য ভেঙে পড়ে কাঁদতে পারি। তোমাতে আছে শক্তি। আমার ভালবাসা দিও—সবকিছুতে, সকলকে, বিশেষ করে র‍্যাটক্লিফদের, আর যদি চাও মে-কে। আমি চাই শুধু বিশ্বাস করতে—শুধু বিশ্বাস করতে। আর নীরব হতে। কোনো গুহায় মাত্র ২০ বছরের নিঃসঙ্গবাস এইসব আসক্তির ইন্দ্রিয়জ ছাপগুলি একেবারে মুছে দিয়ে সত্যকার অনুভূতি দিতে পারে এবং যথার্থ আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে—একি সত্য নয়? কিন্তু সেক্ষেত্রেও ও-জিনিস ঘটবে না যদি-না ঐ নির্জন-জীবনের সমস্ত সময়ে ব্রহ্মে নিমজ্জিত থাকা যায়। সেই অনন্ত উপলব্ধির মধ্যে মানুষ চির আনন্দে পূর্ণ থাকে।

'ক্রাইস্ট দি মেসেনজার' পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম, তুমি কিভাবে কোন্ আলোকে তাঁকে দেখেছ! হাঁ, নিশ্চয়, তোমার আধ্যাত্মিক বোধ সত্যই প্রত্যক্ষ।

২৭ মার্চ, ম্যাকলাউডকে—"আজ যখন জাহাজের ডেকে বেরিয়ে এলাম তখন ক্রীট থেকে ৪-৫ মাইল তফাতে মাত্র! ক্রীট, তার সুদীর্ঘ তুষার-গিরিমালা নিয়ে—অপরূপ!"

[স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৯ সালে পাশ্চাত্য যাত্রাকালে ক্রীট দ্বীপ দেখার স্মৃতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।]

৭ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"বোম্বাই বন্দরে ঊষার উদয়। রাত্রির আঁধারে আচ্ছন্ন দ্বীপখানি যেন উত্থিত হল জলতল থেকে।...ভারত—ভারত—অবশেষে!"

১২ এপ্রিল, ম্যাকলাউডকে—"রবিবারে পৌঁছেছি। ফেরার কী আনন্দ। আজ রাত্রে বিজ্ঞানের মানুষটি ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন এক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য। কিন্তু তিনি আজ অসুস্থ, আমরা ভয় পাচ্ছি। তবু আবার কাজ শুরু হওয়ার আনন্দ অপরূপ। কী শিথিল মুষ্টিতেই মানুষের আনন্দ ধরা থাকে, আর সুখের মধ্যে ঢাকা থাকে কতখানি দুঃখ!

মাতাঠাকুরাণী গতকাল কলকাতায় পৌঁছেছেন দীর্ঘ তীর্থযাত্রা সেরে। আমি এখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। তার ফলে একটু যে শান্তি পেলেন, তার জন্য মনে হয় তিনি কৃতজ্ঞ হবেন।

বিজ্ঞানের মানুষটি বলছেন, পরাজয়ের জন্য আমাদের নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে। সুতরাং আমরা ৬ মাসের জন্য স্কুল বন্ধ করে দিচ্ছি, এবং খরচ একদম কমিয়ে আনছি। ক্রিস্টিনের স্থান পরিবর্তন দরকার। সে মায়াবতীতে গ্ল্যানীর (মিসেস সেভিয়ার) সঙ্গে ৬ মাস কাটাবে।"

১৬ মে, ম্যাকলাউডকে—"নৈনিতাল থেকে আলমোড়া যাওয়ার পথে ১৮৯৮ সালে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য মসুয়ানালায় তুমি যে বিশেষ ঘরটিতে ছিলে, তাতে এখন আছি, সে আনন্দ বুঝতে পারো? স্বামীজী এখানেই আমাকে আমার জীবনের প্রথম তুষারশৃঙ্গ দেখান। শিব! শিব!

য়ুম, য়ুম গো! আমি অনুভব করছি কত বেশী, আর আমার বলার কথা কত অল্প! আজ বোধহয় বসুদের বাড়িতে নূতন ঘরের প্রথম ইঁট গাঁথা হল। আজ মায়েরও জন্মদিন। প্রার্থনা করি এই দিনে, দিনটি পবিত্র। ডার্লিং, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। ঐটুকুই তো চাইতে পারি শুধু!"

১৬ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে—"পরিবর্তিত অবস্থায় অবশ্যই আমার উইল পুনর্লিখন করতে হবে, যেহেতু তুলনায় অল্প রেখে যেতে পারব। কিন্তু এখনো মনে করি, কাজের যেন নতুন পর্ব আরম্ভ হবে।

হঠাৎ খেয়ালে আলেকজান্ডার গতকাল মায়াবতীতে চলে গেছে। মনে হয়, সে ও ক্রিস্টিন ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই ভাবিত, যদিও বুঝতে পারি না ক্রিস্টিনের অত চিন্তার কারণ কি? কিন্তু কেউ অপরের জন্য কিছু নির্ধারণ করতে পারে না—পারে কি?

ওগো য়ুম, মরতে পারলে বেঁচে যেতুম। বহুদিক থেকেই জীবনকে এত ব্যর্থ মনে হচ্ছে। নারী-শিক্ষার জন্য আমি যে, সত্যই উপযুক্ত (?), তা যেন অনুভব করতে পারছি না।...সবকিছুই মনে হয় ভাল চলবে যদি আমাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়!

একটি কি দুটি বই মাত্র লেখা বাকি আছে, যেগুলো সত্যই আমার লেখা উচিত। তাদের মধ্যে, খোকার জীবনী অনেক ভাল করে লিখতে পারবে র‍্যাটক্লিফ। বাকি থাকবে ইতিহাস, কয়েকটি নিরীক্ষা গ্রন্থ এবং শিক্ষার বই। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে এখনো আমার কিছু বলার আছে। সেইসঙ্গে খোকাকে বিজ্ঞানের আর একটি পর্বে এগিয়ে দেওয়ার সাহায্য। তারপরে সকলেরই সুন্দর সমাপ্তি! তাই হোক, তাই চাই। যাদের ভালবাসি এমন কারোর চেয়ে বেশীদিন বাঁচাকে আমি ডরাই। অবশ্য সবই অন্য রকম মনে হবে যদি ১৮৯৮ সালের স্বর্ণোজ্জ্বল আশা-স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু তাকে সার্থক করাও তো প্রায় অসম্ভব। ও সুযোগ তো অন্যে পাবে না। তাদের জন্য আর কত লিখব! কত বলব!"

৩১ অগস্ট, ম্যাকলাউডকে—"ক্রিস্টিন স্থির করেছে, সে ব্রাহ্ম স্কুলে এক বছরের জন্য শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষাদানের কাজে যোগদান করবে, সেইসঙ্গে ছোট স্কুলের প্রধানও হবে। এইভাবে সে অর্থোপার্জন করতে পারবে, কিন্তু সেই কারণেই সে যায়নি, আরও পঞ্চাশটা কারণ রয়েছে। তার সিদ্ধান্তে আমি খুশী। এর দ্বারা মনে হয় সে মনের প্রসার, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা লাভ করবে, যা তার পাওয়া

খুবই দরকার। এখানেই তার বাসস্থান থাকবে; আমার বিশ্বাস আমরা একসঙ্গে শনি-রবিবার ও ছুটিগুলি কাটাব। অভিজ্ঞতালাভের পরে সে 'ব্যক্তিত্ব' হয়ে উঠবে, সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের কাজগুলিকে চালাবার পক্ষে যোগ্যতা অর্জন করবে।"

১১ সেপ্টেম্বর, মিসেস লেগেটকে—[স্বামীজীর সমাধিমন্দির ও পাথরের রিলিফ মূর্তি নির্মাণের ব্যয়ভার সম্ভবতঃ মিসেস লেগেট বহন করতে আগ্রহী হন। তদনুযায়ী জয়পুরে জনৈক প্রস্তরশিল্পীর সঙ্গে গণেন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করেন। এসবের টাকার হিসাব ও ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে নিবেদিতা অনেকগুলি চিঠিতে মিসেস লেগেটকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই কাজটিকে স্বভাবতঃই মহা কর্তব্যকর্ম বলে নিবেদিতা নিয়েছিলেন। এই চিঠিতে কিভাবে মূর্তি নির্মিত হচ্ছে তার বিবরণ দেওয়ার পরে নিবেদিতা লিখেছেন—]

"এহেন উদ্দেশ্যে টাকা খরচ অপূর্ব ব্যাপার। এমন জিনিসের জন্য তো মানুষ তপস্যা করে!

তোমাকে মধ্যযুগীয় ভাব-পরিবেশ খানিক বর্ণনা করি। ভাস্কর প্রস্তর-নিহিত স্বামীজীর ভাবমূর্তির প্রতি আহুতি দান করলেন : "হে স্বামীজী! আমার হাতে আপনি আবির্ভূত হউন সুচারুরূপে।" সকাল ৮টা থেকে রাত ৯।।টা পর্যন্ত তিনি কাজ করেন, কাজের মধ্যেই খেয়ে নেন। আমাকে বলে পাঠিয়েছেন—যদি কাজ সন্তোষজনক না হয়, এক পয়সাও তিনি নেবেন না, টাকা ফেরত দেবেন।

আমি অবশ্য ভয়েই আছি। কারণটা তুমি বুঝবে। ডাঃ বসু সূচনাকালে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন, জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন এই কাজ। সত্যই তাই, যদি ভাল দাঁড়ায়!"

১১ সেপ্টেম্বর, মিস ল্যংফেলোকে—[মিস ল্যংফেলোর উল্লেখ আগে করেছি। ওলি বুলের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এই মহিলা নিবেদিতার প্রতি ওলিয়ার অনুচিত ব্যবহারে খুবই মর্মপীড়িত হন। তাঁর স্নিগ্ধ সান্ত্বনাপূর্ণ কয়েকটি চিঠি এইকালে নিবেদিতার অন্তর্জ্বালার অনেকখানি উপশম করে। ১৬ অগস্টে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা মিস ল্যংফেলোর পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ৭ সেপ্টেম্বর বোন মে-কে নিবেদিতা মিস ল্যংফেলোর চিঠির উল্লেখ করে বলেছেন—'সত্যই তিনি যথার্থ অনুরাগী বিশ্বস্ত বন্ধু।' এঁর সঙ্গে নিবেদিতার হৃদয়ের যোগ কতখানি গভীর হয়েছিল তা বোঝা যায় ৫ সেপ্টেম্বরের সুদীর্ঘ পত্রখানি থেকে। চিঠিটির ছত্রে ছত্রে বিদায়ের সুর।—]

"অব্যাহত কাজের শান্তিময় অপরূপ এই দিনটিতে মধুরতম প্রহর হল সেটি যখন তোমার চিঠি পেলাম, ব্রেকন ওয়েলস্ থেকে যেটি পাঠিয়েছ ১৪ অগস্টে। এখন ঠিক সন্ধ্যাদীপের কাল ,প্রদীপখানি জ্বালিয়ে আমার কাছে আনা হয়েছে এই মুহূর্তে, আর সন্ধ্যারতির শাঁখ ঘণ্টা ঘড়ি বাজতে শুরু হয়েছে চারিদিকে। এখন পূজ্য মানুষ, পূজ্য জিনিসের সামনে লুটিয়ে প্রণাম করার সময়। আহা, গত ১৩ বছরের কত না মধুস্মৃতি ঘনিয়ে আসছে মনে। কত না অপরূপ গভীর পূর্ণ তরঙ্গ ডুবিয়ে দেয় আত্মাকে গোধূলির কালে। স্বামীজী সব সময়ে জোর দিয়ে

বলতেন—'জীবন এবং মৃত্যুর পারে;' কদাপি শুধু জীবনের বা শুধু মৃত্যুর পারে বলে তৃপ্ত হতেন না। সে কথা এইসব দিনে উপলব্ধি করার বড়ই প্রয়োজন কারণ মৃত্যু কতজন—হায় কত প্রিয় পরিচিতকে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের ছোট বাড়িটি যেভাবে সৌন্দর্যের প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে যাচ্ছে—কখনো কখনো বড় ভয় পেয়ে যাই!

আমাদের বাড়িতে এক বছর আগে চারধারে ফুলের বেড় দিয়ে ঘেরা চৌকো লন তৈরী করা গেছে।

বাগান আমাদের নিজেদের সদর দরজার সামনে; চারদিক দেওয়ালে ঘেরা, যার জন্য আমাদের হিন্দু বালিকারা বিকেল চারটের সময় শাড়ি পরে সেখানে ব্যাডমিণ্টন খেলতে পারে।

ঘাস বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, গাছগুলি ভালভাবে ধরে গেছে। গত জুন মাসের শেষ থেকে আমি একলা আছি। আর আছে ঝি-চাকর। ফলে কাজের সুযোগ ও শান্তি অনবদ্য। তবে প্রিয় মিস টমসন যেমন বলেছেন, আমি মোটেই শরীরে সেরকম দৃঢ় হয়ে উঠিনি—আমি আতঙ্কে প্রায় মৃতপ্রায়—যার সম্মুখীন হয়েছিলাম—ওঃ কী ভয়ংকর কাহিনীকে অভিনীত হতে দেখলাম! তার মধ্যে ভয়ঙ্করতম হল—তমসাচ্ছন্ন আত্মা—স্বেচ্ছায় তমোময়—অসীম শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত। ত্রাণ পেয়েছি? হাঁ! আমরা সবাই যেভাবেই হোক সমস্ত সময়টিতে ত্রাণ পেয়েছি। কিন্তু একই সঙ্গে, সে আত্মা মুক্ত, এই পৃথিবীতেই, হায় জানত না তা! এই মৃত্যুর জন্য গভীর গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। যদি তিনি বাঁচতেন তাহলে অবশ্যই তিনি যাতনা পেতেন—দারুণ যাতনা—কিন্তু সেই যন্ত্রণার পথেই উপলব্ধি আসত। পাপীর শান্তিতে অধিকার আছে, একথা কত না সত্য—প্রায়শ্চিত্তের জ্বলন্ত শুদ্ধি-যাতনা। প্রিয় সেণ্ট সারার জীবনের শেষ সপ্তাহগুলিতে মাত্র প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম, কিভাবে তিনি ওলিয়ার চেয়েও—যার বিষয়ে আমরা সকলেই জানি—গভীরভাবে সারাজীবন ধরে কেবলই নিজেকে মাতৃরূপে অনুভব করার জন্য সন্ধান করে গেছেন। শেষ সন্ধ্যায়—তা যে শেষ সন্ধ্যা তা প্রায় বুঝতেই পারিনি—তাঁর বিছানার পাশে উঁচু চেয়ারটিতে বসেছিলাম—আমি তখন প্রবলভাবে একটি প্রার্থনার বিষয়েই সচেতন হয়েছিলাম—তাঁকে যেন মাতৃভাবে নিজেকে অনুভব করতে দেওয়া হয়! আর পরদিন প্রত্যুষে আত্মা উড়ে গেল! প্রিয় মিস লংফেলো, বলো, তাঁর মাতৃত্বের সেই উপলব্ধি কি ওলিয়াকে ত্যাগ করা ঘটতে পারে? সে তো পরম মুক্ত ভালবাসার উপলব্ধি! এমন অসাধারণ ঘটনায় কোন্ আত্মা জাগ্রত না হবে? আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, সুযোগ যেন তিনি পান, এখন বা ভবিষ্যতে, যেভাবে তিনি বেঁধে রাখতেন ও সাহায্য করতেন, তার পরিবর্তে নিজের অনন্ত ভালবাসাকে উপলব্ধি করে, যারা তাঁকে দুঃখ দিয়েছে তাদের ক্ষমা ক'রে তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিরাট মহিমায়, যাকে অগ্রাহ্য করতে কেউ পারবে না।

এইসব কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, এই দেহ কী না বন্ধন, কী না অন্ধকার! কি ভাবে তা আমাদের অন্ধ করে রাখে, জড়িয়ে রাখে শিকলে! আমাদের সত্য স্বরূপকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। কী সত্য একথা! যে-পর্যন্ত না আমরা বিরাট আত্মাদের নিকতনে উপস্থিত হতে পারি, তার পূর্বে ওকথা অনু-

ভবই করতে পারি না, নিজেদের হৃদয়ের রহস্যের গভীরেই নামতে পারি না! নিষ্ঠুর সত্য নরকি কথাগুলি, অথচ কী সহজ সাধারণ সত্য!

এক প্রাচীন আইরিশ বীরকাহিনীর এক বীর বলেছে: 'শুধু বাঁচায় কি অর্থ? সে কাজটা তো আমাদের হয়ে আমাদের ভৃত্যরাও করতে পারে। অনন্ত ছাড়া লাভ করবার শ্রেয় বস্তু আর কি আছে? আর মৃতরাই শুধু তা পায়।' কিন্তু আমার মনে হয় না সকল মৃত তাকে পায়। তা যদি পেত তাহলে সকল জীবিতও তাকে অনুভব করে না কেন? নিখিল সত্য একটিই আছে, যাকে আমরা—জীবিত বা মৃত যে নামেই হোক না কেন, যে স্থানেই হোক না কেন—উপলব্ধি করতে চাই।

'জ্ঞানযোগ' নামে স্বামীজীর একটি অপূর্ব বই আছে; সেটির উপর কাজ করছি। কিছুদিনের মধ্যে সেটি প্রকাশিত হবে উৎকৃষ্টতর ইংরেজিতে। লংফেলো-ভবনে থাকার সময়েও সেটির সম্পাদনা করেছি।

প্রিয় মিস লংফেলো, এই গ্রীষ্মে তোমার স্থির, দৃঢ় সহৃদয়তায় পূর্ণ যে দুটি-তিনটি চিঠি পেয়েছি, সেগুলি যে কতখানি শক্তি ও সান্ত্বনা আমাদের দিয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না। ঠিকই বলেছ তুমি, বাঘেরাই সবচেয়ে মন্দ সঙ্গী নয়। আর 'ট্রানস্‌ক্রিপ্টে' তুমি যে ছোট বিবৃতিটুকু পাঠিয়েছ, তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর কৃতজ্ঞ। এ ধরনের লেখার মধ্যে এর চেয়ে নিখুঁত আর কিছু আমি দেখিনি, এত নৈর্ব্যক্তিক অথচ আস্থাপূর্ণ। প্রিয় সেন্ট সারার জন্য এ ধরনের কাজ করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমি একটা বই করার পরিকল্পনা পর্যন্ত করে ফেলেছি, কিন্তু প্রবন্ধই শ্রেষ্ঠ হবে মনে হয়।...কিন্তু যদি বই হয়, ওলিয়া সম্বন্ধে নিষ্ঠুর নগ্ন সত্য তাতে থাকবেই।

নানা দিক থেকে (মিসেস বুলের) জীবনটির বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমতঃ তিনি তাঁর অর্থকে অপরের সাহায্যার্থে নিয়োগ করে নিজের বৃহৎ শোকের প্রকাশ-মাধ্যম করে তুলেছিলেন, যার ফলে বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল এবং নিজেকে তার দৃঢ় কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। তারপর প্রাচ্য চিন্তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তাছাড়া কতকগুলি ব্যক্তিগত আদর্শকে বাস্তবায়িত করাও রয়েছে। কোনো কিছুকেই বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন না করে পারতেন না।

আমরা বিজ্ঞানের একটি নতুন বইয়ের উপরে কাজ করছি; আমাদের হাত দিয়ে পৃথিবীকে নাড়া দেবার মত সমুচ্চ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক অধ্যায়গুলি ক্রমেই বেরুচ্ছে। তাছাড়া হ্যারাপের (প্রকাশক) জন্য 'মিথস্‌ অ্যান্ড লিজেন্ডস্‌' বইয়ের এক তৃতীয়াংশ লিখে ফেলেছি। আর স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা একেবারে আগেকার মত কমিয়ে ১২-১৬ জনে দাঁড় করানো হয়েছে, কিন্তু উপযোগিতায় বিশেষ কমেনি তা; ছাত্রীরা সকলেই বিবাহিত মহিলা বা বিধবা, তাই কম গোলমাল করলেও এঁদের শেখাতে অনেক বেশী শক্তি লাগে, যা ১০০ জন বালিকার গোটা স্কুল চালাতে লাগত না। মিসেস বনির (?) ওখানে শিক্ষাপদ্ধতির উপরে সপ্তাহে দু'দিন বক্তৃতা করছি। সুতরাং সময় নষ্ট হচ্ছে বলা যাবে না। এখন 'মিথস্‌ অ্যান্ড লিজেন্ডস্‌' ঘাড় থেকে নামাতে বিশেষ উৎসুক। তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের উপরে বইটির কাজে ফিরে যেতে পারব; সেইসঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির উপরে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বইটি লিখে

ফেলব। যদি এইসব কাজ সমাধা করতে পারি তাহলে শান্তিতে মরতে পারব, আর সেইজন্যই মনে হয়—সেকাজ হয়ে উঠবে না এখনি।

শরৎ এখনো আছে—তুমি সত্যিই ভারতে আসবে, কত না আশা করি। তুমি এসো, যদি পারো। মিসেস লেগেট, জর্জ এবং অ্যালবার্টা এই শীতে আসার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু এখন তা বাতিল। তাতে খুবই দুঃখিত। আমাদের নারী-নিবাসের বাগানটিকে শুধু নিজের ব্যবহারে রক্ষা করা বিরাট স্বার্থপরতা। এখন প্রিয় মিস লংফেলো—শুভরাত্রি—পুনশ্চ শুভরাত্রি।......

স্বামীজী হয়ত বলতেন, জীবনের যদি নির্দিষ্ট মান না থাকে তাহলে ব্যবহারগত মানও থাকে না। কঠোর আত্মশাসনের দ্বারা এইসব আচরণ-মান নিয়ন্ত্রিত হলেই জীবন থেকে সরে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং সর্ববস্তুতে বিরাজিত অভেদ-সত্যকে অনুভব করার ক্ষমতা জন্মে। তারপর আসে সমদর্শন, প্রশংসা নিন্দা, উত্তাপ শৈত্য সব যখন সমান বোধ হয়। অন্য কথায়, যতক্ষণ আমরা স্বার্থপর থাকি, আমাদের জীবনের মানদণ্ডেও স্বার্থপরতা থেকে যায়। কিন্তু স্বার্থ যদি চলে যায় তাহলে এইসব মানের প্রশ্ন থাকে না, কারণ কোনো প্রলোভনই তখন আকর্ষণ করে না। বাসনার মূলোচ্ছেদ হয়ে গেছে তখন।"

এই চিঠি লেখার পাঁচ সপ্তাহের মাথায় নিবেদিতা ১৩ অক্টোবর তারিখে দার্জিলিঙয়ে বসুভবনে দেহত্যাগ করেন। যে মৃত্যুকে নিবেদিতা এত ভালবেসেছেন, বন্দনা করে এসেছেন চিরদিন, সে মৃত্যুকালের কোনো বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাইনা, যদিও সংক্ষিপ্ত ভাবপূর্ণ কিছু বর্ণনা রয়েছে শ্রীমতী অবলা বসুর লেখায়, যা অল্প পরেই আমরা উপস্থিত করব। নিবেদিতার শেষের পত্রগুলি থেকে বোঝা যায়, স্বামীজীর ধ্যানই তাঁর সমস্ত আত্মাকে আবৃত করে রেখেছিল—সেই বিবেকানন্দের কোন্ স্বরূপ তাঁর চিত্তক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তার বিবরণ পাইনি—শ্রীমতী অবলা বসুর পক্ষে তা দেওয়াও বোধহয় সম্ভব ছিল না, বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণে। নিবেদিতার দেহান্তের পরেই তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে তিনটি টুকরো লেখা পাওয়া যায়—"প্রিয়তম", "লীলা" ও "মৃত্যু"। লেখাগুলি শেষ যাত্রার পূর্বে লেখা অনুমান করা যায়।* সে যাই হোক মিস লংফেলোর চিঠি থেকে পুনশ্চ এই নিষ্ঠুর সত্যটি আমাদের কাছে ধরা পড়ছে—ওলি বুলের উইলের মামলাই নিবেদিতার অকালমৃত্যুর হেতু।

---

* লেখা তিনটি আধ্যাত্মিক আকৃতিতে পূর্ণ। যেমন 'প্রিয়তম' লেখাটি—

"ঈশ্বর-তৃষ্ণাই জীবনের সমগ্র অর্থ, একথা যেন চিরদিন স্মরণে থাকে। আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম ঈশ্বরই—তবে তিনি আমারই বাতায়নে দৃষ্টি মেলেছেন, আমারই দ্বারে করাঘাত করেছেন। এই প্রিয় পরমের কোনো প্রয়োজন নেই, তবু তিনি মানবিক প্রয়োজনের আকার নিয়েছেন, যাতে আমি সেবা করতে পারি। তাঁর ক্ষুধা নেই তবু তিনি প্রার্থী, যাতে আমি দিতে পারি। তাঁকে দ্বার খুলে আশ্রয় দেব বলেই তো তিনি ডাক দিয়েছেন। তাঁর বিশ্রাম রচনা করে দেব বলেই তো তিনি ক্লান্তি নিয়েছেন। আমার দানে ভিক্ষাপাত্র ভরিয়ে নিতে ভিক্ষুকের সাজে তাঁর আগমন। প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, আমার সব তোমারই জন্য। আমি তোমারই তোমারই। আমাকে নিঃশেষ করে তার পরিবর্তে বিরাজ করো তুমি।"

নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদ জানার পরে মিস লংফেলো মিস ম্যাকলাউডকে ১১ নভেম্বর লেখেন—

"মার্গটের সহসা মৃত্যুর শোকসংবাদ এসে আমাকে ভয়ানক আঘাত করেছে। তোমার শোক আমারও শোক। এমন একজন বন্ধু চলে গেল, তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করছি।

কী অসহ্য মনে হয় যখন ভাবি, তাঁর মত সুকোমল ভালবাসা ও ভক্তির জীবন ওহেন নারকীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাপ্ত হল।

এখনো পর্যন্ত বাইরের তথ্যটুকুর বাইরে আর কিছু শুনিনি। যে-দুঃখ ওলিয়া দিয়েছে এবং যে পরিণতি হয়েছে, তার কর্মফলের মুখোমুখি ওলিয়া কিভাবে হবে জানি না।

সিলভিয়া (ওলিয়ার কন্যা) সম্বন্ধে তুমি পূর্বে যা ভাবতে এখনো তাই ভাবো কি? শিশুটির সামনে কি বিচিত্র ভবিষ্যৎ।

কতই চেয়েছিলাম, আশাও করেছিলাম, মার্গটের সঙ্গে আবার দেখা হবে, অন্য নানা বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলব, এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন থেকে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু ও-বিষয়টার নতুন দিক সদাই দেখা যাচ্ছিল আর সে মুক্তি পাচ্ছিল না তার থেকে। আলোচনার বিষয়ের মধ্যে মার্গট যখন ঢুকে পড়ত, তার তখনকার দীপ্ত, সচেতন, জীবন্ত মুখের চেহারা মনে পড়লে কী গভীর আনন্দ হয়। তার তুলনায় মনে হয় আমরা অর্ধ-জীবিত। আর এখন, সে আগের চেয়েও কত বেশী, কত বেশী জীবিত।"

উইলের মামলার জন্য নিবেদিতা যখন সবচেয়ে অন্তর্যাতনায় আছেন, তখন বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টে মিস্ লংফেলো নিবেদিতার বিষয়ে চমৎকার একটুকরো রচনা প্রকাশ করেছিলেন। রচনাটি নিবেদিতাকে এতই সান্ত্বনা ও আনন্দ দেয় যে, কয়েকটি চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন, আমরা দেখেছি। রেমং-সংগ্রহে তার কর্তিত অংশ রয়েছে। সেটি এই—

SISTER NIVEDITA

Some twelve years ago there came to Boston a young lady, a member of a Hindu religious order, to speak at one of the meetings of the Free Religious Association. Her bright, intelligent face, her earnest manner and attractive personality, enhanced by the simple white habit of her order, made a strong impression on the audience.

Miss Margaret Noble, although her home was in England, is of Irish family, and has all the ardour and fire of the Celtic temperament. She believes strongly in the universality of true religion, in all its various manifestations. The old religion of India made the strongest appeal to her intense, imaginative nature, and her ardent desire is to enlighten the Western world in regard to its many beauties and heights of spiritual thought. She has adopted the country and its life so completely that she

sees everything from the Indian point of view. She knows it to be a country where the ideal is the real, and the real the ideal, and she hopes to bring some of this idealism to the hard, practical life of the West, and to carry to India the best part of this practicality as a basis for its daily life.

Miss Noble has made several visits to Boston, giving talks in private houses, and has many friends here, but her chosen life is among the Hindus in India, where she loves the simple, religious, poetic customs and people. With another sister of the order, she has opened a school in Calcutta for girls and for married women, whose husbands desire to widen their interests beyond the home life. Miss Noble has also found time to write several books about India—its legends and religion. The last one, "My Master", was most favourably reviewed by Canon Cheyne in the Hibbert Journal.

He says: "This book may be placed among the choicest religious classics on the same shelf with "The Confessions of St. Augustine," and Sabatier's life of St. Francis..........There are many important ideas which might be quoted from this remarkable volume. . . The possibility of finding all religions true and yet be a loyal adherent of one of them."

In Miss Noble's case she has never broken her connection with the English Church, of which she is a communicant. At Christmas time the monks of the order show their reverence for Jesus by reading the story of the Nativity, somewhat in the spirit of the early Franciscans, and the miracle plays. Several months ago, at the urgent summons of her dying friend Mrs. Ole Bull, she dropped her work and at a day's notice took the long journey to America to be with her friend and to give the comfort one may at such a time.

After her friend's death her desire was to return to her home and work as speedily as possible, but she felt bound by some promised lectures, and by the desire to be of assistance to her friend's family.

The Hindus act as if their dead were still present in the body as well as in the spirit. Their belief is that "the soul of the righteous goes back to the Father, to be poured out as love, wisdom and peace." "The human frame looses a life, which is gained by all who loved the soul, radiating as wisdom, beneficence and love."

With this thought in her mind, she lingered in this country for several weeks, and then, feeling she was not longer needed, she returned to India as quietly as she came.

Her parting greeting from the steamer was a verse from the Indian Daily Prayer for the world.

In the East, and in the West,
In the North, and in the South
Let all things that are,
Without enemies, without obstacles,

Having no sorrow, and attaining cheerfulness,
Move forward freely,
Each in his own path!

ALICE M. LONGFELLOW

Craigie House, June 29.

নিবেদিতার দেহান্তের পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় জগদীশচন্দ্রের প্রয়াস : নিবেদিতা বিষয়ে ডঃ বসুর কয়েকটি চিঠি

নিবেদিতার দেহান্তের পরে জগদীশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা কল্পনা করতে পারি কিংবা পারি না। কী সে যন্ত্রণা যা বিঁধেছিল এই বিরাট পুরুষের হৃদয়কে, যে-হৃদয় শুধু একাকী বহন করে, নিজের হাহাকারে অপরকে পীড়িত করতে লজ্জিত হয়, সেই বেদনার সামান্য আভাস আমরা পাই ১৯১৩ সালে লেখা সিস্টার ক্রিস্টিনের এক চিঠি থেকে—

"ডঃ বসু দৈহিক ও মানসিকভাবে এখন অনেক ভাল। তিনি আমাদের মধ্যে বেশীদিন থাকবেন না, এ ভয় আর না করলেও চলবে। জীবন তাঁর কাছে নীরস, প্রাণহীন। অবিরত বলছেন, জানি না কী করে আমার দিন কাটবে! মার্গট তাঁকে পুরোপুরি বুঝেছিল; সহানুভূতি, সাহায্য, উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছিল। বুঝতেই পারো, কী শূন্যতা সৃষ্টি করে সে চলে গেছে।"

যে-ইতিহাস-পরিক্রমা আমরা দীর্ঘ কয়েক শত পৃষ্ঠা ধরে করলাম, তারপরে নিশ্চয় আমরা বিস্মিত হব না যদি শুনি, নিবেদিতার মৃত্যু জগদীশচন্দ্রের প্রায়-মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, এবং দেড়-দুই বৎসর পরেও তিনি হাহাকার করেছেন। তবু বিস্ময়ের বিষয় এই, নিবেদিতা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের কোনো লেখা পাওয়া যায়নি। এই অদ্ভুত ব্যাপারের হেতু কি?

জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিস্বভাবে একটা শালীন সংকোচ ছিল, যা ধন্যবাদ ঘোষণার আতিশয্যকে অনেক সময়েই স্থূল মনে করত। তদুপরি নিবেদিতার বিষয়টি একেবারেই স্বতন্ত্র—জগদীশচন্দ্রের জীবনের প্রেরণালক্ষ্মী তিনি—তাঁর কাছে প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতার চেয়ে প্রগল্‌ভতা আর কি হতে পারে? ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কিন্তু জগদীশচন্দ্র হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন অকুণ্ঠে। তেমন দুর্লভ কয়েকটি চিঠি আমরা রেমঁ সংগ্রহে পেয়েছি। সেগুলি উপস্থিত করব।

নিবেদিতাকে লেখা ও নিবেদিতার সম্বন্ধে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র

আগেই বলে এসেছি নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের পরস্পরকে লেখা চিঠি আমরা প্রায় পাইনি। নিবেদিতার যে-কটি চিঠি পেয়েছি, সেগুলির উল্লেখ পূর্বে করে

এসেছি। নিবেদিতাকে লেখা ডঃ বসুর মাত্র একটি চিঠিই রেমং-সংগ্রহে রয়েছে।* আর আত্মপ্রাণার নিবেদিতা-জীবনীতে আর একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত আছে। এই পত্রটিতে, কার্জনের বিরুদ্ধে নিবেদিতার কৌশলী আক্রমণের জন্য ডঃ বসু তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। লর্ড কার্জন তাঁর সমাবর্তন ভাষণে প্রাচ্যদেশীয়দের কার্যতঃ মিথ্যাবাদী বলেছিলেন। নিবেদিতা তার উত্তরে অমৃতবাজার পত্রিকায় এক বেনামা লেখায় কার্জনের নিজের রচনাংশ উদ্ধৃত করে তাঁকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেন, যার ফলে সর্বত্র বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খুব অল্প কয়েকজনই আসল লেখক কে, তা জানতেন। জগদীশচন্দ্র জানতেন। নিবেদিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ভালই হয়েছে, লেখকের পরিচয় লোকে জানে না।—"বজ্র যেন সর্বদা কালো মেঘের পশ্চাতেই থাকে, যাতে করে আকাশের কোন্ অংশ থেকে তা নিক্ষিপ্ত হল, তা কেউ না বুঝতে পারে।"

রেমং-সংগ্রহে রক্ষিত জগদীশচন্দ্রের পত্রটির তারিখ ১৬ অক্টোবর, ১৯০৮। কোথা থেকে লেখা, চিঠির মধ্যে তা নেই ; তবে পোস্টাল স্ট্যাম্প থেকে বোঝা যায় কেম্ব্রিজ ম্যাসাচুসেটস্ (অর্থাৎ ওলি বুলের বাড়ি থেকে) থেকে লেখা, পাঠানো হয়েছিল নিউইয়র্কে মিসেস লেগেটের ঠিকানায়। পত্রটির মধ্যে, সবচেয়ে বিচিত্র কথা, কোনো সম্বোধন বা স্বাক্ষর নেই। হাতের লেখা অবশ্যই জগদীশচন্দ্রের এবং খামের ঠিকানায় মিস মার্গারেট নোবলের নাম। সহজেই বোঝা যায়, অতি গভীর আত্মিক সম্পর্কের জন্যই জগদীশচন্দ্রের পক্ষে সম্বোধন করা বা স্বাক্ষর দেওয়া সম্ভব হয়নি, যার অর্থ, জগদীশচন্দ্রের হৃদয়ে প্রতিভাত মার্গারেট নোবলকে কোনো নামেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চিঠিটির ছবি আমরা দিয়েছি বলে এখানে অনুবাদ দিচ্ছি—

"আশা করি যাত্রা নির্বিঘ্ন হয়েছিল, এবং বন্ধুদের সঙ্গে গন্তব্য স্টেশনে দেখা হয়েছিল।

আজ মাতৃভূমির জন্য উৎসর্গের মহাদিন, (রাখীবন্ধনের দিন)। তাঁর সেবায় আমরা যেন সবাই নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি। কত আশীর্বাদে ভরপুর আমাদের জীবন। পূর্ণ হৃদয়, উদ্বেল। সকল প্রিয়জন যেন তাঁর আশ্রয়ে নিরাপদে থাকে। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, রক্ষা করুন চিরতরে।"

নিবেদিতার মৃত্যুর কুড়ি দিনের মধ্যে ডঃ বসু মিসেস উইলসনকে যে পত্র লেখেন, তার মধ্যে গ্রন্থরচনায় নিবেদিতার সাহায্যের বিষয়ে সমস্ত কথা এক লাইনে বলে নেওয়া হয়েছে : "যে বইটি সে আমাকে লিখতে সাহায্য করছিল, তা আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।" সে বই নিয়ে অগ্রসর হবার কোনো সামর্থ্য অবশিষ্ট নেই, একথা বলার পর ডঃ বসু বললেন, "নিবেদিতা থাকলে কিন্তু এক দণ্ড সময়ও নষ্ট হতে দিত না। তবে সে তো শরীরিণী নয়—সে মনোময়ী।"

---

* ইতিপূর্বে উদ্ধৃত জগদীশচন্দ্রের ৩০ মার্চ, ১৯০৪-এর চিঠি নিবেদিতাকে লেখা হতেও পারে। এখানেও ১৬.১০.১৯০৮ তারিখের চিঠির মতো সম্বোধন নেই।

চিঠিটি উদ্ধৃত করছি—

2nd Nov. 1911.

My dear friend,

I have faced and gone through the papers left. There is a mass of material for two books, but very incomplete. Then there are some of which two books could be made up.

And then the book which she was helping me to write is staring me in the face. I have not at present the strength to do anything with it.

And lastly there is the Women's School. She left it *entirely* under the control and guidance of Christine. When I asked N. to leave a prviso, in case Christine could not carry out the work—poor child broke down feeling her helplessness. Then we assured her that every one of her wishes will be fully carried out, and that *they shall*.

Only I don't see the way just now. Christine is nervous. and is disinclined at this moment to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary 'nerve' or she does not feel herself up to it.

Only one feels that we are letting time be wasted. If she had survived us she would not have allowed a single hour go by. But then she had no body, it was all mind. There was no such thing as despondency or despair in her composition.

Why did you not have another sister? I fear I shall never live to see your children grow up.

Yours affly,
J. C. Bose

এর পরে ১৪ অগাস্ট, ১৯১২ তারিখে ডঃ বসু মিসেস উইলসনকে যে-চিঠি লেখেন, তার মধ্যে নিবেদিতার বাসকক্ষ, গ্রন্থাগার এবং আরব্ধ কার্যের নির্বাহ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ আছে।—

93 Upper Circular Rd.,
14th Aug. 1912

Dear Mrs. Wilson,

I am glad to see your taking so much interest in the children. I hope Miss Richard's school will be suitable. Thinking I would be interested, Miss Macleod sent me your letter to her. About little Cecily, you speak something about non-conformist conscience which I could not understand. If she wants to be a saint by all means encourage. Bless the child!

There is another reference about my desire to keep Nivedita's room like a museum, and Christine's want of freedom and scope. You were afraid I would feel hurt if you wrote to me about it. Please never think like that, for misunderstanding might arise on absolutely wrong basis.

I am afraid you must have misunderstood Christine's letter. You would know how impatient Nivedita was of all morbid sentimentality, and a man is still more sane in such matters. The question arose about the dispositions of the books and other things, that was in her sitting room at Bosepara. You will understand that it is a workroom with some distinction—with a few fine pictures and Ivory Crucifix and a beautiful and rare statuette of Buddha. It was used as her study and reception room—this being in the outer courtyard where the Zenana school girls do not come.

I gathered from Christine that she would like the valuable collection of books on India, to be undisturbed so that girls from the school might afterwards consult it. So I encouraged the idea, and wished Christine to use the room for her school, as a library recitation room or any other purpose; or Christine might use it to receive her men friends. It was left to her entire disposal. Lest she misunderstood me, I asked her last Sunday, whether the room has been used for the school. She said that as it was in the outer courtyard, she used it for her own reception room. I then enquired whether she would like to have the existing furniture changed and get other things. To this she said, nothing could be so distinguished as the present arrangement.

You must remember that Christine has another and better sitting room of her own. She has the entire control and management of the school.

Naturally, the Math and leading monks have the school under them. But I have arranged matters in such a way that the only thing they do is to find money at the beginning of each month. They have no voice in the management or the policy of the school. Christine can have the school open as long as she likes, or keep it closed. There is no one to whom she has to give any account. We only hear anything she wishes to tell us. The matter, as I said is left solely and absolutely under her control.

She spoke sometime ago about the stifling atmosphere of Bosepara and the heat. So we arranged that she would stay with us and go to school everyday. We have a large house, and there are we two and my sister. There is thus plenty of space. After much pressure, Christine came on a visit, but stayed only two days. She spoke of the rooms being much cooler at No. 17 Bosepara! She has not come since I think she would miss her friends in the lane.

You will have an anxious time moving to the new place. You have not sent me the new address, so I am sending something to you earlier than I intended. I want the children to observe the birthday in October. My bankers will send a cheque of £10 to 5 Ashgrove. (Messers Henry King Co., London).

With best wishes for the new venture.

Yours very sincerly
J. C. Bose

নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে পাঁচ বছর কাটবে—জগদীশচন্দ্র অবশেষে সফল হবেন তাঁর এবং নিবেদিতার স্বপ্নকে সফল করতে। বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর, ডঃ বসুর ৫৯তম জন্মদিনে। অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি চলছিল। এইকালে নিবেদিতার স্মৃতি জগদীশচন্দ্রের মনকে কিভাবে আলোড়িত করেছিল তার সুগভীর পরিচয় পেয়েছি ২৭ অক্টোবর, ১৯১৬ তারিখে মিসেস উইলসনকে লেখা একটি চিঠি থেকে। অপূর্ব চিঠিটি—প্রতিটি শব্দ অনুভূতি-রেখাঙ্কিত। এর মধ্যে জগদীশচন্দ্র হৃদয় উজাড় করে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পত্রের সূচনায় তাঁর নিঃসঙ্গ করুণ মনের ছবি। মিসেস উইলসনকে লিখেছিলেন—"তুমি জানো না, তোমার এবং তোমার সন্তানদের চিঠি জীবনে সুখের ও সৌন্দর্যের যা-কিছু আছে, তারই স্পর্শ এনে দেয়। আমার প্রতি সহৃদয়, এমন অনেকে আছেন সত্য, কিন্তু আমি স্বভাবে সংকুচিত, নতুন বন্ধু করতে পারি না, এমন বন্ধুর কথা বলছি, যাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা চলে।"

এর পরে নিবেদিতার কথা প্রায় কাব্যের ভাষায়—

"আমরা ১৩ তারিখটি (নিবেদিতার মৃত্যুদিন) উদ্‌যাপন করেছি, কিন্তু আগামীকাল হল (নিবেদিতার) জন্মদিন। ঐ দিনটি যখন স্মরণ করব, আমাদের মনে পড়ে যাবে, তাঁর আত্মা উত্থিত হয়েছে, বিরাজ করছে আমাদের মধ্যে। যে-শক্তি প্রতিদিন আমার মধ্যে জাগছে, যেভাবে আমি উত্তরোত্তর ভার বহন করে চলতে পারছি, যা এককালে সুদূর স্বপ্নের বিষয় ছিল—এই সকলের মধ্য থেকে আমি ক্রমেই বুঝতে পারছি অমরতার যথার্থ অর্থ কী? যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি—সকলে বলছে কোনো একা মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব—তাহলে সে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।...

বসু বিজ্ঞানমন্দির স্থাপত্যের দিক দিয়েও সুন্দর হবে। প্রবেশপথের বাম পার্শ্বে পাথরের বিরাট একটি পদ্ম—পদ্মটিই জলাধার, যার উপরে সত্যকার পদ্ম ফুটবে। তার উপরে রিলিফ মূর্তি, এক নারীর, তাঁর হাতে জপমালা এবং প্রদীপ। এই বিজ্ঞানমন্দির তাঁরই প্রার্থনামূর্তি। ১৩ তারিখে চিতাভস্ম একটি আধারে করে পদ্মের ঠিক পাশে স্থাপন করা হয়েছে। দুটি প্রস্তরবেদী থাকবে, বুকে পড়বে একটি শেফালী গাছ, যা প্রতি সকালে ঝরিয়ে দেবে ক্ষুদ্র শুভ্র ফুলগুলি, মাটির উপরে বিছিয়ে যাবে ঘন আস্তরণ। এর বীজ তিনি এনেছিলেন অজন্তা গুহা থেকে, এবং বিদ্যালয়ভবনে রোপণ করে যে-কয়েকটি চারা তৈরী করেছিলেন, তারই একটি এনে বসিয়েছি।"

জগদীশচন্দ্র যা বললেন, এর বেশী আর বলা সম্ভব নয়। তবে আর একটি তথ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—জগদীশচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল

মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুদিনে বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করবেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তাছাড়া ঐ চিঠি থেকে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের নিবেদিতা সম্বন্ধে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সংবাদও পেয়েছি। আরও জেনেছি, নিবেদিতার পত্রগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে ডঃ বসু ও মিসেস উইলসনের মধ্যে আলোচনা চলছিল।

পত্রটি মূলে এই—

Darjeeling
27-10-16

My dear Mrs. Wilson,

Your much welcome letter just received. You do not know how your letters and those of the children put me in touch with all that has been happy and beautiful in life. Though there are many who are kind to me, I am naturally reticent, and I cannot make new friends—I mean those to whom you can talk about things that matter.

We observed the 13th, but tomorrow is the Birthday. We will think of that day reminding us that her spirit is risen and is among us. Through the strength that is daily coming to me, and the way in which I am able to carry out more and more of what at one time had been like a dream, through these I realise more and more of the real meaning of immortality. If I am able to carry out that work, which everyone thinks it impossible for one man to accomplish—that will be due to the strength which comes from the life and memory of those who are living in us.

I had to work out many things, and the strain was too great. I am glad to say that my natural constitution is very strong, and two weeks rest in the hill station has made a different person of me. I hope it will not be necessary in the future to over-exert myself.

I have the good fortune of winning the love of our own people, as also the trust of the government! How long it takes for people to be properly understood! You will be astonished to hear that our present Governor Lord Carmichael is a great admirer of Nivedita. He has bought all her works, and wanted very much to have a good portrait.

The Bose Institute will also be beautiful architecturally. As you enter there is a large stone lotus on the left—that is the basin in which water lilies will grow. Just overlooking that will be a bas-relief of a woman, with prayer beads and a lamp in her hand. The Institutite is the embodiment of her prayer. On the 13th, the ashes were laid in a receptacle just by the side of the lotus. There will be two stone seats, and there will be a overhanging *shefali* tree, which sheds every morning lily white flowers, and makes a white carpet on the ground. The seed she brought from the caves of Ajanta and the plant was one of several which she planted in the school grounds.

I intend to formally open the Institute on the anniversary of St. Sara's passing away—I believe about the 11th Jan. It will be a great national occasion. Other people are realising its importance, as you will see from the enclosed which some friends have printed for private circulation.

As regards the papers and correspondence, I have a good number, I also got copies of letters to St. Sara. But these may not be enough. What do you think of the following idea? I could have the letters accepted by the Modern Review and as we publish them, there will be others coming in from people who would see the [ ] in the magazine. These may afterwards be collected, rearranged (if necessary) and published in book form.

Write to me as often as you can. For I feel very solitary: I try to keep myself busy and my work finds good acceptance. The outside appreciation can never fill up that longing to have the touch of hands that met mine in comradeship or in token of blessing.

With much love to self and children.

Yours affectionately,
J. C. Bose.

আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে যখন লিজেল রেম' ও জিন হারবার্ট একত্রে নিবেদিতা-জীবনী লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন, তখন স্বভাবতঃই ডঃ বসুর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। মিসেস উইলসন, ডঃ বসু ও রেম'-হারবার্টের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করেন। মিসেস উইলসন শ্রীমতী রেম'কে এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রের পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করেছেন—

"শ্রীযুক্ত জিন হারবার্ট এবং শ্রীমতী রেম' কলকাতায় এসে সাক্ষাৎ করলে অবশ্যই সুখী হব। আমার বৈজ্ঞানিক জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে পূর্ণ সাফল্যলাভ না করা পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ে নিবেদিতা যে সাহায্য করেছেন—সেই কথাই শুধু তাঁদের বলতে পারব। তৎকালীন যথার্থ পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত নয়, এমন কারো পক্ষে ভারতের জাতীয়তার উদ্বোধনে নিবেদিতার নিঃস্বার্থ ভক্তি এবং সুদীর্ঘ সহনের মূল্য বোঝা সম্ভব নয়।"

ডঃ বসু ৭ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে জিন হারবার্টকে যে চিঠি লেখেন, তাতে সুস্পষ্টভাবে জানান—"ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিবেদিতার গভীর বিশ্বাসই আমাকে আমার রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছে।" টাইপ করা এই চিঠিটির ছবি ছাপা হয়েছে বলে বিষয়বস্তুর পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন নেই।

অবলা বসুর নিবেদিতা বিষয়ে রচনা

[নিবেদিতার প্রতি প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রয়াসকে কৃতজ্ঞতার নগদ বিদায়ের মত ডঃ বসুর মনে হয়েছিল। যে কাজ নিজে করতে পারেননি, অপরকে

দিয়ে যথাসম্ভব সে কাজ করিয়ে নিয়েছেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় অবলা বসুর নামে প্রকাশিত শোকপ্রবন্ধে বসুদম্পতির বক্তব্যই নিবেদিত হয়েছিল। নিবেদিতা স্মৃতিভাণ্ডারে শ্রীমতী বসুর নামেই চাঁদা দেওয়া হয়। রেমং-হারবার্ট যখন জগদীশচন্দ্রকে নিবেদিতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন, তখন সংক্ষেপে মূল কথা বলে ডঃ বসু জানান, অতঃপর বাকি কথা লেডী বসুই বলবেন। ডঃ বসু যখন অনুভব করেছিলেন, নিবেদিতা সম্বন্ধে কিছু লেখা তাঁর পক্ষে সত্যই অসম্ভব, এমনই অনির্বচনীয় সে অনুভূতি, অথচ লেখা প্রয়োজন, তখন তিনি দেশের সবচেয়ে বড় বাণীশিল্পীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই অনুরোধ রক্ষায় এবং নিজ হৃদয়ের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছিলেন, তার ফলে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামক অসাধারণ রচনাটি আমরা পেয়েছি। নিবেদিতার রচনা সংকলন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজে ডঃ বসু কতখানি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার তথ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। নিজ উইলে বসুদম্পতি নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা রাখেন, যা দিয়ে লেডী বসু তাঁদের স্থাপিত 'বাণীমন্দিরে' নিবেদিতা হল নির্মাণ করে দেন।

মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত লেডী বসুর রচনাটির অনুবাদ উপস্থিত করছি।*]

---

* লেডী বসুর কথা ইতিমধ্যে অজস্র উল্লিখিত হয়েছে। ডঃ বসুর এই জীবন-সঙ্গিনী সত্যই শ্রদ্ধেয়া মহিলা। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে সর্বগুণসম্পন্না সাধ্বী গৃহিণী বলেছেন, তাঁর চরিত্রগুণ সহজেই অনুমান করা যায়। ডঃ বসুর জীবনীকার অধ্যাপক গেডিস শ্রীমতী বসুর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাজ্ঞান করে বলেছেন—'বসু সত্যই ভাগ্যবান, এমন জীবনসঙ্গিনী পেয়েছিলেন।' ডঃ বসুর দীর্ঘ সংগ্রামজীবনে ইনি স্নেহ ও শক্তি নিয়ে সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছেন। অর্থকষ্টের মধ্যে যখন তাঁদের যেতে হয়েছে, কঠোর মিতব্যয়িতায় গৃহিণীপনার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন; আবার ডঃ বসুর দেশী বিদেশী অতিথি, বন্ধু বা ছাত্রদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রসন্ন মর্যাদার সঙ্গে।

অবলা বসুর জন্ম ১৮৬৫ সালের ৮ অগস্ট। বিশিষ্ট ব্রাহ্ম দুর্গামোহন দাশের ইনি দ্বিতীয় কন্যা; প্রথম কন্যা সরলা রায়, অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী, পরে গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী। দুর্গামোহন দাশ প্রথমে কেশবচন্দ্র সেনের দলভুক্ত ছিলেন, পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন। এখানে স্মরণযোগ্য, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অবলা বসুর খুড়তুতো ভাই।

অবলা বসু প্রথমে বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরে মাদ্রাজে মেডিকেল শিক্ষা নিতে শুরু করেন, চার বছর তা নেনও, কিন্তু সমাপ্ত করার আগেই ১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহিত হন, ও শিক্ষায় ছেদ আসে। অতঃপর স্বামীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে তাঁর জীবন মিশে যায়। ডঃ বসুর সব কয়টি বিদেশ ভ্রমণে ইনি সঙ্গী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে এঁর আগ্রহ থাকায় জন্য বিদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি যথাসম্ভব দেখেছিলেন।

স্বদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে এঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে ইনি নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ইনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। এইকালে বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ইনি প্রধানতঃ গ্রামনারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নারীশিক্ষার উপযোগী শিক্ষিকা তৈরীর ব্যবস্থা করেন। সূচীশিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দান আছে। বিধবাদের শিক্ষা দিয়ে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ইনি ঝাড়গ্রামে বিদ্যাসাগর বাণীভবন করেন। দুঃখী ও উদ্বাস্তু মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উইমেনস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কিছু সময়ের সভানেত্রীও ইনি ছিলেন, এবং আড়িয়াদহে সাধনা আশ্রম স্থাপন করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে তা দান করেন।

এখন থেকে ঠিক তের বছর আগে একজন ইংরাজ রমণী, বয়সে তরুণী, স্বাস্থ্যের আর তেজের প্রতিচ্ছবি, উৎসাহে জ্বলন্ত মুখখানি—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর আসার উদ্দেশ্য তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন : তিনি আমাদের নারীসমাজের সেবা করতে চান, বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে, আর সেইজন্য যাদের সেবা তিনি করতে চান তাদের জীবনযাত্রা বরণ করবেন, ঠিক তাদেরই একজন হয়ে যাবেন।

আরও অনেক দিন পরে, যখন আমি তাঁর বন্ধুত্বের পুণ্য গৌরব পেলাম, তখনই ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলাম মার্গারেট-ই-নোবলের জীবনের আধারে রয়েছে কী শক্তি। সে কী না পুণ্য আশিস্ তিনি সহস্রধারে বর্ষণ করতেন তাঁর সঙ্গধন্যদের উপর। কতদিকে তিনি আমাদের মাতৃভূমির প্রত্যক্ষ সক্রিয় সেবা করেছেন, সে কথা আজ এত শীঘ্র আমরা বলে উঠতে পারব না। এখানে আমি শুধু আমাকে যা এত অভিভূত করেছে, সেই তাঁর সুন্দর জীবনের দু'একটি আলোকরেখাকে অবারিত করছি।

তাঁর এমন জীবন, এ কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। তাঁর পিতা ইংরাজ ধর্মযাজক, বাগ্মী—জীবনের বিরাট সাফল্য-সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে, তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে তরুণ বয়সে ম্যাঞ্চেস্টারের দরিদ্রদের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা। পিতার বন্ধুদের একজন ভারতে ধর্মপ্রচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তিনি দেখা করতে এসে বন্ধুকন্যাটির শিশুমুখে সুগভীর আধ্যাত্মিক আবেগ লক্ষ্য করে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন, একদিন ভারতের ডাক তোমার কানে পৌঁছবে। দৈববাণীর মত কথাগুলি, সত্য-বাণীর মত তা সফল হয়েছিল। পিতাও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তরুণী পত্নীকে বলে যান, ভবিষ্যতে একদিন তাঁদের শিশুকন্যার কাছে মহান্ আহ্বান আসবে, সেদিন জননী যেন তাঁর কন্যার পাশে সমর্থন নিয়ে দাঁড়ান। তিনি প্রথম থেকে এইভাবেই উৎসর্গীকৃতা। তাই যখন আহ্বান সত্যই এল, তখন মায়ের প্রাণ যদিও বিচ্ছেদ-বেদনায় মথিত, তবু তাঁর লোকান্তরিত স্বামীর স্মৃতি তাঁকে শক্তি দিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর কন্যার ভক্তি-ভুবন ভারতবর্ষ তাঁরও শ্রদ্ধাতীর্থ ; তাঁর উইম্বলডনের গৃহখানিতে ভারতীয়রা সর্বসময় তাদের নিজস্ব ঘরখানি খুঁজে পেত।

শিশুকন্যাটির মধ্যে ক্রমে বিরল মনস্বিতার বিকাশ ঘটল। হাক্সলি পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধিশক্তিতে চমৎকৃত হলেন। কালক্রমে তিনি বিরাট একটি শিক্ষা-আন্দোলনের কেন্দ্রচরিত্র হয়ে দাঁড়ালেন। এই আন্দোলনের অন্যতম পরিণতি বিখ্যাত 'সীসেম ক্লাব'। তাঁর অপূর্ব মনস্বিতার জন্য যখন লণ্ডন শহরে তাঁর সামনে বিরাট ভবিষ্যতের দ্বার খুলে গেছে, ঠিক তখনি ভারতের ডাক তাঁর কাছে পৌঁছল। স্বামী বিবেকানন্দ তখন লণ্ডনে প্রচার আরম্ভ করেছিলেন। প্রাচ্যের সেই বাণীতে তিনি সাড়া দিলেন। আজীবন সেবার ব্রত ধারণ করে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন অনতিবিলম্বে।

যাঁরা অবলা বসু সম্বন্ধে বেশী জানতে চান, তাঁরা ডঃ ডি. এম. বসু রচিত, মডার্ন রিভিউ পত্রিকার জুন, ১৯৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত *Abala Bose and her life and times* প্রবন্ধটি পড়লে ভাল করবেন।

তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতে আমি কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল ভগিনীদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভরসা বোধ করতে পারিনি। এর কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে তাঁর বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে আহ্বান জানালেন। সেখানে গিয়ে চমৎকৃত। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাড়ি নিয়েছিলেন বলে প্রথমে কোনো হিন্দু ভৃত্য তাঁর কাজ নেয় নি। তিনিও প্রতিবেশীদের ভাবে আঘাত করার চেয়ে বিনা চাকরেই রইলেন। কতবার হয়েছে, রান্না করা সম্ভব হয়নি, শুধু ফল খেয়ে কিংবা কোনো সহৃদয় প্রতিবেশী যা পাঠিয়েছেন, তাই খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কিছুদিন পরে সেই প্রতিবেশীরাই তাঁকে এমন আপন জন বলে মনে করল যে এমন কি সবচেয়ে রক্ষণশীল অথচ শ্রেষ্ঠা তাপসী নারীও* তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতে পেয়ে খুশী হলেন।

সে এক অপরূপ কাহিনী—কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে, ধৈর্যশান্ত প্রেমের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করলেন। প্রথমে এল পাড়ার শিশুর দল। তাদের নিয়ে কিন্ডার-গার্টেন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল। শিশুর মায়েরাও বেশীদিন সরে থাকতে পারলেন না, তাঁরাও এলেন। তাঁদের পড়ানোর পৃথক ব্যবস্থা হল। অনাথা আর বিধবারা, তাঁর কাছে সর্বদা পেত সহানুভূতি ও সেবায় প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ হৃদয়ের আশ্রয়। শিক্ষয়িত্রী করে তোলার ইচ্ছা নিয়ে তাদের তিনি শিক্ষা দিতেন।

এইভাবে রক্ষণশীল সমাজের বুকের মধ্যে 'ভগিনী নিবাস'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটল। ভারতে তাঁর এই কাজ এমন ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকার অতিশ্রেষ্ঠ মানুষেরও কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে আসতেন। তাঁরা ফিরে যেতেন এই দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে—যে-দেশকে ইনি স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন।

পাশ্চাত্ত্যের একজন এঁকে কন্যা বলে গ্রহণ করেছিলেন।† তাঁর সাহায্যে এবং নিজ লেখা থেকে অর্জিত টাকায় ইনি নিজ সংসার ও বিদ্যালয় চালাতেন। তাঁর প্রতিবেশীরা জানতেন, তাঁর আয়ের বড় অংশ কিভাবে দুঃখীর প্রয়োজনে, ক্ষুধাতুরের ভোজনে ব্যয়িত হত। নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর জন্য তিনি উৎসর্গ করতেন।

তাঁর পৌরনীতিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র রূপে অচিরে তাঁর গলি এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চল পরিচ্ছন্নতার একটি আদর্শ ছবি হয়ে দাঁড়াল। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজ হাতে পথ পরিষ্কার করে পথ দেখালেন। এই সময়েই কলকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব ঘটে। তখন জনগণের ভীষণ আতঙ্কের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। পাগলের মত ট্রেন, স্টীমার বোঝাই করে পালিয়েছিল লোকে। ভীতির যখন চরম, ঠিক তখন মার্গারেট নোবল ত্রাণবাণী নিয়ে এলেন। একদল তরুণকে সংঘবদ্ধ করে তাদের সাহায্যে তিনি শহরের উত্তর অঞ্চলের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর অংশগুলি

---

* লেখিকা এখানে সম্ভবত সিদ্ধ তাপসী গোপালের মার কথা বলছেন। এঁর বিষয়ে আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে।

† অবলা বসু এখানে মিসেস ওলি বুলের কথা বলেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিস্ জোসেফিন ম্যাকলাউডও নিবেদিতাকে সাহায্য করেছেন।

পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্লেগরোগীদের সেবার ভার নিলেন, যে-কাজে রোগীদের ছোঁয়াচ ছিল অপরিহার্য। একবার নীচুঘরের একটি শিশুরোগী মারা গেল তাঁর কোলে শুয়ে—সে তাঁকে নিজের মা মনে করে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ছিল সারাক্ষণ।

সন্তানকে ঘিরে রক্ষা করার এই মাতৃত্ব তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে—তিনি একবার নিজ ভৃত্যকে গায়ের গরম কাপড়টি দিয়ে দিলেন; ফলে যদিও তাঁকে শীতে কাঁপতে হয়েছিল, তবু ভেবেছিলেন, ঐ দরিদ্র মানুষটির প্রয়োজন তাঁর থেকে বেশী। অন্যের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করার এ তো মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। চারিপাশের মানুষের অভাব ও দুঃখে তিনি কখনো অভ্যস্ত হতে পারেননি। আর তাই ছিল তাঁর নিত্য বেদনার কারণ।

প্রথমবার যখন ভারতে আসছেন, তখন একই জাহাজে আসছিল একটি ইংরেজ যুবক। ছেলেটিকে তার পিতামাতা বাড়িতে সামলানো অসাধ্য মনে করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দেন। ছোকরা অসংযত-প্রকৃতি, খাওয়ার টেবিলে উৎপাত-বিশেষ। সকলেই তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু মার্গারেটের হৃদয় ভরে গেল গভীর করুণায়। বাড়ির শাসন আর প্রভাবের বাঁধন-কাটা ছেলেটির ভবিষ্যৎ কী ভয়ঙ্কর! ছেলেটির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতে লাগলেন, তাকে তাঁর সঞ্চয়ের মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিসটি, একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন। ঐ ঘড়িটি জন্মদিনে মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। মার্গারেট ছেলেটিকে বলেছিলেন, সে যেন কদাপি ঘড়িটি হাতছাড়া না করে—নিজ জীবনকে নিজে নির্মাণ করতে সে সমর্থ—তার উপরে একজনের এই বিশ্বাসের স্মারকরূপে যেন সে উপহারটিকে রক্ষা করে। গত বছর ছেলেটির মায়ের কাছ থেকে একটি মর্মস্পর্শী পত্র এসেছে। নিবেদিতার মধ্য দিয়ে তাঁর পুত্র কিভাবে নবজীবনের পথ খুঁজে পেয়েছিল, ঐ পত্রে সেকথা তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন; দক্ষিণ আফ্রিকায় মৃত্যুশয্যাতেও তাঁর পুত্র সেকথা স্মরণ করেছে,—মা লিখেছিলেন।

নিবেদিতার মাতৃহৃদয়ের ঐ সমুদয় রক্ষা-শক্তি এসে কেন্দ্রীভূত হল ভারতবর্ষে। যে কঠোরতা বরণ করতে হল, তা অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে দিল। জীবন-মৃত্যুর মধ্যে রইলেন দীর্ঘদিন। আরোগ্যলাভের পরে ডাক্তারের বিশেষ সতর্কবাণী শুনলেন, কর্মবাহুল্য তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বনাশা।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষের সংবাদ যে এসে গেল! এ দেশের মানুষের কষ্ট, আর তিনি শান্ত নিশ্চিন্ত থাকবেন, সে কি হয়! তাঁকে যেতেই হবে। দিনের পর দিন বরিশালের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালেন বন্যাপ্লাবিত কর্দমাক্ত ভূখণ্ডের উপর দিয়ে। যে-ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলেন, তাকে পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন 'পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা' রচনায়। জলাভূমির উপর দিয়ে অবিরত ভ্রমণ, তদুপরি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও মানসিক চাপ, ফলে বিশ্রী ধরনের ম্যালেরিয়া ধরল তাঁকে। দারুণ রোগযন্ত্রণা, তবু তাঁর মর্মযাতনার তুলনায় সে কত সামান্য! আবার কাজ শুরু করার মত ক্ষমতা ফিরে পেতে দীর্ঘদিন লাগল। কিন্তু তিনি কোনদিনই এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর পাশ্চাত্যের প্রিয় বন্ধুরা ও এখানের ডাক্তার বন্ধুরা শহরের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর কোনো স্থানে বাসাবদল করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলেও ফল হয়নি, যে-স্থানটি তাঁকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছে তার প্রতি বিশ্বস্ত তাঁকে যে থাকতেই হবে! 'এই গলিটি আমাকে দত্তক নিয়েছে, আমি একে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।' ছোট ছোট যে-সব বাচ্চাগুলোকে গলিতে টলমল করে চলতে দেখেছেন তারা তাঁকে ঘিরে বড় হয়ে উঠেছে—তারা তাঁর সন্তান। কতো খড়ো-প্রাণ তাঁর কাছে এসেছে, তিনি তাদের মহৎ করে তুলেছেন। তিনি বাছাই করে নেবেন? সে হয় না। তিনি তুলে নেবেন, যা এসেছে।

প্রতিদিনের জীবনে যা দেখেছি, সেই বিশেষ নারীপ্রকৃতির দিক থেকেই তাঁর কথা আমি বলছি। পূর্ণ তপস্যা আর ন্যায়েষণা তাঁকে বেষ্টন করে থাকত পবিত্র অগ্নির মত, তাঁকে আলোকিত করত। অন্যেরা বিরাট নৈতিক ও মানসিক শক্তিরূপে তাঁকে জানবে। এ দেশের পরম প্রয়োজনের ক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, ঐ শক্তির ঐশ্বর্য নিয়ে। তাঁর মত সম্পূর্ণ আত্মবিলয় আমি কোথাও দেখিনি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, বা পণ্ডিত-কুলের অনেককেই আমি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ মনীষা, মহান্ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসায় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হতে দেখেছি।* যে-সকল বিরল গুণরাশি পাশ্চাত্য দেশে বিরাট ভবিষ্যতের পথ খুলে দেয়, সে সকলই তাঁর ছিল, আর সমস্তই তিনি অর্পণ করেছিলেন আমাদের মাতৃভূমির সেবায়। তিনি ইংলণ্ডকে কম ভালবাসতেন, তা নয়, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন ন্যায়ের মধ্য দিয়েই ইংলণ্ডকে বড়ো থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে এমনভাবে একাত্ম করে দিতে পেরেছিলেন, যাতে আমি তাঁকে কখনো বলতে শুনিনি "ভারতের প্রয়োজন", "ভারতীয় নারী"—সব

---

* নিবেদিতার প্রতিভার ও চরিত্রের প্রতি 'শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় পূর্ণ' বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামগুলি লেখিকা এখানে দেননি। এই প্রবন্ধে তার অবকাশও অল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালেও অবলা বসুর কাছ থেকে সে নামগুলি সংগ্রহ করা হয়নি। জগদীশ বসু ও তাঁর পত্নীর পক্ষে এই নামগুলির সঙ্গে যতখানি পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল, অন্যের পক্ষে ততখানি প্রায় নয়। বিশেষত জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে নিবেদিতার যোগ থাকায়, এবং নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করায়, স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক মহলের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘটেছিল। নিবেদিতা অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার স্বীকৃতির জন্য বহু লড়াই করেন। এখানে একথাও বলতে হবে, জগদীশচন্দ্রের চিন্তা ও আবিষ্কার-গুলিকে নিবেদিতা যে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন, তা তিনি করতেই পারতেন না, যদি না স্বয়ং তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হতেন। লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে, যাঁরা জগদীশচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে নিশ্চয় নিবেদিতারও।

নিবেদিতা বোসপাড়া লেন নামক বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলিতে বাসস্থান করলেও বিশ্বচারিত্র। পৃথিবীর চিন্তাবিদ মহলের বৃহৎ অংশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। সে তালিকা বর্তমানে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। নিবেদিতার দেহত্যাগের পঁচিশ বছর পরে সেই কাজ আরম্ভ ক'রে নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেম' অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছেন। বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিন, বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলা, দার্শনিক উইলিয়ম জেমস্, সমাজকর্মী মিসেস অ্যাডামস্, রাজনীতিবিদ্ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, জন ল্যাণ্ড, কেয়ারহার্ডি, আর্ল মর্লে, লর্ড মিণ্টো ও লেডী মিণ্টো, সাংবাদিক উইলিয়ম স্টেড, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, এফ জে রেয়ার, ডবলিউ নেভিনসন, অধ্যাপক চেনী, ধর্মযাজক হাউই, সমাজতাত্ত্বিক প্যাট্রিক গেডিস প্রভৃতির নাম করা যায়। হাক্সলি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন, একথা প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। আমি যে কয়েকটি নাম করলাম, তা অগণ্যের অঙ্গুলী-গণনীয় অংশ মাত্র।

সময়ে তা "আমাদের প্রয়োজন", "আমাদের নারী"। বাইরে থেকে তিনি সাহায্য করতে আসেননি, কদাপি নয়, তিনি আমাদেরই একজন, আমাদের মুক্তির জন্য ব্যাকুল বেদনায় সন্ধান ও সংগ্রাম করে ফিরেছেন।

আর অল্পই বলবার আছে। ভারত সম্বন্ধে দুটি বৃহৎ গ্রন্থরচনার ভার তাঁর উপর দিয়েছিল লণ্ডন ও নিউইয়র্কের দুই প্রধান প্রকাশক। সেই কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এর সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের শ্রমসাধ্য কাজও করে চলছিলেন। ফলে স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটল। মনে হল দার্জিলিঙয়ের সুন্দর আবহাওয়ায় হয়ত তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধার হতে পারে।

অনেক বছর আগে একদিন বিদেশে রোগশয্যায় তিনি আমার শুশ্রূষা করেছিলেন, আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। এবার সুযোগ আমার। আমরা আশা হারাই নি, কিন্তু তিনি জানতেন, নিয়তি অন্য কথা লিখেছে। তাই বলে কোনো বিষাদ নয়। প্রতি প্রভাতে উজ্জ্বল হাসি আর দীপ্ত কথায় আমাদের অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর জীবনের প্রিয় কাজের কথাই শুধু বলতেন—"আমাদের মেয়েদের" শিক্ষা—সে শিক্ষা কি করে চালাতে হবে, সেই কথা। তাঁর যা-কিছু সম্বল, বই থেকে ভবিষ্যতে যা-কিছু আয় হবে, সবই তিনি উইল করে দিলেন মাতৃভূমির সেবায়।

সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গিয়েও এই শেষের দিনগুলিতে তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর আত্মবিলয় সম্পূর্ণ হয়নি। কে-যেন তাঁকে একবার তাঁর প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কথা বলেছিল। সেই কথাটি নিশ্চয় তাঁর মনে ফিরে এসেছিল। তিনি প্রার্থনা করলেন, এবার তিনি যেন চলে যেতে পারেন, যাতে অন্যরা বেড়ে উঠতে পারে।*১

---

*১ নিবেদিতার এই প্রার্থনা তাঁর গুরুর মনোভাবের সঙ্গে কী গভীরভাবে এক। নিবেদিতা তাঁর গুরুর চিন্তায় ও কাজের মধ্যে জীবনের প্রতিটি শ্বাস নিয়েছেন—অন্তিম ক্ষণেও গুরুর অনুরূপ ভাবনায় তিনি সমাচ্ছন্ন হলেন। স্বামীজী বারাণসীতে তাঁর শেষ ভ্রমণ সাঙ্গ করে ফেরার পরে, নিবেদিতা লিখেছেন, "Strangely enough, in his first conversation......his theme was the necessity of withdrawing himself for a time, in order to leave those that were about him a free hand.

"How often" he said, "does a man ruin his disciples, by remaining always with them! When men are once trained, it is essential that their leader leave them, for without his absence they cannot develop themselves!" (The Master as I saw Him).

নিবেদিতা অবশ্য কখনো নিজেকে নেতা মনে করতেন না, এবং যে-কারণে বিবেকানন্দ নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছেন, হুবহু সেই কারণে নিশ্চয় নিবেদিতা নিজে সরে যেতে চাননি, কিন্তু নিবেদিতার মহিমা এইখানে, 'শিষ্যা' বা 'ভগিনী' নিবেদিতাও নিজের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বকে অপরের বৃদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ মনে করেছিলেন। নিবেদিতার এই উগ্র ব্যক্তিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায় আছে।

নেতা বিবেকানন্দ পরবর্তীদের পথ করে দেবার জন্য কিভাবে উদগ্রীব হয়েছিলেন (যার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর চরিত্রমহিমার প্রতি নমস্কার জানিয়েছেন) তার পরিচয় মিস ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথাতেও পাই।—

"He said, 'I delivered my message and I must go'. I asked, 'Why go?' and he said, 'The shadow of a big tree will not let the smaller trees grow up. I must go to make room".

দার্জিলিঙয়ে আসার কয়েকদিন আগে তিনি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রার্থনামন্ত্র ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন বন্ধুদের কাছে পাঠাবার জন্য।*২ সেটি বিশ্বের জন্য মানুষের প্রতিদিনের প্রার্থনা। তিনি বোধহয় জানতেন, এই তাঁর বিদায়বাণী। বিশ্বমুক্তির জন্য নিরন্তর প্রার্থনায় তুল্য তাঁর যে-জীবন—এই বৌদ্ধ প্রার্থনায় তারই ধ্বনি। প্রার্থনাটি তিনি আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন :

> শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত যাহা কিছু আছে, সে সকলের শ্বাস প্রবাহিত হউক, তাহারা নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক। পূর্বে এবং পশ্চিমে, উত্তরে এবং দক্ষিণে যাহা কিছু আছে, যাহা শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত, তাহাই নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক।

তাঁর কাছে অজ্ঞানই চরম বন্ধন। তাঁর আনন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত যখন তিনি আবৃত্তি করতেন :

> অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যাও ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও ; আমার অন্তরের অন্তরে তুমি প্রবেশ কর। হে রুদ্র, তোমার কল্যাণ-মধুর মুখশ্বারা তুমি আমাদের নিরন্তর রক্ষা করো।

মেঘে কুয়াশায় পূর্ণ দিনগুলি। কিন্তু ১৩ই অক্টোবরের প্রভাতে কিছু কালের জন্য মেঘ সরে গেল। যে-তরী ডুবছে, তার কথা তিনি বললেন, কিন্তু সূর্যোদয়ও দেখবেন, সে কথাও। তুষারের উপর সদ্য সূর্যোদয় হয়েছে, তারই একটা আলোকরেখা যখন বিচ্ছুরিত হয়ে প্রবেশ করেছে কক্ষে, তখনই সেই বিরাট সংগ্রামী আত্মা চলে গেল, অন্য উষার দ্বারে।

তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে আছি আমি, হৈমবতী উমার যে-কাহিনী বলতেন, তা চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল। এই তো সেই ঋতু, যখন তিনি পিতৃগৃহে আসেন। আমার সামনেও আর এক উমা, তুষারশুভ্র তুষারকন্যা, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে ফিরে এসেছেন আবার তাঁর ভারতের ভবনে। তাঁর স্বজন, স্বগৃহকে জানবার জন্য কি তাঁর এই আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল! নাকি আমাদের পিতার গৃহে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম বলে কোনো কথা নেই!

---

*২ কথাটি আক্ষরিক সত্য নয়। মিস্ ম্যাকলাউডের জুন, ১৯১১-র লেখায় দেখেছি, ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি এই প্রার্থনাটির অনুবাদ পেয়েছিলেন।

বসু বিজ্ঞানমন্দির*

জগদীশচন্দ্র মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, ভারতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিবেদিতার আগ্রহই আমাকে আমার বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রণোদিত করেছে। আগেও মিসেস উইলসনকে এক পত্রে লিখেছিলেন : নিবেদিতার স্বপ্নই আমার বিজ্ঞানমন্দিরের মধ্যে রূপায়িত। তাই বলে গবেষণাগার স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা নিশ্চয় নিবেদিতা তাঁকে দান করেন নি। নিজস্ব গবেষণাগার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই আনন্দস্বপ্ন, জগদীশচন্দ্রের মত কল্পনাপ্রবণ বৈজ্ঞানিকের তো নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ যাঁকে অধিকাংশ সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় বিনা গবেষণাগারে গবেষণা করতে হয়েছে। ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে গবেষণাগার গড়ে উঠেছিল, তাও তাঁরই সংগ্রামের ফলে। সেইসঙ্গে কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার স্থাপনের ক্ষীণপ্রাণ স্বপ্ন-শিশুটিকে মাতৃস্নেহে লালন করেছিলেন নিবেদিতা—তারই জন্য আচার্যের ঐ কৃতজ্ঞতা।[১]

বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৯১৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী, জগদীশ-চন্দ্রের জন্মদিনে। প্রথমে স্থির করেছিলেন মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুদিনে উন্মোচন করবেন, পরে নিজের জন্মদিনে তা করেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয় তাঁর, বা অধিক ভাবে তাঁর অনুরাগীদের মনে হয়েছিল—মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়, বসু বিজ্ঞানমন্দির বসুর আবির্ভাব দিনেই ভূমিষ্ঠ হোক ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে। আমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে, এইরকম এক ৩০শে নভেম্বরকে অভিবাদন জানিয়ে নিবেদিতা কী লিখেছিলেন। চেতনাসমুদ্রের মহান নাবিকের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত নিবেদিতার সুমহান গদ্য স্তোত্রটির শব্দগুলি একবার শুনলে কখনো ভোলা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে আবাহনসঙ্গীত লিখেছিলেন, তার ধ্রুবপদ ছিল—

> বল, 'জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
> জয় তপস্বীরাজ হে।
> জয় হে, জয় হে, জয় হে।'

বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবার আগে জগদীশচন্দ্র একটি কাজ করেছিলেন —নারী-দধীচির অস্থিচূর্ণ স্থাপন করেছিলেন দ্বারপ্রান্তে। দধীচির আদর্শকে তিনি বহু পূর্বেই পেয়েছিলেন ভারতীয় পুরাণ কাহিনী থেকে। কিন্তু সে আদর্শ বাস্তব সত্য রূপে আবির্ভূত হয়েছিল নিবেদিতার মধ্য দিয়ে। তাই নিবেদিতা যখন বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধ-বেদীমূলে বজ্রচিহ্ন আবিষ্কার করলেন, এবং ভাবলেন, এই বজ্র প্রতীক হোক ভারতবর্ষের, তখন তাঁর সে অভিপ্রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন ডঃ বসু। তাঁর বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতীক—বজ্র, মন্দিরভবনের শীর্ষে তা স্থাপিত। তারই নিম্নে আচার্য বসু স্বতঃই নারী-দধীচির বজ্রাস্থি স্থাপন করেছিলেন। সে কথা কিন্তু জানত খুব অল্প জনেই। আচার্য বসু নিবেদিতার

* এই অধ্যায়ের পাদটীকাগুলি অধ্যায়শেষে একত্রে দেওয়া হয়েছে।

বোনকে সে সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর পত্র থেকে আগে জেনেছি। এ বিষয়ে আচার্য বসুর ছাত্র, বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ যশীশ্বর সেন আলমোড়া থেকে ২১ জুন, ১৯০৯ তারিখে এক পত্রে লিজেল রেমঁকে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিলেন :

"The day she left Calcutta for Darjeeling in the last week of September 1911, she told me that she was feeling quite unhappy over the fact that she had not written the History of India she promised Swamiji she would, and also that she wanted a life of the 'Man of Science' written. She showed me the material she had collected......I owe my science to Sister Nivedita. She it was who placed me under Sir J. C. Bose. It is difficult for me to express in words what I feel about her. In my own little ways I try to express in life some of the dynamic ideas she used to radiate.

I brought back her ashes from Darjeeling, part of which is now at Belur Math and the rest of it is now in my little chapel at 8, Bosepara Lane, Baghbazar, Calcutta. *When the Bose Institute was founded, Sir J. C. Bose asked me to put some of her ashes there. At the base of the fountain I put a little box containing Nivedita's ashes, just where the bas-relief of Sister Nivedita has been placed. Except Lady Bose no one else knew it.*" (বক্রলিপি লেখককৃত)

দ্বারপ্রান্তে নিবেদিতার যে মূর্তিটি স্থাপন করেছিলেন, তার নাম 'লেডি অব দি ল্যাম্প', অর্থাৎ দীপরূপিণী ; মন্দিরপথে দীপধারিণী তো নিশ্চয়ই। নিবেদিতাই বিজ্ঞানমন্দিরের আলোকদূতী—নীরব নমস্কারের সঙ্গে সেই স্বীকৃতিটুকু আচার্য বসু প্রবেশপথেই নিবেদন করলেন। অথচ নিবেদিতার নাম সেখানে নেই। এর থেকে সুগভীর সুগম্ভীর শ্রদ্ধানিবেদন অল্পই সম্ভব।

মূর্তিটি যে নিবেদিতার, একথা বসু বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন সম্বন্ধে যে-কটি বিবরণী দেখেছি, কোথাও চোখে পড়েনি। মিসেস উইলসনকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠি তো সাধারণের জানার কথা নয়। বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার তিন বৎসরের মধ্যে ডঃ বসুর যে-জীবনী অধ্যাপক গেডিস লেখেন, তার মধ্যে স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখা গেল। তিনি লিখেছিলেন—

"Her (Nivedita's) fervid faith in the long-dreamed of Research Institute, its possibilities for science and its promise for India, was no small impulse and encouragement towards its realisation ; and thus is explained the memorial fountain with its bas-relief of 'Woman carrying light to the Temple' which adorns the entrance of his Institute."[2]

নিবেদিতার স্বপ্ন বোধহয় বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিটি পাথরে মিশে ছিল। সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে বিজ্ঞানমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সভাগৃহটি 'অজন্তার স্মারক', ছাতের বিশাল পদ্ম অজন্তার থেকেই অনুকৃত।

সভাগৃহের এক মুখ্য আকর্ষণ নন্দলাল বসুর অসাধারণ রূপক চিত্রটি, যার নাম 'অন্বেষণ'। তাতে দেখা যায়—পবিত্র নদীমুখ থেকে সূর্যোদয়ে যাত্রা করেছে ঋজু প্রখর-আকার 'জ্ঞান', যে-অসি দিয়ে পথ পরিষ্কার করে অগ্রসর হবে তার শাণিত অগ্রভাগ সে স্পর্শ করে আছে; এই দুঃসাহসী যাত্রায় তার বধূ-সঙ্গিনী 'কল্পনা' বাঁশি বাজিয়ে সুরের প্রেরণা ছড়িয়ে দিচ্ছে মনে। সভাগৃহের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ব্রোঞ্জ, রৌপ্য ও স্বর্ণ-নির্মিত একটি সুমহান মূর্তি—সূর্যদেবের—রথে করে তিনি চলেছেন তিমিরহরণ ও আলোকবর্ষণের নিত্য যাত্রায়।

ভারতরসের মধ্যে সঞ্জীবিত আচার্য বসুর কল্পনার সঙ্গে ভারত-শিল্পের একালের ধাত্রী-জননী নিবেদিতার কল্পনা এই মন্দিরসজ্জায় পরিকল্পনায় মিশ্রিত ছিল বুঝতে অসুবিধা হয় না।[৩]

বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন সকলের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করেছিলেন, তখন সেই প্রৌঢ় মহাবিজ্ঞানীর হৃদয় কী অসীম আবেগে আলোড়িত হয়েছিল, তা কোনো কল্পনাতেই ধরা দেবে না। সিদ্ধির আনন্দ, সিদ্ধির বিষাদ নিশ্চয় মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল, জীবিত কণ্ঠের মঙ্গলাচরণের মধ্যে, তিনি নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন, মিশে গেছে লোকান্তরগত আত্মার অন্তহীন আশ্বাস-নিঃশ্বাস। আচার্য যখন প্রবেশ করছিলেন, তাঁর অঙ্গে ছিল শুভ্র উত্তরীয়ের বর্ম, বহু যুদ্ধের বহু আঘাতেও যা অটুট, কিন্তু বর্মতলে ঢাকা ছিল কত রক্তচিহ্ন! এবং পায়ের তলায় কত ক্ষুদ্র কণ্টক। সদ্য বিঁধেছে তেমন একটি কণ্টকের কথা আমরা জানি।

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধনের আয়োজন যখন সম্পূর্ণপ্রায়, দেশের ম ় এবং পত্রপত্রিকাগুলি যখন একত্র হয়ে আচার্যকে অভিবাদন জানাচ্ছে, ঠিক সেই সময়টিতে 'বাঙালী পদার্থবিদ্' নামের অন্তরালবাসী কোনো এক ব্যক্তি দেশের প্রধান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র স্টেটসম্যানকে বেছে নিলেন আচার্য বসুর বিরুদ্ধে বিষোদগারের ক্ষেত্ররূপে। ঘৃণা, ঈর্ষা, ও পরশ্রীকাতরতায় তেমন দৃষ্টান্ত অল্পই মিলবে। প্রশংসনীয় সময়জ্ঞান সেই 'বাঙালী পদার্থবিদ্'-এর যিনি বীরের করায়ত্ত অমৃতভাণ্ড ওষ্ঠাগ্রে তোলার ক্ষণটিকে বেছে নিয়েছিলেন বিষক্ষেপ করবার জন্য।[৪৩] এমন আঘাত জগদীশচন্দ্র পূর্বে অনেক পেয়েছেন, তবু স্বদেশে স্বদেশবাসীর (?) কাছ থেকে এই বিদ্বেষ-দংশন মনে হয় তাঁর অসীম সহ্যশক্তিকেও বিদীর্ণ করেছিল, নচেৎ কেন তাঁর উদ্বোধন-ভাষণের বৃহৎ অংশ জুড়ে প্রতিকূলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বীরপ্রাণকে আহ্বান করা থাকবে, কেন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে নানা চক্রান্তের কাহিনী জানাবেন এই সিদ্ধির সিদ্ধপূজার ক্ষণে। আচার্য বলেছিলেন—

"কী সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার সমস্ত জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না। যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা কর্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।"

নিজের বিরুদ্ধে কিছু চক্রান্ত-কথা জানানর পরে আচার্য বলেছিলেন—

"এইসকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর; বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।"

মানুষ নীচ, আচার্য তা বহু জেনেছেন। আবার মানুষ মহৎ, তাও জেনেছেন কখনো কখনো। তেমনি একটি দৃষ্টান্ত এই ভাষণে না দিয়ে পারেন নি। 'বর্তমান উদ্ভিদ বিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপৎজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেরারের অর্ধ-শতাব্দীর অসীম কৃতিত্বের ফল।' কিন্তু জগদীশচন্দ্রের 'কোনো কোনো আবিষ্ক্রিয়া' যেহেতু ফেরারের 'কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে', সেই কারণে জার্মানী ভ্রমণকালে সংকোচবশে জগদীশচন্দ্র অধ্যাপক ফেরারকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক ফেরারের অকুণ্ঠ অভিনন্দন কিন্তু অযাচিতভাবে জগদীশচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছিল। অভিভূত কণ্ঠে আচার্য বসু এই ভাষণে বলেছিলেন—

"ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এ বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের।"

বিজ্ঞানের জন্য অর্থসংগ্রহের পিছনে অর্থলোভ আছে এই নীচ সন্দেহের সুমহান উত্তর আচার্য দিলেন—

"সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে।......এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার......জগতের সম্পত্তি হইবে, এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোনো পেটেন্ট লওয়া হইবে না, কারণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থ-লাভের উপায় নহে।"[৫]

বিজ্ঞানমন্দির যে সত্যই মন্দির, প্রতিষ্ঠাভাষণের সূচনায় আচার্য বসু সঘন কণ্ঠে তা নিবেদন করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গের ব্রত তিনি নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন—

"বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।"

'মন্দিরের' কথা বলেছিলেন একালের আচার্য, কণ্ঠে ছিল প্রাচীন ভারতীয় আচার্যদের ভাষাভঙ্গি। তিনি 'দেবতার' কথা বলেছিলেন, 'আরাধ্য দেবীর' কথাও॥

ভাষণের শেষাংশে ছিল বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'রই প্রতিধ্বনি। সমস্ত ভাষণটিতে ভারতীয় হিন্দু-সংস্কৃতির প্রগাঢ় মুদ্রণ।[৮৬]

'বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠার তাম্রলিপি' ছিল নিম্নরকম—

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু,
১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪

আচার্য বসু ভারতের গৌরবকে নিজ সাধনার ধন করেছিলেন, প্রতিষ্ঠাভাষণে তা না জানিয়ে পারেন নি :

"ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্রনির্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে নাই, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি। সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল।"

প্রতিষ্ঠাভাষণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে মাত্র একজনের স্পষ্ট উল্লেখ আচার্য বসু করেছিলেন। পিতার বৃহৎ বিফল সংগ্রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাস্মৃতে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছিল। বাকি কারো কারো কথা আভাসে বলেছিলেন ; যেমন নিজের ধর্মপত্নীর কথা :

"আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যে বহুদিন অটল রহিয়াছে।"

এর পরে যা বলেছিলেন, সে কথাগুলি প্রাধানত নিবেদিতার (কিছুটা মিসেস ওলি বুলের) সম্বন্ধে তাতে সন্দেহ নেই :

"বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।"[৮৭]

নিবেদিতা বা মিসেস বুলের নাম না করতে জগদীশচন্দ্রকে কতখানি আত্মশাসন করতে হয়েছিল, ভাবতেও স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। যথার্থ ভক্তি কখনও প্রগল্ভ হয় না।[৮৮]

এই প্রায় আত্মগত স্মরণ-মননেই নয়, নিবেদিতার উদ্দেশে জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, যখন তিনি বিজ্ঞানমন্দিরের 'পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন' এবং মন্দিরগাত্রে সন্নিবিষ্ট অর্ধ-আমলক চিহ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। বজ্রচিহ্নকে নিবেদিতা বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে কিভাবে আবিষ্কার করে-ছিলেন, তার পটভূমিকা ভবিষ্যতে নিবেদিতা-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে উপস্থিত করব। অশোকের অর্ধ-আমলক কাহিনীর প্রতি নিবেদিতার অনুরক্তির সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সংবাদ এ-পর্যন্ত আবিষ্কার করে উঠতে না পারলেও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির এই একান্ত অনুরাগিণী নারী ঐ সুন্দর কাহিনীর বিষয়ে অনবহিত ছিলেন মনে হয় না, এবং কোনো সুন্দর বস্তুর প্রতি নিবেদিতার মনোযোগের অর্থ তাঁর সন্নিকটের মানুষদের সে বিষয়ে আবশ্যিক মনোযোগ, আশা করি নিবেদিতার জীবনের সঙ্গে পরিচিতজন মাত্রেই তা স্বীকার করবেন। আর যদি এই কাহিনীর প্রতি প্রীতি আচার্যের ব্যক্তিগতই হয়, কিছু এসে যায় না, কাহিনীর অন্তর্গত সত্যবস্তু নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্র, উভয়ের জীবনেই প্রতিফলিত হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হইয়া থাকে দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব।"

এই উদার বৈরাগ্য, ভাষণশেষে অসাধারণ মহিমায় প্রকাশিত হয়েছিল। জগদীশ-চন্দ্রের ভাষা নিতান্ত সরল, সে সরলতা সত্য-সঞ্জাত; তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলিতে তাঁহার অব্যাহত আত্মা ধ্বনিময়। সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করেই প্রসঙ্গ শেষ করব :

"জীবন আঘাতেরই ক্রিয়া।......আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হয়।...... (কিন্তু) একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে। তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে আর উঠিবে না।......ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবন-ব্যাপী ব্রত ও সাধনা।......

কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানবচিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্য জ্ঞান প্রচারদ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলকমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে-দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া

থাকে।"[১] আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনর্বার কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্য দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নয়, হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে, এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তারপর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্য দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।"

---

[১] অধ্যাপক গেডিস তাঁর বসু-জীবনীতে লিখেছেন, ১৮৯৬ সালে ইংলণ্ডে প্রথম স্বীকৃতি পাবার পরে ডঃ বসুর মনে বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনের কল্পনা জাগে। গবেষণার যে-অসুবিধা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, অন্য অনুসন্ধিৎসুদের যাতে সে কষ্ট ভোগ করতে না হয়, সেজন্য এই পরিকল্পনা। 'কিন্তু তাঁর এই ভিশন্, যা তখন স্বপ্নমাত্র, তার জন্য অপরের দ্বারস্থ হতে তাঁর গর্বিত স্বভাবে বেধেছিল। যা কিছু করতে হবে, নিজেই করবেন, নিজে ঝুঁকি নিয়ে।' এইজন্য তাঁর পত্নী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করে টাকা জমিয়েছেন। 'এই সময় থেকে পরবর্তী ২৫ বৎসর এই লক্ষ্য সিদ্ধিতেই তাঁর (ডঃ বসুর) মনপ্রাণ নিয়োজিত হয়েছিল।'

[২] অধ্যাপক গেডিস আচার্য বসুর বন্ধুগণের পরিচয় দিতে গিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে বন্ধুত্বকে সমুচ্চে স্থাপন করেছেন:

"Latest among these friendships, but in some ways of the very highest importance, came that with Margaret Noble, better known as Sister Nivedita."

নিবেদিতার মনের ব্যাপ্তি ও কর্মক্ষমতা অসাধারণ ছিল বলে শিক্ষামূলক ও সামাজিক অন্যান্য কাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের কাজকেও গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল, এবং তিনি মনে করতেন, ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সহায়তা ক'রে ভারতীয় বিজ্ঞানের জাগরণের কাজ করছেন,—এইসব কথা বলার পরে অধ্যাপক গেডিস জানিয়েছেন, সংকটকালে নিবেদিতা ডঃ বসুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নিবেদিতা চরিত্র-মহিমার কথা জানাতে গিয়ে অধ্যাপক গেডিস লেডী বসু এবং এস, কে, র‍্যাটক্লিফের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। র‍্যাটক্লিফ বলেছেন—"যাঁদের উপর তিনি তাঁর বন্ধুত্বের মহাসম্পদ অর্পণ করেছেন, তাঁরা সেই স্মৃতিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ আশীর্বাদ বলে মনে করেন।" আর, লেডী বসু 'ন্যায়ের শুভ্র দ্যুতিকে' নমস্কার জানিয়েছেন।

অধ্যাপক গেডিসের কথাগুলির উপর বিশেষ মূল্য আরোপ করছি, কারণ, প্রথমতঃ, নিশ্চয়ই ডঃ বসুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি লিখেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্বয়ং ব্যক্তিগত-ভাবে নিবেদিতাকে জানতেন। নিবেদিতার সঙ্গে এই বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকের সম্পর্কের বিষয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। এখানে এইটুকু বলতে চাই—গেডিসের বসু-জীবনীতে নিবেদিতার চরিত্রের প্রতি যে ধরনের শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, সেরকম অন্য কারো বিষয়ে করা হয়নি।

[৩] বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে যে-সব বিবরণ বেরিয়েছিল, তার মধ্যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার বিবরণই নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। ১ ডিসেম্বর, ১৯১৭ তারিখে প্রকাশিত সুদীর্ঘ এই বিবরণের সূচনায় এই বিজ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকে ভারতীয় বিজ্ঞান এবং বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে আখ্যাত করা হয়। স্থাপত্য ও অলঙ্করণের প্রভূত প্রশংসার পরে বলা হয়, যিনি এর কল্পনা করেছেন তিনি বিজ্ঞানী নিশ্চয়, কিন্তু সেইসঙ্গে কবি ও শিল্পীও বটেন। রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

"It is a magnificent edifice that has reared in Upper Circular Road, built entirely of stone, expressing fine artistic design....... Yesterday a Temple of scientific learning was opened in that beautiful and massive building, which posterity will cherish with reverence as associated with the honoured name of Sir Jagadish Chunder Bose, the prince of Physicists of modern times. It will be regarded as an accession to the beauty and grandeur of the City of Palaces.........The design of the edifice which owes its inception to the imaginative insight of Sir J. C. Bose, shows him at once in the role of a great poet and artist......All the details of the building have been worked with a scrupulous regard for the fitting and the beautiful,...... thereby truly realising the dictum of Socrates. The decorations are again symbolic, reminiscent of old world grandeur and solemnity.........The whole institution represents the working of a virile mind in its scientific, artistic and spiritual aspects, Science and Art thus converging to serve the highest spiritual purposes."

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের স্থাপনা ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, একথা কেবল বাঙালী জাতীয়তাবাদী 'বেঙ্গলী'তেই লেখা হয়নি, বিখ্যাত বিদেশী সংবাদপত্রসমূহেও লেখা হয়েছিল। এক বিরাট রচনায় 'টাইমস' যা লেখে তার দু'এক লাইন—

"To bringing about the scientific renaissance (of India) Sir Jagadis has influentially contributed. Indians are justly proud of the possession of a few men who gained world-wide reputation in their particular fields of activity......In this (scientific) field there is no fundamental difference between the Western and Eastern mind as was assumed when Sir Jagadis began his work. It may be, as one writer said, that the bent of research and the colour of theories will take something from the inherent qualities of the Indian mind; but the faith in ascertainable truths and the appeal to facts can underline that research and those theories equally well in India and in Europe."

Athenaeum পত্রিকা স্পষ্ট ভাষায় লেখে—

"The foundation of an Institute for research in pure science is an event in the history of India. The publication of the Transactions, and first fruits of its activity, shows that it is an event also in the history of science."

৪ স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২৭ নভেম্বর ১৯১৭ তারিখে 'এ বেঙ্গলী ফিজিসিস্ট' নাম দিয়ে এক ব্যক্তি এক পত্র লেখেন। পত্রের উদ্দেশ্য ২৫ নভেম্বর তারিখে বেঙ্গলী পত্রিকায় ডঃ বসুর উপর প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ। বেঙ্গলী পত্রিকার রচনাটিতে ডঃ বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করে বলা হয়েছিল, "পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে তা নূতন পথ উন্মোচন করেছে" ইত্যাদি। সেইসঙ্গে ডঃ বসুর গবেষণাগারকে সাহায্য করার আবেদন জানানো হয়েছিল। স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'বাঙালী পদার্থবিদ্' বলেন, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নূতন পথ উন্মোচনের দাবি ভিত্তিহীন; ডঃ বসু ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, হাইনরিখ হর্টসের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছেন। রেডিও-টেলিগ্রাফের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় সমুদয় গৌরব মার্কনির উপরে আরোপ করে ইনি লেখেন—

"Prof. Bose was only one of the many physicists who were attracted to the study of the subject by the discoveries of Hertz, and while some of his laboratory experiments with waves of very short wave length were undoubtedly interesting, it is incorrect to say that his work opened out any essentially new path in physical science."

এইসব কথাও যথেষ্ট অপমানসূচক মনে হয়নি। ইনি অধিকন্তু জানিয়েছিলেন, ডঃ বসুর কোনো ছাত্র বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক পেপার করতে পারেননি।

দুদিন পরে উক্ত পত্রলেখক স্টেটসম্যানে একই বিষয়ে আরও একটি চিঠি লিখলেন। তাতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের উপরে এক হাত নিয়ে পত্রলেখক জানালেন, দেশীয় কাগজগুলির অভ্যাস, সমস্ত ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক বা আধা-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতকগুলি জিনিসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে, সরকারের কাছ থেকে অকারণে টাকা আদায়ের ফিকির করা। এক্ষেত্রে ডঃ বসুর কাজকর্মকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ফাঁপানো হয়েছে। পত্রলেখকের উদ্দেশ্য, ফাঁপানোকে ফাঁসানো।—

"Prof. Bose's work has been so used and it is so frequently written upon in extravagant language in your contemporaries that I think it would be useful for once to reduce it to its proper dimensions."

এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রথমেই জানালেন, ইউরোপীয় মাপকাঠিতে ডঃ বসু প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক নন। বলার হেতু? ডঃ বসুকে কোনো বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ দেওয়া হয়নি, সম্মানসূচক উপাধি, বা অ্যাকাডেমিক প্রাইজ পাননি, যদিও নিজের বৈজ্ঞানিক কাজগুলিকে অপরের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য বারবার তিনি পাশ্চাত্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর এক্সপেরিমেন্টগুলি বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল, এসব কথা একেবারেই বাজে, তাঁরা ভদ্রতার হাততালি দিয়েছিলেন মাত্র। যে রয়াল সোসাইটিতে ৫০০ সদস্য, সেখানেও তাঁকে সদস্য করা হয়নি, যদিও বারবার তার প্রার্থী তিনি ছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে ডঃ বসুর কাজে গণিত প্রতিভার কোনো ছাপ নেই, যা এইজাতীয় সেরা কাজে অবশ্যই থাকে। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত বা যুক্তিতে একটি নিতান্ত বদ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই তিনি লাফ মারেন, ফলে সিদ্ধান্ত সন্দেহজনক হয়। তার প্রমাণ, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'প্ল্যান্ট' ও তাদের 'নার্ভাস সিসটেমে'র উপর সর্বশেষ রচনায় ডঃ বসুর নামোচ্চারণ পর্যন্ত করা হয়নি। পত্রলেখক পুনশ্চ জানালেন, ডঃ বসুর অধীনস্থ গবেষকেরা কোনো উল্লেখযোগ্য পেপার প্রকাশ করতে পারেননি, এটা তাঁর অযোগ্যতার আর একটি প্রমাণ।

ডঃ বসু নিজে বাদ-প্রতিবাদে পারঙ্গম নন, এবং 'বসু সমর' করবার জন্য (হায়, এবার গৃহযুদ্ধ!) কোনো নিবেদিতা ধরাধামে বর্তমান নেই, অগত্যা আহত ও লজ্জিত হারিতকৃষ্ণ দেব এগিয়ে এলেন। স্টেটসম্যানে ১ ডিসেম্বর তাঁর যে পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখতে পাই, ডঃ বসুকে খাটো করার এই চেষ্টার মূল কারণ স্পষ্টভাবেই লিখেছেন, তা আর কিছু নয়, প্রফেশনাল জেলাসি। তাছাড়া পদার্থবিদের পক্ষে সাধারণভাবে 'প্ল্যান্ট ফিজিয়লজি'র উপরে গবেষণাকে তারিফ করাও সম্ভব নয়। যেমন ডঃ বসু নিজে পদার্থবিজ্ঞানী বলে একদা তাঁর গবেষণাকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন শারীরতাত্ত্বিকেরা। বিজ্ঞানী মহলে ডঃ বসুর আবিষ্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, ও তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নন,— তার জবাবে ইনি লেখেন :

'This however proves nothing more than that the Royal Society is slow to accept far-reaching ideas.'

হারিতকৃষ্ণ তির্যক বিদ্রূপের সঙ্গে লেখেন—'সেখানকার অধিকাংশ ফিজিয়লজিস্ট মনে করেন ডঃ বসু নিছক ফিজিসিস্ট, এবং বাঙালী ফিজিসিস্ট, অতএব তাঁরা প্ল্যান্ট ফিজিয়লজির বিষয়ে তাঁর মত মানতে পারেন না। ইউরোপের বিজ্ঞান-পণ্ডিতদের মধ্যে এক ধরনের জাতিভেদ রয়ে গেছে।' এনসাইক্লোপিডিয়ায় ডঃ বসুর অনুল্লেখের প্রসঙ্গে ইনি জানান, ঐ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯১০ সালে, আর ডঃ বসুর শেষ কাজ 'রিসার্চেস্ অন দি ইরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্টস্' বেরিয়েছে ১৯১৩ সালে, যার মধ্যে সূক্ষ্মতর যন্ত্-

পাতির সাহায্যে তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তকে অখণ্ডভাবে প্রমাণ করেছেন, স্থূলতর যন্ত্রপাতির দ্বারা আগে তা করা হয়েছিল বলে গৃহীত হয়নি। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের উপর ডঃ বসুর কাজ এনসাইক্লোপিডিয়ায় বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয়েছে, এই তথ্য পরিবেশন করে শীতল-ভাবে হারিতকৃষ্ণ বলেছেন, এ ব্যাপারটি 'বাঙালী পদার্থবিদে'র কাছে উপভোগ্য মনে হয়নি বলেই তিনি এড়িয়ে গেছেন। ডঃ বসু ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্. সি., সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছেন, আরও গৌণ বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন, একথা অধিকন্তু হারিতকৃষ্ণ জানিয়েছেন। বাঙালী পদার্থবিজ্ঞানীর অবগতির জন্য তিনি আরও জানিয়ে-ছিলেন, তিনি ডঃ বসুর ছাত্র বা ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট নন। শেষের দিকে তিক্ত বিষাদের সংগে ইনি লেখেন, প্রফেট নিজ দেশে সম্মানিত হন না, এবং 'বাংলা দেশে প্রফেট যাতে কখনো সম্মানিত না হন, তার ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি!'

'বাঙালী পদার্থবিদ্' নাছোড় পত্রলেখক। অপরকে লাঞ্ছিত করবার জন্য বিশিষ্ট মনে যে ব্যক্তি কাজ শুরু করে, সে মধ্যপথে থেমে যায় না। বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধ বাধার বিরুদ্ধে ডঃ বসুকে কিভাবে সংগ্রাম করে পথ কেটে এগোতে হয়েছে, সে ইতিহাস এই ব্যক্তির জানার কথা নয়, কারণ জানার ইচ্ছা নেই। জানলেও ভুলতে বাধা নেই। অতএব ৪ ডিসেম্বর তারিখে এঁর যে উত্তর বেরুল, তাতে দেখা গেল, 'ইলেকট্রো ফিজিয়লজি' গ্রন্থের উপরে 'নেচার' পত্রিকায় কদর্য সমালোচনাটিকে ইনি সুখের সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, (নিবেদিতার পত্রে যার উল্লেখ আগে দেখে এসেছি); জানা গেল, মাঝারি বুদ্ধিমান ছোকরারা ডি. এস. সি. উপাধি পায়, এবং সরকার স্যার উপাধি দেয় নানা অতিরিক্ত কারণে। ইনি উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, নাইটহুডের মূল্য নেই যথার্থ বৈজ্ঞানিকের কাছে, আসল জিনিস সমস্তরের বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি।

যতদূর দেখেছি, হারিতকৃষ্ণ উত্তর দেননি। বলাবাহুল্য গালাগালির জন্য গালাগালির আসরে নামতে তাঁর রুচিতে বেধেছিল। উত্তর কিন্তু এসেছিল, কিছুদিনের মধ্যে, 'বাঙালী পদার্থবিদের' পক্ষে বড় অসুখকর সেই উত্তর। প্রথমতঃ অ্যাবার্ডিন ইউনিভার্সিটি ডঃ বসুকে সম্মানসূচক এল এল ডি উপাধি দিল; তার পরে ১৯২০ সালে রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো করে নিল, যে-সম্মানকে 'বাঙালী পদার্থবিদ' প্রার্থিত বলেও লঘু করে দেখানর চেষ্টা করেছেন ('যে রয়াল সোসাইটিতে ৫০০ সদস্য আছে'), যদিও বিখ্যাত প্যাট্রিক গেডিসের মতে :

> "The honour recognised by men of science throughout the British Dominions as the proudest of all is the award of the fellowship of the Royal Society."

এই সম্মান পাবার জন্য ডঃ বসুকে যুদ্ধসমাপ্ত ইংলণ্ডে ১৯১৯-এর মাঝামাঝি পুনর্বার যাত্রা করতে হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড যাত্রায় সকলেই তাঁকে নিষেধ করেছিল, কিন্তু সংগ্রামী জগদীশচন্দ্র সন্দেহের উপরে সত্যস্থাপনে বদ্ধপরিকর। এই ভ্রমণে অসাধারণ সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হয়। বড় বৈজ্ঞানিক হবার পক্ষে যা যা প্রয়োজনীয় বলে 'বাঙালী পদার্থবিদ্' জানিয়েছিলেন, সবই তিনি পেয়েছিলেন। রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো করেছিল পদার্থবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান, উভয় বিজ্ঞানে দানের জন্যই। মহাভারতের ভক্ত আচার্য জগদীশের মহাকাব্যিক বিজয় এটি। ১৯ বছর আগে রয়াল সোসাইটি যাঁর পেপার প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই পেপারের প্রতিপাদ্যকে সসম্মানে সে বরণ করল মধ্যবর্তী বছরগুলিতে ডঃ বসুর ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলে। অধ্যাপক গেডিস জানিয়েছেন, যে-সব বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের স্বীকৃত রাজপথ দিয়ে হাঁটেন, দ্রুত সম্মান তাঁরা পেয়ে যান; সে সম্মান সবচেয়ে বিলম্বে সবচেয়ে কঠিন পথ বেয়ে আসে ডঃ বসুর মত মানুষের কাছে :

> "Who find themselves impelled over the frontiers as drawn, moving among the conceptions of different sciences and pursuing experiments in territory where, inevitably, they are looked upon as intruders."

এ লেখা হারিতকৃষ্ণের নয় (যাঁর বিষয়ে 'বাঙালী পদার্থবিদ্' বলেছিলেন, তুমি কে হে বাপু, বিজ্ঞানী তো নও!), স্বয়ং প্যাট্রিক গেডিসের।

জগদীশচন্দ্রই ভারতবর্ষে প্রথম '<u>বিজ্ঞানী</u>' যিনি এফ, আর, এস্ হলেন, একথা *টাইমস লিখেছিল; এর আগে শ্রীনিবাস রামানুজম্ এফ, আর, এস্, হয়েছিলেন গাণিতিক* গবেষণার জন্য। আচার্য বসুর সুদীর্ঘ সাধনার প্রশংসা করার পরে টাইমস অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই স্বজাতি-সমর্থনে লেখে, এ'কে সম্মানিত করতে এত যে বিলম্ব হল, এর মূলে কোনো জাতি-প্রশ্ন নেই। টাইমস্ প্রভৃতি পত্রিকার এইসব প্রশংসাবালীর পিছনে বৃহৎ বৈজ্ঞানিকদের সমর্থন ছিল। অধ্যাপক জে আর্থার টমসনের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিখেছিলেন—

"It is in accordance with the genius of India that the investigator should press further towards unity than we have yet hinted at, should seek to correlate responses and memory impressions in the living with their analogous in organic matter, and should see in anticipation the lines of Physics, of Physiology and of Psychology converging and meeting. These are questionings of a prince of experimenters whom we are proud to welcome in our midst to-day."

আমাদের পূর্বপরিচিত অধ্যাপক ওয়েলারের (যিনি 'বাঙালী পদার্থবিদে'র ভাবপিতা) পক্ষে এসবই মর্মান্তিক মনে হয়েছিল। টাইমস্ পত্রিকায় পত্রযোগে তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন, নিজের ভিন্ন অন্য ল্যাবরেটরীতে ডঃ বসু নিজের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করুন। ডঃ বসু তা গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরীতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতে ২৩ এপ্রিল, ১৯২০ তারিখে যে পরীক্ষা দেখান তাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে লর্ড র‍্যালে, অধ্যাপক বেলিস্, ডি, এইচ ব্ল্যাকম্যান, এ জে, ক্লার্ক, ডবলিউ সি ক্লিনটন্, *এফ জি ডোনান টাইমস্ পত্রিকায় ৪ মে তারিখে লেখেন—*

"We are satisfied that the growth of plant tissue is correctly recorded by this instrument, and at a magnification of from one million to ten million times."

জগদীশচন্দ্রের চিরশত্রু 'নেচার' পত্রিকাতেও এই অংশটি উদ্ধৃত হয়েছিল, শুধু তাই নয়, সেখানে আরও লেখা হয়েছিল—

"Sir W. H. Bragg and Professor F. W. Oliver, who have seen similar demonstrations elsewhere, give like testimony that the crescograph shows actual response of living plant tissues to stimulus."

যুদ্ধজয়ী মহাবীর সম্ভ্রম-আকর্ষক একটি পত্র লিখলেন ৫ মে'র টাইমস্ পত্রিকায়—

"যে-সব সমালোচনা ন্যায়বোধকে লঙ্ঘন করে তা জ্ঞানের বিস্তারের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপ। আমার অনুসন্ধানকার্যের বিশেষ প্রকৃতি স্বতঃই অসাধারণ সব বিঘ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, গত কুড়ি বছরে এইসব অসুবিধা বহুলাংশে স্ফীত হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ব্যাখ্যা এবং আরও মন্দ নানা চেষ্টার দ্বারা।... আমার পথে যে-সব বাধাকে ইচ্ছাপূর্বক স্থাপন করা হয়েছিল, এখন তাদের উপেক্ষা করতে পারি, বিস্মৃত হতে পারি। যদি আমার গবেষণাফল কোনো বিশেষ থিয়োরীকে উলটে দিয়ে এখানে ওখানে কোনো কোনো ব্যক্তিকে শত্রুতায় উদ্বুদ্ধ করে, তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ কিন্তু হয়েছে এদেশের বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া উষ্ণ অভ্যর্থনায়।"

ঠিক এই সিদ্ধিক্ষণে যিনি সবচেয়ে আনন্দিত হতেন, তিনি মরজীবনে ছিলেন না। জগদীশচন্দ্রকে তাই বিশ্বাস করতে হয়েছিল, নিবেদিতার বোনকে তিনি সেকথা

লিখেছিলেন—"যদি আমি কাজ সমাপ্ত করতে পারি, সকলে বলছে কোনো একা মানুষের পক্ষে তা সম্পন্ন করা অসম্ভব,—তাহলে সে সবকিছুই হবে আমাদের মধ্যে বিরাজিত জীবন্ত স্মৃতির শক্তিতে।"

*৩ জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য ১১ লক্ষ টাকা দান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ভারত সরকার বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। জীবিতকালে তিনি ১২ লক্ষ টাকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড তৈরী করে যান। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী বাকি সম্পত্তির সাহায্যে তিন লক্ষাধিক টাকার আর একটি ট্রাস্ট স্থাপন করেন। অর্থসংগ্রহে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বের বিষয়ে তাঁর মৃত্যুর পরে স্মৃতি-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"...অবশেষে ঐশ্বর্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হতে পারল।...কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধকরি ভারতবর্ষে আর কখনো পায়নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্তই আপন লোক-বিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেননি। লক্ষ্মীর...আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।"

এ-সবই আচার্যের নিষ্কাম কর্ম, বিজ্ঞান-দেবতাকে হৃদয়ে রেখে যা তিনি করেছিলেন।

** আমি এখানে প্রবাসীর পৌষ, ১৩২৪ সংখ্যায় মুদ্রিত 'জগদীশচন্দ্রের নিবেদন'-এর উপর নির্ভর করেই একথা বলছি। ইংরাজী ভাষণে কিন্তু এই ধরনের কথা বর্জিত। আন্তর্জাতিক প্রচারের জন্য যা মুদ্রিত হয়েছে, তার উপর থেকে একান্ত জাতীয় সংস্কৃতির ছাপ ডঃ বসু মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন মনে হয়। বাংলা ভাষণটি জগদীশচন্দ্রেরই রচনা, কারণ তাঁর ভাষাভঙ্গিতে এটি রচিত; এবং ইংরাজীর সঙ্গে বাংলা ভাষণের কোনো কোনো স্থানে এতই তফাত যে, সে-রকম স্বাধীনতা অনুবাদকের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

*৭ "In all my struggling efforts I have not been altogether solitary; while the world doubted, there had been a few, now in the City of Silence, who never wavered in their trust."

*৮ এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত করা হয়নি। জানিনা তার জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীমহলে কোনো গুঞ্জন উঠেছিল কিনা। বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত গেডিসের বসু-জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের বিশেষ উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথকে ডঃ বসুর পুরুষ বন্ধুদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করে ("Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest has been that with the Poet Rabindranath Tagore") আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে উভয়ের পারস্পরিক সহায়তার বিষয়ে অধ্যাপক গেডিস যা বলেছেন, তাতে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রচারে ডঃ বসুর প্রয়াসের অপেক্ষাকৃত অধিক বিবরণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অপর পক্ষে বাংলা দেশে জগদীশচন্দ্রের জীবন ও সাধনাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টাই শুধু করেননি, অর্থসাহায্য সংগ্রহেরও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, সে বিষয়ে তথ্য আমরা দিয়ে এসেছি। তাই মনে হয়, এই প্রসঙ্গে গেডিসের রচনাংশটুকু রবীন্দ্র-মহলকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করেনি। সে কারণেই কিনা জানি না, নিজের সপ্ততিতম জন্মোৎসবে ভাষণ দিতে উঠে আচার্য বসু জীবিত সহায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহায্যের সর্বাধিক উল্লেখ করেছিলেন। বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাভাষণে জগদীশচন্দ্র লোকান্তরিত কয়েকজনের বিশ্বাস ও সাহায্যের প্রতি যে-ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, জীবিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সেই ভাষাই ব্যবহার করলেন :

"In all my efforts I have not altogether been alone. In days of our common insecurity my life-long friend Rabindra Nath Tagore was with me. Even in those doubtful days his faith never faltered."

(Amrita Bazar Patrika, Dec. 2, 1928)

আচার্য বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। এর সংগঠনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বৃহৎ ভূমিকা ছিল, যিনি আচার্য বসুর ছাত্র, এবং জগদীশ-চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাধনার প্রথম পর্ব থেকেই প্রবাসী ও পরে মডার্ন রিভিউ মারফত আচার্যের কীর্তি-কথা প্রচার করে এসেছেন। আচার্য বসুর প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষে অভিনন্দনপত্র পাঠ করতে উঠে তাঁর নিশ্চয় মনে হয়েছিল, এই অনুষ্ঠানে নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন অবশ্য-কর্তব্য। এখানে উল্লেখযোগ্য নিবেদিতার বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যের তুলনায় নিবেদিতার ভূমিকার বিষয়ে অধিক জানতেন। প্রবাসী পত্রিকার পৌষ, ১৩৩৫ সংখ্যায় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' পাই—

"গত ১লা ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞানমন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।...আচার্য মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমাদের তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র পাঠ করিতে বলা হয়। তাহা পড়িবার পর আমি মৌখিক কিছু বলিতে চাহিয়াছিলাম। তাহার তাৎপর্য এই:

'এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত কেহ হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে সেখান হইতে যোগ দিতেছেন। তিনি এই আশা পোষণ করিতেন, যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও অচিরে জগৎকে নূতন কিছু শিখাইবে। বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান-মন্দির তাঁহার জীবিতকালে নির্মিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেন যে, বসু বিজ্ঞানমন্দিরে নূতন জ্ঞানলাভার্থ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীর আগমন হইবে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। নিবেদিতার সহিত সমসাময়িক সমুদয় ভারতীয় মনীষীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে জানিয়া যেমন তিনি ভারতের প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছিলেন, ও ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য বসুকে জানিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তিনি উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন।"

এর পরে রামানন্দ সূচনাপর্বেই যাঁরা জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম করেন—রবীন্দ্রনাথের ও বিবেকানন্দের। "একত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ("বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে") সেটি, এবং "আর এক মনীষী" বিবেকানন্দের জগদীশ-প্রশস্তি (পূর্বে উদ্ধৃত) পাঠ করেন।

জগদীশচন্দ্রের আর্থিক সংকটের কালে রবীন্দ্রনাথ সাহায্যের যে ব্যবস্থা করেছিলেন, জগদীশচন্দ্রের জীবিতকালে তা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানি না, তবে ডঃ বসুর দেহত্যাগের পরে স্মৃতি-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা বিবৃত করেছিলেন। ঐ ভাষণের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে অথচ গভীরভাবে কিছু বলেন। তা এই—

"এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বভূমিকায়।"

** ১৯০৪ সালে বুদ্ধগয়া ভ্রমণকালে নিবেদিতা যখন বজ্রচিহ্নটি আবিষ্কার করেছিলেন, তখনই কয়েকটি চিঠিতে বজ্রের তাৎপর্যের বিষয়ে লেখেন। তারপরে ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তার কিছু অংশ:

"দেবতারা চরম একটি দৈবাস্ত্র চাইছিলেন। তাঁরা জানলেন যে, যদি এমন কোনো মানুষ পাওয়া যায় যিনি স্বেচ্ছায় নিজের অস্থি দান করে দেবেন, তবেই ঐ অজেয় অস্ত্র নির্মিত হতে পারবে। তদনুযায়ী তাঁরা ঋষি দধীচির কাছে দল বেঁধে গিয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। বিদ্রূপের মত শোনালো তাঁদের কথাগুলি। মহৎ উদ্দেশ্যে মানুষ সব কিছু, শেষ নিঃশ্বাস অবধি, দিতে পারে, কিন্তু তাই বলে নিজের শরীর দান—হোক না ইন্দ্রবজ্র নির্মাণের প্রয়োজন! দধীচির কাছে কিন্তু এটি মোটেই অসম্ভব ত্যাগ নয়। স্মিতহাস্যে দেবতাদের কথা শোনার পরে পরম আনন্দে উত্তর দিয়েছিলেন, সে উত্তর,

মুহূর্তে প্রাণত্যাগ, যার ফলে পড়ে রইল মানবতার প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁহার সর্বোচ্চ দান।

এখানে তাহলে আমরা বজ্রের তাৎপর্য পেয়ে যাচ্ছি। স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র। সে-ই নিঃস্বার্থতার সাধনা আমাদের করতে হবে, যাতে দেবহস্তের বজ্র হয়ে উঠতে পারি। কিভাবে—সে প্রশ্ন আমাদের নয়। হিসাব-নিকাশও আমাদের জন্য নয়। আমাদের জন্য শুধু রয়েছে বেদীমূলে আত্মদান। বাকি কাজ করবেন দেবতারা। তাঁরাই বহন করেন আমাদের। বজ্র দুর্ভেদ্য নয়, দুর্ভেদ্য সেই হস্ত যা বজ্র ধারণ করে। মা! মা! আমাদের অহংকে দূর কর। যশের, লাভের, দেহসুখের আধিপত্য যেন আমাদের উপর না হয়। তুমি সূর্যকিরণ, আমরা যেন তোমার তাপে বিলুপ্ত হয়ে যাই।"

নিবেদিতা-নির্দেশিকা

নিবেদিতা, ভগিনী

জীবন ও ব্যক্তিত্ব

আবৃত্তি ৪৫। চিতাভস্ম ৬৩-৬৪। চিত্র ৩৫-৩৬, ৩৮, ৭২, ৩০২, ৩১৩। ছদ্মনাম ২১, ৩৫। ডাকনাম ৩৪। বংশলতিকা ১৬। ভ্রমণ—কেদারবদরী ৩৪৭-৫৩। মূর্তি ৩৯১। স্মৃতিকথা—মেরী উইলসন ১৬, ২৪-৪০ ; রিচমন্ড নোবল ৪১-৫০ ; লেডী ইসাবেল মার্গসন ১৬৪ ; ই টি স্টার্ডি ১৬৩-৬৪ ; এরিক হ্যামণ্ড ১৬৪-৭১—বঙ্গানুবাদ ১৬৮-৭১। স্মৃতিভাণ্ডার ৩৮৩। মিসেস ওলি বুলের উইলের মামলা ৩৬০-৬২, ৩৬৪-৬৬। [আরও দেখুন প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, লিজেল রেমঁ, সরলাবালা সরকার, জিন হারবার্ট]

পত্রাবলী

নিবেদিতা লিখিত :

অবলা বসু ৩০৪-০৫ ; অরবিন্দমোহন বসু ২৬৩-৬৫ ; মেরী উইলসন ৬১-৬৩, ৭১-৭৫, ৩১৩, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬৫ ; গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৩১৬, ৩২৩-২৪, ৩২৭-২৮ ; ক্যানন চেনী ৬০, ৩৫৩-৫৪, ৩৫৯-৬০, ৩৬৪ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭২-৭৭ ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৭২ ; মিস অ্যালিস এম লংফেলো ৩৭০-৭৩ ; মিসেস লেগেট ৩৪২, ৩৭০ ; মিস্টার লেগেট ৫৭ ; নেল হ্যামণ্ড ৫৩-৫৪, ৬৫-৬৬, ২২২। [আরও দেখুন মিসেস ওলি বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড]

নিবেদিতাকে লিখিত :

জগদীশচন্দ্র বসু ২৪৩-৪৪, ২৬২ (?), ৩৩১ (?), ৩৭৭ ; রিচমন্ড নোবল ৭৮ ; মিসেস ওলি বুল ৩৩৩-৩৬।

প্রসঙ্গ আলোচনা

মেরী উইলসন (বোন) ৬৫-৭৫, মেরী ইসাবেল নোবল (মা) ৫২-৬৩ ; রিচমন্ড নোবল (ভাই) ৭৬-৮২।

ভাষণ

কলিকাতা বিজ্ঞানে হিন্দু মন ২৯৪-৯৭ (জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে) বোম্বাই ২৯৭-৯৮ (জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে) মাদ্রাজ ২৮৯-৯৩ (জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে)

রচনা

অ্যাম্বুলেন্স ওয়ার্ক ১৪৭-৪৮ ; ইজ ম্যাটার অ্যালিভ ২৭৯-৮৮ ; ইণ্ডো এরিয়ান মিথস ১৭ ; এনসেন্ট অ্যাবে অব অজন্তা ৩৪৮ ; এলিফান্টা—দি সিনথিসিস অব হিন্দুইজম ৩৪৮ ; ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ ১২, ১৪-১৫, ১৮, ৭২, ৭৮, ২৫০, ২৭৯, ৩০৬, ৩০৮, ৩১৩ ; কয়লাখনি দেখে আসা (এ ভিজিট টু এ কোল মাইন) ১১১-১৬—আলোচনা ১০৯-১১ ; ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম ১২,

১৪-১৫, ২৫০, ৩০৬, ৩৩৯ ; চার্টম্যান ডায়ার্স ইন্টারলোপার ১৫ ; ডাইনী পাওয়া (হ্যাগ-রিডন) ১০৫-০৯—বঙ্গানুবাদ ১০০-০৫ ; ডায়েরি প্রসঙ্গ ২১-২২ ; এম্পারার অব জার্মানি অ্যান্ড কিং অব প্রাসিয়া ১৫ ; নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংসে উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ ৬২ ; পেজ ফ্রম রেক্সহ্যাম লাইফ ১৫০-৫৪— আলোচনা ১৪৯-৫০ ; পেপার্স অন উইমেন্স রাইটস : ১ দেয়ার রাইট টু বি বিউটিফুল ১২৩-২৬ ; ২ দেয়ার রাইট টু সার্ভ ১২৬-৩০ ; ৩ দেয়ার রাইট টু চুজ (হাউসেস) ১৩০-৩৩ ; ৪ দেয়ার রাইট টু অ্যাডভান্স ১৩৩-৩৭ ; ৫ দেয়ার রাইট টু নো ১৩৭-৪৩—আলোচনা ১১৬-২৩ ; ফ্রেনলজি অ্যান্ড ফিজিওলজি ১৫৪-৫৮ ; মাস্টার অ্যাজ আই স হিম ১২, ৩৪, ১৫৯, ৩৪৬, ৩৮৮—আলোচনা ক্যানন চেনী ৩৫৯-৬০, ৩৭৫ ; 'মিথস অব দি হিন্দুজ অ্যান্ড বুদ্ধিস্টস' ১৭ ; রেক্সহ্যাম ফ্রি লাইব্রেরী ১৪৩-৪৬ ; শিশু খ্রীস্ট (দি খ্রাইস্ট চাইল্ড) ৯৮-১০০—আলোচনা ৯৬-৯৮ ; সারা চাপম্যান বুল ১৯০-৯৬, ৩৬৫ ; সিভিক অ্যান্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস ১৭ ; স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম ১৭-১৮ ; স্টোরি অব দি গ্রেট গড ২৫০। ['আচার্যদেব' দ্রঃ মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' দ্রঃ নোটস অব সাম ওয়্যান্ডারিংসে উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ]

শোকবার্তা

ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট ১৩-১৪ ; টাইমস ১২-১৩ ; নেশন ১৩।

শ্রদ্ধার্ঘ

অবলা বসু ৩৮২-৮৯ ; জগদীশচন্দ্র বসু ৩৮০ ; এলিস এম লংফেলো ৩৭৪-৭৬ ; এস কে র‍্যাটক্লিফ ১৪-১৫।

নিবেদিতা

—এবং জগদীশচন্দ্র বসু ১৯৭-৩১৬।

—এবং মিসেস ওলি বুল ১৮৬-৯০।

সাধারণ নির্দেশিকা

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০৭-১০
অতুলানন্দ, স্বামী ৩১২
অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী ৩০৯-১২
অবলা বসু ২১-২৩, ৪৩, ৪৯, ৫৫, ২১১, ২১৩, ২১৯, ২৩৯, ২৪২, ২৫০, ২৫২, ২৫৪-৫৭, ২৬১, ২৬৬, ২৬৯, ২৭৩, ৩০৩-০৪, ৩১২, ৩২১, ৩২৪, ৩২৬, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৬৪, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৯১, ৩৯৬
'অবলা বোস অ্যান্ড হার লাইফ অ্যান্ড হার টাইমস্' ৩৮৪
অভেদানন্দ, স্বামী ১৫৯-৬০
অমিয়কুমার মজুমদার ২৭২
অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৮, ১৯০, ২০৫, ২০৯, ২৮৯, ২৯৪, ৩৭৭, ৪০১
অরবিন্দমোহন বসু ২৬৩-৬৫, ৩০৯, ৩১৫, ৩২০
অলিভার, এফ ডবলিউ ৪০০
অসিতকুমার হালদার ৩৪৮
অ্যাডমস, জেন ১৭৭, ৩৮৭
'অ্যাথিনিয়াম' ৩৯৭
অ্যানী ২৮-২৯
অ্যাপলটন ৩৮
অ্যাপ্যায়সন ২১৪
অ্যাভেরবী, লর্ড ৩২৯
অ্যাশটন জনসন, মিসেস ১৫৯-৬১

আত্মপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ২২-২৩, ২১০, ৩৩৯, ৩৬৩, ৬৭৭
আনন্দকুমার স্বামী ১৭
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৭
আনন্দমোহন বসু ২৬১, ২৬৩, ৩১২
'আমেরিকান বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' ৩৪৩
আর্ল, মিস্টার ৩২৮
আলেকজান্ডার, এফ জে ৩৬৯

'ইউনিভার্সাল রেসেস কংগ্রেস' লন্ডন ১৫
'ইনকোয়ারার' ২৫৯
'ইন্ডিয়ান মজলিশ, কেমব্রিজ' ২০৯-১০
'ইন্ডিয়ান মিরর' ২৯৪
'ইন্ডিয়ান রিভিউ' ১৭
'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' ২৯৭
'ইন্ডিয়ান স্পেকটেটার' ২০৭
'ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন' ২৫০
'ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব ফিজিসিস্ট' ২৪১
'ইলেকট্রিসিয়ান' ২০২, ২৪৬

'উইমেনস্ কোঅপারেটিভ সোসাইটি' ৩৮৩
'উইম্বলডন নিউজ' ৩৪
উইলকক্স, এলা হুইলার ৩৬৬
উইলকিনস্, মিস ২১৪, ২১৬, ২৩৯
উইলসন, আর্নেস্ট ৬০-৬১, ৭০-৭১, ৭৩-৭৪, ৮১
উইলসন, গাই ফ্রীটউড ৩৪৫
উইলসন, মেরী ১১, ১৬-২৪, ৫২, ৫৪, ৫৮-৬৩, ৬৫-৭৫, ৮১, ৯৫, ১৬৪-৬৫, ১৯৮, ২১৬, ৩১৩, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৯-৫০, ৩৫৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭৭-৭৮, ৩৮০-৮২, ৩৯১ [দ্রঃ নিম, রেন]
উইলসন, সিসিলি ১৮-১৯, ২১, ৬৫, ৭৪, ৯৫

উইলি, মিস ২৫১
উইলিয়ামস, এস ফ্রেচার ২৫৮-৫৯
উডবার্ন, জন ২৯৭

এ. কে. মজুমদার ৩৩১
এ. দত্ত ২৫৯
এডউইনা ৩৫৯
এমার্সন ১৬৯
'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' ২০২
এস্টেয়ে, ডি. মিস ৩৩

ওকাকুরা ৩০১-০২
'দি ওয়ারলড্ অ্যান্ড দি নিউ ডিসপেনসেশন' ২৫৮
ওয়েলার ২৪৭, ২৫১, ২৭৬, ২৯৫, ৩০৯, ৩২৯, ৪০০
ওয়েলারস্টিন, মাদাম ৩২৭
'ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেট' ১৩-১৪

'কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিয়লজি—এ ফিজিকো-ফিজিওলজিক্যাল স্টাডি' ৩০৬-০৮, ৩২২, ৩২৮, ৩৩৯
কলিনস্, মিস ৩১
কল্পলতা, ব্রহ্মচারিণী ৩২২
কারমাইকেল, লর্ড ৩৮১
কার্জন, লর্ড ৩৫, ৭৩, ৩৭৭
কালভে, এমা ২৪১
কালীচরণ কর্মকার ২৪
কুক, এবেনিজার ৩৮, ৪৯, ২৫৩
কৃষ্ণমূর্তি ৩৪
কেয়ারহার্ডি ৩৮৭
কেন্সিন, লর্ড ২০৩, ২০৬, ৩৪০, ৩৮৭
কেশবচন্দ্র সেন ৩৮৩
ক্রপটকিন, প্রিন্স ৩৮, ২৪১, ২৭৪, ৩৮৭
ক্রফট, অ্যালফ্রেড ২০০
ক্রিস্টিন সিস্টার ৩৫, ৬৮, ৭৩, ৩১২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৮, ৩৪৮, ৩৫৪-৫৭, ৩৬৯, ৩৭৮-৭৯ [দ্রঃ গ্রীনস্টাইডেল ক্রিস্টিন]
'ক্রিস্টো-থিয়জফিক্যাল সোসাইটি' ১৬৯
ক্রুকস, উইলিয়ম ২৪৬-৪৭, ২৭৫
ক্র্যাব ৩৭
ক্লার্ক, এ জে ৪০০
ক্লিনটন, ডবলিউ সি ৪০০

খ্রীস্ট, যীশু ৪৯, ৬৪, ৯৮-১০০, ৩০১, ৩৬৫

গগনেন্দ্রনাথ ১৭-১৮, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৭০
গারনেট ২৭৬
গিবসন, মিসেস ৬৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২১৫
গুডউইন, জে জে ১৬৩
গেডিস, প্যাট্রিক ৩৫, ৩৮, ১৯৭-৯৮, ২০১-০২, ২১৩, ২২২, ২৪১, ২৪৪-৪৫, ২৪৯-৫০, ২৫৬, ২৭১, ৩১৯, ৩২৫-২৬, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৭-৪৮, ৩৬৩, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০১
গেডিস, মিসেস ৩২০
গোখলে, গোপালকৃষ্ণ ৭৩, ১৯৭, ৩১৬, ৩২৩-২৫, ৩২৭-২৮, ৩৩৯
গোপালের মা ৫৭, ৯৬, ১৮৩, ৩৮৫
গ্রিভলে ৩০০
গ্লাডস্টোন ৯৬

ঘনানন্দ, স্বামী ৩৬-৩৭

'চিঠিপত্র' (ষষ্ঠ খণ্ড) ২৭০, ২৭২, ৩২৬
চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশবন্ধু ৩৮৩
চিডলি, মিস ৩২
চেইনী ক্যানন ৬০, ২৪৯, ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৭৫, ৩৮৭
চেইনী, মিসেস ২৪৯

জগদানন্দ রায় ২৭২
জগদীশচন্দ্র বসু ১৭-১৮, ২০, ২২-২৩, ৩৪-৩৬, ৩৮-৩৯, ৪৪, ৪৯-৫০, ৫৫, ৬৩-৬৫, ৭২-৭৪, ১৭১, ১৮৫, ১৮৮, ১৯৮-৪০২
জগদীশচন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকা ১৯৮, ২০২, ২৩৯-৪০, ২৪৫, ৩৩৯
জনসন, এথেল ১৬১-৬৩
জর্জ হ্যারাপ অ্যান্ড কোম্পানী ১৭

জে ডি দত্ত ২৮৯
জেনস, লুইস জি ১৯৫
জে বি ৩৩২
জেমস, উইলিয়ম ১৭৭, ২৪১, ৩৮৭
জ্যাক ২৪৯

টনী, সি এইচ ২০১
টমসন, জে আর্থার ৩৮, ২৭৪, ৪০০
'টাইমস' ১২-১৪, ২০৩, ২০৭, ৩৯৭, ৪০০
টাটা, জামসেদজী ২৪৩, ২৬১, ২৭১
'টাটা স্কিম' ২৫৩, ২৬২
টেসলা, নিকোলা ২৪৩, ৩৮৭
ট্রাভেস, গ্রাহাম ২১৩

ডিগবি ৭৪
'ডেইলী ক্রনিকল' ১৬১
'ডেইলী নিউজ' ১৪, ৩৩
ডেভিস, ডি ডি ২৫৮
ডেমিডফ, প্রিন্সেস ২৪১
ডো, জর্জ এম ৬৪
ডোনাল, এফ জি ৪০০

তরু দত্ত ২৫৪
তিলক, বালগঙ্গাধর ৭৪, ২০৬, ২৪৩
তুরীয়ানন্দ, স্বামী ৪০
ত্রিপুরা, মহারাজা ২৬৯

থরো ১৬৯
থর্প, জোসেফ ১৭৬
থর্প, জোসেফ জি ৩৫, ১৭৫-৭৬, ৩৪২, ৩৬০-৬১, ৩৬৫
'থিওজফিস্ট' ২০৬

দাদাভাই নওরোজী ২৮৯
দুর্গামোহন দাশ ৩৮৩
দেবমাতা, সিস্টার ১৯৮, ৩৪৪
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪৩
দেবেন্দ্রমোহন বসু ৩২০, ৩৮৪

নন্দলাল বসু ৩৪৮
নরেন্দ্রনাথ সেন ২৯৬

'নর্থ ওয়েলস গার্ডিয়ান' ৯৫, ১২৩, ১২৬, ১৩০, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২১২
নারায়ণী দেবী ১৯৭
'নিউইয়র্ক ইভনিং জার্নাল' ৩৬৬
'নিউ স্টেটসম্যান' ৩৫
নিকলসন, মিস ৩৫
নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (বাংলা) ১৯৭, ৩২৩
নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (ইংরেজী) ২৭২, ৩৬১
নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ৩০৮, ৩৪৫, ৩৬১
নিশি সেন ২৮৯
নীলাস, এলিজাবেথ ২৬
নীলাস, মার্গারেট ৪৬
'নেচার' ৩২২, ৩৩১, ৩৪১, ৩৯১, ৪০০
নেভিনসন, হেনরি উড ৩৬২-৬৩, ৩৮৭
নেশন ১৩
নোবল, জন ২৬
নোবল, জর্জ ২৭
নোবল, জিরাল্ড ৩৪
নোবল, মেরী ইসাবেল (হ্যামিলটন) ২৪, ২৭, ৫১-৫২, ৫৪, ৬৮, ২৫২, ৩৬৭
নোবল, রিচমণ্ড ১১, ১৬, ১৮, ২০-২১, ৩১, ৩৫-৩৬, ৪০-৪১, ৫৪, ৬০, ৭৫-৮২, ৯৫, ১১৮, ২৬৫
নোবল, স্যামুয়েল রিচমণ্ড ১২, ২৪, ২৭, ৫১, ৬০
নোবেল ৭৬

পরমেশ্বরলাল ৭৩, ৭৮
পাদশা ২১৩, ২২০
'পায়োনীয়ার' ২০৫
পেভসে, ডি ডি ১৯৭, ৩২৩
প্যাস্টন, মিস ৬৮
প্রবাসী ২১৭, ৪০১
'প্রবুদ্ধ ভারত' ৩৭, ৬৪, ১৬৮, ১৭৭, ২৪২, ৩০৯-১২, ৩২২
প্রসন্নকুমার রায় ৩৮৩
প্রেমঘনানন্দ, স্বামী ১৮-১৯
'প্ল্যান্ট রেসপনস্ অ্যাজ এ মিনস্ অব

ফিজিওলজিক্যাল ইনভেসটিগেশন' ৩০৬

ফস্সেট ২০০
ফাব্বি, মিসেস ৬৮
'ফিলজফিক্যাল ট্রানজাকশন' ৩১৩, ৩১৫
ফেরার ৩১৩
'ফেলো ট্রাভলার্স' ২১৩
ফ্রেজার ৩২৯

'বঙ্গদর্শন' ২৭২
বজ্রচিহ্ন ৩০৮, ৩১৪, ৩৯০, ৩৯৫, ৪০২
বনি, মিসেস ৩৭২
'বম্বে গেজেট' ২০৪
বশীশ্বর সেন ৩৫, ৩৯১
বসু বিজ্ঞানমন্দির ১৯৭-৯৮, ২৪১, ৩২৬, ৩৬২, ৩৮০-৮১, ৩৯০-৪০২
বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট ৩৭৪
বাউই, ডব্লিউ কোপল্যান্ড ২৫৮
বাকিং হ্যামশায়ার, আর্ল অব ১৬৪
'বাণীমন্দির' ৩৮৩
বামাসুন্দরী ১৯৮
বার্ক, মেরী লুই ১৭৫-৭৭
বার্কলি, ই আর ৫৯-৬০
বার্ডউড, জর্জ ২৬২
বার্ণসটীন এডওয়ার্ড ৬৪
বার্ণহার্ড, সারা ২৪১
বি সি চট্টোপাধ্যায় ২৫৮-৫৯
বি সি ঘোষ ২৫৮
বিদ্যানন্দ, স্বামী ১৭৭, ২৪২
বিদ্যাসাগর বাণীভবন ৩৮৩
বিপিনচন্দ্র পাল ২৪০-৪১
'বিবেক লাইব্রেরি' ১৬০
বিবেকানন্দ, স্বামী
জীবনী ও ব্যক্তিত্ব :
এরিক হ্যামণ্ডের স্মৃতিকথা ১৬৫-৬৮
রচনা 'অনযোগ' ৩৭২ ; 'পরিব্রাজক' ২৪২
সাক্ষাৎকার
—এবং মিসেস ওলি বুল ১৭৭-৮৬
—এবং জগদীশচন্দ্র বসু ২০৯, ২১৭, ২২১, ২৩৯
'বিবেকানন্দ ইন ইন্ডিয়ান নিউজপেপার্স' ২০৭, ২০৯
বিয়েট্রিস ৮০
বিরজানন্দ, স্বামী ৩১২
'বিশ্ববিবেক' ১৭৭
বীটী অক্টেভিয়াস ৩৪, ৪৯
বুকানন ৩৩১
বুদ্ধদেব ৬৪, ১৬২, ৩১৪, ৩৬০, ৩৭৯
বুল, ওলি ৩৬, ১৭৫-৭৭, ১৮৮, ১৯২-৯৪, ১৯৩
বুল, ওলি (মিসেস) ২১-২২, ৩৪-৩৫, ৩৭-৩৮, ৪০, ৫১, ৫৬-৫৯, ৬৩, ৬৬, ৬৯-৭০, ৭৬, ৮২, ১৭১, ১৭৫-৯৬, ২১২, ২১৪-১৭, ২১৯, ২৩৯-৪০, ২৪৩-৪৪, ২৪৮-৫০, ২৫৩-৫৬, ২৬১-৬২, ২৬৯-৭১, ২৭৭-৭৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩১৩-২২, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৯-৩১, ৩৪০-৪৪, ৩৪৭, ৩৫৩-৫৯, ৩৬১-৬২, ৩৬৪-৬৫, ৩৬৭, ৩৭২-৭৩, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮১-৮২, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯৪ [দ্রঃ ধীরামাতা, বুল সারা.]
—এবং নিবেদিতা ১৮৬-৯০
—এবং বিবেকানন্দ ১৭৭-৮৬
বুল, ওলিয়া ৬১, ১৭৬, ৩৫৩, ৩৫৭-৫৮, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭০
'বেঙ্গলী' ৪১, ২০৬, ২৪১, ২৮৮, ২৯৪, ৩১৬
বেঙ্গলী ফিজিসিস্ট ৩৯১, ৩৯৭-৯৯
বেটা ৭২, ৩০৫
বেদান্ত সোসাইটি, লন্ডন ১৫৯-৬০
'বেদান্ত কেশরী' ১৬৫
বেলিস ৪০০
বেশান্ত, অ্যানি ২৯৭
ব্যাবিট আরভিং ১৭৭
ব্যারেট ২৪৬
ব্যাসেট, এবি ৩৩১
'ব্রহ্মবাদিন' ১৫৯, ১৬১-৬২, ১৬৬
ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ৩৫, ১৮৩ [দ্রঃ রাখাল]
ব্রাউনি, শ্যাসটন ১৬০
ব্রাডফোর্ড বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ২৪৬,

২৫১
ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ৩৮৩
ব্র্যাগ, ডবলিউ এইচ ৪০০
ব্রেয়ার, এফ জে ৩৮৭
ব্ল্যাকম্যান, ভি এইচ ৪০০

ভগবানচন্দ্র বসু ১৯৮
ভাইনস ২৪৭, ৩২২
'ভারততীর্থে নিবেদিতা' ৩৪৫
ভুবনেশ্বরী দেবী ৩৬৭
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৪০
ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৩২৮-২৯

'মডার্ন রিভিউ' ৪১, ১৯০, ৩৬৫, ৩৮২-৮৪, ৪০১-০২
মন্টেগু, অ্যালবার্টা ৩৬, ৭০
মরিস ফ্রেডারিক ডেনসেন ৪৮-৪৯
মর্লি, আর্ল ৩৮৭
মহম্মদ ৩০১
মহাজন সভা, মাদ্রাজ ২৮৯
'মাদ্রাজ টাইমস' ২০৫
মাল্টার বার্গ ১৭৭
'মারহাট্টা' ২০৬-০৭
মার্কনি ২৭৪, ২৯০, ৩৯৭
মার্গসন, লেডী ইসাবেল ৩৪, ৩৮, ১৬৪, ২৪৯, ২৫৪
মার্গসন, ডেভিড ৩৪
মার্গসন, মার্টিমার ১৬৪
মিন্টো, লর্ড ৩২৯, ৩৪৫, ৩৮৭
মিন্টো, লেডী ৩৪৪-৪৫, ৩৮৭
মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ১৯, ৫৬, ১৫৯, ২৫০, ৩৬১, ৩৬৩
মুরহেড ২৭৫
মুলার, হেনরিয়েটা ৩৪
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৯৫, ২২০, ২৫৪
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামসে ৩৩, ৩৮৭
ম্যাকনীল, রোনাল্ড ৪৬, ১৬৪
ম্যাকলাউড, জোসেফিন ১১, ১৮-২৩, ৩৬-৩৯, ৫২-৫৩, ৫৬-৫৮, ৬১, ৬৬-৬৮, ৭০-৭১, ৭৬, ৭৮-৮০, ১৭১, ১৮৬-৮৯, ২১২-১৭, ২১৯, ২২১-২২, ২৩৯, ২৪৮-৫৩, ২৫৭-৫৯, ২৬১, ২৬৩, ২৭০, ২৭৮, ২৯৯-৩০০, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮-০৯, ৩১৩-১৪, ৩১৬-১৮, ৩২০-২২, ৩২৪-২৮, ৩৪০-৪৬, ৩৪৯-৫০, ৩৫৩-৫৬, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৩-৬৬, ৩৬৮-৬৯, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮৫, ৩৮৮ [দ্রঃ জয়া, ট্যান্টিন, যুম]
ম্যাকসিম, হিরাম ২৪২
ম্যাক্সওয়েল, ক্লার্ক ২৮৩, ৩৯৭
ম্যাগী ২৮

রইস, জোসিয়া ১৭৭
রণজিৎ সিংহী ২০৭-১০
রঁদ্যা ২৪১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৭, ২১০, ২১৭, ২৪০, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১, ২৬১, ২৬৬, ২৬৮-৭১, ২৭৩, ৩০৮, ৩২৬, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯৫, ৪০১-০২
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮, ১৯৪, ২৭০-৭২, ২৮৮-৮৯, ৩৪৫
রয়াল ইন্‌স্টিটিউশন ২৪৬-৪৭, ২৫৮, ২৬১, ২৬৩, ২৬৯, ২৮২-৮৩, ২৮৭, ৩৩১
রয়াল সোসাইটি ২০২, ২০৮, ২৪৬-৪৭, ২৫২, ২৭৪, ২৭৭, ২৮২, ৩০৭, ৩০৯, ৩৩২, ৩৯৮-৯৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস ৬০, ৮২, ১৬৫, ১৮১-৮২, ১৮৪-৮৫, ২০১, ২১৭, ২২২, ২৫৭, ২৫৯-৬০, ৩০১, ৩০৫, ৩০৮, ৩১৫-১৬, ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৫৯-৬০, ৩৬৩-৬৪
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ৩৬৬
রামকৃষ্ণ মিশন ১৬০-৬১, ১৬৫, ২৯৮, ৩০৯
'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' ১৭৮
রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ৩৬৮
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯৭, ৪০১-০২
রামানুজম, শ্রীনিবাস ৪০০
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৭২
রাসকিন ৩৮
রিচার্ড, আইভন ২৫৯

রিপন, লর্ড ২০০, ২৪৯
রিপন, লেডী ৪৫-৪৬
'রিভিউ অব রিভিউজ' ৩৩, ২৭৮
'রিসার্চ' ১১-১২
'রিসার্চেস্ অব দি হেরিটেবিলিটি অব প্ল্যান্টস্' ৩৯৮
'রেক্সহ্যাম অ্যাডভারটাইজার' ১৪৯
রেমঁ, লিজেল ১১, ১৯-২০, ২২-২৪, ৪১-৪২, ৬৩, ৬৫, ৯৫-৯৬, ১৪৩, ১৬১-৬৫, ১৮২, ১৯৭, ২৬৫, ৩৫৭, ৩৭৪, ৩৭৬-৭৭, ৩৮২-৮৩, ৩৮৭, ৩৯১
'রেসপন্স অন দি লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং' ৪৯
'রেসপন্স অব ইনঅর্গানিক অ্যান্ড লিভিং ম্যাটার' ২৪৪
রেসপন্স অব ম্যাটার ২৭৯
রেসপন্স ইন লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং ২৭৬-৭৭, ৩০৬
রোলাঁ, রমাঁ ৫২
র‍্যাটক্লিফ, এস কে ১১, ১৪, ১৭-১৮, ২১, ৩৫, ১৬৪, ১৯৮, ৩০২, ৩৪৭, ৩৬২, ৩৬৮-৬৯, ৩৮৭, ৩৯৬
র‍্যাফেল ৯৬, ১১৮
র‍্যালে, লর্ড ২০২-০৩, ২৪৯, ২৭৫, ৪০০

লংফেলো, অ্যালিস এম ৩৬, ১৩৬, ১৭৭, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৮৯
লকউড, মিস ৩০৫
লঙম্যান ১৭-১৮
লঙম্যান, গ্রীন অ্যান্ড কোম্পানি ১৭, ২৭৯
লজ ২৪৬, ২৭৫, ২৯৫
'লাইফ অব ওলি বুল' ১৭৫-৭৬
'দি লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ, বাই হিজ ইস্টার্ন এন্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপল্স' ২৪২
'দি লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অব স্যার জগদীশ সি বোস' ১৯৮
লাওয়েল ২৪৯
লাজপত রায়, লালা ৩২৭
লাফোঁ, ফাদার ১৯৯
'লিভারপুল সায়েন্স ক্লাব' ৪৫
লীড, ডি ৩২
'লীনিয়ান সোসাইটি' ২৪৭
লুথার, মার্টিন ১১০, ১১২
লেগেট ৪০, ৫৭-৫৮, ১৮৩, ২৪১, ২৪৯, ৩৪২
লেগেট, মিসেস ৩৬-৩৭, ৫৬, ৭৬, ২৪৯, ৩৪১-৪২, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৭ [দ্রঃ বেটী লেডি]
ল্যান্ড জন ৩৮৭

শঙ্করাচার্য ১৮০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ৩২৩

'সঞ্জীবনী' ৩৩১
সদানন্দ, স্বামী ৩৫, ৩৫৫, ৩৬৭
সরলা দেবী চৌধুরাণী ৩৩২
সরলা রায় ৩৮৩
সরলাবালা সরকার ১৮
সাটার, মিস ১৮৩
সান্ডারল্যান্ড, জে টি ২৫৮
সাধনা আশ্রম ৩৮৩
সারদাচরণ মিত্র ২৯৪
সারদাদেবী ৩৪-৩৫, ৫১, ৫৩, ১৮৬, ২৫৯, ২৬৩, ৩০৫, ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৬৮
সারদানন্দ, স্বামী ২১, ১৭৮, ১৮২-৮৫
সিদ্ধেশ্বরানন্দ, স্বামী ২৩
সিসেম ক্লাব ১২-১৪, ৩৩, ৪৫-৪৬, ২৫৪
'দি সিস্টার নিবেদিতা লীগ অব হেল্প ফর ইন্ডিয়া' ৩৪
'সুখ সমিতি' লন্ডন ২৮৯
সুনীলবিহারী ঘোষ ১৯৭, ৩২৩
সুন্দরম আয়ার ৩৫
সুভাষচন্দ্র বসু ৩৮৮
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭২
সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস ২০৮
সেজউইক ২৪৯
সেজরিক ৩৪২
সেভিয়ার ৩১২, ৩২২, ৩২৪, ৩৬৯
স্টাম, মড ৩৫, ৩১৩
স্টার্ডি, ই. টি ৬৮, ১৫৯-৬০, ১৬২-৬৪, ১৬৯
স্টেইন, গারট্রুড ১৭৭

স্টেটসম্যান ৩৩২, ৩৯২, ৩৯৭-৯৮
স্টেড, উইলিয়ম ৩৩, ৬১, ৭২, ২২২, ২৭৮, ৩৮৭
স্টেপলি, রিচার্ড ১৬৯
'স্পেকটেটার' ২০৩
স্পেনসার হার্ভার্ট ৩০৯
স্মিথ, মর্টিমার ১৭৫
স্যাডলার, মাইকেল ৩৩
স্যান্ডউইচ, আর্ল অব ৩৬, ৩৪১ [দ্রঃ মন্টেগু, জর্জ]
স্যান্ডারসন, বার্ডন ২৪৭
স্বরূপানন্দ, স্বামী ২১৩

হর্টম, হাইনরিখ ৩৯৭-৯৮
হল্যান্ড স্কট ৪৮
হাউ, জুলিয়া ওয়ার্ড ১৭৭
হাউই ২৬০, ৩৮৭
হান্টার, উইলিয়ম ২০৭-০৯
হারউড, জে ২৫৮
হারবার্ট, জিন ১৯-২০, ২২-২৪, ৪১-৪২, ১৬২-৬৫, ২৬৫, ৩৮২-৮৩
হারিতকৃষ্ণ দেব ৩৯৮-৯৯
হিগিনসন, টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ ১৭৭
'হিবার্ট জার্নাল' ৩৫৯, ৩৭৫
হিয়াসাহ, পিয়ের ২৪২
হুইটম্যান, ওয়াল্ট ১৬৯, ২৬৪-৬৫
হেক্তিসাইড ৩৩১
হেল, মেরী ১৭৯, ২৪২
হেলিস, মিসেস ৩৫৬-৫৭
হোবার্ট, লর্ড ১৬৪
হ্যান্ডেল ৩৮
হ্যামন্ড, এরিক ১১, ১৫৯-৬০, ১৬৪-৭১
হ্যামন্ড, নেল ৩৭-৩৮, ৫৩, ৬৫, ৬৭, ১৬৪-৭১, ১৮৬, ২২২
হ্যামলিন, মিস ১৭৯
হ্যামিলটন, রিচার্ড ২৭
হ্যারিয়োম, লেডী ৩৪৮